CVIL- HO2000-34- P36148

(34)

P36,148

ভারতীয় ঐতিহ্য

দ্বিতীয় ভাগ

(পরিবর্ধিত সংস্করণ)

ইতিহাস ইতিহাস-চর্চার ও ঐতিহাসিক বিষয় বহুতে নিযুক্ত হইয়া মনে হয়। নিম্ন [illegible] প্রাচীন ভারতের [illegible] ইতিহাসের নূতন [illegible] ভারতীয় [illegible] ইহা [illegible] হইয়াছে। এখন [illegible] ইহা [illegible] [illegible] [illegible]

সম্ভব। অতএব গৌড়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আলোচনার উপলক্ষেই আমরা শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ গিরির গ্রন্থাবলীর বিষয় বিবৃত করিব।

শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ গিরি এযাবৎ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি লিখিয়াছেন বলিয়া সুপরিচিত।

১। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, ২। [illegible] তত্ত্বসংগ্রহ, ৩। ষাট্‌কৌশম, ৪। সাধনসূত্র, ৫। ষট্‌চক্রনিরূপণ, ৬। [illegible], ৭। [illegible], ৮। [illegible] টীকা, ৯। ষট্‌চক্রনিরূপণ টীকা।

ষাট্‌কৌশম, তত্ত্বসংগ্রহ ও ষট্‌চক্রনিরূপণ মুদ্রিত হইয়াছে,* অন্যগুলি এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে। আমরা এই প্রবন্ধে ক্রমে ক্রমে উক্ত পুস্তকগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

১।—শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি।

শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ গিরি যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিই অতি সুন্দর গ্রন্থ। এই পুস্তকে শ্রীবিদ্যা অর্থাৎ ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনা-প্রণালী অতি বিশুদ্ধভাবে বিবৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক [illegible] নিবন্ধে সমাপ্ত। ইহার পরিচ্ছেদগুলি 'প্রকাশ' নামে অভিহিত, যেমন 'প্রথম প্রকাশ' ইত্যাদি।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ দুটী শ্লোকের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শ্লোক দুটীতে কবিত্বের কিরূপ বিকাশ হইয়াছে, এবং পরমপ্রধান পাদ্মের নিকট ভগবান্ বিষ্ণু কিরূপ নতশির হইয়াছেন, তাহা পাঠকের গোচর করিবার জন্য শ্লোকদুটী এখানে উদ্ধৃত হইল।—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

১ ষট্‌চক্রনিরূপণ পৃথক্ গ্রন্থ নহে; শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নামই ষট্‌চক্রনিরূপণ। সেজন্য অপর নাম যোগচিন্তামণি। ইহা পৃথক্ গ্রন্থ না হইলেও বর্তমান সময়ে পৃথক্ গ্রন্থরূপেই পঠিত হইতেছে, তাই পৃথক্ ভাবেই ইহার নামোল্লেখ করিলাম।

* পূর্ণানন্দ স্বকৃত ষট্‌চক্রনিরূপণের একখানি টীকাও লিখিয়া গিয়াছেন। এই টীকার নাম [illegible] তত্ত্বচিন্তামণি।

† মুদ্রিত পুস্তকগুলিও নিতান্ত সুলভ ও বিনা ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

পদ্মাং শোণিতপৌণ্ডরীকনয়নাং পীনস্তনীং সংবিদং
বন্দে তীক্ষ্ণকপর্দ্দিনং চরণয়োর্নিত্যং শিবং শাশ্বতম্ ॥ ২
অজ্ঞানৌঘমহান্ধকারপটলধ্বংসপ্রচণ্ডদ্যুতি
র্ব্রহ্মানন্দপরম্পরোত্তরিণাং পূর্ব্বপ্রকোটিপ্রভঃ।
পাণিস্যাদ্ভবতঃ বরশ্চ বরদ ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণ্বাদিভি
র্মূর্দ্ধি যেন মহে সুরাসুরনরাসীনঃ শিবঃ পাতু নঃ ॥ ৩
[illegible]
ভাবৎকৌস্তুভনায়কেন মিলিতা নম্রস্তুরুণ্যৈ।
[illegible]
লোকাম্ভোরুহভেদনে দিনপতি র্যো মোহনিদ্রাক্ষয়ম্ ॥ ৪
[illegible]
নিধাস্তৈর্যদি কল্পিতৈর্বিরচিতৈঃ ঘাতাদি পীঠাদিকৈঃ।
[illegible]
[illegible]
ন দীনং নাথীনং নহি পতিহিতৈ পোষয়িত্রি
ন বন্দে মাতরং যদি বহজিতৈ মায়য়মিত্রি
[illegible]
তথাপ্যেনং বন্দে ভবদ্বদনপেক্ষিত্বত্ব ॥

মঙ্গলাচরণের পর গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায় যে, সংসার-সাগর-মগ্ন জীবসমূহের উদ্ধার-বাসনায় পরম্পরাক্রমাগত ভগবান্ পরম শিব পরম কারুণ্যবশতঃ বহুতত্ত্বপূর্ণ আগমের এতদ্ভিন্ন অনেক-কোটিসংখ্যক সারভূত তন্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল তন্ত্রের দুরূহতা তীব্রতর প্রতীয়মান হইয়া অল্প মানবমাত্রের পক্ষে উপাসনা অসম্ভব; তাহাদের উদ্ধারের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া শ্রীপূর্ণানন্দ শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় তাঁহার গুরু শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক ব্রহ্মানন্দের নিকট সমস্ত বহুল অবগত হইয়া ষোড়শশতাব্দির নবনবতি শকাব্দে [১৩৯৯ শকাব্দ, ১৫৭৭ খৃঃ অঃ] শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি রচনা করিয়াছেন।

সূচনায় দার্শনিক প্রণালীতে ব্রহ্ম-প্রভৃতিরূপে দ্বারা আত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। অদ্বৈত আত্মতত্ত্বনিরূপণে শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত মায়াবাদের প্রতিধ্বনি লক্ষিত হয়। অধ্যাসভাষ্য-বর্ণিত অবিদ্যার বিবরণ ইহাতেও যে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সময়ে গৌড়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বেদান্তশাস্ত্রানুশীলনে বিশেষরূপে ব্যাপৃত ছিলেন।

গ্রন্থকার নিজেও বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষুদিগের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য অনাদি অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে তিনি 'সাধনা'র অর্থাৎ আরাধনার প্রকার বলিয়াছেন। স্মৃতি-আগম-পুরাণবিদ্‌দিগের সৎসম্প্রদায়ানুমোদিত সিদ্ধান্তানুসারে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি তিনি শ্লোকের দ্বারা বিস্তৃতভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের প্রথম 'প্রকাশে'র পূর্ব্বার্দ্ধে আত্মনিরূপণ প্রকরণে একটু গদ্য আছে, তদ্ব্যতীত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই পদ্যাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। অনেক স্থলে মূলতন্ত্রের বচন অবিকলরূপেই উদ্ধৃত হইয়াছে; কোথাও বা কিঞ্চিৎ অন্যথা করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে মূলতন্ত্রের ভাব গ্রহণ করিয়া নিজের ভাষায় পদ্য রচিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ তন্ত্র হইতে তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সর্ব্বত্র তাহার উল্লেখ করেন নাই। কোনও কোনও স্থানে তন্ত্রের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রথম 'প্রকাশে' সংসারের অনিত্যতা, দুঃখবাহুল্য প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধকের বৈরাগ্যোৎপাদনের অভিপ্রায়ে যে সকল শ্লোক উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই কুলার্ণব তন্ত্র হইতে সংগৃহীত।

জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না, কাহারও মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, তাঁহাদিগের মতে তৃষ্ণার নাশ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই মুক্তি। গ্রন্থকারের নিজের মতে, স্বানন্দময় পরমাত্মাতে জীবাত্মার বিলয়াবস্থাই মুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র মুক্তির কারণ নহে, দর্শনাদি শাস্ত্রও মুক্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ। সেই জ্ঞান দুই প্রকার,—এক শব্দব্রহ্মের অবগতিজন্য, অর্থাৎ বেদান্তাদি-বাক্যার্থ-জ্ঞানজন্য; অপর পরব্রহ্মের বিবেকজন্য। ৬১ হইতে ৬৫ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রদর্শিত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ৬৬ হইতে ৬৯ শ্লোক পর্য্যন্ত শব্দব্রহ্মের স্বরূপ এবং বর্ণিকারে তাহার অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই তিনটি শ্লোক শারদাতিলক হইতে সংগৃহীত।

অতঃপর বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সেই পর্য্যন্তই জপ, হোম, পূজা, তীর্থস্নান প্রভৃতি আবশ্যক। অতএব মোক্ষকামী মানব সকল অবস্থাতেই তত্ত্বনিষ্ঠ হইবেন। নিগমাগমসম্মত-তত্ত্বনিষ্ঠ হইবার উপায় কথিত হইতেছে,—এক সনাতন পরংব্রহ্মই রসরূপী, তিনি প্রকৃতির দ্বারাই অভিব্যক্ত হন, এবং তদ্দ্বারাই আবার অব্যক্তও হন। অতএব [illegible]

প্রত্যক্ষের উপায়। প্রকৃতি পুরুষের সমবস্থ জ্ঞান, অর্থাৎ ফটচক্রবর্ণিত হংসযোগ ব্যাপার পরমপদস্বরূপ। যদিও ব্রহ্মজ্ঞানের বহু উপায় বিদ্যমান, তথাপি প্রকৃতিযোগে যত সহজ ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তত সহজ অন্য কোনও উপায়েই হয় না। প্রকৃতি ও স্বরূপ বর্ণনার অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় প্রকাশে দীক্ষাপ্রণালী কথা হইবে, এই সূচনার পর প্রথম প্রকাশ উপসংহৃত হইয়াছে।

এই স্থলে বর্ণিত 'তত্ত্বনির্ণয়' ও 'প্রকৃতিযোগ', এই দুইটি কথার ভিতর শাস্ত্র-দর্শনের গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। যথাশ্রুত অর্থ—প্রকৃতিক ব্যাপার অতীত নিরাকার গুণাতীত ব্রহ্মকে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। ধ্যান উপদেশ, সন্ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি যত কিছু অনুষ্ঠানের উপায় আছে, তাহা সাকার ও সগুণকে ব্যাপারে। শক্তিতত্ত্বে, শুদ্ধ অদ্বৈত—ব্রহ্ম স্বীকারপূর্বক, তাহার সহিত ব্রহ্মশক্তিরূপিণী প্রকৃতির সম্পূর্ণ অভিন্নতা দেখাইয়া প্রকৃতির সম্পূর্ণ অভিন্নতা দেখাইয়া প্রকৃতিযোগের স্বতন্ত্রত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে; কারণ, প্রধান-তন্ত্রকারে পাঁচটি বিশেষরূপে স্বীকৃত অভিপ্রায়। * প্রথম প্রকাশের শ্লোকসংখ্যা ৮৫, দ্বিতীয় প্রকাশের শ্লোক সংখ্যা ৮৫ বিবেচন।

[illegible] এবং অনিষ্টের শমন করিবার সমর্থ, যিনি অন্তর্যামিরূপে, যিনি [illegible] মঙ্গল, এবং এতদ্ব্যতীত যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি [illegible] আত্মাস্বরূপ [illegible] এই শ্লোকে মঙ্গলকর্তা ও কল্যাণদাতা এই দুইখানি [illegible] পারা যায়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৭৯।

[illegible] কথন, ইহাতে কাল [illegible] হইয়াছে। ইহার শ্লোক-[illegible]

[illegible] বিষয়ক [illegible] ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৮৫।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পঞ্চম প্রকাশে দীক্ষাবিধি উক্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা ১৭৮।

অতঃপর ষষ্ঠ প্রকাশে ষট্‌চক্র বর্ণিত হইয়াছে। যে গ্রন্থ সাধারণের নি[illegible] 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' বা 'যোগচিন্তামণি' নামে পরিচিত, তাহা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থেরই ষষ্ঠ প্রকাশ। আমরা পূর্বে পৃথক্ ভাবে এই গ্রন্থের আলোচনা করিব। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৫৬।

সপ্তম প্রকাশে হোমের উপযোগী কুণ্ড প্রভৃতির লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে উত্তর তন্ত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬৫।

অষ্টম প্রকাশে শক্তিতন্ত্রানুসারে হোমের বিধান কথিত হইয়াছে। ইহাতে হোমের পরিপাটী অতি বিশদভাবে ও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হোম সম্বন্ধে এমন কথাও বলা হইয়াছে, যাহা অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না। গ্রন্থকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—শূদ্র যদি স্বয়ং তান্ত্রিক হোম করিবার ইচ্ছা করে, তবে স্বাহা শব্দের পরিবর্ত্তে 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে। 'বারাহীতন্ত্ররাজে'র এই মত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১২৬।

নবম প্রকাশে অনেক প্রকার হোমদ্রব্যের নাম প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ইহাতে অগ্নিমন্ত্র-পরিত্যাগের 'মালিনীবিজয়তন্ত্র'সম্মত বিধান কথিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ৭৮।

দশম প্রকাশে শ্রীবিদ্যার মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রমাহাত্ম্য, বিদ্যামাহাত্ম্য ও পরমেশ্বর হইতে দেবীর অভিন্নতা প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ইহাতে মন্ত্রনির্ণয়তন্ত্র, কুলোড্ডীশতন্ত্র ও বৃহৎ শ্রীক্রমতন্ত্র, এই তিনখানি তন্ত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ২২৭।

একাদশ প্রকাশে কতিপয় মন্ত্রোদ্ধার, শাক্তা ও শাম্ভবী, এই দুই প্রকার বিদ্যাভেদ, পূর্ব্বাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, উত্তরাম্নায়, ঊর্দ্ধাম্নায় ও অধঃ-আম্নায়, এই ষড়াম্নায়-ভেদে শক্তির ও শাম্ভবীর পার্থক্য কথিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ৬৫।

দ্বাদশ প্রকাশে শুদ্ধাশুদ্ধ মন্ত্রভেদে মহাত্রিপুরসুন্দরী মন্ত্রের মেরুমন্ত্রকথন, মেরু হইতে মন্ত্রের উৎপত্তিকথন, মনু, চন্দ্র, কুবের, কাম, লোপামুদ্রা, অগস্ত্য, নন্দি, সূর্য্য, বিষ্ণু, স্কন্দ ও দুর্ব্বাসাঃ, ইহাদের আরাধিত দ্বাদশপ্রকার বিদ্যা ও বলিয়া কথিত হইয়াছে। অগস্ত্যারাধিত বিদ্যা দুই প্রকার। এই সকল বিদ্যার প্রভেদ ও শিবপূজিত বিদ্যা কথিত হইয়াছে। অতঃপর সবল-[শবল]-সংজ্ঞক মন্ত্রকথনের প্রসঙ্গে বরুণপূজিত, যমপূজিত, বহ্নিপূজিত, প্রয়াগরাজপূজিত,

সোমপূজিত, ঈশানপূজিত, যমপূজিত, ব্রহ্মপূজিত, বৃহস্পতিপূজিত বিদ্যা কথিত হইয়াছে। মনু প্রভৃতি কি জন্য শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই স্থলে কথিত হয় নাই। পুরাণ গ্রন্থে এই বিষয়ের বিবরণ নিহিত আছে। অতঃপর ত্রিপুরভৈরবীমন্ত্রের দীপনী প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ইহাতে দক্ষিণামূর্ত্তিতন্ত্র, শ্রীক্রম, ভূতডামরতন্ত্র ও ভৈরবী তন্ত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ১২৫।

ত্রয়োদশ প্রকাশে ষোড়শীবিদ্যা বিবরণ কথিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ৬৪।

চতুর্দ্দশ প্রকাশে উপাসনাপ্রকরণ কথিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ১০৩।

পঞ্চদশ প্রকাশ অতিবিস্তৃত। ইহাতে প্রথমতঃ আচমন, স্নানপ্রণালী, অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাহ্যস্নানপ্রণালী কথিত হইয়াছে। স্নানের কতিপয় পরিপাটী বলিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, অন্যান্য বিষয় মৎকৃত ভাষাগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। স্নানের অনন্তর বৈদিক সন্ধ্যা প্রভৃতি ক্রিয়ার পর অতিবিস্তৃত তর্পণানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ শ্রুতি প্রভৃতির তর্পণও নিহিত হইয়াছে। অনন্তর অতিবিস্তৃত পূজানুষ্ঠানপদ্ধতি [illegible] বিস্তৃত ও বিশদ ভূতশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ আত্মপূর্ণতত্ত্বে ভূতশুদ্ধি পরে প্রকারান্তর ভূতশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। অনন্তর [illegible] ভূতশুদ্ধির তাৎপর্য্যার্থ কথিত হইয়াছে। তাহার পর [illegible] কথপ্রসঙ্গে ষট্‌চক্রস্থিত [illegible] দেবতার স্থান, [illegible] বৌদ্ধদর্শন, ব্রহ্মদর্শন, শৈবদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, জৈনদর্শন ও শক্তিদর্শন, [illegible] প্রমবিশেষ দ্রষ্টব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অনন্তর [illegible] অন্তর্যাগপদ্ধতি কথিত হইয়াছে। [illegible] এই দুই প্রকার সমাধি উক্ত হইয়াছে। অনন্তর [illegible] উপায় জ্ঞানযোগ কথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বড়ই উপাদেয়। ইহাতে তান্ত্রিকোপাসনার [illegible] আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা, এতদ্ভিন্ন ষটের লক্ষণ অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কলনাময় ভিন্নভেদে অনুষ্ঠানও ভিন্নরূপে কথিত হইয়াছে। ইহাতে কুলোড্ডীশ, তন্ত্রবিধিবিধি ও জ্ঞানার্ণব, এই তিনখানি গ্রন্থের নাম আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৫৯০।

ষোড়শ প্রকাশে যন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ইহাতে গন্ধোহন তন্ত্র, ভাবচূড়ামণি তন্ত্র, তন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্র, শ্রীক্রম তন্ত্র, বৃহৎ শ্রীক্রম তন্ত্র ও ওড্ডীশ

সপ্তদশ প্রকাশে দেবীর অভিষিক্ত গুহ্য পীঠপূজা কথিত হইয়াছে। ইহাতে অম্বাযাহন প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দেবীর ধ্যেয় রূপে নানাবিধ গন্ধ, পুষ্প ও অলঙ্কারের সন্নিবেশ বর্ণিত হইয়াছে *। সুতরাং নীলালোকের ব্যবহার পূর্ব্বকালেও ছিল, তাহা বলিতে পারা যায়। ইহা নাগেন্দ্রবস্ত্রনির্ম্মিত বলিয়া ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। † অতএব শাক্তদের বিবিধ অলঙ্কার প্রাচীন যুগেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইহাতে অঙ্গদেবতার পূজাপ্রসঙ্গে ত্রৈলোক্য-মোহন নামক চক্রে পূর্ব্বাদি ষড়ঙ্গের পূজা ও তদ্বুদ্ধমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ‡ ইহাতে বৌদ্ধতন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। তুর্গা পূজা প্রসঙ্গে সৌরতন্ত্রের পূজা এবং সর্ব্বরক্ষাকরচক্রে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পূজা বিহিত হইয়াছে। দেবীপ্রিয় অনেক প্রকার ধূপ কথিত হইয়াছে। তুর্গা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ছাগের দ্বারা তর্পণ করিবে, কখনও মদ্য ব্যবহার করিবে না। বামমার্গাবলম্বী ব্রাহ্মণও মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবে না। যে স্থলে মদ্যের বিধান আছে, সে স্থলে তাম্রপাত্রে মধু অথবা কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক দান করিবে; বৃহৎ শ্রীক্রম তন্ত্রেও এই মত। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে এই নিয়মই কথিত হইয়াছে। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের মতেও বর্ণভেদে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে) সত্ত্বিকম্ম অর্থাৎ দৈবতন্ত্রী যাগের জন্য দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মদ্য বিহিত হইয়াছে। অষ্টম শ্লোকে দেবী অনঘা-ত্রিগুণা নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই প্রকরণে মহাতন্ত্র, কুলার্ণব, সময়াচারতন্ত্র, শক্তিযামল, যোনি, বৃহৎ শ্রীক্রম, দক্ষিণা মূর্ত্তিতন্ত্র, তন্ত্রবিনোদিনী, জ্ঞানার্ণব ও মন্ত্রনির্ণয়, এই কয়খানি তন্ত্রের নাম আছে। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা ৬২৬।

অষ্টাদশ প্রকাশে প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত 'ক্রমস্তব' নামক ৫৬ শ্লোকাত্মক একটি স্তব কথিত হইয়াছে। এই স্তোত্রে আনন্দলহরীর ন্যায় নিরতিশয় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনন্তর ত্রিপুরার্ণবতন্ত্রোক্ত কবচ, তৎপরে কুলার্ণবতন্ত্রোক্ত কবচ, অনন্তর রুদ্রযামলতন্ত্রোক্ত শতনাম কথিত হইয়াছে।

---

* নানাঙ্গ-গন্ধরাগোদ্ভটভাস্বদ্ভূষাবিধ-প্রেতাম্। ১১৫

† নাগেন্দ্রবস্ত্রশয়নে মণিবিদ্রুমবিলসিতাম্। ১৭৮

‡ এবমঙ্গ ভতস্তস্মাদ্ভূতাদেচ তরঙ্গতম্। বহিঃস্থাস্তা নিষেদিতো বৌদ্ধমার্গো যমীরিতঃ। ৩৬৩ ইহাতে "ওঁ তারে তুতারে তর তর স্বাহা" এই মন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওয়াডেল কৃত 'তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম' নামক পুস্তকে বৌদ্ধতারার সাধারণ মন্ত্র "ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা" এই প্রকার

ইহাতে ত্রিপুরার্ণব, কুলার্ণব ও রুদ্রযামলের নাম আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৩২।

ঊনবিংশতিতম প্রকাশে পুরশ্চরণ কথিত হইয়াছে। যথোক্ত পুরশ্চরণানুষ্ঠানেও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তবে দ্রাবণ প্রভৃতি সাত প্রকার অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়াছে।

'এবমনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে।
উপায়া স্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত প্রকরণভাবিতাঃ॥
দ্রাবণং মোহনং বশ্যং পীড়নং শোষ-পোষণে।
দহনান্তং পুনঃ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥' ৯৫, ৯৬

অতঃপর মন্ত্রজপের অঙ্গরূপ কতিপয় হোমানুষ্ঠান ও মালাশোধনাদির বিস্তৃত অনুষ্ঠান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বামকেশ্বর তন্ত্র ও মুণ্ডমালা তন্ত্রের নাম আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৫২।

বিংশতিতম প্রকাশে প্রথমতঃ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পূজানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান কুলাচারানুসারে কর্ত্তব্য, ইহাও উক্ত হইয়াছে। এই প্রকরণে মণিমুক্তা-নির্ম্মিত বিবিধ পুষ্পের দ্বারা পূজার বিধান বলা হইয়াছে। ইহাতে শিল্পের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—স্বর্ণের দ্বারা পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া মুক্তারত্নের দ্বারা তাহা অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে, ইত্যাদি।

পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণিনির্ম্মিত স্বর্ণযুক্ত পুষ্পেরও উল্লেখ আছে। কোন্ কোন্ পুষ্প দেবীপূজায় দেয়, ইত্যাদি অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেবীসাধকের পক্ষে মদনপূজার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত ও মদনপূজার প্রকারান্তরে দেবীর বিশেষ পূজা বিহিত হইয়াছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১৬।

একবিংশতিতম প্রকাশে আনন্দভৈরবীকূটত্রয়-সাধন-নামক রহস্যপূর্ণ অনুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা ৯৪।

দ্বাবিংশতিতম প্রকাশে উচ্চাটন, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকরণের নাম শ্রীবিদ্যাজীবনষট্কাদি-বিবরণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৫২।

ত্রয়োবিংশতিতম প্রকাশে স্তবপাঠের নিয়ম, ছাগাদি-বলির লক্ষণ ও বলিদানের নিয়ম কথিত হইয়াছে। এই নিয়ম বারাহীসংহিতোক্ত। [illegible]

বলিদানের যে পদ্ধতি আছে, উহা সেরূপ নহে। ইহাতে পৌরাণিক রীতিই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৮০।

চতুর্ব্বিংশতিতম প্রকাশে রুদ্রযামলোক্ত সহস্রনাম কথিত হইয়াছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৯৩।

পঞ্চবিংশতিতম প্রকাশে প্রথমতঃ যন্ত্রসংস্কার, তৎপ্রসঙ্গে ষোড়শোপচারযাগের মুদ্রা, অনন্তর দেবতা-প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতি, অনন্তর শরৎকালে দুর্গাদেবীর গৃহপ্রতিষ্ঠা, তৎপ্রসঙ্গে দুর্গাদেবীর পূজা, হোম, সন্ধিপূজা, বলিদান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অতঃপর মিলিত সাধকগণ চক্রানুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে। এই চক্রানুষ্ঠান 'সময়' নামে অভিহিত হইয়াছে। সময় শব্দের অনেক অর্থ অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে সিদ্ধান্ত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অথবা, আচার অর্থও হইতে পারে; কৌলিকদিগের এই আচার, বা সিদ্ধান্ত এই প্রকাশের শ্লোকসংখ্যা ১২৪।

শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির মোট শ্লোকসংখ্যা ৩৯৬৮। এই পুস্তকে প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠানই কুলাচারানুসারে কথিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল বিষয় উক্ত হয় নাই, তাহা ভাষাবিদ্যা, শাক্তক্রম ও তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণীতে নিবদ্ধ হইয়াছে।

২। তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী।

এই গ্রন্থ একাদশ উল্লাসে সমাপ্ত। ইহাতে কৌলিকদিগের গূঢ় উপাসনা-প্রণালী কথিত হইয়াছে। ইহার প্রথমোল্লাসে গ্রন্থকার ওঙ্কারাতীত আত্মাকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবতা-নমস্কারের পর দ্রব্যসংস্কার কথিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, শিবাগমান্ত ও গুরুমত অবগত হইয়া পূর্ণানন্দগিরি দ্রব্যসংস্কার বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় উল্লাসে দ্রব্য প্রভৃতি তত্ত্বের শোধন কথিত হইয়াছে। তত্ত্বপদার্থের শোধনে বৈদিক মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—ব্রহ্মানন্দগিরি হইতে অবগত হইয়া পূর্ণানন্দ এই প্রক্রিয়া বলিয়াছেন।

'ব্রহ্মানন্দগিরেঃ শ্রুত্বা পূর্ণানন্দোঽব্রবীদিদম্।'

তৃতীয়োল্লাসে অর্ঘপাত্রাদিস্থাপন কথিত হইয়াছে। ইহাতেও বৈদিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। চতুর্থোল্লাসে তত্ত্বশুদ্ধি ও পঞ্চমোল্লাসে বলিদান-প্রকার কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম উল্লাসে পানানুষ্ঠান, দ্রব্যের গুণাগুণ ও অশক্তের পক্ষে প্রতিনিধি কথিত হইয়াছে। অষ্টম হইতে একাদশ উল্লাস পর্য্যন্ত পদ্ধতি কথিত

ইহার গ্রন্থে হইতে সপ্তম পটল পর্য্যন্ত বর্ণিত; অবশিষ্ট অনাবশ্যক।

৩। শাক্তক্রম।

শ্রীমৎপূর্ণানন্দগিরি-কৃত শাক্তক্রমসবিবরণও তান্ত্রিকসমাজে সুপরিচিত। এই গ্রন্থ সপ্ত পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। এবং একটি পরিচ্ছেদে এক এক 'আম্নায়' নামে অভিহিত হইয়াছে।

প্রথম অংশে গ্রন্থকার দেবীস্তবচ্ছলে পূর্ব্ব-প্রাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের শাক্তদিগের কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত সব বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গে ধ্যেয়-স্বরূপ-বর্ণনা, ও বীজপূজাবিধি প্রভৃতি একটি স্তবের একত্রিংশ অর্থাৎ হইয়াছে। এই স্তবটি ত্রিপুরারহস্যের দ্বিতীয়ভাগ জ্ঞানখণ্ডে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপরে কুলক্রম প্রকাশ-প্রসঙ্গে দ্বাদশ প্রকার কুলাচারের নাম করা হইয়াছে। অনন্তর স্নানবিধি, ভস্ম, পূজার স্থান, মাল্যবিধি, পাত্রবিধি, দীক্ষা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে অতিবিস্তৃত সন্ধ্যাবন্দনবিধান বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর অভিষেক, ত্রিপুরা-ত্রিয়াবিধিও বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর পর ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ত্তব্য মহাবিদ্যা-কবচ হইয়াছে। ইহাতে সমস্ত শরীরকে মহাশূন্যে নিযুক্ত করিতে হয়।

দ্বিতীয় অংশে দিব্য, বীর ও পশু এই ভাবত্রয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, দিব্যভাবে স্বকীয় প্রেমভক্তি, বীরভাবে আত্মরক্ষা, এবং পশুভাবে বহু-জনসাধ্য কার্য্যসমূহ সিদ্ধিলাভ হয়। সুতরাং গ্রন্থকারের মতে, কলিতেও ত্রিবিধ ভাবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পাঠক ইহা ভবিষ্যতে এই তিনটি বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে। অবশ্য বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য ভাবের অন্যতম ভাব বাহ্যিক পূজাদি ক্রিয়ার ফল হইয়া থাকে।

'কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা কেন বা ন প্রজপ্যতে।
ভাবাভাবৌ দেবেশ ভাবাভ্যাং প্রজপ্যতে॥'

অনন্তর দিব্যভাবের ও বীরভাবের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্র-মতে দিব্যভাবে ও বীরভাবে বিশেষ প্রভেদ নাই। এইমাত্র ভেদ যে,—

'আত্মো বিনিয়োগো যত্নো ফলং নাবেশ এব তু।
দিব্যাত্ত দেববৎপ্রোক্তে বীরশ্চোক্তস্তথা নরঃ॥'

অর্থাৎ [শক্তি] স্বাভীষ্ট দিব্য ও বীরের কার্য্যে অধিকার নাই।

অনন্তর পশুভাবের কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। পশুভাবের সাধক পশ্চাচার-[illegible] দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পশুভাবপরায়ণ হইবেন।

পশুভাব-সাধক মৎস্য ভক্ষণ করিবেন না, কোনও স্ত্রীকে মনেও স্মরণ করিবেন না, পরদ্রব্যে লোভ ও ভোগে মনোনিবেশ করিবেন না, নদীতীরে পর্ব্বতে বনে দেবালয়ে বিল্ববৃক্ষমূলে নির্জ্জন স্থানে মনোহর পুণ্যক্ষেত্রে জপাদি করিবেন। শূদ্র দর্শন করিবেন না, সর্ব্বতোভাবে কুলিপূজা পরিত্যাগ করিবেন। উপাস্য দেবতাকে শুভ্রবর্ণ-রূপে ধ্যান করিতে হইবে। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে দেবতার পূজা ও মন্ত্রজপ করিবেন। জপমালা ও যন্ত্র, এতদুভয়কে রাত্রিতে স্পর্শ করিবেন না। ভোজনের পর জপ কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত বৈধ কার্য্যেই মৌনাবলম্বন কর্ত্তব্য। পর্ব্বকালে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাজ্য। দৈবুন, তৎকথা ও স্ত্রীসম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের আলোচনা হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবেন। স্বকীয়া ব্যতীত নিজস্ত্রীতেও উপগত হইবেন না। পুরাণ-শ্রবণে শ্রদ্ধাবান্ এবং বেদপাঠে ও বেদার্থজ্ঞানে তৎপর হইবেন। রাত্রিতে ভোজন ও তাম্বূল ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবেন। গুরু বাহা আদেশ করেন, যত্নপূর্ব্বক তাহাই করিবেন। কৌলিকদিগের পরম পবিত্র স্বয়ম্ভুকুসুম ও মদ্য প্রভৃতি স্পর্শ করিবেন না; এই সকল দ্রব্য স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসের পর পঞ্চগব্য-পানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। দেবীভক্তিপরায়ণ পশুভাব-সাধক রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিবেন না। বিষ্ণুতন্ত্রানুসারে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। বীরাচার-সাধকের সহিত আলাপ করিবেন না, এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিবেন না।

পশুভাব প্রকার;—পূর্ব্ব ও সাধারণ। পশুবর পূজার অধিকার আছে, অর্থাৎ বীরের পূজাও পশুবর করিতে পারেন, কিন্তু গুরু হইতে পারেন না। পূর্ব্বসংজ্ঞক পশুবর পক্ষে বীরের পূজাপ্রদেশে গমন করিবারও অধিকার নাই। কৌলিকগণ নিজের পূজা-স্থান হইতে পূর্ব্বসংজ্ঞক মহাপশুকে বাহির করিয়া দিবেন; দৈবাৎ পূর্ব্বকে দর্শন করিলে স্নানদর্শন করিবেন। কৌলিকদিগের আরও অনেক নিয়ম কথিত হইয়াছে।

অতঃপর শাক্তদর্শনের তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। এই মতে, মন-আনন্দময় এক আত্মাই প্রকৃতিরূপধারী, তিনিই রসরূপী, তিনিই পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎই বীর সাধকগণের করণীয়; অর্থাৎ, আত্মার সাক্ষাৎকারই পরমপুরুষার্থ বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে। এই স্থলে শ্রবণ-মননাদির স্বরূপ গদ্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশে ভগবৎপাদ-শঙ্করাভিমত অদ্বৈতবাদের সহিত তান্ত্রিক শাক্তদর্শনের পার্থক্য নাই। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম প্রকৃতির দ্বারাই ভোগ প্রাপ্ত হন, সুতরাং প্রকৃতির যোগ ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীভাব প্রকৃতি ও পুংভাব পুরুষ-রূপে জ্ঞাতব্য। উক্ত সাধকগণ জাতি-ভেদ বিভাগানুসারে ইহার তত্ত্ব বুঝিয়া লউন। যাঁহার চিত্তে দিব্যভাব ও বীরভাব অবস্থিত হয় তাঁহার এক জন্মেই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। তিনি জীবন্মুক্ত অদেহীর ন্যায় ভোগার্থ পরিভ্রমণ করেন। তিনি দেবীপুত্র নামে ও ভৈরব নামে কথিত হন।

অনন্তর কৌলিকদিগের কর্ত্তব্য অভিহিত হইয়াছে। কৌলিক সাধক সমস্ত জগৎকে শক্তিময় চিন্তা করিয়া নিজেও শক্তিময় হইবেন। সজ্জিত হইয়া চক্ষু, চোলা, লেহা, পেয় প্রভৃতি সুস্বাদু দ্রব্যজাত সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক চিন্তা করিবেন। কুলজা যুবতীকে দর্শন করিলেই প্রণাম করিবেন। তাহার সহিত বাহিরে মনে মনে তাহাদের পূজা করিবেন। স্ত্রী জাতির প্রহার, নিন্দা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীজাতিই দেবতা, স্ত্রীজাতিই প্রাণ, এবং স্ত্রীজাতিই জগন্ময়। সর্ব্বদা স্ত্রীযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন। অন্য স্ত্রী না পাইলে নিজ স্ত্রীকেই সঙ্গে রাখিবে। স্ত্রীলোকের হস্তের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য ও ভোজ্য দেবতাকে নিবেদন করিবেন। স্বয়ং তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন, কিন্তু তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করিবেন না। সাধিকের ক্ষোভ অর্থাৎ চিত্তের উপস্থিত হইলে দেবীরও ক্ষোভ হয়; অতএব সুবুদ্ধি-বীরসাধক ক্ষোভযুক্ত হইবেন। সাধক ভোগের দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্ত হন, ভোগের দ্বারাই কুলসাধন হইয়া থাকে। হেতুদ্রব্য [সুরা] আদেয় ব্যতীত সাধক ক্ষোভযুক্ত হয়; অতএব, কারণ দ্রব্য পান ও মাংসাদি ভোজন করিয়া পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। ইহার পর আরও অনেকগুলি প্রতিপাদ্য বিষয় কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশের শেষ ভাগে দেব-গন্ধর্ব্ব-মানব-স্ত্রীভেদে অনেকগুলি নরনারীর নাম শক্তির উপাসক-সম্প্রদায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুষ্পদন্ত ও মহাবুদ্ধ, এতদুভয়ের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ তন্ত্র হইতে এই অংশের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করেন নাই। তবে প্রকট বীর-সাধনার উপযোগী প্রমাণগুলি স্বতন্ত্রতন্ত্র, কালীতন্ত্র, মুণ্ডমালাতন্ত্র, কুমারীতন্ত্র, মহাচীনাচারক্রম, কুলার্ণব, রুদ্রযামল, উড্ডীশোত্তরখণ্ড, সময়াচারতন্ত্র,

তৃতীয় অংশের প্রথমে কুমারীপূজা কথিত হইয়াছে। ইহাতে এক বৎসর হইতে ষোড়শবর্ষবয়স্কা পর্য্যন্ত অনাঢ্যভার্য্যা কন্যা কুমারী-রূপে পূজনীয়া বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মতান্তরে, দুই বৎসর হইতে আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কুমারী। ইহাদের একবার হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত বারম্বারে নামবিশেষ কথিত হইয়াছে। কুমারীপূজার যাহাফল-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, কুমারী-পূজায় ব্রাহ্মণবিচার করিবে না; অর্থাৎ, যে কোন কুমারীকেই পূজা করিবে।

অতঃপর শক্তিপূজার আবশ্যকতা ও তৎপ্রসঙ্গে কুলতিথি, কুলনক্ষত্র ও কুলাচার কথিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিথিবিহিত তান্ত্রিক কার্য্যে পশুভাবাশ্রিত ব্যক্তি বর্জ্জিত হইবে। তৎপর শিবাবলির মন্ত্র প্রভৃতি এবং কৌলিক-দিগের বর্জ্জনীয় বলির নিষেধ কথিত হইয়াছে। ক্ষমাশক্তি, নবশক্তি ও পঞ্চশক্তি, এই তিনটি শক্তিসমূহের পূজাক্রম বিবেচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, শূদ্রা, শৈবী, নাগিতকন্যা, বৃদ্ধা ও যোগিনী, এই অষ্ট প্রকার যুবতীকন্যা যথাক্রমে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী এই অষ্ট শক্তি-রূপে পূজনীয়া বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উক্ত কন্যা না পাইলে, নিজের কন্যা, কনিষ্ঠা ভগিনী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা, অথবা সপত্নী মাতা, ইঁহাদিগকে পূজা করিবে। বয়সে অথবা জাতিতে হীন স্ত্রীলোককেও পূজা করিবে। সধবাই হউক, অথবা বিধবাই হউক, পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকের অভাবে পরোক্ত স্ত্রীলোককে পূজা করিবে; যেহেতু স্ত্রীলোকগণ দেবীর অংশ। এই অনুষ্ঠান পুরশ্চরণের অঙ্গীভূত আছে, এবং মধ্যে অনুষ্ঠেয়কর্ত্তব্য। অনন্তর পুরশ্চরণ-প্রয়োগে জপের নিয়ম এবং মালা প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অনন্তর পরতত্ত্ব-দীক্ষিত ব্যক্তির পূজা কথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—

> "দিবসে মাসে তথা বৎসরে মুক্তি র্ন সুনিশ্চয়ঃ।
> সাধকানাঞ্চ কো দোষঃ পশুভাবস্য ন বিদ্যতে॥
> অতএব মহেশানি! পশুভাবং পরিত্যজেৎ॥"

এই মহাপ্রাজ্ঞ বাক্যের অর্থ আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, পরবর্ত্তী গ্রন্থের দ্বারা উহার প্রকৃত অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। পঞ্চমকারের প্রশংসার পরই বলা হইয়াছে যে, এই পূজায় মদিরাপান অবশ্যকর্ত্তব্য; কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি মদ্যের পরিবর্ত্তে তাম্রপাত্রে মধুরূপ মদ্য অথবা তাম্রপাত্রে ঘৃত বা তাহার অভাবে গব্যরূপ মদ্য, অথবা কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক, কিংবা গুড়সংযুক্ত তাম্রপাত্রে জলরূপ মদ্য কল্পনা করিবেন। এই বাক্যের পরিচয়

সাধকের পক্ষে, অর্থাৎ 'আমি ব্রাহ্মণ, মদ্য পান করিলে আমার ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হইতে পারে', এই সংশয় যাহার চিত্তে আছে, তাহার পক্ষে। পক্ষান্তরে, নির্ব্বিকল্প সাধকের পক্ষে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাধিকারের অতীত অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন অবধূতের পক্ষে মহামদ্য সাধনে শ্রুতি-স্মৃতি-নিষিদ্ধ আচরণে কোনও অধর্ম্ম হয় না, প্রত্যুত অভিপ্রেত-সিদ্ধিই হইয়া থাকে। অতঃপর মদ্যের প্রকারভেদ ও ফলবিশেষ বলা হইয়াছে।

মাংস সাধারণতঃ জলচর, ভূচর ও খেচর, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। অষ্টপ্রকার মাংস মহামাংস নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—গো, নর, হস্তী, অশ্ব, মহিষ, বরাহ, ছাগ ও মৃগ; এই সকল জন্তুর মহামাংস দেবতার প্রীতিবর্দ্ধক।

শক্তিপূজনতৎপর সাধক দক্ষিণাচার, বামাচার, বেদবাহ্য ও শক্তিসিদ্ধান্ত, এই গুলির নিন্দা করিবে না। শক্তি হইতেই সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতেই পুনঃ পুনঃ লীন হয়; অতএব শক্তিতত্ত্ব জ্ঞানবান্, এবং সর্ব্বতঃ পূজনীয়া। যোগের পক্ষেও কয়টি কার্য্য বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

অনন্তরঞ্চ শিবেমদ্যং বলাৎকারেণ মৈথুনম্।
স্বহস্তেন পশুং হত্বাদ্ যোগেঘি বর্জ্জয়েৎ ॥'

অনন্তর শক্তিপূজার অনুষ্ঠান অথিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান অতি রহস্যপূর্ণ, ইহার বিশ্লেষণ সাধারণের নিকট নিষিদ্ধ, এবং সমাজের অনিষ্টকর। তবে ইহাতে যেরূপ সংযম ও সাবধানতা আবশ্যক তাহা প্রকৃত মানবের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে পঞ্চতত্ত্বের নামপ্রকার তাৎপর্য্য কথিত হইয়াছে। শাক্ত দর্শনের তাৎপর্য্য ইহাতে অতি সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিরপেক্ষভাবে স্থিরচিত্তে এই ক্রিয়ার বিষয়গুলি চিন্তা করিলে, অদ্বৈতবাদের সহিত শাক্তাদিগের যে ক্রিয়াগত সামঞ্জস্য তাহা কে বুঝিতে পারা যায়। মদ্যপানের মাত্রা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত দৃষ্টির চাঞ্চল্য ও মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত পান করিবে। ইহার অতিরিক্ত পান পশুপান' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকারিবিশেষের পক্ষে অর্থাৎ অবধূতের পক্ষে বিশেষ পান বলা হইয়াছে।

'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পীত্বা পতন্তি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥'

এই প্রকরণে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান এবং সুরার উৎপত্তি-[illegible] প্রকাশ করিত হইয়াছে।

চতুর্থ অংশে প্রথমতঃ বিজয়াকল্প, অনন্তর শবব্রতাশ্রমের কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে। পঞ্চম অংশে প্রথমতঃ কামকলার বিবরণ কথিত হইয়াছে। অনন্তর বীরদিগের অনুষ্ঠেয় মন্ত্রসিদ্ধির নানা প্রকার অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। শব-সাধন প্রভৃতি প্রক্রিয়া-কথনের পর পঞ্চম অংশের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, শাক্ত সাধক যে ভাবে অর্থাৎ পশ্বাদি ভাবত্রয়ের মধ্যে যাহাতে অবস্থিত, তিনি যদি তদ্‌ভাবোক্ত বিধানানুসারে অর্চ্চনা না করেন, তবে দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন, এবং ভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য হন। কিন্তু এই আদেশানুযায়ী কার্য্য বর্ত্তমান সময়ে কতটুকু হইয়া থাকে, তাহা আমরা পশ্চাৎ প্রতিপন্ন করিব।

ষষ্ঠ অংশেও নানা প্রকার সাধনা কথিত হইয়াছে। ইহাতে শবসাধন সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইহাতে শাক্তাচারের তাৎপর্য্য অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম অংশে ষট্‌কর্ম্ম অর্থাৎ গ্রাবণ, উচ্চাটন প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। গ্রন্থকার উপসংহারে রচিত পুস্তকের মূলীভূত গ্রন্থের নামনির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—ভাবচূড়ামণি, বীরচূড়ামণি, কুলচূড়ামণি, বীরতন্ত্র, যামল, জ্ঞানার্ণব, শীক্রম, রামকেশ্বরসংহিতা, সময়তন্ত্র, অন্নদাকল্প, মাতৃকাতন্ত্র, উত্তরাতন্ত্র, কালী-তন্ত্র, কুলার্ণব ও ওরুয় মত।

গ্রন্থকারের উক্তি হইতে জানা যায় যে, ১৪৭৬ শকে [১৫৫৪ খৃঃ অঃ] আশ্বিন মাসে বিজয়ার দিবসে 'নিত্যমুক্তস্বভাব' সাধকের জন্য তিনি এই উৎকৃষ্ট শাক্তক্রম গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়াছেন। *

৪। শ্যামারহস্য।

শ্যামারহস্যে কালীর উপাসনা-পদ্ধতি অতি বিস্তারভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ কৌলিকদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ-রূপে পরিচিত। উহা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই কর্ত্তব্য বিষয়গুলি বিশদ গদ্যাকারে লিখিয়া তাহাদের সমর্থনের জন্য বিভিন্ন তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যাস পর্য্যন্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তর্যাগ প্রভৃতি কৃত্য কথিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অতিনিগূঢ়। ইহাতে পূজাপদ্ধতি ও তদঙ্গ মদ্যপান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে স্ত্রীবেশধারী

* ঈশে কালাঙ্গবেদেন্দুশাকে মঙ্গলবাসরে।
নিত্যমুক্তস্বভাবার্থং শাক্তক্রমমমুত্তমম্ ॥

হইয়া উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্তব কবচ, পঞ্চমে মন্ত্রসিদ্ধার্থ পুরশ্চরণ ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহার নানা প্রকার মন্ত্র ও ধ্যান কথিত হইয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে বিদ্যামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে যৌগিকদিগের আসন উক্ত হইয়াছে। নবম পরিচ্ছেদে যৌগিকদিগের প্রত্যাহৃতি ও দমনে সমাধি সাধন অভিহিত হইয়াছে। একাদশে মন্ত্রসিদ্ধির উপায়, দ্বাদশে কৌলিকদিগের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ত্রয়োদশে মহিষমর্দ্দিনী পূজা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে নানাপ্রকার সাধনপ্রণালী ও পঞ্চদশে যৌগিক মুদ্রা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য আলোচ্য বিষয় পর্য্যালোচনায় ও ভাষা-সৌষ্ঠবাদিতে লেখক বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে ভ্রমপ্রমাদাদি থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সহিত তুলিত করিলে ইহাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারা যায়। এই গ্রন্থের মুদ্রণপদ্ধতি অতি বিশুদ্ধরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। ব্যাকরণ-দুষ্ট ভাষাতে মুদ্রাঙ্কণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে নানাপ্রকার ত্রুটি আছে।

এই গ্রন্থের উপক্রমে গ্রন্থকার যে সকল তন্ত্রের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত আরও যে কয়েকটি তন্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। উত্তরতন্ত্র, ২। ঈশ্বরকল্পদ্রুম, ৩। কালিকাপ্রকৃতি, ৪। কুব্জিকা, ৫। কৌলাবলি, ৬। কৌলিকী, ৭। কৌলোড্ডীশ, ৮। ক্রমকেলি, ৯। ক্রমগীতা, ১০। ক্রমদীপিকা, ১১। ক্রমসূত্র, ১২। গুহ্যকালী, ১৩। গুহ্যকালীক্রম, ১৪। গুহ্যকালীতন্ত্র, ১৫। গুহ্যসূত্র, ১৬। গুহ্যসূত্রোদ্ধার, ১৭। চামুণ্ডা, ১৮। চামুণ্ডোড্ডীশ, ১৯। চিত্রা, ২০। চিত্রাকল্প, ২১। চিত্রাতন্ত্র, ২২। চিত্রাসূত্র, ২৩। চিত্রাসূত্রোদ্ধার, ২৪। জ্ঞানার্ণব, ২৫। তারা, ২৬। তারাকল্পদ্রুম, ২৭। তন্ত্রার্ণব, ২৮। তন্ত্রচূড়ামণি, ২৯। তারাতন্ত্র, ৩০। তারাবিলাস, ৩১। তারাসূত্রোদ্ধার, ৩২। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা, ৩৩। দিব্য, ৩৪। দীপিকা, ৩৫। দুর্গাবাসন, ৩৬। নবরত্না, ৩৭। নেত্রকারিকা, ৩৮। নারায়ীতন্ত্র, ৩৯। পিঙ্গলা, ৪০। পীঠনির্ণয়, ৪১। বৃহৎক্রম, ৪২। বৃহৎক্রমসংহিতা, ৪৩। ভাবচূড়ামণি, ৪৪। ভৈরবতন্ত্র, ৪৫। মহাতন্ত্র, ৪৬। মন্ত্রচন্দ্রাবলী, ৪৭। মহাকালক্রম তন্ত্র, ৪৮। মুণ্ডমালা, ৪৯। মুণ্ডবিজয়তন্ত্র, ৫০। যামল, ৫১। যোগিনীহৃদয়, ৫২। রাঘবভট্ট, ৫৩। রুদ্রযামল, ৫৪। লঘিষ্ঠহারীতিকা, ৫৫। শারদা টীকা, ৫৬। শিবাগম, ৫৭। শ্রীক্রম, ৫৮। শ্রুতি, ৫৯। সনৎকুমার, ৬০। সময়াচার, ৬১। সম্মোহনতন্ত্র, ৬২। সারসর্ব্বস্ব, ৬৩। সিদ্ধনাথতন্ত্র, ৬৪। সিদ্ধেশ্বরতন্ত্র, ৬৫। স্কন্দ, ৬৬। [illegible]

৫। ষট্‌চক্রনিরূপণ।

গ্রন্থকার ইহার প্রথমেই বলিয়াছেন—

'অথ তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রনিরূপণং তৎ।
উচ্যতে পরমানন্দবিধায়কতয়া সতাং॥'

ভট্টের মতানুসারে ষট্‌চক্রনিরূপণাদি পরমানন্দনিকাহের প্রথম সূত্র কথিত হইতেছে। এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার অনেকগুলি তন্ত্র হইতে ষট্‌চক্রনিরূপণের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কোনও একখানি নির্দিষ্ট তন্ত্র হইতে উহা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু বৈদিকাধিকরণস্থ বিদ্বন্নাথ ষট্‌চক্রের যে সংক্ষিপ্ত টীকা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পূর্ণানন্দগিরির নামোল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তাঁহার মতে, উহা কৈবল্যকালিকা তন্ত্রের দ্বিতীয় পটল। ষট্‌চক্রের বিস্তৃত টীকার প্রণেতা কাশীচরণের মতে, উহা শ্রীমৎপূর্ণানন্দের লিখিত। টীকাকার হরিহর, রামভদ্র, রামমিশ্র প্রভৃতির মতও কাশীচরণের মতেরই অনুরূপ। ইহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, বিদ্বন্নাথ নিজের সুবিধার জন্যই শ্রীমৎপূর্ণানন্দের, নামোল্লেখের অভিপ্রায়ে এই অভিনব মতের প্রচার করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থানের ষট্‌চক্রের সূচির শেষে দেখিতে পাওয়া যায়, 'ইতি কৈবল্যকালিকাতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ'। ইহা যে বিদ্বন্নাথের কলেরই অদ্ভুত আবিষ্কার, এ কথাও সাহস করিয়া বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শ্রীতন্ত্রচিন্তামণির প্রত্যেক পরিচ্ছেদে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ কথা কথিত হইয়াছে, সেইগুলির মূল কোন্ তন্ত্রে নিহিত আছে, গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' যদি কৈবল্যকালিকাতন্ত্রেরই নিজস্ব হইত, তবে তিনি সে কথার উল্লেখ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, ষট্‌চক্র-বর্ণনের পদ্ধতিগুলিতে অনেক পার্থক্যের কেবল অনুপ্রাসের অনুরোধেই হইয়াছে; মূলতন্ত্রে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য তন্ত্রে ষট্‌চক্রের অনেক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াতন্ত্র, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রেও ষট্‌চক্রসম্বন্ধে অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু ঐ সকল গ্রন্থে শ্লোকসমূহে বিভাগোপযোগী সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় নাই। শ্রীমৎপূর্ণানন্দই তাহা একত্র সুসংবদ্ধ করিয়াছেন। যদি কৈবল্যকালিকাতন্ত্রে ষট্‌চক্রনিরূপণের শ্লোকগুলি থাকিত, তবে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের গ্রন্থে ইহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। বিভিন্ন দেশের নিবন্ধে ষট্‌চক্রের যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত আছে, তাহাতে পূর্ণানন্দীয় শ্লোকের অনুরূপ পদ্য দেখিতে পাওয়া যায়

না। গ্রন্থকার শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির উপক্রমে ছয়টি শ্লোকের রচনায় যে রীতির অনুসরণ করিয়াছেন, ষট্‌চক্রবর্ণনেও সেই রীতি দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষে নানা স্থানে নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; হরিদ্বার হইতে হিন্দী টীকা সহ এক খানি ষট্‌চক্রনিরূপণ মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতেও পূর্ণানন্দেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় সাধুগুণও ইহাকে পূর্ণানন্দ-রচিত বলিয়াই স্বীকার করেন। এই সকল কারণে ষট্‌চক্রনিরূপণের পদ্যাবলী যে শ্রীমৎপূর্ণানন্দের নিজস্ব, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

৬। যোগসার।

যোগসার গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমাদের জ্ঞাতি, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ব্যাসদী গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র স্মৃতি-ভূষণের বাড়ীতে একখানি "যোগসার" দেখিয়াছি। এই পুথি অত্যন্ত জীর্ণ ও অসম্পূর্ণ, তাহার অনেক স্থান পাঠ করা যায় না। যতটুকু পাঠ করা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, তান্ত্রিক সাধকের যোগানুষ্ঠানই ইহার প্রতিপাদ্য।

৭। কালীকল্পদ্রুমস্তবনাম-টীকা।

এই গ্রন্থের একখানি মাত্র পুথি আমরা দেখিয়াছি, ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-অনুসন্ধান-সমিতির পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। এই পুথিও অতিশয় জীর্ণ, এবং ছিন্ন। কালীর বহুবিধ স্তবস্তুতি গ্রন্থের অধিকাংশই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত। পূর্ণানন্দ এই গ্রন্থে এই সকল স্তোত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৮। ষট্‌চক্রনিরূপণ-টীকা।

এই গ্রন্থের নাম যোগচিন্তামণি। শ্রীমৎপূর্ণানন্দ এই গ্রন্থে স্বকৃত ষট্‌চক্রনিরূপণ-পদ্যাবলীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

* ষট্‌চক্রবিবরণের প্রতিপাদ্য বিষয় অল্প কথায় বুঝান অসম্ভব, এই হেতু এখানে তাহার প্রসঙ্গ করিলাম না। আমরা অনেকগুলি টীকার সাহায্যে ষট্‌চক্রনিরূপণের বিশদ বঙ্গানুবাদ

সমুদ্রতীরে।

সহ্য ক্রোয়াজিক হইতে বাঁজ সহর পর্য্যন্ত কোনও বাঁধা রাস্তা নাই। গাড়ীর যাতায়াতে যে চাকার দাগগুলি পড়ে, তাহা একদিন বাতাস একটু সোরে বহিতে থাকিলেই বালিতে ঢাকিয়া যায়। কোথাও মাঠের ভিতর দিয়া, কোথাও বা সমুদ্রের ধার বাহিয়া, কোথাও বা সমুদ্রতীরস্থ পাহাড় ঘুরিয়া, রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। বিদেশী লোকের পক্ষে এ পথ চিনিয়া চলা বড় সহজ নহে; তবে স্থানীয় পথ প্রদর্শকের হস্তগত বিক্ষিপ্ত গোময় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া কোনও প্রকারে পথভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। আমরা অর্দ্ধেক পথ যাইতে না যাইতেই বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। সম্মুখেই সাগরতীরে একটী অতিক্ষুদ্র পাহাড় দেখিয়া মনে হইল সেখানে হয় ত একটু ছায়ায় বিশ্রামের স্থান পাওয়া যাইতে পারে। সঙ্গী মেলিয়াটিকে তাই বলিলাম, 'বাপু, বড়ই হাপাইয়া পড়িয়াছি, এখানে একটু বসিয়া গেলে হয় না?' পথপ্রদর্শক আমার কথায় পাহাড়ের দিকে চাহিয়াই যেন হঠাৎ থমিয়া গেল, বলিল, 'মাপ করিবেন, ওখানে গিয়া যাওয়া হইবে না। কাজ হইতে কোনক্রমে পর্য্যন্ত যাহাদিগকে সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয়, তাহারাও ও স্থানটি দূরেই রাখিয়া চলে। ঐ পাহাড়ের ধারে একটী লোক বসিয়া থাকে, তাহার কাছে কেহই ঘেঁষিতে চায় না।'

কথা কয়টি বেশ ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় উচ্চারিত হইল, তাহাতে আমার কৌতূহল আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য একটু আগ্রহ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত ভয় কিসের হে? ডাকাত, না খুনে?' লোকটা কি বলিল, শুনা গেল না; তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম, সেখান দিয়া গেলে যে আমাদের সঙ্গে যাইবে না। আমাদেরও কেমন যেন ঝোঁক চাপিয়া গেল। বলিলাম, 'যদি প্রাণের ভয় না থাকে ত বাপু! জায়গাটা একবার দেখিয়া যাইব। যদি বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা থাকে ত এই বেলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বল।' জেলে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'জীবনের ভয় থাকিলে কি আমি আপনাদের ছাড়িয়া দিই? যাকে ওখানে দেখিবেন, সে মোটেই কথাবার্ত্তা কয় না, ঠায় এক জায়গায় চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে।'

'কে সে? এ দেশেরই—'

'কে আবার? মানুষ—আমাদেরই মতন।'

লোকটার কথা শুনিয়া বুকটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আমাদের সম্মুখে প্রায় বিশ হাত দূরেই একটা সমুদ্রের খাড়ি। তখন জোয়ার। ফেনিল ভরঙ্গ সমুদ্রবেলায় আছাড়িয়া পড়িতেছে। আমি ও আমার স্ত্রী হাত-ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথপ্রদর্শক সেখান হইতেই বাঁকা পথ ধরিল। তাহার সঙ্গে কথা রহিল, সেই তেমাথা'র মোড়ে সে আমাদের সঙ্গ ধরিবে। দেখিলাম, তখনই বেশ পা চালাইয়া চলিয়াছে। পথপ্রদর্শকের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, তাহার দৃঢ় ধারণা, লোকটিকে একবার চাক্ষুষ করিলে, আমাদিগের আর সেখানে দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইবে না। আমাদের মনে কোনও ভয় ছিল না বটে, কিন্তু কৌতূহলের আবেগে বুকটা কেমন ধড়ফড় করিতেছিল। এই যে চূপুর রৌদ্রে বালির উপর দিয়া এতখানি আসিলাম, একবার স্ত্রীপুরুষে হাত-ধরাধরি করিয়া ঘাটিতেই সুদক্ষিণে শ্রান্তি ক্লান্তি যেন কোথায় উড়িয়া গেল। তখন যেন আমাদের একই প্রাণে একই স্পন্দন। সুকণ্ঠ গায়িকাযুগলের সম্মিলিত স্বরলহরীর ন্যায় একটু চিন্তা বা অনুভূতির পবিত্র বন্ধনে আমাদের দুইটি হৃদয় যেন একীভূত হইয়া গিয়াছিল। বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দের এ অপূর্ব্ব বিকাশ আর কখনও অনুভব করি নাই। পথশ্রান্তি দূরীভূত হইয়া কি আনন্দে যে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। এ অনুভূতি কেবল উক্ত অঙ্গের সঙ্গীত-শ্রবণেই সম্ভবে। সেদিনকার অপূর্ব্ব ভ্রমণসুখে কতখানি ভোগাসক্তি মিশ্রিত ছিল, জানি না। কুক্ষণে আকস্মিক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া যে আনন্দের মধুর প্রতিহেলায় হারাইয়া ফেলিলাম। মনে হইতে লাগিল, যেন নীলাম্বরে বৃক্ষশাখায় চিত্র বিচিত্র হরিতাল কপোত মধুর স্বরে কূজন করিতেছিল; কোথা হইতে দুরন্ত শ্যেন আসিয়া তাহাদের ভীম নখরে বিদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল!

P 36,143

খানিক দূর সোজা পথে চলিয়া আমরা একটী গুহার পার্শ্বে উপনীত হইলাম। গুহাসন্নিধানে বারান্দার মত পাহাড়ের স্তর; আর তাহার সম্মুখেই প্রাচীরের ন্যায় খাড়া পাহাড়। বারান্দাটি সমুদ্রতীর হইতে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। সম্মুখে এই স্বাভাবিক শৈল-প্রাচীরের ব্যবধান থাকায় জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

কাছে যাইতেই দেখিলাম, গুহার নিকটে পাথরের উপর এক জন লোক বসিয়া আছে। এ কি! তাহার রক্ত চক্ষুর্দ্বয়ের ভয়াবহ দৃষ্টি যে আমাদেরই

উপর সংন্যস্ত! কি স্থির অচঞ্চল মূর্ত্তি! যেন আগা গোড়া পাথর কুঁদিয়া বাহির করা। যেন কোনও সমাধিমগ্ন যোগী হঠাৎ পাষাণ হইয়া গিয়াছে। কেবল অগ্নিপক্ষের ধীর সঞ্চালন তাহার প্রাণের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছিল। ক্রমে তাহার বিকট দৃষ্টি আমাদের মুখ হইতে অপসৃত হইয়া উন্মুক্ত-বারিধি-বক্ষে সংন্যস্ত হইল। মানুষের চক্ষে এমন জ্বালাময়ী দীপ্তি আর কখনও দেখি নাই। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণে উদ্দীপ্ত সমুদ্রের জলরাশি, সৌরকরদীপ্ত দর্পণের ন্যায় আমাদের চক্ষু পীড়িত করিতেছিল, কিন্তু সে ব্যক্তির যেন তাহাতে আদৌ ভ্রূক্ষেপই নাই! বাল্যকালে শুনিতাম, ঈগলপক্ষী নাকি এইরূপ অকম্পিত-দৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে। আজ সে চোখ তুলিয়া আমাদের দিকে চাহিল না।

গ্রীক বীর হার্কিউলিসের অনেক মূর্ত্তি দেখিয়া থাকিবে—এ যেন তাহারই সজীব ভগ্নাবশেষ। যেন দেবরাজ জুপিটার লোকে, খাদ্যাভাবে, অভিবিক্ত পরিশ্রমে, নির্ম্মমতা এইরূপ জরাগ্রস্ত যুবিরের আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

পথিপার্শ্বস্থ বিশাল ছায়াতরুর শাখাপ্রশাখাগুলি কাননে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে, অগ্নিপর্ব্বতে শুষ্ক কঠিন কাষ্ঠখণ্ডটির যেমন দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, এ লোকটির আকৃতি দেখিয়া আমার কেবল সেই কথাই বার বার মনে পড়িতেছিল। আমি তাহার রোমাবৃত, পেশীবহুল বাহু দুইটি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। শিরাগুলি স্থানে স্থানে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। মিশাও নয়; যেন ফুল ইস্পাতের তার! এ ব্যক্তি এক কালে কত শক্তিই না ধারণ করিত! এখনও এ ভগ্ন দেহে স্বাভাবিক শক্তিমত্তার কত চিহ্নই না বিদ্যমান! কোনও প্রাকৃতিক উৎপাতে এক খণ্ড পাষাণ পাহাড়ের গাত্র হইতে সরিয়া আসিয়া গুহার ভিতর একটী 'ভাকে'র সৃষ্টি করিয়াছিল। দেখিলাম, সেই উদ্গত প্রস্তরখণ্ডের উপর মৃন্ময় কলসীতে এক কলসী পানীয় জল রহিয়াছে। কলসীর মুখ এক খণ্ড রুটীর টুকরা দিয়া ঢাকা। গুহার কোণে এক রাশি শুষ্ক লতাপাতা। বুঝিলাম, উহাই উদাসীর শয্যার একমাত্র উপকরণ। শুনিতাম, খৃষ্টিয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে মরুপ্রান্তরবাসী খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিগণ নানারূপ কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত হইতেন। ধর্ম্মোন্মাদনা ও আত্ম-প্রাধান্যের এমন জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

কত স্থানে কত লোক দেখিলাম, কিন্তু এই সমুদ্রচারী দীবরের ন্যায় এরূপ মনোরঞ্জক মূর্ত্তি ত আর কাহারও দেখি নাই। ইহার বৈরাগ্যের পশ্চাৎ

কারণ তখন অবগত না থাকিলেও, মনে মনে অনেক কথা যেন বুঝিতে পারিলাম।

এ কঠোরব্রতধারী কে? কাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে চোখ রাঙ্গা করিয়াছে? ঐ পাথরে গড়া হাতের আঘাতে কাহার বক্ষপঞ্জর চূর্ণ হইয়াছিল? এ কুঞ্চিত ভ্রূযুগে ত কুটিলতার চিহ্নমাত্র নাই। যে-নারীরা প্রাণীজগতের স্বাভাবিক সহচর, এ যেন তাহাদেরই নির্দ্দোষ রেখাঙ্কিত। তবে কি এ ক্ষেত্রে কর্কশ আকৃতির সহিত উদার হৃদয়ের সমন্বয় ঘটে নাই? এ গৃহত্যাগী সব ছাড়িয়া পাথরেই উপুর হইয়া কেন? তবে কি ইহার মনুষ্যত্বটুকুও প্রতারীভূত হইয়া গিয়াছে? ইহার মধ্যে কতটুকু মানুষ আর কতটুকু পাথর, তাহাই বা কে বলিবে?

এইরূপ নানাবিধ প্রশ্নে আমাদের চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল, কিন্তু কে ইহার সদুত্তর দিবে? পথপ্রদর্শকের অনুমানই ঠিক হইল। আমরা আর সেখানে অযথা বিলম্ব না করিয়া বিনা বাক্যে অতিক্রান্ত পথের অনুসরণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

তেমাথায় আসিয়া দেখিলাম, পাণ্ডারা আমাদিগের অপেক্ষা করিতেছে। ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা অনুতপ্তা নূতন-যাত্রিকা-প্রত্যাগমনের ভাব ব্যক্ত করিয়া সে নিজের অচিন্তিতার মার্জ্জনা করিয়া লইবে, 'কি মা'র, স্নানে কি বাসী হইলে মিষ্টি লাগে কি না?' কিন্তু সেখানে আসিয়া, কোনও যাত্রী কথা না তুলিয়া বসিল, কেহ বোধহয় পেছনের ও পূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিবার, 'ওখানে বসিয়া ও কবে কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে? যাহাতে নারী জাতির সঙ্গে কি তত্ত্ব প্রেম করিয়াছে? তাহা কি, এই সব লোকে তাহাকে 'ব্রতধারী' বলিয়া ডাকে। আমাদিগের চোখে চক্ষুনিতে যেন আকাঙ্ক্ষার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। পথপ্রদর্শক আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, আমাদিগের অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত কাহিনী শুনাইয়া দিল। তাহার গ্রাম্য ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমি পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিব।—

'মা ঠাকরুণ!' লোকে বলে, ও মহাপাপী। যাত্রে মহাপাপ তাহাতে কোনও পুরুতঠাকুরের কাছে নিস্তার পাপ স্বীকার করে' যাবতা নিয়ে এসেছে! তিনি যে রকম প্রায়শ্চিত্তির করতে বলে দিয়েছেন, তাই ঠিকমত করবার জন্য ও ঐ পাহাড়ের ধারে পড়ে থাকে। নাম ও কামরেনার। আসল কেউ

পেট চিরে দেওয়া, এই সব ছিল তার নিত্যিকার ছেলেখেলা। ভাদের মত মেরে ফেলা, রক্তারক্তি করাটাই যেন তার খুব ভাল লাগ্‌ত। বাপ দেখে বল্‌ত, "বেটা মরদ দেখে ডরায় না; বয়েস হ'লে, লড়াইয়ে গিয়ে ভারি নাম কিন্‌বে।" তার ছেলেবেলার এ সব কীর্ত্তি আমরা ত ভুলিইনি, পরে তার বাপকেও এ সব কথা বিশেষ করে' মনে কর্‌তে হ'য়েছিল। যখন বছর পনর ষোল বয়েস, তখন পিয়েরের পো জ্যাক্ কামব্রেমার থেকে আঁটা হয়ে গিয়েছে। তখন থেকেই সে গাঁয়ের কি সে ভূতের গিল্লে মজা ওড়াতে আরম্ভ কর্‌লে। এ সব আমোদ 'রেস্ত' ভিন্ন হয় না; কাজে কাজেই চুপি-চুপি তার মার টাকায় হাত পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভালমানুষের মেয়ে সে, ছেলের এ সব চুরী চামারীর কথা মুখ ফুটে' সোয়ামীকে বল্‌তে পার্‌ত্তো না। আর টাকা কড়ির ব্যাপারে পিয়ের কামব্রেমার ছিল খুব খাঁটী লোক। কেউ কখনো ভুলে' দুটো পয়সা বেশী দিয়ে গেলে সে দশ ক্রোশ হেঁটে গিয়ে তা ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌ত।

জ্যাক্ কামব্রেমারের ক্রমেই সাইস বেড়ে উঠ্‌ল। একবার তার বাপ দিন কতকের জন্যে মাছ ধর্‌তে বেরিয়েছে, তারই মধ্যে এক দিন সন্ধ্যে বেলা, ছোঁড়া যা কিছু গেরস্থালীর জিনিসপত্র ছিল, সব বেচে' নাস্তে সহরে আমোদ করতে চলে গেল। কাপড় চোপড়, বাসন-কোষন, বাপ মা, এমন কি, বিছানার চারখানা পর্য্যন্ত বাকি রইল না; থাক্‌ল কেবল, ঘরের দেয়াল চারখানা। মাগী আর কি কর্‌বে? দিনরাত্তির কেঁদে বুক ভাসাতে লাগ্‌ল।—ছোঁড়া বাপ ফিরে এলে তাকে কোন্ মুখে ছেলের কীর্ত্তির কথা বল্‌বে, এই ভয়েই অস্থির। তার নিজের আর অপরাধ কি? যা কিছু ভয় ভাবনা, তা ঐ হতভাগা ছেলেটার জন্যে। পিয়ের কামব্রেমার এসে দেখ্‌লে, —এর ওর কাছ থেকে জিনিস পত্তর ধার করে' নিয়ে ভাদের সংসার চল্‌ছে। পরিবারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "হাঁগা, এ সব এলো কাদের কাছ থেকে? আমাদের ঘরের বাক্স সিন্দুক আসবাবপত্তর সব গেল কোথা?"

'জাকের মা এই ক'দিনেই আধমরা গোছ হয়ে উঠেছিল। কি আর জবাব দেবে? বল্‌লে "সব চুরী হয়ে গিয়েছে।"

"জাক কোথায়?"

'সে আমোদ করতে চলে গিয়েছে।"

পিয়ের বল্লে, "তার আহ্লাদ যে বড় বেড়ে উঠেছে দেখ্‌ছি।"

'লাইছাড়া ছোঁড়াটা যে কোথায় গিয়েছিল, সে খবর কেউই জানত না।

'মাস ছয় পরে জাকের বাপ খবর পেলে যে, তার ছেলেকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। নাতের ফৌজদারী আদালতে বিচার হবে। বেচারা আর কি করে? মনুষ্যের পথে যেতে গেলে দেরী হয় বলে' হেঁটেই নাগেশ চলে গেল। গিয়ে কোনও রকমে ছোঁড়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

'ছেলেকে—সে কি করেছিল না করেছিল, তা আর জিজ্ঞাসা না করে' শুধু বললে, "দেখ বাপু! তুই বইয়ে লাইছাড়ের মত সোজা পথে চলবি। আর মাছ ধরতে পারার সময় মাছ ধরবি মাত্র। এ যদি না করিস, তবে এবার আমার সঙ্গে বোঝা পড়া।" লাইছাড়া ছোঁড়া বাপের কথার জবাব না দিয়ে মুখের কাছে গিয়ে মুখভঙ্গী করলে ভেংচিয়ে, অর্থাৎ বাপের মত হবে—এবারও তা আমল করবে' উড়িয়ে দেবে। কিন্তু বাছাধনকে—জাকের ভার বাপ এমন চড় মারলে যে, মুখের বিড়ালী ছোঁড়া ছ' মাস আর উদ্ভূত হলো না। ছেলের যা পাপ করেছে তা'লে—তা জানা ছিল মায়ের। পিয়েরের পরিবার মনের কষ্টে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল।

একদিন তারা শীতঋতুতে শুয়ে রয়েছে, এমন সময়ে জাকের মা কি যেন একটা শব্দ শুনতে পেয়ে। বিছানা থেকে উঠতেই বুঝি যেন তার হাতে ছুরী মারবার—এমন চেঁচানী শুনে' পাড়ার প্রতিবেশীরা ছুটে এল। পিয়ের তাদের জিম্মে রেখে গেল, তার স্ত্রীর পাশ দিয়ে রক্ত-রক্ত হয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। তারা মনকে বোঝালে, তার অকিঞ্চিৎ হৈমবতী কিন্তু ছোঁ থেকে আসবে বাঁচার? এ বেধে কি তোর তাকাত আছে? হাজার জোরের তোড়া দিয়ে না জোয়ান্দিক থেকে সাঁ নাজোয়ার পর্য্যন্ত কোন্ উড়ে-এসে-জুড়ে বাও, কি আছে কি না আছে, কেউ তোমাদের জিজ্ঞাস করবে না। পিয়ের সেই রাত্তিরেই জাকের খোঁজে চলে গেল; কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। পরের দিন সকালে পাষণ্ডটা নিজে নিজেরায় ভাবে এসে বললে, "কাল একটু বাজে সহরে বেড়াতে গিয়েছিলুম—" একটা কিছু বলতে হচ্ছে, জাকের মা টাকা কড়ি লুকিয়ে রাখতে ভুলে না। পিয়েরের হাতে কিছু হ'লে সে ক্রোয়াজিকের দু পোন্ ম'শায়ের কাছে গচ্ছিত রেখে আসতে; কিন্তু তার পরিবারের তত ভঁস-পর্ব্ব ছিল না।

'ছোঁড়ার বদ্‌খেয়ালিতে জাকের যে কত খরচ হয়ে যাচ্ছিল, তা আর বলবার

নয়। তাদের হাতায় অনেকের সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক শুধু এই কাজেই নষ্ট হয়ে গেল। অবস্থা ত নিতান্ত মন্দ ছিল না। বাস্তুভিটার খাজনা টাজনা কিছুই তাদের দিতে হতো না। সে দ্বীপটার তারাই মালিক ছিল। জমেরও বন্দোবস্তী ত ছিলই। তার উপর স্যুলেনের পাশ থেকে তাকে তাড়িয়ে আনতে কত যে খরচ হয়েছিল, তার আয় লেখা-জোখা ছিল না। তাদের যেন কেমন একটা দুঃসময় পড়ে গেল। সময় বুঝে' সিমেয়ের ভাই ব্যবসায় লোকসান দিয়ে একবারে ফতুর হয়ে এলো। এমনি হয়ে থাকে যে, যতই না কাজে চলে না। তারা অনেক দিন থেকেই আলাদা। তা হ'য়ে থাকে। ভাকের তাই থাকে কোথায়? ভাকের বাপ আপন ভাইকে কাছে এনে মহা চিন্তায় পড়ে গেল। ভাকের কাকীমা আবাদ কোণের একটা কাঁচা মেয়ে মেপে বাড়ী থেকে বেরুতে না বেরুতেই মারা গেল। সেই মেয়েই এই মেয়ে। এর জন্যে ভাকের বাপকে যথেষ্ট খরচ করতে হলো। নিতান্ত ছোট মেয়ে, মায়ের দুধ ছাড়া খেত না। ভাগ্যে সেই সময়ে তাদের একটি বাছুরে ছেলে হয়েছিল। তারই দুধ খেয়ে মেয়ের কোনও মতে বেঁচে গেল। সে মাগী ত আর মেয়েটাকে অমনই দুধ খাওয়াত না। তার জন্যে পিতের কাছ থেকে মাস মাস টাকা নিতে হতো। পিতেয় ভাইকে বোঝাবার জন্যে বলতো, "তুই ভাবিসনে; মেয়ে বেঁচে থাক, ওর সঙ্গে আমার ভাকের বিয়ে দেব।" আপনা-আপনির মধ্যে এ-রকম বিয়ে এ দেশে আজকাল হয়ে থাকে। ছেলে মানুষ করা কি সাংঘাতিক ব্যাপার, দুধের দাম ত আছেই। তা ছাড়া কত কাপড় কাচিয়ে দিতে হয়েছে—সবই যোগাতে হয়। এই-সব খরচ খরচার আর পেরতের সেই দুধ-না-খাওয়ার মাস দু'য়ের বাকী খাজনা চুকিয়ে দিতে সিমেয়ের স্ত্রীর গ্রাস থানেক টাকা ধার হয়ে পড়লো। ভাকের বাপ লেখাপড়া জানত, বাড়ীর লেখা ছিল তাকা মুহুরীর মতন। সেমাগীর কাছে একদিন একখান চিঠি লেখা হচ্ছিল, সে কাগজ মুড়ে' পেরতের যৌতুক বলে' এই ছুতায় নিয়ে গায়ের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল। তাকে হতচ্ছাড়া ভাই না টের পেয়ে, ভাতে ভাতে যখন বার করে নিয়ে, তা ক্রোমাদিকে ফুর্তি করতে পালিয়ে গেল। বিধির লিখন খণ্ডাবে কে? যা হবার, তা কি আর আটকে থাকে। পিতের কামব্রেমায় মাছ ধরতে গিয়েছিল? সে দিন নৌকা থেকে নেমেই দেখ্‌লে, ঘাটের ধারে জলে কি একখান কাগজ ভাসছে। বাড়িয়ে নিয়ে তার ভাব হাতে দিলেই, চোখের জল চিবুক বেয়ে

স্বস্তান হয়ে মাটীতে পড়ে গেল। কাম্‌ব্রেমার আর কিছু না বলে' সা ক্রোয়াজিকে রওনা হ'ল;—গিয়ে শুন্‌লে, ছেলে চন্দর হোটেলে বিলিয়ার্ড খেলছে। হোটেলওয়ালী মেয়েকে ডেকে বল্‌লে, "দেখ, জান তোমাকে আমার ছেলে একটা স্পেনী মোহর দেবে। আমি তাকে সেটা খরচ করতে মানা করে' দিয়েছিলাম। যদি দেয় ত সেটা আমাকে দিবিয়ে দিও। আমি বাইরে দুয়ারের কাছে বসে রইলাম। মোহরটা পেলেই তার যা নায্য দাম হয়, নগদ টাকা দিয়ে তখনই মিটিয়ে দেব।" হোটেলওয়ালী ভালমানুষ, কথামত মোহরটা এনে দিলে। কাম্‌ব্রেমার দাম চুকিয়ে দিয়ে সেটা নিয়ে বাড়ী চলে এল। বল্‌লে, জান, একবার ওর দৌড়টাই দেখা যাক। মহুরের মোক শুধু এইটুকুই টের পেলে। কাম্‌ব্রেমার বাড়ী এসে স্ত্রীকে বল্‌লে,—"দেখ, নীচের ঘরটা বেশ সাফ্ করে ফেল ত।" ঘর দুয়োর সব পরিষ্কার হ'ল। সাঁজকাল, আগুনের কুণ্ডে আগুন জ্বেলে' ঘরটা গরম করা হ'ল। টেবিল খাওয়ান হ'ল। তার উপর মোটা বাতি জ্বলতে লাগলো। টেবিলের এক দিকে দু'খানা চেয়ার, সামনে একখানা টুল। পিয়ের জাকের মাকে বল্‌লে, "দেখ, আমাদের সেই বিয়ের রাত্রের কাপড় চোপড়গুলো বার করত। তোমার গুলো তুমি পর; আমার গুলো আমাকে দাও, পরে আসি।"—যা বলা, তাই করা। বিয়ের পোষাক পরা হ'য়ে কাম্‌ব্রেমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাইকে ডেকে বল্‌লে, "দেখ, তুই বাইরে বেশ হুঁসিয়ার হ'য়ে পাহারা দে। যদি জলার ও পারে কি গাঁয়ের দিক থেকে কোনও শব্দ শুনতে পাস্, ত আমাকে তখনই খবর দিবি।"

'এটুকু বলি পরে, আর পরিশ্রমের কাপড় ছাড়া সাঁঝা হয়েছে বুঝে, পিয়ের বন্ধুর ঘরে ফিরে এল। তার পর নিজের বন্দুকটা বার করে' বারুদ ঠাসল গেদে আগুনের কুণ্ডের কাছে বেশ কোণে লুকিয়ে রেখে দিলে।

'খানিক পরেই তার বাড়ী ফিরে এল। তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সে হোটেলে বসে' বসে' শুধু মদ খেয়েছে, আর জুয়ো খেলেছে। শেষে এমন অবস্থা যে, ধরাধরি করে' ও পারে কার্ল্‌ব পয়েন্টের কাছে রেখে যেতে হয়েছে। সেখান থেকে তার চীৎকার শুনে তার কাকা নৌকা নিয়ে গিয়ে তাকে জলা পার করে নিয়ে এল। পার হবার সময় কিন্তু ভাগ্নে মন্দ কোনও কথাই তার কাছে ভাঙলে না। জাক বরে ঢুক্‌তেই তার বাপ বল্‌লে, 'এই—এ দিকে এসে বস্‌তো ওই টুলখানার উপর; তোর বাপ

মার কাছে তুই আজ গুরুতর অপরাধ করেছিস্—আজ আমরা দুজনেই তোর বিচার করবো।" কাম্‌ব্রেমারের চোখের ভাব দেখে জাকের ভয় হ'ল, সে নেশার ঝোঁকে হাউ-হাউ করে' কান্না জুড়ে' দিলে। তার বাপ ধমক্ দিয়ে বল্লে,—"দেখ্, ফের যদি চেঁচাবি, তা হ'লে এখনই তোকে কুকুরের মত গুলি করে' মারবো।" ধমক খেয়ে বাছাধন একদম্ চুপ। পিয়ের বল্লে, "দেখ্, এই কাগজখানার একখান হিস্পানী মোহর জড়িয়ে তোর মা বিছানার ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল। সে খবর সে ছাড়া আর কেউ জান্তো না। কাল দেখ্‌লাম, কাগজখানা জ্বলে ভাস্‌ছে, আর তোর মা মোহরটা খুঁজে পাচ্ছে না। তুই জাক্‌কে হোটেলওয়ালী ফ্লেরীকে—এই মোহরটা দিয়ে এসেছিলি। এটা ও হিস্পানী আস্‌রফী। এখন তোর কি বল্‌বার আছে, বল্।"

'জাক্ কি তেম্‌নি ছেলে যে, স্বীকার যাবে? সে বল্লে, তার এক মোহর, সে চোখেও দেখেনি—এটা হচ্ছে তার নাস্তের দরুণ মোহর। খরচ খরচা করে' এইটেই বেঁচে গিয়েছিল।

'পিয়ের বল্লে, "বেশ। তোরই যদি হয়, তার কোনও প্রমাণ আছে?"

'জাক বল্লে, "প্রমাণ আবার কি?"

'আমি বল্‌ছি—"আমার মোহর।"

"তোর মার মোহর নিস্‌নি?"

"না।"

"একবার পরকালের কথা ভেবে' হলফ্ নিয়ে এ কথা বল্‌তে পারিস্?"

'জাক্ হলফ্ নিতে যাচ্ছে দেখে' তার মা তার মুখের দিকে চেয়ে' বল্লে, "দেখ্ বাবা, মিছে কথা হলফ্ করে' বলে' চিরজীবনের মত ইহকাল পরকাল খোয়াস্‌নি; এখনও ভাল-হ'তে পারবি; এখনও শোধরাবার উপায় আছে।" বলে' জাকের মা হাঁটুসুদ্ধমনে কাঁদিতে আরম্ভ করিলো। জাক্ বাপের তেমনি অনুগত। সে মার কান্না দেখে নরম হবে। তাকে মুখ বেঁকিয়ে বল্লে, "বাঘিনে দিয়ে এখন এয়েছেন ভাঁওতাময়ী কবিতে। তুমি যে কি চিজ, তা জানা আছে। কিসে আমি হাঙ্গামে পড়ি, তোমার কেবল সেই চেষ্টা।"

'রাগে কাম্‌ব্রেমারের মুখ ফেকাসে হ'য়ে গেল;—ছেলেকে বল্‌লে, "তোর মার যে এই অপমান করলি, এর জন্যে তোর শাস্তি বাড়বে বই কমবে না। বাজে কথা রেখে দে; বল্, হলফ্ নিয়ে বল্‌বি ত?"

'জাক বল্লে, "হাঁ।"

পিয়ের বল্লে, "দেখ, সার্ডিন মাছের দাম মেটাবার সময় মহাজন নিজে হাতে এমনই করে' মোহরটায় চেরা কেটে দিয়েছিল, বল্—তা হ'লে তোমার টাতেও এম্নি দাগ দেওয়া ছিল।"

জাকের তখন বেশ চটে আস্ছিল। সে আর জবাব না দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কর্লে। পিয়ের বল্লে, "মা-মুখর, তা হয়েছে; এখন কথা কয়ে আর মিছে সময় নষ্ট করার দরকার নাই। কাম্ব্রেমার বংশের কেউ যে ফাঁসিকাঠে অন্যের হাতে মরবে, সেটা আমি ইচ্ছা করি না। ভগবানের নাম কর, অন্তিমকালে যা কিছু প্রার্থনা থাকে, সেরে ফে। পাদরীকে ডাকতে পাঠিয়েছি; দোষ স্বীকার না থাকে, তিনি এসে পরে তাঁর কাছে স্বীকার করিস্।" জাকের মা একটু আগেই উঠে গিয়েছিল—ঘরে প্রোটেস্ট বটে, বসে' থেকে ছেলের প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনবে কি করে? একটু পরেই জাকের কাছে গিয়ির্যাকের পাদরীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। জাক্ তাঁর কাছে মোটেই মুখ খুল্লে না, না কর্লে অপরাধ স্বীকার; না কর্লে 'প্রাচিত্তির'। বেশী চালাক কি-না, ভেবেছিল, তার বাপ গরুকে নষ্ট হবার ভয়ে পাদরীর কাছে অপরাধ স্বীকার না করিয়ে প্রাণে মারবে না।

'কাম্ব্রেমার ছেলের একগুঁয়েমী দেখে পাদ্রীকে বল্লে, "বাবা! মিছে-মিছি আপনাকে কষ্ট দিলাম, কোনও অপরাধ নেবেন না। ছোঁড়াটা যে বজ্জাত, ওকে একবার ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়েছিল। ঘরের ব্যাপার বলে' কারুর কাছে এ সব কথা প্রকাশ কর্বেন না।" তার পর ছেলেকে খুব ধমকে বল্লে, "দেখ্ ভৈরব যদি এমন হয়, তা হ'লে তোকে সেই দিনই সাবাড় কর্বো, প্রাচিত্তির-ট্রাচিত্তির কিছুই মান্বো না।" ছোঁড়া মনে কর্লে, আজ তাহ'লে এই পর্য্যন্ত—রাগ পড়ে গেলে যে-কে-সেই হয়ে যাবে। এই ভেবে সে নিশ্চিন্ত হয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়্লো। তার বাপ কিন্তু চারিদিকে চোখ রেখে জেগেই বসেছিল। ছেলে ঘুমিয়ে পড়্তেই তার মুখের ভিতর খানিকটা সবের ফেঁসো পুরে দিয়ে, ছেঁড়া পাইলের একটা টুকরা কেটে বেশ করে মুখটা বেঁধে ফেল্লে, তার পর তার হাত পা বেশ শক্ত করে বেঁধে দিলে। ছোঁড়ার আর নড়্বার চড়্বার যো-রইল না। ছোঁড়ার যে কান্না, কাম্ব্রেমার গুজকে বলেছিল, তার চোখ ফেটে নাকি রক্ত বেরিয়েছিল। জাকের মা এসে সোয়ামীর পায়ে লুটিয়ে পড়্লো। পিয়ের কিন্তু কোনও কথাই কাণে তুল্লে না। স্ত্রীকে বল্লে, "ওর বিচার হ'য়ে গিয়েছে; যার একটা

ঠিক। ওকে নৌকার উপর তুলে নাই গে।" জাকের মা রাজী হ'ল না। তখন পিয়ের হাত দু'খানা বাঁধা জোয়ান ছেলেটাকে এক রকম কাঁধে ক'রে নিয়ে নৌকার পাটাতনের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে তার গলায় মস্ত একখানা পাথর বেঁধে দিলে। তার পর পিয়ের সেখানে পাহাড়ের কাছে বসে আছে—দেখেছ, এখান থেকে প্রায় তিনটী ক্রোশ দূরে সমুদ্রের ভিতর একটী নৌকাপাল দেখা যাচ্ছে। জাকের মা সেই নৌকাখানা ফিরবার জন্যে তার হাতবহে ডেকে নিয়ে এল। তাই কি আর পারে? সেই থেকেই 'একবারটী মাপ কর!' 'একবারটী দয়া কর!' বলে' ছেলেটীর জন্যে কত যে মিনতি করতে লাগল, তা আর বলবার নয়—চেঁচিয়ে তার গলা ভেঙে গেল। পিয়ের কিন্তু সে সব গ্রাহ্যই করলে না। পর ত নয়—আপনার ছেলে, মায়ার বন্ধন তখন ছেঁড়বার জন্যে ছট্‌ফট্ করে উঠ্‌ছিল। চাঁদনী রাত; ফুট্‌ফুটে জোৎস্না; হাওয়া একেবারে নাই। পিয়ের স্ত্রী দেখতে পেলে—বাপ এত আদরের ছেলেকে নিজে ভুলে' ঘুমে' সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিলে! ঝুপ্ করে একটা শব্দ, ব্যস্—একটা বুদ্‌বুদ্ পর্য্যন্ত—তাও উঠ্‌লো না। এত বড় যে একটা কাণ্ড হয়ে গেল, তার কোনও চিহ্নও রইলো না। সমুদ্রের ত আর নদী পুকুর নয়, তার কাছ থেকে কোনও কথাই ফাঁস হয় না। কাযে কাযেই কামব্রেমার তার স্ত্রীর গোঙানি শুনে তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে কিনারায় ফিরে এল। এসে দেখ্‌লে, তার আর ছেলে-মেয়ে নাই, মড়ার মত পড়ে আছে। দুই ভাইয়ে ধ'রে তুলে তাকে আর তিন্ পথ হাঁটিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারলে না—কোনও রকমে তারা ছেলের দরুণ নৌকাখানায় উঠিয়ে তা ভেসে-চিন্তে দাঁড় দিয়ে ঠেলে বুঝে পেতে বাড়ীর দোরে পৌঁছল। তাদের বাড়ীটা খুব্‌সই বড়। মোটা রকম দশ দিন পাঁচ ছয় কেটেছিল। সেবার সময় মেয়েমানুষটীর হাতে ধ'রে বলে' গেল, সে যেন সে নৌকাখানা সাম্‌নে না রাখে; —যেন সেটা সঙ্গে সঙ্গেই পুড়িয়ে ফেলে। মিনসে এ কথাটা আর দ্বিতীয়বার বল্‌লে না। বৌটা মরে যেতেই সেও যেন কেমনতর হ'য়ে গেল। কি যে নাই, কি যে চাই, সবই যেন ভুলে গিয়েছে। চলা-ফেরা যেন মাতালের মত, যেন কোনও কিছুরই হুঁস্ নাই।

'তার পর—দিন দশেক ধরে' কোথায় কোথায় ঘুরে' ফিরে পিয়ের সেই যে এসে পাহাড়ের ধারে ব'সেছে, কারুর সঙ্গে আর একটী কথাও কয় নি।'

লিখিতে লিখিতে কলম থামিয়া গেল। লিখিতে যে মন

[illegible] অনাড়ম্বর 'চাঁচা-ছোলা' [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]ভার জলে সওদাগরের আর কোন্য রোগচিকিৎসন করিয়া রহিয়াছে। এখানকার এ নিমন্ত্রণ মহলের আর কি বর্ণনা করিব? চারিদিকে অগম চড়ুচোরা 'খাড়' ভিতর হইতে মাটী তুলিয়া বেশ গভীর করিয়া কাটা। ঢালু পাড়। ভিতরে ভিতরে বাঁধ—সমস্তই মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত। খাল-খাড়ে লোণা জলের উপরিভাগে লবণ জমিয়া থাকে। লবণ-আবাদের মজুরেরা বাঁধের উপর দিয়া বিভিন্ন খাতে যাতায়াত করিয়া 'কাঁচা' লবণ-সংগ্রহ করিয়া আনে। 'বিদা'র ন্যায় এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ভিসিয়ানে [illegible] হইতে উহা কতকগুলি বৃত্তাকার পাটা তলের উপর সঞ্চিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ লবণস্তূপ গঠিত হইয়া থাকে। নববর্ষে খেলার ছকের ন্যায় পরস্পর-সন্নিবিষ্ট এই সকল চৌকা কাটা গর্ত্তের ধার দিয়া আমাদিগের গাড়ী দুই একবার দুলিয়া যাইতে হইল। এ লোনার দেশে গাছ পালা কিছুই জন্মে না। ঘাস পাতা সমস্তই লবণে 'জরিয়া' যায়। মাঝে মাঝে দুই এক জন লবণ-সংগ্রাহক ছাড়া এ পথে লোকজনের সহিত বড় দেখাশুনাও হয় না। লবণ-আবাদে নিযুক্ত লোকদিগকে এ অঞ্চলে 'পালুদিয়ে' বলিয়া থাকে। চোলাই-লরখানার মদ্য-ব্যবসায়ীদিগের হাত-কাটা মেরজাইয়ের ন্যায় ইহারাও এক প্রকার বিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করে। এ-শ্রেণীর বাহিরে ইহারা কদাচ বিবাহ করে না। এ-জন্যই কোনও 'পালুদিয়ে'-কন্যার অপর-জাতীয় পুরুষের সহিত পরিণয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এই সকল শ্রীমণ্ডিত জলা, কদর্য্য কর্দ্দম-স্তূপ, পুষ্পহীন বৃক্ষের মৃত্তিকার সহিত আমাদিগের তখনকার সাক্ষাৎ-পরিচয় বেশ সুমিষ্ট ঘটিয়াছিল। কতক দূর আসিয়া সমুদ্রসংলগ্ন একটী খাল পার হইতে হইল। দেখিলাম, এই খাল-পথেই সাগরের জলরাশি বিনা প্রবেশ করিয়া এই সকল জলাভূমি লবণাক্তপূর্ণ করিয়া রাখে। ক্রমাগত কয়েক দিবস নিরানন্দ দৃশ্যের পর খালধারের সেই সামান্য তৃণগুল্মের হরিত শোভা দেখিয়া আমাদের কি আনন্দ! পাক হইবার সময় কাস্টিয়েরা দিগের [illegible] সেই কি মধুর ঘাসটি নজরে পড়িয়া গেল। আমরা তাড়াতাড়ি সে [illegible] ফিরাইয়া লইলাম। হোটেলে আসিয়া দেখিলাম, নীচের তলায় এক ঘরে একটী বিলিয়ার্ড টেবল রহিয়াছে। অনিলাম, লা ক্রোয়াজিকে ইহাই সাধারণের বিলিয়ার্ড খেলিবার স্থান। আমাদের আর সেখানে রাত্রিবাস করা হইল না। সেই রাত্রেই যাত্রার ব্যবস্থা করিলাম। পর দিন সকালে গাবাদে পঁহুছিয়া তবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

---

* ব্যালজাকের Un drame de lord de la mer নামক গল্পের মূল করাসী হইতে অনূদিত।

ঊরুক্ষিতি ও পাঞ্চজন।

ঋগ্বেদ আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। কিন্তু ইহা যে আর্য্যদিগের প্রথম রচনা নহে, তাহাও ঋগ্বেদপাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন। আমরা এই প্রবন্ধে প্রাক্‌বৈদিক যুগের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। সেই প্রাচীন কালে আর্য্যগণ যে দেশে বাস করিতেন, এবং যে নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাহার সন্ধানই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ যখন যজ্ঞার্থ ঋক্ রচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন দিগ্বিজয়ী সম্রাট প্রাদুর্ভূত হন। ইহাদের বিজয়-কাহিনী ঋষিগণ ঋকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল ঐতিহাসিক বিষয়েরও আমরা এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব না।

ঋষিগণ আপন আপন কালের কথা বলিতে গিয়া প্রাক্‌বৈদিক যুগের অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন। উহা বৈদিক যুগে কিংবদন্তীরূপে বা পূর্ব্বতন ঋষিদিগের রচনা হইতে তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন। ঋষিদিগের রচিত এই জাতীয় ঋক্ হইতে আমরা আর্য্যদিগের বাসস্থানের নাম ও আর্য্যগণ যে সকল নামে আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন, তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদে আর্য্যগণ দাস, দস্যু, বৃত্র, দানব, পণি, মৃধ, যাতুধান, রাক্ষস, কিকটদিন্ প্রভৃতি জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল শত্রু-জাতীয়দিগকে আমরা অনার্য্য বলিতে পারি। আর্য্য শব্দের অর্থ কি? আর্য্য শব্দ 'ঋ' ধাতু হইতে আসিয়াছে। উহার অর্থ—'গমন'। অতএব আর্য্য শব্দের অর্থ 'যিনি দেবতার নিকট গমন করেন'। যাহারা অনার্য্য জাতি, তাহাদিগকে অব্রত বলা হইত। (১) ইহা দ্বারা বেশ বুঝাইতেছে যে, আর্য্যগণ যজ্ঞরূপ ব্রত করেন, এবং অগ্নি, ইন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি দেবগণের নিকট গমন করিয়া থাকেন। আর্য্যগণ আপনাদিগকে 'আর্য্যবর্ণ' বলিতেন। (২) বেদে আর এক বর্ণের উল্লেখ আছে, তাহা 'দাস বর্ণ'। (৩) জাতিদিগের

(১) সহবান্। দস্যূন্। অব্রতান্। ত্বয়ঃ। পাত্রঃ। নু। শোচিষা।—১।১৭৫।৩
অগ্নি যেমন তাপ দ্বারা পাত্রকে, (তুমি) সেইরূপ অব্রত দস্যুদিগকে তপ্ত কর।

(২) হন্। দস্যূন্। প্র। আর্য্যং। বর্ণং। অবিৎ।—১০৩।৯
ইন্দ্র দস্যুদিগকে হত্যা করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।

(৩) যঃ। দাসং। বর্ণং। অধরং। গুহা। অকঃ।—২।১২।৪
যিনি দাসবর্ণকে দক্ষিণ দিকে গুহায় (দূরে) করিয়াছেন।

মধ্যে বিভেদ বর্ণ দ্বারা সহজে করা যায় বলিয়া বোধ হয়, 'বর্ণ' শব্দ জাতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল। অপর যে সকল অনার্য্য বা অব্রত জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা দাস জাতি হইতে বিভিন্ন বলিয়া অনুমান করি। কারণ, পণি নামক এক জাতির 'সম' আখ্যা দেখিতে পাই। (১) অনুমান করি, পণিগণ সমান-বর্ণ হইয়াও অব্রত ছিল।

— দাস, দস্যুগণের অনেকে সাঁওতালি-জাতীয় ছিল বলিয়া অনুমান করি। কারণ, দাসগণের বর্ণ কৃষ্ণ ছিল। (২) এক স্থলে ইন্দ্র 'উরণ' নামক দস্যু সংহার করিয়াছেন, বর্ণিত হইয়াছে। (৩) সাঁওতালদিগের মধ্যে 'উরাও' জাতি এখনও বর্ত্তমান। দাসগণ দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বতগুহায় বিতাড়িত হইয়াছিল, ইহাও জানিতেছি। এই সকল একত্র গ্রহণ করিলে, দাস ও দস্যুগণ সাঁওতাল-জাতীয়, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। দাস জাতি কৃষ্ণবর্ণ ছিল; আর্য্যগণ কিন্তু শ্বেত ও সুবর্ণ-বর্ণ ছিলেন, বৈদিকে পাই। (৪) ঋগ্বেদের যুগে, আর্য্য ও দাস, উভয় বর্ণই, একই ঋষির অধীনে বাস করিত, এবং তিনি উভয় বর্ণকেই পালন করিতেন, এরূপ বর্ণনাও বেদে দেখা যায়। (৫) ইহা হইতে মনে হয়, বৈদিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋগ্বেদের কালেই দাসগণ আর্য্য সমাজের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। শূদ্র শব্দ ঋগ্বেদের মধ্যে কেবল এক স্থলে

---

(১) তন্না। সমস্য। ত্বন্ময়ং। যাবিষ্ণ।—
কিকিরা কৃণু —ভাংতীচ
তাহার দ্বারা 'সমে'র হৃদয় কাটিয়া কিকিরা কর।

(২) নঃ। বৃত্রহাঃ। ইন্দ্রঃ। কৃষ্ণযোনিঃ—
পুরন্দরঃ। দাসীঃ। ঐরয়ৎ। বি॥ —২।২০।৭

সেই বৃত্রহননকারী, পুরবিদারণকারী ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাসী (বিশেষ) সংহার করিয়াছেন।

(৩) অধ্বর্যবঃ। যুঃ। উরণং। জঘান।—২।১৪।৪

হে অধ্বর্য্যগণ। যিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) উরণকে সংহার করিয়াছেন।

(৪) পিতাকঃ। বজ্র। নমসা। কপর্দ্দিনঃ।—৭।৮৩।৮

যাহার শ্বেতবর্ণ কপর্দ্দিগণ নমস্কার দ্বারা...।

পিশঙ্গ-রূপঃ। সুভরঃ। বয়োধা।
শ্রুষ্টী। বীরঃ। ভরতে। দেবকামঃ।—২।৩।৯

সুবর্ণবর্ণ, শোভনযজ্ঞ, অন্নধারক, ক্ষিপ্রগুণযুক্ত, বীর, দেবভক্ত জন্ম গ্রহণ করেন।

(৫) উভৌ। বর্ণৌ। ঋষিঃ। উগ্রঃ। পুপোষ।—১।১৭৯।৬

উগ্রঋষি (অগস্ত্য) দুই বর্ণকে পালন করিয়াছিলেন।

[illegible] কিন্তু ভরতবংশের নাম অমর হইয়া পুরাণার্থে ব্যবহৃত হইয়া, পরে শুদ্ধ একে প্রচলিত হইয়াছে।

আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই অগ্নিপূজক ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, অগ্নি সেই প্রাণবায়ু এবং আর্য্যজাতির বিশ্বপতি হইয়াছিলেন। (১) অথর্ব্ব, অঙ্গিরা, ভৃগু প্রভৃতি প্রাচীনতম ঋষিরা অগ্নিবংশীয় বলিয়া কথিত। (২) সেই অগ্নি-উপাসকদিগের অতি প্রাচীন নাম 'আয়ু'। (৩) ঋগ্বেদে পুরুরবা ও ঐলীন সন্তানেরা আপনাদিগকে 'আয়ু' বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে আয়ুকে কোথাও পুরূরবা ও ঐলীন সন্তান বলা হয় নাই। তবে আয়ু ও মনুর জন্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ একাত্মিক হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা একটী ঋকে দেখিতে পাই। (৪) আমরা বৈদিক আয়ু শব্দ ও গ্রীক জ্যায়ন্ শব্দ একই মনে করি। মনুষ ও যযাতি নাম যথেষ্ট আছে। ইলা-পতি প্রাচীন রাজা ছিলেন। মনুষ্যকেও আয়ু বলা হইয়াছে। তাঁহা হইতে মনুষ্য ঐলবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ।

(১) তানি অগ্নে। প্রথমজঃ। ঋষিঃ। আয়বে। [illegible] ১০।২১।৫

হে অগ্নে। যে সকল [illegible] তোমাকে আয়ু-কুলের বিশ্বপতি করিয়াছিলেন।

(২) তং। বঃ। প্রথমং। মাতরিশ্বা। অথর্বা। ঋষিঃ।—১।৮৩।১

হে অথর্বা। তুমিই প্রথম অগ্নির ঋষি।

ত্বো বিশ্বে। পাক। অগ্নিরে। হিতাসঃ। বিশঃ। পরি।

নমস্য। মনু। নমস্য। আয়ুমন্তমঃ। গরা। দেবেষু। মাহতে।—১।৭৬।৫

ছোট অগ্নি হইতে অগ্নিগণ। (তাঁহারা) দেবলোকে বিশ্ব-রূপযুক্ত; নমস্য ও প্রশস্য পুরাণিদিগের মধ্যে তোমাকে মনুষ্যেরা আয়ুর্বিদ্যা লাভ করিয়াছিল।

[illegible] অথর্বণঃ। অগ্নয়ঃ। ভৃগবঃ।

বৃহস্পতিঃ। তান্ত্রিবাঃ। ইন্দ্রিয়ান্।—৩।৩।১

অঙ্গিরা গোত্রোদ্ভব বৃহস্পতি প্রভৃতি; যিনি আয়ু-উদ্ভবকারী ভৃগু ও অথর্বা।

(৩) আয়বে। [illegible]। অগ্নয়ে।—১।৩১।১

বিশ্বমেধ আয়ুগণ (যজ্ঞে) উচ্চারণ করিয়াছেন।

অভক্ত। আয়ুঃ। নমসে। বম্।—২।৩১।৭

আয়ুগণ স্তুতি রচনা করিয়াছেন।

আ। ভক্ষঃ। কেতুং। আয়বঃ।

ভৃগবাণং। বিশে। বিশে।—৩।২৪

আয়ুগণ ভৃগুসম্বন্ধীয় কেতুকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) সকল বিশের (অর্থাৎ প্রজার) নিমিত্ত আহরণ করিয়াছেন।

(৪) যেন। জ্যোতীংষি। আয়বে। মনবে। চ। বিবেদিথ।—৮।৬।৩০

আর্য্যদিগের আর একটী সাধারণ নাম—মানুষ। কারণ, তাঁহারা মনু হইতে উৎপন্ন। এই মনু বিবস্বানের পুত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বৈবস্বত মনু বলা হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে বিবস্বান্ শব্দ সূর্য্যকে বুঝায়; এবং যিনি ব্রতপরায়ণ, তাঁহাকেও বুঝায়। আমরা মনে করি, ঋগ্বেদোক্ত যুগল মনু—পিতা বিবস্বান সূর্য্যপুত্রক ব্রতপরায়ণ ঋষি রূপেই গৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবর্ত্তী যুগে বিবস্বান শব্দের অপর অর্থ গৃহীত হইয়া মনুকে সূর্য্য-পুত্র-রূপে প্রচার করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে মনুর বিষয় আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাতে তাঁহাকে এক জন ধর্ম্মসংস্কারক-রূপে দেখিতে পাই। যথা, তিনি ৩৩টী দেবপূজার প্রবর্ত্তক। ২য়, তিনি ইড়া নামক এক নূতন যজ্ঞবেদি রচনা করিয়াছিলেন। (১) ইহা হইতে অনুমান করি, আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখায় মনুর সময় বিভিন্ন দেব-পূজার সৃষ্টি ও প্রচার হইয়াছিল। ইহার ফলে কর্ম্মণঃ উঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সহিত ত্বষ্টার মধ্যে এইরূপ বিদ্বেষের আভাস দেখা যায়। ঋভুদিগের বর্ণনাতেও অগ্নিবংশীয়দিগের সহিত ঋভুদিগের মনোমালিন্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনু ৩৩টী দেব গ্রহণ করায় দেখা যাইতেছে যে, তিনি নিতান্ত গোড়ার দিকের লোক নহেন। যাঁহারা তাঁহার দ্বারা প্রচারিত এই ৩৩টী দেবপূজা ও ইড়া নাম্নী অগ্নিবেদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই মানব সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মনুবংশীয়গণ দেবতাকে পিতৃ, পুত্র সোহন করিয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন, (২) এবং ইড়াকে (ধেনুর

(১) ইতি। স্তুতাসঃ। মনবে। বৃ। জিনঃ। চ। ত্রিংশৎ। চ। দেবাঃ। দক্ষিয়াসঃ।—৮।৩০।২।

যে মনুর যজ্ঞাই দেবগণ। যাঁহারা (সংখ্যায়) ৩৩টী; তাঁহারা হিংসকদিগের হইতে উদ্ধারকর্ত্তা হন। এইরূপে তাঁহারা স্তুত হইয়াছেন।

যোনেঃ। অগ্নিঃ। প্রথমে। পিতেব।

ইড়ঃ। পদে। মনুষঃ। বনে। সমিদ্ধঃ॥—২।১০।১

পিতার স্থানে জোষ্ঠপুত্র অগ্নি ইড়ার পদে মনু দ্বারা প্রথম প্রজ্বলিত হন।

ইড়াঃ। অকৃণ্বন্। মনুষস্য। শাসনম্।

পিতুঃ। যৎ। পুত্রঃ। মমকস্য। জায়তে।—১।৩১।১১

(দেবগণ) ইড়াকে মনুষ্যের পিতৃর শাসনী করিয়াছিলেন—যে (যজ্ঞে) আমাদের পুত্র জন্মে।

(২) অস্য। প্রজাবতী। গৃহে। যমস্তুয়ী। দিবে। দিবে।

ইড়া। ধেনুমতী। দুহে॥—৮।৩১।৪

ইহার (অর্থাৎ যজমানের) গৃহে প্রজাবতী ধেনুমতী, আয়ুষ্মতী ইড়া (পুত্র, ধেনু,

নাভিরূপে কল্পনা করিতেন। (১) তাঁহারা আরও মনে করিতেন, বিষ্ণুদেব মনুর ক্ষেত্র করিবার জন্য উরুক্ষিতি প্রদান করিয়াছেন। (২) এই সঙ্গে তাঁহারা দূর হইতে আগত একটী পথেরও উল্লেখ করিতেন। (৩) এই সকলের একত্র বিচার করিলে মনে হয়, ইড়া দূরদেশ হইতে উরুক্ষিতিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যে দেশে ইড়া বেদি প্রথম স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাকে ইড় দেশ বলা হইত, অনুমান করি। তাঁহার নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মানব সম্প্রদায় উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ ইড় দেশ হইতে উরুক্ষিতিতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন। যখন উরুক্ষিতিতে মানবগণ যজ্ঞ করিতেন, তাহাদের বন্ধু ও জ্ঞাতিগণ সেই দূরবর্ত্তী দেশ হইতেও আসিতেন, এরূপ বর্ণনাও দেখা যায়। (৪) তাঁহারা দেব-নীবের অধিকারী এবং মানবদিগের যজ্ঞে আসিয়া মন্ত্র উচ্চারণও করিতেন। ইড়া যে দেশ বা পৃথিবীর একটী নাম, তাহা কোনও কোনও আখ্যায়িকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৫) পারস্যের নাম

---

(১) ইড়ায়াঃ। তা। পদে। অরম্।
নাভা। পৃথিব্যাঃ। অধি।—ঋ১০।৭।৪
পৃথিবীর নাভিরূপ উপরি ইড়ার পদে তোমাকে আমরা (প্রজ্বলিত করিয়াছি)।

(২) বি। চক্রমে। পৃথিবীং। এষা। এতাং। ক্ষেত্রায়। বিষ্ণুঃ। মনুষে। দশস্যন্।
ধ্রুবাসং। অস্য। কীরয়ঃ। জনাসঃ।
উরুক্ষিতিং। সুধনিমা। চকার।—৭।১০০।৪
এই বিষ্ণু মনুষ্যের (কৃষির জন্য) এই পৃথিবীকে ক্ষেত্রার্থে প্রদান করিতে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন। হে জনগণ! ইঁহার স্তবকারিগণ অটল (বা ধ্রুবলোকবাসী)। শোভনধনা উরুক্ষিতিকে করিয়াছেন।

(৩) মা। নঃ। পথঃ। পিত্র্যাৎ। মানবাৎ।
অধি। দূরং। নৈষ্ট। পরাবতঃ।—৮।৫০।৩
পিতা মানব হইতে (প্রাপ্ত) দূরবর্ত্তী পথ হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যাইও না।

(৪) পরাবতঃ। যে। দিধিষন্তে। আপ্যং
মনুং পীতাসঃ। ঊতিভিঃ। নবিষ্ঠ। বিবস্বতঃ।
যযাতেঃ। যে। নহুষস্য। বর্হিষি দেবাঃ। আসতে। তে। অধি। ব্রুবন্তু নঃ।—১০।৬৩।৩
দূর হইতে আগত, যাঁহারা মনুর প্রতি প্রীত, বিবস্বান্ হইতে (আমরা) অভিলাষি (এরূপ আমাদের) ভ্রাতৃত্ব ধারণ করেন, (এবং) নহুষ-পুত্র যযাতির যজ্ঞে যে দেবগণ আসীন আছেন, সেই সকল (দেব) আমাদিগকে অধিক বলুন।

(৫) পারস্যদেশের নাম ইরাণ। এলো-স্যাক্সন ভাষায় পৃথিবীর নাম—Eorthe ;

ইরাণ। ইড়া শব্দ হইতেই এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে, মনে করি; এবং পারস্যের নিকট কোনও স্থান হইতে মনু সম্প্রদায় ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান পঞ্জাব দেশে আসিয়া আর্য্যবংশীয় মানবগণ উপনিবেশস্থাপন করেন; এই দেশ প্রাচীন কালে উরুক্ষিতি, উরুলোক (১), উরু ও ক্ষিতি, এই সকল নামে অভিহিত হইত। উরু অর্থে বহু, প্রচুর, বিস্তীর্ণ; তাহা হইলে উরুক্ষিতি বা উরুলোক অর্থে, বিস্তীর্ণ ক্ষিতি বা লোক বুঝায়। অনেক স্থলে উরু শব্দ এরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেখানে উহার অর্থ উরুদেশ বুঝায়। (২) বিষ্ণুকে উরুগায় বলা হইত। বিষ্ণুই মনুকে 'উরুক্ষিতি' প্রদান করেন। তাঁহার 'উরুগায়' নামের অর্থ, উরুদেশীয় লোকের দ্বারা গীত, করিলে সার্থক হয়। যাহা হউক, সাধারণে এই দেশকে ক্ষিতি বলিত, এবং দেশবাসিগণও ক্ষিতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। পঞ্জাবে শুতুদ্রী (বা সুটলেজ্), বিপাশ্ (বা বিয়া), পরুষ্ণী (বা রাভী), অসিক্নী (বা চেনাব্), বিতস্তা (বা ঝিলম্) এবং সিন্ধু, এই ছয়টী প্রধান নদীর অন্তর্গত যে সকল ভূখণ্ড আছে তাহাকে পঞ্চক্ষিতি নামে প্রাক্‌বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধ ছিল। (৩) এই জন্যই বেদে পাঞ্চজন্য বিশ নাম নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) আর্য্যদিগের একটী

(১) বসিষ্ঠস্য। স্তুতঃ। ঊরুঃ অর্থাৎ।

উরুং। তৃতীয়ার। পরিপূর্ণং। ঊঁ। লোকম্।—৭।৩৩।৫

তৎকর্ত্তা বসিষ্ঠের (স্তুতি) ইন্দ্র এরূপ করিয়াছিলেন। তৎস্থানিকে 'উরুলোক' প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) উরা। ন। মানুষ। চিত্তগত। ধৃগয়ঃ।—১০।৯০।৩

উরু (দেবে) ধৃষিগণ [illegible] জানে না।

উং। স্থা। পীঃ ভিঃ। উরুধারাঃ

বৃষাবাহন্। যম্। পৃথিবে।—১০।১১৮।৯

দেবাবহনাদ্যা, ইতি যাহা দেবিত [illegible] দেবাবিষ্ট (অর্থাৎ যাজ্ঞিক) উরুদেশীয় গৃহ সকল [illegible]

ত্রী। সু। মিত্রাবরুণা। ভুবিজাতৌ। উরুক্ষা।—৭।৬৫।৩

হে ভুবিজাত কবি মিত্রবরুণ! আমাদের উরুদেশবাসিন্ধয়।

(৩) পঞ্চ। ক্ষিতীঃ। মানুষীঃ। বোধয়ন্তি।—৭।৭৬।১

পাঞ্চজন্যগণ পঞ্চক্ষিতিনিবাসে চেতনা-প্রদায়কারিণী।

(৪) ঋং। পাঞ্চজন্যা। বিশঃ।—৮।৫৩।৭

৪ পাঞ্চজন্যদের বিশ্ (অর্থাৎ প্রজা) দাস

নাম যেমন ক্ষিতি ছিল, সেইরূপ তাঁহাদের আর এক নাম ছিল,—জন। কিন্তু তাঁহারা প্রধানতঃ কৃষক ছিলেন বলিয়া আপনাদিগকে কৃষ্টি বা চর্ষণী বলিতেন। (১)

অতএব আমরা দেখিতেছি, পঞ্জাবে যে পাঁচটী 'দোয়াব' বা দ্বীপ আছে, (২) সেই পঞ্চ প্রদেশে আর্য্যগণ প্রথম আগমন করিয়া বাস করেন। তথায় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা 'মনু' ও 'মানুষ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রদেশে আসিয়া তাঁহারা দেশের নাম 'ক্ষিতি' বা 'উদক্ষিতি' রাখিয়াছিলেন, এবং আপনাদিগকে 'পঞ্চ-মানুষ', 'পঞ্চ-ক্ষিতি', 'পঞ্চ-জন' ও 'পঞ্চ-কৃষ্টি' বলিতেন।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

পরীর শ্রম

'পূজার মৌসিমে' সকলেই একটু 'চাঙ্গা' হইবার চেষ্টা করে,' ইহা আমাদের জমিদ্দীন চাচার উক্তি। জমিদ্দীন চাচার জুতার দোকান; আমাদের হরিদাস খুড়ার কাপড়ের দোকান। দুই জনেই মধ্যে মধ্যে রেলে আরোহণ করিয়া 'গুদের' জুটাইয়া আনেন। চাচায় ও খুড়ায় মধ্যে বড় ভাব, বিশেষতঃ পূজার মৌসিমে। এ বৎসর জুতার দর অপেক্ষা বস্ত্রের দর বেশী। চাচা কিন্তু ম্রিয়মাণ হরিদাস খুড়া বলিলেন, 'ভয় নাই দাদা, জুতা না খেলে কাপড়ের দাম জুটবে কোথা হতে? তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাক। নিতান্ত দরকার হয় ত পরে "গুল" কেটে চটী করা যাবে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান খুব সম্ভব। আমি হরিদাস চাটুয্যে তোমাকে এ কথা বলছি।'

এ সব ভবিষ্যদ্বাণীতে হরিদাস খুড়া ঠিক পিপীলিকা কিম্বা চক্রবাকের মত

(১) অধি। ক্রঃ। পাঞ্চজন্যাসু। কৃষ্টিষু।—৯।৩।১৩

পঞ্চজন-নবদ্বীপ কৃষকদিগের মধ্যে অধিক যত্ন।

চর্ষণয়ঃ। ইন্দ্রং। বধ্রিং। ক্ষিতয়ঃ।—৮।১৩।৯

কৃষক ক্ষিতিগণ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিতেছেন।

ইন্দ্রো রাজা জগতঃ চর্ষণীনাম্।—৭।২৭।৩

ইন্দ্র চর্ষণীদিগের জগতের রাজা।

(২) বি। দ্বীপানি। পাপতং। ভিতঃ।—৮।২০।৫

দ্বীপানি তে পার্থিবানি আপো বেবৃ তানি উপমেষু বন্দানি।—ইতি সায়ণ।

পারে। এখন যে চলে তা খুড়ার মনের মধ্যে বিনা চেষ্টায় উদয় হইয়া পড়িত। সেই জন্য চাঁদনীচকে খুড়ার বড় খাতির। হরিদাস খুড়ার বাটী কোন্নগরে। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা কাশীবাসী। সেখানে আমাদের খুড়ামাও থাকেন। খুড়া শ্বশুরের পুত্র নতুবা কিংবা কন্যা সন্তান কিছুই হয় নাই। জমিরুদ্দীন সাজাতও তথৈবচ। উভয়ের মধ্যে নিবিড় সখ্যের ভাবটাই অন্যতম কারণ। উভয়েরই প্রতিজ্ঞা যে, দশ হাজার টাকা না জমিলে সন্তানের আবির্ভাব সহ্য করা। অন্ততঃ দোকানদার ও পেশাদার লোকের পক্ষে এই বিধান হওয়া উচিত। যাহারা চাষী, জমী চষে, কুলিগিরি লোক খাটায়, তাহাদিগের জন্যই 'পুন্নাম নরক' নির্দ্দিষ্ট ছিল। যখন মনু সে বিধান করিয়াছিলেন, তখন চাঁদনী-চক, ইন্‌কমট্যাক্স, ঘারভঙ্গাসন, এ সব গোলমাল ছিল না।

চাচা এবং খুড়া উভয়েই স্থির করিলেন যে, একবার বারাণসী ঘুরিয়া কিছু গড়াওয়ের জুতা ও কাশীনের গঙ্গাজলে প্রস্তুত পাপিলে ও সেই সঙ্গে কলিকাতায় জাকজমক খরিদার জুটাইতে বাহির হবে না। খুড়ার অবশ্য খুড়ীমাকে দেখিবার অনেকটা ইচ্ছা ছিল। জমিরুদ্দীন চাচা খুড়ার বাটীতে অতিথি হইতেন, তাঁর তাঁহাতে কর্ত্তা মহাশয় ও খুড়ার বিধবা ভগ্নী অনেক ছুটিতেন। কর্ত্তা মহাশয়ের মনের ভাব সম্পূর্ণ বৈদিক আমলের। এমন কি তাঁহার জমিরুদ্দীন চাচার সহিত পুরোডাশ ভক্ষণ করিতে যাইবার কোনও আপত্তি ছিল না।

এই সনাতন বদান্যতার গুণে পূর্ব্বে হিন্দু খুড়া ও মুসলমান চাচাদিগের পক্ষে কোনও হাঙ্গামাই হইত না।

দুই বন্ধু টিকিট ক্রয় করিয়া সাবড়া ষ্টেশনে ট্রেণে যে-সময়ে প্রবেশ করিতেছিলেন। তখন এক যুবক হ্যাটকোট পরিধান পূর্ব্বক সকলকে সম্ভাষিত করিতেছিল। হরিদাস খুড়া লোক চিনিতে অদ্বিতীয়। তিনি চাচার কাণে কাণে বলিলেন, 'ঐ যে লোকটা দেখছ, ও এগার বি এ-পাশ ক'রেছে, প্রায়ই ষ্টেশনে আসে, এক জন গাটকাটা।' চাচা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'তোবা, তোবা, হরিদাদা, এমন খবরাম্ কথা আর শুনিও না। আমি লেখাপড়ার অত্যন্ত সম্মান করি। হায় আল্লা! কিছু লোকের এ কি হৈল? শিক্ষা এমনই উচাদরের জিনিস যে, শিক্ষিত ব্যক্তি যদি চুরী করে, তবে চুরীরও সম্মান থাকে, কিন্তু চুরী ও মিথ্যা কথার সঙ্গে যদি 'বি-এ', 'এম-এ', থাকে, [illegible] এ রকম শিক্ষা না হওয়াই ভাল। এ সব সময়ের

গুণ। তাই, আমরা কোরাণ আগে পড়ি, তার পর অন্য সাহিত্য। আমাদের স্ত্রীলোকও কোরাণ পড়ে। ধর্ম্মই আসল, হরিদাদা, ধর্ম্মই আসল।'

এই সকল কট্-কথা মনে হওয়াতে ধর্ম্মপরায়ণ জমিরুদ্দীন্ মুন্সী মুখ হইতে পাকা নিঃসৃত করিয়া প্লাটফর্ম্মের এক পার্শ্বে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। হরিদাস-প্রভৃতি আরোহীদিগের প্রতি একে একে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ক্রমেই অশান্তি লাভ করিতেছিলেন।

গাড়ীতে ধড়্ ভিড়।...সেকণ্ড ক্লাসে 'বার্থ' সবগুলিই 'রিজার্ভ' হইয়া গিয়াছে। মাড়ওয়ারীগণ দলে দলে বস্ত্রা ও পুত্র লইয়া বিকানীরের ও জয়পুরের ও-যোধপুরের টিকিট হস্তে শশব্যস্তে নিজের 'বার্থ' দেখিয়া লইতেছে। কাহারও হস্তে নিমকী ও মোহনভোগ, কাহারও পরিধানে আদ্ধির 'সার্ট' ও সোনার বোতাম। মাথায় পাগড়ী। কাহারও বা তাহাও নাই, ত্রিশ বত্রিশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোট। এই গোলমালের মধ্যে একটী যুবক সেকণ্ড ক্লাসে স্থান না পাইয়া 'দেশী মাণ্ডলের' গাড়ীতে প্রবেশের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িল। যুবক দেখিতে অতিশয় সুশ্রী; পরে পাঞ্জাবী পরিধান, হস্তে 'রিষ্টওয়াচ' ও সুবর্ণ-কজুলাঙ্গুরী। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একটা কামরার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়াতে হরিদাস খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর কাণে কাণে বলিলেন, 'ছোকরাটা খুব ধনী ব'লে বোধ হচ্ছে', এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী মুন্সীজী যুবককে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আপনি এই কামরায় আসুন। যথেষ্ট জায়গা আছে।' যুবক চকিতে উঠিয়া পড়িল, এবং তাহার অব্যবহিত পরে আর এক জন ভদ্রলোক সেই কামরায় প্রবেশ করিলে ট্রেণ গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল।

২

শেষোক্ত ভদ্রলোকটি অভিনব পরিচ্ছদে। কেশ-কলাপ, ও হাতে একটা ক্যানবিশের ব্যাগ্, এবং বহু পুরাতন একটি টীনের ট্রাঙ্ক। ভদ্রলোকটি গাড়ীতে উঠিয়াই যুবককে সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'দাদা, আপনার পকেট হ'তে মনিব্যাগটা প্লাটফর্ম্মে পড়ে' গিয়েছিল, আমি কুড়িয়ে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি।' যুবক স্বীয় পকেটে হাত দিয়া কহিল, 'তাই ত! আমি কি অসাবধান! আপনি আমার বড় উপকার ক'ল্লেন!' আগন্তুক কোনও উত্তর না দিয়া ব্যাগটি যুবকের হস্তে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক কামরার এক কোণে বসিয়া পড়িলেন। হরিনাথ খুড়া তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি হে, শ্রীশচন্দ্র, এস—

ইত্যবসরে জমিরুদ্দীন চাচা যুবককে বলিলেন, 'আপনি মনি-ব্যাগের মধ্যের টাকা কড়িটা দেখে নিয়ে সাবধানে রেখে দিন, আজ কাল চোরের উপদ্রব খুব।' যুবক ব্যাগের মধ্যে নোটগুলি বাহির করিয়া গণিয়া বলিলেন, 'ঠিক আছে, এতে বেশী ছিল না, কেবল আট্ হাজার টাকা মাত্র, আর একটা ফটো। এই ফটোখানিই মহামূল্য। এটা সেই বায়স্কোপের পরীর ফটো।' ইহা বলিয়া যুবক সেই ফটোর দিকে একবার তাকাইয়া মনিব্যাগ পকেটে রাখিয়া দিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে অন্তর্ধান হইয়া পড়িল।

এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীশবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'কি করা যায়—বলুন ত?' জমিরুদ্দীন চাচা বলিলেন, 'কোনও ভয় নাই, আমার কাছে 'লোলেনানী নেমক' আছে, ইহার জিহ্বায় চুলিয়া দেও।' হরি খুড়া চাচাপ্রদত্ত খানিকটা 'লোলেনানী নেমক' যুবকের জিহ্বায় প্রয়োগ করাতে জিহ্বা অবলীলাক্রমে জলাভীর্ণ হইয়া পড়িল, এবং সেই সঙ্গে যুবকেরও জ্ঞানসঞ্চার হইল। কিন্তু যুবকের তখনও কিঞ্চিৎ লেশার মত ছিল। সে বলিয়া উঠিল, 'প্রমীলা, বিমলা, অমলা, শুক্লা, মালতী, কুন্দ, তোমরা এর মত কেউ ও এর তুলনা নাই! তুমি কে?'

সকলেই অবাক্। জমিরুদ্দীন চাচা বলিলেন, 'এ মেয়েরা কোনও নায়িকার প্রতি 'আসেক' হয়েছে, এবং তার সঙ্গে পূর্ব্বে যাদের উপর 'আসেক' হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে অধুনাতন সাব্জিদার তুলনায় সমালোচনা করছে।'

যুবক তাহা শুনিয়া বলিল, 'না, না! যদিও আমি তাদের 'আসেক' হয়েছি বটে, কিন্তু সেটা একটা পরীর প্রভি। আর যাদের নাম করি, সে সব ছোট বড় উপন্যাসের নায়িকা। আমি যাকে দেখে পাগল, সে নরমেড।' সমুদ্রের অর্দ্ধনগ্না, জলমগ্না, অপ্সরা জাতির কেউ। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই সে আছে। তার প্রমাণ যে, আমি তাকে পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখেছিলুম, এবং তার কিছু দিন পরে হরসিংহের দোকানে তার ফটোগ্রাফ দেখতে পেলুম। তারা কার ফটো, তা বলে' না। যা হোক, সেখানা কিনে নিইছি। কাল রাত্রি-কালে আমি যখন বায়স্কোপ দেখি, তখন যে 'মরমেড' সমুদ্রে স্নান কচ্ছিল, ডুবছিল, উঠছিল, মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছিল, মাঝে মাঝে কাঁদছিল, এবং করুণ ভাবে জগতের দিকে তাকাচ্ছিল, তাহার চেহারা, আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট চেহারা, ও ফটোর চেহারা, ঠিক একই রকম! এটা আশ্চর্য্য নয় কি?'

হরি খুড়া। আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে!

জমিরুদ্দীন চাচা। আমার বোধ হয়, উপন্যাস পড়ে' ও বায়স্কোপ দেখে

যুবক। কাশীধামে।

হরি খুড়া। কাশীতে হারানো জিনিস্ পাওয়া যায়। আপনার সঙ্গে কিছু কাপড় চোপড় দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আপনার সেখানে কেউ আছে?

যুবক। কেউ নাই। কোনও পাণ্ডার বাসায় গিয়ে থাকব। এক জোড়া ঢাটী পায় দিয়ে এসেছি। আমার ঠিক বিশ্বাস যে, কাশীতেই সেই পরীটি আছে; কেন না, স্বপ্নে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়োর উপর তাকে উড়তে দেখেছি।

জমিরুদ্দীন। আপনি এক জোড়া জড়াওয়ের জুতা ও একটা কাশী সিল্কের 'লেবাস' প্রস্তুত সংগ্রহ করুন। আমাদের হরিদাসীর দোকান খুব ভাল, উহার ও আমাদের কারবার একত্র। মনে রাখবেন। এই কার্ডখানা রেখে দিন।

ইহা বলিয়া মুনশীজী জমিরুদ্দীন খাঁ এণ্ড হরিচাটুর্য্যে এণ্ড কোং' মুদ্রিত একখানি কার্ড লইয়া যুবকের হস্তে দিলেন। যুবক বলিল, 'আমার ঠিক এই-রকমের দরকার। আপনাদের ঠিকানা?'

হরি খুড়া। দশাশ্বমেধ ঘাট। বেনারস সিটী।

যুবকের মাথায় বোধ হয় মধ্যে মধ্যে কোনও কষ্ট হইতেছিল। সে মধ্যে মধ্যে তাহার কুঞ্চিত কোমল কেশ অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া অনেকক্ষণ পরে শ্রীশবাবু বলিলেন, 'আপনি শুইয়া পড়ুন, আমি একটু বাতাস করি।'

যুবক কৃতজ্ঞভাবে শ্রীশবাবুর ক্যানবিসের ব্যাগের উপর মাথা দিয়া শয়ন করিল, এবং জমিরুদ্দীন মুনশীর 'সৌবীরানী লবণ' পুনর্ব্বার আস্বাদনপূর্ব্বক তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

২

চন্দ্রালোকে হরিহর শোভা-বৃদ্ধি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ পার হইয়া, ক্রমে গিরিশ্রেণীর শোভা নয়নপথে উদিত হওয়াতে হরি খুড়ার আনন্দ উছলিয়া পড়িল। মুনশীজী অহিফেনের সাহায্যে আত্মস্থ চিত্ত করিতেছিলেন। ক্রমে অত্যন্ত বর্ম্মভাবে অধীর হইয়া বলিলেন, 'ভায়া, এক সময় হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের যেমন সদ্ভাব ছিল, তাহা অভিধান হইতে প্রকাশ। আমরা বাল্যকালে যে অভিধান মুখস্থ করেছি, সেটার নাম "পদ্মনামা"। সেই পদ্মনামা সমগ্র কাব্য লেখা।'

হরি খুড়া। কি আশ্চর্য্য! অভিধান কাব্যে লেখা।

রমিরুদ্দীন হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ! ছন্দ না রক্ষা করলে স্মৃতিশক্তি কাবু হয়ে পড়ে, যেমন স্ত্রী-বিহনে পুরুষ, কিংবা তাল বিহনে নবনীত। প্রথম পোটা কতক শোন তোমাকে শুনাই,—

রহমান রাম, আল্লা কর্ত্তার,
পরওর দিগার হয় পালন হার।
নবী, রসুল, পয়গম্বর জান্,
চার ইয়ারকো পহিলা মান্।
ওয়াহিদ এক, পানি তুজা
খুতখানা মণ্ডপ, পরস্ত পূজা।

এই দেখ, এক একটা কথার অর্থ তাহারই পরে কি সুন্দরভাবে বসান হয়েছে। যেমন আমাদের রহমান্=তোমাদের রাম, আল্লা=ঈশ্বর, আমাদের খুতখানার অর্থ তোমাদের মণ্ডপ, আমাদের পরস্ত শব্দের অর্থ তোমাদের পূজা। এই রকম হিন্দুদের কথা আমাদের অভিধানে কাব্যসংযোগে সন্নিবেশিত হওয়াতে ঠিক যেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মত ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। তোমরা যদি পেঁয়াজটা বরাবর খেতে, তবে আমরা এত দিন বৈষ্ণব হয়ে পড়তুম, তার কোনও সন্দেহ নাই।'

'ভাষা সম্বন্ধে আমারও তাই মত' ইহা বলিয়া হরি খুড়া বলিলেন, 'তোমাদের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিশে আজকালকার পোষাকের মত একটা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছিল, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ক্রমে ইংরাজী ভাষার ভাবগুলো এসে 'ওড়না' জিনিসটা লোপ পেয়ে গিয়েছে। স্ত্রীলোকের 'হ্যাটের' চেয়ে, এবং পুরুষের 'নেকটাই'এর চেয়ে, আমার বোধ হয় ওড়না ও পগ্গীর কদর ভাল।'

ক্রমে উভয় বন্ধুর মধ্যে বাজারের দর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইলে মুনশীজি বলিলেন, 'আটা, কলসী ও মাটীর বাসনের দর পর্য্যন্ত এত বেড়ে গিয়েছে যে, আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা মুস্কিল হবে। জুতোর দর বাড়লে অনেকে জুতো ছেড়ে দেবে, কিন্তু আটা ছাড়া মুস্কিল।'

হরি খুড়া। এ সব বড় শক্ত কথা। মাটীর কদর্তি নাই, অথচ কলসীর দর বাড়ে কেন? তা বুঝলে না? যারা পরিশ্রম করে, তারা পরিশ্রমের দর বাড়িয়ে দিয়েছে। এক জন যদি পরিশ্রমের দর বাড়ায়, তবে আর এক দল বাড়ায়ে

নিশ্চয়, ক্রমে এক রকম পরিশ্রমের সঙ্গে আর এক রকম পরিশ্রমের টক্কর বেধে যাবে। যারা আগে ব্যাগার খাটিয়ে সুখকর সঞ্চয় ক'রে বসে' আছে, তারা মুস্কিলে পড়বে। হয় তাদের নিজের গতর খাটাতে হবে, কিংবা এক টুক্‌রো একটা ঝাঁটা কিন্‌বে। কাজেই তাদের টাকার দর কমে গেল। এখন জোর ক'রে মজুরী কমিয়ে নেবার সময় আর নেই। এক কথায় বিপ্লব। ভদ্রলোকের পরিশ্রমের চেয়ে ছোট লোকের পরিশ্রম হবে মূল্যবান, সুতরাং মাল এখন সংগ্রহ ক'রে নিজে না খাট্‌লে দিন চলা দুষ্কর।

কমিরুদ্দীন। তোমাদের ধর্ম্মে কি বলে?

হরি খুড়া। এই রকম অবস্থা হ'লে 'চান্দ্রায়ণ' নামক একটা ব্রত কর্ত্তে হয়। সেটার মধ্যে ভয়ানক আধ্যাত্মিক মানে আছে। চাঁদ যত বাড়ে, আহারের গ্রাস তত কমান' উচিত; এমন কি, পূর্ণিমার দিন মোটে এক গ্রাস, কিংবা উপবাস। সেই রকম অমাবস্যার দিকে। এই ত মেন আহার। নিদ্রার বেলাও তাই। যতক্ষণ অন্ধকার, ততক্ষণ জেগে থাক্‌বে। পূর্ণিমার রাত্রিতে একেবারে ঘোর নিদ্রা। আর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে সম্পূর্ণ জাগরণ। তোমরা সবে 'ভেলভেলা' গান জান ত? এর একটা মহা সুবিধা। অন্ধকার রাত্রিতে চোর ঘরে প্রবেশ কর্‌তে পারে, আর ভদ্রলোকের পক্ষে ঠিক তাই উচিত। অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্তিরে জাগ্‌বে, এবং অমাবস্যায় ঘুমুবে। এই ছিল আমাদের শাস্ত্র। সেসে লোপ পেয়ে আমরা পাশ্চাত্যানুগামী হয়ে পড়েছি।

মুন্সীজী বলিলেন, 'হায়! হায়! ঠিক কথা। অন্ধকার চন্দ্রিকা রাত্রিকালে চোরের মেন মেডার বাজার, সে দিন আর হবে না। সবলেই পরিশ্রমের ঘর চাটতে গিয়েছে। এই যে দেখ্‌ছ ছোকরাটি, কেমন খোসকরা চেহারা, দেমাগও তেমনই, কিন্তু পরিশ্রম না করে' বিগ্‌ড়ে গিয়েছে। কোনক কাজ না থাক্‌লে মাথা বিগ্‌ড়ে যায়, এ রকম অনেক কারণের দেখেছি। সেকেন্দার শাহ সৃষ্টির ধর্ম্মই এই। মাহমুদ নামে এক জন বাদশাহ গজনীতে ছিলেন, তাঁহার চক্ষু সেইরূপ তীক্ষ্ণ; উজীরেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর কারণ কি মহারাজ?" মাহমুদ শাহ চক্ষু আরও ঘুরাইয়া বলিলেন "দেখ মন্ত্রী, সৌন্দর্য্য দেখে দেখে একেবারে কেনা হ'বার উপক্রম হচ্ছিল, তাই একটাকে পরিশ্রমে নিযুক্ত করেছি।"

৪

ইতিমধ্যে [illegible] আসিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে সেই সোকোমা

ষ্টেশনে আসিয়া পড়িল। যুবক নিদ্রা হইতে উঠিয়া স্মিতমুখে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া শ্রীশচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, 'আপনি আমার জন্য বড় কষ্ট করেছেন। এ কথা আমি জন্মে ভুলব না। আপনার কি কর্ম্ম হয় ?'

শ্রীশ। আমি কেরাণীগিরি করি। কাশীতে আমার শ্বশুরবাড়ী, তাই যাচ্ছি।

যুবক। কৈ, আপনি কাপড় চোপড় ত কিছু কিনে নিয়ে যাচ্ছেন না ?

হরি খুড়া যুবককে বুঝাইয়া বলিলেন, শ্রীশের মাইনে কম, এমন কি, তার স্ত্রীকে কল্‌কেতায় নিয়ে যেতে পারে না। শ্বশুরের যজমানী আছে, আর একটু জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন, তাইতে দিন চ'লে যাব, কিন্তু তাঁরও আবার অন্নাদায় হয়ে পড়েছে। এ বৎসর কি কাপড় চোপড় কেনা কারও সাধ্য ? পুরানো কাপড় সেলাই ক'রে সকলে দিন চালাচ্ছে।'

যুবক সহসা বলিয়া উঠিল, 'আপনি কিছু ভাববেন্ না, বিয়েটিয়ের যদি আমার সঙ্গে দেখা করবেন, যত টাকা লাগে, আমি দিয়ে কল্‌কেতার থেকে উদ্ধার করিয়ে দেব।'

ইহাতে শ্রীশচন্দ্রের মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তাহা বোধ হয় যুবক বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইল। 'আমারি বিবাহ। স্থির যে, আমিও ব্রাহ্ম। আমিও ব্রাহ্মণ। আমাদের যৌতুক দান সেইভাবে বাধা নেই। আপনার শ্বশুর মহাশয় যদি জ্যোতিষী হন, তবে নিজের (পকেটের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া) এর একটা সুরাহা কবে হবে বলতে পারবেন বোধ হয়। ইনি ভক্ত আছেন খুব বেশী। আমি অনুমতি কচ্ছি যত টাকা লাগে খরচ ক'রব।'

হরি খুড়া। ফটোখানা দেখতে পাই কি ?

যুবক সিহরিয়া বলিল, না, ঐটি আমার ধ্যানের জিনিষ। যখন তাকে পাব, তখন নিশ্চয় দেখাব। ততক্ষণ কখনও না—না—

যুবককে উৎসাহিত দেখিয়া জমিরুদ্দীন খাঁ বলিলেন, 'আপনি অত উতলা হবেন না। আমাদের 'হাতেমতাই' নামক 'কেচ্ছা'তে পড়েছি, যে অধ্যবসায় থাকলে লায়লাকে পাওয়া যায়, পরী কোন্ ছার ?'

যুবক। আমার বোধ হয় এই পরীই আমাকে উহাদের খবর বলবে, না ত আমি এত পাগল হয়েছি কেন ?

যুবকের অবস্থা পুনরায় অস্থির দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, 'আপনি একটু বরফ ও লেমোনেড্ খান।' যুবক স্বীকৃত হইলে শ্রীশ বাবু তাহা [illegible]

...ন্দীন মুন্সী বাবু খুড়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আর! ... কয়ে বসে' থাকলে যাবে কি বলুন? অপদার্থ হয়ে যাব, এটা তাঁর প্রাণে মানবে না। মানব সংসারে যদি ঠিক থাকা হতে চায়, তবে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হবে। আমার বিনি দিনের বেলায় কেবল চরকা কাটে, সুতো ছিঁড়ে গেলেই করে, আবার দোকানের হিসাব রাখে, আর একটু অবসর পেলেই কাশি বুনতে আরম্ভ করে। বাল্যকালে এত ঘুমায় যে, একদিন হাকিম ডাকতে হয়েছিল। এই জন্য তার উপর আমি বড় খুসী, নচেৎ এত দিনে আমাদের দু জনের মাথা খাবান হয়ে যেত।' শীশ বাবু 'আপনার সন্তান হয়েছে?

শীশ। সন্তানাদি হয়েছে।

ইমিরুদ্দীন। এই বেলা থেকে সাবধান হবেন। লড়াইয়ের পর বাবু ফরমাবে, ভাল ভাল কাপড় চোপড় পরবে, ঘুমাবে, খাবে, জিনিসপত্র ভাঙবে।

শ্রীশ। আপনি পুনর্জন্ম মানেন?

ইমিরুদ্দীন। হিন্দুদের সঙ্গে থেকে থেকে ক্রমে মানতে হয়েছে। তবে ঠিক সেই দৈত্যগুলোই যে এসে মানুষের ভাল্লুক হয়েছে তার প্রমাণ নেই; তবে তাদের মত লোভ যখন দেখতে পাচ্ছি তখন সন্দেহ করি না। এই দেখুন, আমাদের আরব দেশে হজরতের যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে সেই দৈত্যেরা আমাদের দেশে ধর্মবীর মহম্মদে জন্মাতে লাগল। যুদ্ধের পর যখন কোন অধিকৃত অধিকুল রাজপুত অবতার হয়ে পড়েছিলেন, তখন মহাভারতীয় বিধেয় (ইতিহাসের) কথা, মনে করি।

ইহা বলিয়া মুন্সীজী পরম গম্ভীরভাবে হুঁকার অগ্রভাগে মুখ দিয়াই সুবিধামত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীশচন্দ্র মাদুরে পাশমোড়া বাঁধিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে মস্তক ধারণ করিয়া নিদ্রা দেবীকে আকর্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীশের সম্মুখে খোকার মাথায় বাতাস করিতে করিতে ... মাতা এতক্ষণে সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একবার সেই মুখর হইয়া উঠিয়া শ্রীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমাদের দেখচ কি?' শ্রীশবাবু ঘুমন্ত অবস্থাতেই বলিয়াছিলেন, 'হাঁ'।

৫

শ্রীশচন্দ্র পিতৃহীন। কলিকাতায় থেকে বাসিয়া একটা মার্চেণ্ট-আপিসে সে চাকরির করে। বেতন তিন টাকা। মাতা অতি বৃদ্ধা। তিনি ঘরে ... সাহেব বাড়িয়া, করেন। তাঁহার ... শ্রীশ ...

টাকা করিয়া দিতে হয়। বাকী টাকার মধ্যে শ্রীশের নিজের ভরণপোষণেই পঞ্চাশ টাকা বায় হইত। কখনও কখনও দুই কপর্দকও থাকিত না। সুতরাং পয়সার হিসাব করিতে গেলে শ্রী-পুত্রের সংসারে বাপ ব্যতীতকেও 'আমার' বলিয়া পালন করিবার অধিকার ছিল না।

কিন্তু 'আমার' বলিবার এক জন ছিল। সে শ্রীশের স্ত্রী। সেই চিরন্তন বিশ্ব বসন্ত প্রতিবৎসর দুর্গাপূজার সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছুটিয়া উঠিত। হাতে পয়সা না থাকিলেও শ্রীশচন্দ্র বাড়ীতে একবার প্রবাস করিয়া ও স্ত্রীকে একবার কোলে লইয়া দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের সার্থকতা অনুভব করিত।

আজ শ্রীশের স্ত্রী বিনোদিনী স্বামীর পায়ে ভক্তি ও গায়ে বাস দেখিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহা কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। এতদিন এক যমুনা চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'ছেলে হইলে কি করা হইবে'।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যাহা উপার্জ্জন, তাহাতে কাহাকেও এতদিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সরোজিনী বিবাহযোগ্যা। তখন কি, বিবাহ না দিলে আর চলে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উদারচরিত লোক।

তিনি সরোজিনীকে অর্থে লইয়া [illegible] সরোজিনীর বয়স বাড়িয়াও 'ষোলোনাম্বী' যায় নাই। সে অতিশয় তরুণী। কিন্তু কৃশা হইয়াও রোগা নহে। একখানি ছবি। গৃহকর্ম্ম, সূচীকর্ম্ম সকলই সুচারু; কিন্তু চিন্তা জানে না। দিদি যখন সরোজিনীকে আহার করিতে ডাকে, তখন সরোজিনী বলে, 'আমি খেয়েছি'। কিন্তু বস্তুতঃ সেটা ঠিক কথা নয়। অনেক সময় খাদ্যের অকুলান হইলে সরোজিনী অর্দ্ধ-উপবাসিনী থাকে। কিন্তু সে এত হাস্যময়ী ও আনন্দময়ী যে, সে কথা কেহ বুঝিতে পারে না।

সরোজিনী সেটুকু দিদির নিকট শিখিয়াছিল। শ্রীশকে যাহা বিনু খাওয়াইয়া দিয়া বিনোদিনী অনেক সময় উপবাসে থাকিত। সরোজিনীর সেটুকু মনে লাগিয়াছিল। প্রেমের রাজ্যে আত্মা কেন উপবাসী হয়, তাহার দর্শনশাস্ত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিতেন; কিন্তু সরোজিনী না বুঝিয়াও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। সেটুকু তাহার চৈতন্যের একটা অংশ। তাহার জীবনের গতিও সেই দিকে। ধর্ম্মপরায়ণ হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্যের কন্যা বলিয়াই হউক, কিংবা চরিত্র বলেই হউক, সরোজিনী স্বভাবতঃ আত্মসংযত। দিদির চরিত্র ও তাহার

বিনোদিনী সংসারের দুঃখ অনুভব করিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় দুঃখের আভাস অন্তরে পাইয়াছিল। তাহার জীবনও দুঃখের দিকে গিয়াছিল। সরোজিনী দুঃখের কল্পনা করিতেই পারে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জামাতাকে সংসারের দুঃখের কথা বলিতেছিলেন। শ্রীশ বসিয়া শুনিতেছিল। বিনোদিনী অন্তরালে দাঁড়াইয়া। সরোজিনী তাহার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতেছিল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'দেখ বাবা, তুমি ঘরে আসিয়াছ, আজ কত আনন্দের দিন, কিন্তু তোমার যত্ন আদর করিবার উপায় আমার নাই। এমন দুর্বৎসর পড়িয়া গিয়াছে যে, এক যোড়া নূতন কাপড় কিনিবার শক্তি আমার নাই। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত। অধর্ম্মের পথে লোকে অর্থ ব্যয় করিতেছে। পূর্ব্বে আমার দৈনিক চারি আনায় আহার চলিয়া যাইত, এখন তাহার চতুর্গুণ লাগে। তোমার শাশুড়ী যখন বাঁচিয়াছিলেন, তিনি কন্যা দুটীকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এদের যেন কষ্ট না হয়'। কিন্তু তাহার শেষ ইচ্ছা আমি রাখিতে পারিলাম না।

পিতার সকরুণ কথা শুনিয়া সরোজিনীর মনে কি জাগিয়া উঠিল। সরোজিনী বলিল, 'বাবা, গৌরী যখন শিবের জন্য তপস্যা করেছিলেন, তখন কি খেতেন?'

পিতা হাসিয়া বলিলেন, 'মা, তাঁহারা দেবতা। দেবাদিদেব শিব মহাযোগী। তিনি অনাহারী সন্ন্যাসী। গৌরীও সেই পথের পথিক। আমরা সংসারী। অন্ন-বস্ত্রের ভিখারী।'

সরোজিনীর মনে লাগিল। মাঝে মধ্যে কুমারসম্ভবের টীকা পড়িয়া তাহার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব! তপস্যাই মানব-জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথ। তপস্যার বলে ক্ষুধা, নিদ্রা ও অভাবের জ্বালা অতিক্রম করিয়া আমরা আনন্দে ও সহজে জীবনের গন্তব্য পথে যাইতে পারি। তাই সরোজিনী বলিল, 'ভাল খেতে পারলে, ভাল কাপড় পরলেই কি মানুষ বড় হয়?'

ভট্টাচার্য্য। ঠিক তা নয়, কিন্তু সকলে ত তোর মত পাগলী নয়। অসুখ বিসুখ হ'লে ঔষধ চাই, ছেলে পুলে হ'লে তার লেখাপড়া চাই, দাস দাসী না হ'লে সেবা শুশ্রূষা করবে কে?

সরোজিনী। কেন? নিজে দাস দাসী হব, নিজে সেবা শুশ্রূষা করব, নিজে লেখা-পড়া শেখাব।

ভট্টাচার্য্য। [illegible]

সরোজিনী। আমাদের অপমান করে, কাহার সাধ্য? আমরা সকলে মিলে কেউ তার সেবা করব না। কাজেই সে লজ্জা পেয়ে মরে যাবে, নয় ত নিজেই আমাদের মত পরিশ্রম করে' একলা একলা বসে কাঁদবে, আর দু'চক্ষের শূল ভাত গিল্‌বে।

৬

সরোজিনীর আদর্শে আঘাত লাগিয়াছিল। পিতার গৃহকর্ম্ম সবই সরোজিনী করে। সকালে উঠিয়া সে বাসন মাজে, উনুন ধোয়ে, পিতার পূজার উপকরণ-সামগ্রী একত্র করিয়া দেয়, স্নান করিয়া চন্দন ঘসিয়া দিয়া দেবতার সম্মুখে রাখে, তৎপরে রন্ধনশালায় যায়, পিতার ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর আহার হইলে সে কারিনী যাহা কিছু পায়, মুখে দিয়া পুঁথি পড়িতে বসে। বিকালে সে দিদির চুল বাঁধিয়া দেয়, এবং কত রকম গল্প করে; তাহা শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হয়। সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া সরোজিনীর আবার সেই গৃহকর্ম্ম। সে নিদ্রার জন্য ব্যস্ত নহে, কিন্তু নিদ্রা দিবার জন্য ব্যস্ত। সে বিশ্রামের জন্য ব্যস্ত নহে, কিন্তু বিশ্রাম তাহার পদতলে থাকিয়া গৌরবান্বিত। সে আহারের জন্য কখনও ভাবে না, কিন্তু যে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের আহার যোগাইয়া দেন, তিনি বোধ হয় অন্ততঃ একমুষ্টি পাকান্ন লইয়া সরোজিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং কোনও সময়, সময় পাইলে তাহা সরোজিনীর মুখে গুঁজিয়া দেন।

কেন? যে অন্তরে তপস্যারতা, তাহার জন্য অন্তর্বেধ দেবতাও ব্যস্ত।

কিন্তু সে তথ্য সরোজিনী নিজেই জানিত না, তাহাই সে অসূর্য্য হইয়া গেল।

মনোজগতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও শ্রীশচন্দ্র তাহা খানিকটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, 'মা, তুমি আমায় ক্ষমা; আমার ভয় হয়, তুমি এত দিন আমাকে ছাড়িয়া না যাও।'

সরোজিনী। কখনও না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

শ্রীশচন্দ্র সাদরে সরোজিনীর হাত ধরিয়া বলিল, 'সরো, আমি আশীর্ব্বাদ করছি যে, তুমি মহাদেবের মত স্বামী পাও। তোমার অনেক কথায় আমার মোহ দূর হয়ে যায়। আমরা অনেক শুনেছি ও লিখেছি, কিন্তু আমাদের জীবন তোমার মত গঠিত হয় নাই।' ইহা বলিয়া শ্রীশ উঠিল।

সরোজিনী। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

শ্রীশ। কমলাদের অতিথিকে দেখতে।

সরোজিনী। উনি কি সত্যই পাগল?

শ্রীশ। বোধ হয়। তুমি ওঁর সম্মুখে যেরিও না।

সরোজিনী। না, কিন্তু আমার ভয় হয়, কোন সময় আমাকে দেখ্‌তে পান।

ভয়ের কারণ ছিল। আমাদের সেই মাথা-পাগলা যুবকটি এখন শ্রীশদের বাটীতে অতিথি। তিনি প্রায়ই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে তাঁহার 'গরীব' অনুসন্ধানে যাইতেন। সেই অবসরে সরোজিনী তাঁহার সমস্ত কাজ করিয়া দিত। গৃহমার্জ্জন, বাধা পাল্টিয়া দেওয়া, আলোটুকু জ্বালিয়া দেওয়া, বইগুলি সাজান', কাপড় কোঁচান', ঘরে খাবার ঠিক যায়গায় রাখিয়া পলায়ন, ইত্যাদি।

আমাদের সেই মাথা-পাগলা যুবকের নাম গৌরচন্দ্র। সে শ্রীশের সঙ্গে বন্ধু হইয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীশ তাহাকে ডাকে নাই। সে আপনিই বেনারস হইতে শ্রীশের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিল। ইহার সেখানে আসিবার আর একটি কারণ যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় জ্যোতির্ব্বেত্তা, এবং তিনি একটু চেষ্টা করিলে সেই বায়ুরোগের পূরীর অক্ষয়নলি করিয়া দিতে পারেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া গৌর পরম প্রীত হইয়াছিল, এবং তাঁহার সেকেলে পাতঞ্জল-দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি বহি সংগ্রহ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া পাঠ করিত।

আজ গৌর ঘরে বসিয়া সরোজিনী ও ভট্টাচার্য্য পিতার কথোপকথন গৌর চন্দ্রের কর্ণগোচর হওয়াতে পাগল গৌর একটু হাসিল। সরোজিনীকে দেখিবার পর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এখানেও এক জন আমার মত কোনও একটা অবস্থা করিয়াছে। সেও একটা কি চাহে। অতএব, সে আমারই পথের পথিক।

হাসিটুকু সুরেই লাগিয়াছিল, তখন শ্রীশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীশ। তাই ত, আজ খুব প্রফুল্লে বসে এরেছেন।

গৌর। আজ আমি একটা নূতন কন্দী এঁটেছি। আপনাদের চাকর কেউ নাই?

শ্রীশ ব্যথিতমুখে বলিল, 'না। আপনার কোনও দরকার আছে?'

গৌর। না। চুপ করে বসে' থেকে থেকে আমার শরীর খারাপ হচ্ছে। তাই স্থির করেছি যে, আপনাদের বাড়ীর [illegible]

ইহা কলাচ নহে, প্রতিজ্ঞা। অন্য কেহ হইলে ভীম হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু গৌর এক জন অর্দ্ধ-উন্মাদ যুবক। হরি খুড়া ও জমিরুদ্দীন পরামর্শ দিলেন, 'উহাকে বাধা দিলে লোকটা খেপিয়া উঠিবে, অবশেষে পুলিস না ডাকিতে হয়।'

কাজেই ফাঁপরে পড়িয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও শ্রীশ অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

কি সুন্দর পরিচর্য্যা! লক্ষপতি হরিহর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র গৌরচন্দ্র কোথা হইতে শিখিল এ সব? কোথা হইতে তাহার কোমল দেহে বল আসিল, কে জানে? পাগল যাহার পাগ্‌লুটী বাঁধিয়া ভৃত্যের ন্যায় সমস্ত গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিল। সরোজিনী পিতাকে নিকটে ডাকিয়া বলিল, 'বাবা, এ পাগল কোথা থেকে এল বাবা?'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মস্তক কণ্ডূয়নপূর্ব্বক হাসিয়া বলিলেন, 'সে বিষয় সন্দেহ নাই বটে। তবে তুমি একটু বিশ্রাম কর। তোমার মার আজ বড় ভুগিয়াছেন। এর একটা উপায় করতে হবে।'

সরোজিনী। কি?

ভট্টাচার্য্য। ওঁর বাড়ীতে চিঠি লিখে খবর দিতে হবে। কি জানি, আর মন্দ কিছু হয়ে পড়ে।

শ্রীশের মা বিনোদিনী গৌরের মুখ চক্ষু প্রভৃতি দেখিয়া বলিয়া ফেলিল, 'এ যে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া গৌরের সম্মুখে উপস্থিত। আজ থেকে তুমি আমার ভাই।'

গৌরের ইচ্ছা ছিল, আরও এক জন তাহার সম্মুখে আসে। কিন্তু তাহা হইবার নহে। সে বিধাতার হাত চালাইবে কেমন করিয়া।

গৌর। আমার একটি অনুরোধ আছে। আমি চলিয়া যাইতে পারি। এ কথা বোধ হয় আপনারা জানেন না।

বিনোদিনী। জানাই নয়, যখন সব কাজই যায়, তখন এই বাড়ী থাকিবে কেন?

ভট্টাচার্য্য। তবে যোগাড় করে দিন।

ইহা শুনিয়া গৌর স্নান করিয়া আসিল, এবং প্রফুল্লমনে গিয়া আহারে বসিল।

শ্রীশচন্দ্র গৌরের পার্শ্বচারীর সঙ্গে যোগ দিয়া সবজান্তাগিরি সম্মুখে বহিল। কিন্তু সরোজিনী কৈ? সে পূর্ব্বের ন্যায় নাই। সে কোনও অজ্ঞাত কারণে গৌরচন্দ্রের [illegible] করিতেছিল।

হরিকথা শুনিয়া বলিলেন, 'দেখ হরি ভায়া, তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম; পরিণামের মূল্য না বুঝলে গন্তব্যস্থ হয় না। পরিণামের অর্থই গভীর অন্ধ প্রেম। এই যে মায়া-ভরা সংসার, তাই রেখে শেখ সাদি বলেছেন—

ইলাহম! বদকুনায় বদ হাল মা,
কে দোস্তম মুসিবি বদ্দে হাওয়া।

অর্থাৎ, হে ভগবান, আমার কপাল কত খারাপ, কেন না, আমরা সংসার কারাগারে বন্দী।

হরি খুড়া। (নত হইয়া) ভগবান্ তাতে কি বল্লেন?

গৌর। ভগবান্ বলেন, জেলের কয়েদী কেবল পরিশ্রম করিবে। পরিশ্রমে কারাগারের ঐ ভুলিয়া যায় এবং বুদ্ধি থাকিলে শরীরও হৃষ্টপুষ্ট হয়, যেমন আম ও খোরাকের চাচার হইয়াছিল।

হরি খুড়া তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। গৌরচন্দ্রের বিবাহের সব ঠিক হইল, শ্রীনিবাস, তাঁর বহুসংখ্যক বন্ধু ও আত্মীয়গণও অন্ত কাশী মিত্র ও অনেক পরিবারের কুটায় বসিয়া গেলে, উভয় বন্ধু আনন্দে তাঁহাদের মাঝে মিশিয়া বসিয়া গেলেন। এই মহৎ কর্ম্মে বিভাবরী কেটে গেল।

গৌরচন্দ্র অতি প্রত্যুষে আকাশের শুকতারা দেখিতেছিল। মালার মধ্যে একটী যুবতী বালিকা আসিয়া অভিমানস্বরে বলিল, 'আমার একটা মিনতি আছে।'

গৌর। কি সরোজিনী?

সরোজিনী। আমি বাবাকে ছেড়ে যেতে পারব না।

গৌর। প্রত্যেক পূর্ণিমার সময় বাবাকে দেখতে এস।

সরোজিনী। না। বাবার এখানেই থাকব। এই বলিয়া সে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

গৌর অবাক হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকাইয়া রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সমর্পণ।

১

তিন বছরের ছেলে ধনাকে রাখিয়া স্ত্রী যখন মারা গেল, তখন গগনের বয়স বেশী নয়, সুতরাং অনেকেই গগনকে পুনরায় বিবাহ করিতে, অন্ততঃ একটা সাঙ্গা করিতেও পরামর্শ দিল। গগনের কিন্তু ধারণা ছিল, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেই ছেলে পর হইয়া যায়; তাহার উপর আর তেমন মমতা থাকে না। এই ধারণার বশে গগন [illegible] ছিল না। বিবাহের কথা মনে হইলেই সে যাতৃহীন অসহায় শিশুটীর মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে স্নেহ [illegible] প্রবাহটা এমনই ঘুরিয়া যাইত যে বিবাহের কথাটাকে সে মন হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া দিত, এবং এই মুক্ত শিশুটীর বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকেই [illegible] সে ধনাকে খাওয়াইয়া, সাজাইয়া, আদর করিয়া [illegible] একটা তৃপ্তি অনুভব করিত যে, হৃদয়ের কোথাও [illegible] একটুও ছায়া দেখিতে পাইত না।

কিন্তু একটা বড় গোল বাধিত, মজুরী খাটিতে যাইবার সময়। ছোটো ছেলে, দিন-মজুরীই তাহার জীবিকা। সুতরাং মজুরী খাটিতে যাইবার সময় ছেলেটীকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইত না; যাহার কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেও বিশ্বাস হইত না, ছেলেও [illegible] অমনি গগনকে ছেলে কোলে করিয়াই খাটিতে যাইতে হইত। [illegible] বসাইয়া রাখিয়া কাজ করিত। কিন্তু সব দিন প্রায়ই [illegible] নহে; ভিন্ন গ্রামে দুই এক [illegible] যাইতে হইত। সে দিন গগন ছেলে লইয়া বড়ই অসুবিধায় পড়িত। মজুরী ছাড়িলে দিন চলে না, অথচ ছেলেকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়াও যাইতে পারে না। সুতরাং এই [illegible] সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গগন যখন কোনও দিকেই কূল কিনারা দেখিতে পাইল না, তখন কিনু সর্দারের মেয়ে সারী এই সমস্যা-সাগরের মধ্যে তাহাকে কূল দেখাইয়া দিল। সে গগনের কোল হইতে ছেলে লইয়া বলিল, 'ছেলের তরে তোর ভাবনা নাই ঘোড়ই, তুই যা।'

যে ছেলেকে কাহারও কাছে রাখিয়া গগনের মনঃস্থির হইত [illegible] সেই [illegible] নিশ্চিন্তমনে কাজে গেল।

সকালে যদি ছেলে দিতে যাবি, তবে তোরই এক দিন কি আমারি এক দিন।'

সারী রাগিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। গগন ধনাকে কোলে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সকালে সারী দেখিল, ধনাকে কোলে লইয়া গগন কাজে যাইতেছে। ধনা যাইতে আপত্তি প্রকাশ করিতেছে, এবং কোল হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অদূরবর্ত্তিনী সারীর দিকে কচি হাতখানি তার বার প্রসারিত করিয়া দিতেছে। গগন তাহাকে দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। সারী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সে দিন সারী খুব মনোযোগের সহিত কাজ করিলেও সমস্ত দিনে যখন একটা ঘুচুনীও গড়িয়া শেষ করিতে পারিল না, তখন মা বলিল, 'হাঁলা, আজ তোর হ'য়েছে কি? একটা ঘুচুনী নিয়েই যে বুড়ো হ'লি?'

সারী মায়ের মুখের উপর তার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, এবং অসম্পূর্ণ ঘুচুনীটা মায়ের কোলের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া রাগে গর্-গর্ করিতে করিতে উঠিয়া গেল। মা তখন আপন মনে কন্যা যে কিরূপে অন্নসংস্থান করিবে, প্রকাশ্যভাবে তাহারই চিন্তায় ব্যাপৃত হইল।

পর দিন সন্ধ্যার সময় গগন দিনু ডাকিল, 'সারী!'

সারী কেরোসিনের ডিব্বায় সলিতা পরাইতেছিল। সে খুব গম্ভীর-ভাবে উত্তর দিল, 'কি?'

গগন বলিল, 'ধনার বড্ড জ্বর হ'য়েছে।'

চমকিতভাবে মাথা তুলিয়া সারী জিজ্ঞাসা করিল, 'কখন্ জ্বর হ'লো?'

গগন বলিল, 'কাল রাত্তিরে একটু জ্বর হ'য়েছিল। আজ রায়েদের ঘর বাঁধতে গিয়েছিলাম, সারাদিন ভিজে মেঝেটার উপর প'ড়েছিল।'

সারী তীব্র তিরস্কারের সুরে বলিল, 'রোগা ছেলে, সারাদিন ভিজে মেঝেয় ফেলে রেখেছিলি?'

ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে গগন উত্তর করিল, 'কাজেই। কিন্তু আজ বিকেল থেকে জ্বরটা বড্ড তোড়ে এসেছে, যেন বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে আছে।'

সারী ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় জ্বলন্ত চোখ দুইটা গগনের মুখের উপর স্থাপন করিল। গগন বলিল, 'একবার যাবি সারী?'

দৃষ্টিটা ফিরাইয়া লইয়া সারী উত্তর করিল, 'না।'

একটু আমতা আমতা করিয়া গগন [illegible]

ভারী গলায় সারী বলিল, 'আমার সময় নাই।'

গগন মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, 'ছেলেটা অরের ধমকে থেকে থেকে চমকে উঠ্‌ছে, আর তোকে ডাকছে।'

সারী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'তোর ছেলে আমাকে কেন ডাকে বল্‌ তো? আমি কি তোদের বাঁদী চাকরাণী?'

মৃদুস্বরে গগন বলিল, 'তুই তাকে [illegible]'

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া সারী বলিল, 'আমি একটুও ভালবাসি না। পরের ছেলেকে ভালবাস্‌তে যাব কেন? আমি যদি ভালবাসতাম তা হ'লে তুই—'

সারী আর বলিতে পারিল না, ক্রোধ ও অভিমানের উচ্ছ্বাস যেন চাপিয়া ধরিল। গগন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সারী তাহার মুখের উপর রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'রোগা ছেলেটাকে একা ফেলে দাঁড়িয়ে রইলি যে? আমি যেতে মারবো না, যাবো না।'

গগন মাথা নীচু করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সারী বাধা দিয়া এবং দাতে দাত চাপিয়া ভিরায় পলিতা পরাইতে লাগিল।

ভিটে বেড়ার ছোট ঘর, কতক খড়ে, কতক তালপাতায় ছাওয়া। বর্ষায় জলে তালপাতা পচিয়া গিয়াছিল, দরজার নীচে বাঁশের আগড়টা খুলে যাওয়ায় কেলিয়াছিল। ঘরের ভিতর কেরোসিনের একটি ছোট ডিবে নিট নিট করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহারই পাশে একখানি ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া বেহুঁস হইয়া ধনা পড়িয়া ছিল। গগন ছেলের মুখের উপর শঙ্কাকম্পিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া নিষ্পন্দভাবে বসিয়া ছিল।

ধনা একবার চমকিয়া উঠিল। গগন ডাকিল, 'ধনা, ধনা!'

ধনা আরক্তদৃষ্টি ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'সারী, সারী!'

ডাকিয়াই সে চক্ষু নিমীলিত করিয়া পুনরায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। গগন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার মাথার উপর হাত রাখিল। ঘরের ভাঙা চালটার ওধু কেরোসিনের ডিবেটা ধুম উদ্গিরণ করিতে লাগিল।

[৩৫]

উহার কথাগুলার সঙ্গে সঙ্গে যাদবের আপাদমস্তক বোধ করি সারা বর্ষে চমকিয়া, এবং কোনদিকে না চাহিয়াই একেবারে গগনের বিছানার কাছে গিয়া বসিল। তার পর সে উপুড় হইয়া পড়িয়া, গগনের মুখের উপর মুখ রাখিয়া, উচ্চ করুণকণ্ঠে ডাকিল, 'গগা, ধন্নু!'

গগন চমকিয়া উঠিল, চোখ মেলিয়া ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল, 'সাবা!'

'ওই যে আমি ধন্নু!'

সাবী তাহাকে তুলিয়া কোলে লইয়াছিল। তার পর গগনের দিকে ফিরিয়া তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিল, 'ডাক্তার এসেছিল?'

গগন মাথা নাড়িয়া ঘাড় কাইতে চুপাইতে উত্তর দিল, 'না।'

সাবী তীব্রদৃষ্টিতে গগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর কর্কশ কণ্ঠে বলিল, 'শীগ্‌গীর ঠাকুর মশাইকে ডেকে আন্!'

ঠাকুর মশায় বা গোপাল ঠাকুর পাড়ুড়ে ডাক্তার হইলেও, গ্রামের মধ্যে, বিশেষতঃ নিম্ন দরিদ্র শ্রেণীর ভিতর তাঁহার খুব সসার প্রতিপত্তি ছিল। ভিজিটের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না; আট আনা, এক টাকা, যে যাহা দিতে পারিত, তাহাই লইয়া চিকিৎসা করিতেন। ওঁষধের মূল্যও তেমন বেশী ছিল না, আট আনা দামের মিকশ্চারের শিশিতে তিনি চার আনা লইতেন। তাই বলিয়া তাঁহার ওঁষধ যে কম ছিল, তাহা নহে; লোকে বলিত, ঠাকুর মশায়ের ওষুধ ডাকলে ডাক শোনে।

গগন ব্যস্তভাবে উঠিয়া বাহিরে যাইয়া ঠাকুর মশায়কে ডাকিতে ছুটিল। সাবী বোকে কোলে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, এবং গগনের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় বার বার দর-দার দিকে চাহিতে লাগিল।

খানিক পরে গগনের সাড়া পাইয়া সাবীর মুখখানা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু গগন ঘরে দাঁড়াইয়া যখন ম্লান মুখে জানাইল যে, সে ঠাকুর মশায়ের দেখা পায় নাই, তিনি সন্ধ্যার আগে মেয়ের বাড়ী গিয়াছেন, তখন সাবীর মুখখানায় কে যেন কালী মাড়িয়া দিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, 'তুই মেরেমানুষের অধম। ঠাকুর মশাই ঘরে নাই বলিস ছেলেটার চিকিচ্ছে হবে না? পাশের বাবুকে কোন্ ডেকে আনলি?'

কথাটা যে গগনের মনেও উঠে নাই, এমন নয়; কিন্তু পাশের বাবুকে ডাকা

যে কতটা দুঃসাধ্য, তাহা সে জানিত। গণেশ বাবু পাশ করা ডাক্তার, গ্রামে এক টাকা ভিজিট হইলেও রাত্রিতে তিনি দুই টাকার ভিজিটের কম কিছুতেই আসিবেন না। দরিদ্রের কাতর ক্রন্দনেও তাঁহার নিয়মের অন্যথা হইবে না। জানিত বলিয়াই সে তাঁহাকে ডাকিতে সাহস করে নাই, এবং সারীর তিরস্কার শুনিয়াও সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সারী তখন খুব রাগ করিয়া বলিল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে, ছুটে যা।'

গগন ধীরে ধীরে কুলুঙ্গীর কাছে গিয়া একটী ছোট মাটীর ভাঁড় পাড়িল, এবং তাহার ভিতরকার পয়সাগুলি মাটীতে ঢালিয়া গণিতে বসিল। একবার, দুইবার, তিনবার গণিয়া পয়সাগুলি আবার ভাঁড়ে তুলিল, এবং পয়সা সমেত ভাঁড়টী কুলুঙ্গীতে রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সারী জিজ্ঞাসা করিল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে?'

গগন বলিল, 'মোটে সাত আনা আছে।'

সারী বলিল, 'দুটো একটা টাকা নিয়েও ঘর করিস্ নে?'

সারীর দুই হাতে চারি গাছা করিয়া আট গাছি শঙ্খের চুড়ী ছিল। সে এক গাছা করিয়া রাখিয়া বাকী দুই গাছা চুড়া ভাঙিয়া খুলিয়া ফেলিল, এবং সেগুলা গগনের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'যা।'

গগন কিন্তু গেল না। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চুড়ীগুলার দিকে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সারী ভয়ের ভাব দেখিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, 'তোর পায়ে পড়ি বোড়ই, ছুটে যা। ছেলেটা বে ব্যয়।'

গগন চঞ্চলদৃষ্টিতে একবার সারীর মুখের দিকে, আর বার মৃত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া, চুড়ীগুলা লইয়া ছুটিয়া ঘরের বাহির হইল।

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ধনার শিয়রে বসিয়া থাকিয়া সারী যখন ধনাকে হাসিয়া কথা কহিতে এবং উঠিয়া বসিতে দেখিল, তখন সে তাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গগনকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র তিরস্কারের স্বরে বলিল, 'পাবিস্ তো কাল্লই ছেলেটাকে কাদা দিয়ে মাটীতে শুইয়ে রাখিস্।'

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সারী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গোপাল মাঝি আসিয়া বলিল, 'সারীর মা, যদি দশ বুটুমের খবর রাখতে হয়, তা হ'লে মেয়েটাকে একটু নজরে রাখ।'

সারীর মা আক্ষেপ করিয়া বলিল, 'মেয়েটাকে নিয়ে আমি যে কি

করি, তা তো ভেবে পাই না। বল্লেও কথা শোনে না। এই দেখ না, এক লায়গায় পাঁচ রাত্তির কাটিয়ে এল।'

গোপাল বলিল, 'সেই জন্যেই তো বলচি, শেষে দশ জনে দশ কথা বল্‌লে সেটা আমাদেরই গায়ে লাগবে। তুমি তো পর নও, আপন যামাতো ভেয়ের জেঠতুতো শালী।'

সারীর মা উত্তর করিল, 'তাতো বটেই ভাই, আপনার লোক হলেই বলতে হয়। আর অপরকেই বা বলতে হবে কেন, নিজের কথা নিজেই বলছি, সোমত্ত বয়সে এগুলো কি ভাল? দেখ না, গগনার ছেলেটাকে নিয়ে সারা দিনটা কাটাবে। কাজ কর্‌লে চার গণ্ডা পয়সার কাজ তো হয়; পেট তো চলে।'

বিজ্ঞের মত মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে গোপাল বলিল, 'ঠিক কথাই তো। এমন করলে লোকেই বা বলবে কি? তুমি এক কাজ কর, সারীর মা, মেয়েটার সাঙ্গা দিয়ে দাও।'

সারীর মা বলিল, 'আমারও তো তাই ইচ্ছে। মনে ক'রেছিলুম, গগনার সঙ্গে সাঙ্গা দেব। কিন্তু ও তো তাতে রাজি নয়। ওর রাজি হ'বারই বা দরকার কি: পরকে দিয়ে ছেলে মানুষ ক'রে নিচ্ছে, কিছুই তো আটকাচ্ছে না, কেন সাঙ্গা করবে?'

গোপাল বলিল, 'সাঙ্গাই যদি দাও, ছেলের অভাব কি? চক্করপুরে আমার শালার ছেলে বীরু, ছেলে তো নয়, যেন একটা অসুর, বেতের কাজে রোজ দশ গণ্ডা পয়সা ঘরে আনে। বল তো আমি কথা কই।'

সারীর মা ইহাতে সম্মতি দিল। কিন্তু বয়স্থা মেয়ের সাঙ্গায় শুধু তাহার মতই যথেষ্ট নয়, মেয়েরও সম্মতির দরকার। সুতরাং সে সারীকে ডাকিয়া গোপালের সম্মুখেই তাহার মত জিজ্ঞাসা করিল। সারী কিন্তু কোনও মতামত প্রকাশ করিল না। গোপাল তাহাকে সাঙ্গার প্রয়োজনীয়তা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল। সারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিল। কথা শেষ হইলে নিরুত্তরে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

সারীর মা তখন গোপালকে অনুরোধ করিল, 'ওর মত আছে। তুমি চেষ্টা দেখ ভাই মাঝি, যাতে এটা হয়, তা তোমাকেই কত্তে হবে।'

গোপাল তাহাকে আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল।

পর দিন সকালে গগন ধনাকে দিতে আসিলে সারী ছেলে তো লইলই না,

অধিকন্তু রাগিয়া গগনকে তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেন বল্ দেখি ছেলে দিতে আসিস্? আমি কি তোর ছেলে দেখবার বাঁদী? নিজে মানুষ কত্তে না পারিস্, সাঙ্গা কর, সে ক্ষমতা না থাকে, ছেলে বিলিয়ে দে।'

গগন অবনতমুখে ছেলে কোলে লইয়া চলিয়া গেল। মেয়ের কথা শুনিয়া মা সহর্ষে বলিল, 'এই দেখ্ দেখি, এদ্দিনে তোর বুদ্ধি হয়েছে। পরের ছেলে নিয়ে কেন এত? এখন চুড়ীগুলো আদায়ের চেষ্টা দেখ্।'

পর দিন গগন ছেলে কোলে লইয়া যখন কাজে যাইতেছিল, তখন ক্ষুধার্ত্ত বাজ যেমন মাতার পক্ষাবরণ হইতে পক্ষিশাবককে ছোঁ মারিয়া লয়, তেমনই ভাবে হঠাৎ কোথা হইতে সারী আসিয়া গগনের কোল হইতে ছেলেটাকে ছিনাইয়া লইল। গগন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সারী তাহার মুখের উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রোষরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'মরতে হয় নিজে মরবি, ছেলেটাকে কেন মারিস্ বল্ তো? তুর মা নাই ব'লে কি ওকে খুন করবি?'

ধনাকে লইয়া সারী চলিয়া গেল। গগন কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

৫

ধনার অসুখের পর হইতেই গগন বুঝিতে পারিয়াছিল, যে ছেলের উপর মমতাপ্রযুক্ত সে পুনরায় বিবাহে অনিচ্ছুক, সেই ছেলেকে [illegible] করিবার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে গগন এটাও ভাবিয়াছিল যে, ইহা করিতে হইলে সারীকেই সাঙ্গা করা উচিত। সে কয় দিন হইতেই কথাটা নিজের মনেই তোলাপাড়া করিতেছিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় গগন ধনাকে আনিতে গেলে সারী খুব তিরস্কার করিয়া বলিল, 'ছেলেটার কি দশা ক'রেছিস্? ওই সেদিন মরা বাঁচল না? এখন ওকে কত সাবধানে সতর্কে রাখতে হবে।'

গগন বলিল, 'দেখচি সারী, একটা মেয়েমানুষ না হ'লে আর ঘর চলে না।'

'অচলটাই বা হ'লো কিসে?'

'আমার অচল না হ'লেও ছেলেটার চলে না।'

সারী বলিল, 'ওঃ, ছেলে মানুষ করবার ত'রেই বুঝি সাঙ্গা কত্তে চান্?'

গগন উত্তর দিল, 'কাজেই।'

সারী মুখখানা ভার করিয়া বলিল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর, ছেলেটাকে বিলিয়ে দে।'

'কে নেবে?'

'আমি নেব, দিবি?'

মৃদু হাসিয়া গগন বলিল, 'আমারও তো তাই ইচ্ছে, তোকেই ওর ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি হই।'

বলিয়াই গগন সারীর মুখের উপর সহাস্য মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সারীর মুখে একটা অসাধারণ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সারী নিঃশব্দে ধনাকে তাহার কোলে দিয়া চলিয়া গেল। গগন ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিল।

মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগা, গগন কি বলছিল? ও সাদ্দা করবে?'

গম্ভীরভাবে সারী উত্তর দিল, 'হুঁ।'

মা প্রীত উৎফুল্লভাবে বলিল, 'বেশ তো, তা যদি করে—'

বাধা দিয়া সারী জিজ্ঞাসা করিল, 'তা হ'লে কি হবে?'

'তা হ'লে আমার আর চন্দ্রপুরে যাবার দরকার কি?'

'কেন বল দেখি?'

'কেন আবার কি গো? পাড়ায় ঘরে চোখের সামনে থাকবি। আমারি আর কটা বেটা পুত্তুর আছে? ওই তো বয়েস, মুখে জল দেবার কেউ নাই।'

সারী বলিল, 'তোমার মুখে জল দেবার তরে এক জনের ছেলে মানুষ করবার বাঁদী হ'তে বল মাকি?'

বিস্ময়ের সহিত মা বলিল, 'ওমা, তা তুই কোন্ তার ছেলে খাবার কচ্ছিস্ না?'

গম্ভীরভাবে সারী উত্তর দিল, 'সে কথা আলাদা।'

বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিল, 'তা হ'লে গগনকে তোর পছন্দ নয়?'

মুখ ভোর দিয়া সারী বলিল, 'না।'

মেয়ের কথা শুনিয়া মায়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কেন না, সে জানিত, গগনকে সারী ভালবাসে। যে দিন হইতে গগনের বৌ মারা গিয়াছে, সেই দিন হইতেই সারী যেন গগনের উপর ভালবাসার একটা প্রবল আগ্রহ লইয়া খুব আকুলভাবেই দিন কাটাইতেছে। তাহার ছেলেটাকে লইয়া মানুষ করিতেছে, তাহার একটু অসুবিধা দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া সে অসুবিধাটুকু দূর করিয়া দিতেছে। আজ সারী সেই গগনকে সাদ্দা করিতে অসম্মত শুনিয়া মা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল।

আসলে কথা, গগনকে সাজা করিবার ইচ্ছা যে সারীর ছিল না, তাহা নহে; বরং সে জন্য তাহার প্রাণের ভিতর বেশ একটু আগ্রহই ছিল। আর সেই আগ্রহটুকুই যে তাহাকে প্রথমে ধনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিল, ইহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। এই ছেলেটাই গগনের সর্ব্বস্ব; সুতরাং এই সর্ব্বস্ব-টুকুকে রক্ষা করিবার জন্যই সে এতটা আত্মগতা প্রকাশ করিত। কিন্তু এক দিন গগনের একটা কথা তাহার প্রাণে এমন খোঁচা মারিয়া বিঁধিল যে, তাহার চিত্তটা গগনের উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। গগন যে দিন স্পষ্টভাবে তাহার নিকট প্রকাশ করিল যে, শুধু ছেলেটাকে বাঁচাইবার জন্যই সে সারীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত, সে দিন ভালবাসার অপমানে তীব্র অভিমানের আঘাতে তাহার সমগ্র হৃদয়টাকে অধিকার করিয়া লইল। ছি ছি, এই কি তাহার ভালবাসার প্রতিদান! তাহার জন্য গগন তাহাকে চাহে না, শুধু ছেলেটার খাতিরে চায়! সারী এতটা অপমান মাথা পাতিয়া লইবে? ধিক্ তাহাকে!

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সারী স্থির করিল, প্রাণ থাকিতে গগনের ঘরে যাইবে না।

মা মেয়েকে আরও দুই-চারিবার বুঝাইল, কিন্তু মেয়ে যখন কিছুতেই বুঝিল না, অধিকন্তু গগনের কথা তুলিলেই খেঁকাইয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে কন্যা চক্রবর্ত্তীপুরেই সাদার কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া ফেলিল।

গগনের কানেও কথাটা গেল। শুনিয়া সে যেন বজ্রাহত হইয়া গুম্ভিত। সে এক দিন সারীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর সাদী হবে সারী?'

কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেও গগনের গলা যেন বাধিয়া যাইতে লাগিল। সারী যে তাহার এ ভীরুটুকু লক্ষ্য করিতে পারিল না, এমন নয়; কিন্তু ইহাতে সে যেন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার আনন্দ অনুভব করিল, মুখ ঘোর করিয়া হাসি আনিয়া উত্তর দিল, 'হাঁ, হবে।'

গগন আর কিছু বলিল না; শুধু সারীর মুখের উপর বিষাদ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সারী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

৬

'তোর জ্বর হ'য়েচে ঘোড়ই?'

'হাঁ।'

'ক'দিন?'

'আজ পাঁচ দিন।'

'আমাকে তো কৈ একদিনও বলিস্ নি?'

'ব'লে কি হবে?'

সারী অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, 'কি হবে? আমি কি তোর এতই পর?'

গগন কোনও উত্তর করিল না, শুধু একটু হাসিল। সারী জিজ্ঞাসা করিল, 'ওষুদ খাচ্ছিস্?'

গগন বলিল, 'না।'

সারী ভয়দৃষ্টিতে গগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরে গগন জিজ্ঞাসা করিল, 'কবে—কবে ভেরি—'

গগন কথাটা যেন শেষ করিতে পারিল না। সারী রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমার—কি? সাঙ্গা? পরশু।'

গগন পাশ ফিরিয়া শুইল। ধীরে ধীরে বলিল, 'একটা কথা তোর মনে আছে?'

'কি কথা?'

'ধনাকে তুই নিবি ব'লেছিলি।'

'ব'লেছিলাম।'

'কথাটা রাখিস্, ওকে তোর হাতেই দিয়ে দিয়ে গেলাম।'

'তুই কোথায় যাবি?'

ম্লান হাসি হাসিয়া গগন বলিল, 'তা জানি না। এক ঘড়া জল তুলে দিয়ে যা।'

'আমার বোধ হচ্ছে' বলিয়া সারী এক প্রকার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বিকালে সারী আসিয়া দেখিল, গগনের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া আসিয়াছে গলার ভিতর একটা ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছে, কথাগুলা যেন জড়াইয়া যাইতেছে। সারী ছুটিয়া গিয়া ঠাকুর মশায়কে ডাকিয়া আনিল। ঠাকুর মশায় আসিয়া নাড়ী টিপিলেন, বুকে চোঙ লাগাইয়া রোগ পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখ ব্যাদান করিয়া বলিলেন, 'সময় নিমুনিয়া, সন্নিপাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ঠাকুর মশায় ঔষধ দিয়া গেলেন। সারী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গগনকে ঔষধ খাওয়াইল। সেবাশ্রমে ঔষধ চোষাণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সকালে দুই এক জন প্রতিবেশী আসিয়া জুটিল। ঠাকুর মশায় হাত দেখিয়া বলিলেন, 'সাঙ্গাই প্রহর।'

ধনাকে কোলে লইয়া সারী শুষ্কদৃষ্টিতে গগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গগনের অস্থিরতা বাড়িতে লাগিল। সারীর মা আসিয়া মেয়েকে তিরস্কার করিয়া বলিল, 'আচ্ছা সারী, কাল তোর যেমন হোক একটা শুভকাজ, আর আজ তুই মড়া কোলে ক'রে ব'সে আছিস্?'

কথাটা বুঝি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান গগনের কানে গেল। কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটা তুলিয়া সে সারীর মুখের দিকে চাহিল। সারী দাঁতে দাঁত চাপিয়া আর একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিল, এবং গগনের অবসন্ন হাতখানা আপনার হাতের উপর লইয়া স্থির উচ্চ-কণ্ঠে বলিল, 'ধর্ম্ম সাক্ষী যোড়ুই, তোর সঙ্গে আজ আমার সাঙ্গা হ'য়ে গেল। আজ থেকে ধনা আমার সন্তানপো।'

গগনের পাণ্ডুর অধরপ্রান্ত মৃদু হাস্য রেখায় রঞ্জিত হইল। সমাগত প্রতিবেশীরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহাদের সেই স্তব্ধতার মধ্যে গগন অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করিল।

হাতের চুড়ী দুই গাছা খুলিয়া কৌলিন্য-সাক্ষী আর্ত্তনাদ করিয়া গগনের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন।—প্রথমেই 'শরৎ-শ্রী' নামক ছবি—অতুলনীয় বঙ্গুর অঙ্কিত। যে ক্ষেত্রের মধ্যে চিত্রকর 'শরৎ-শ্রী'র কল্পনা করিয়াছেন, তাহার পারিপার্শ্বিক দেখিয়া মিশরের সমীর 'আধার' মনে পড়ে। সহজে চক্ষুর আগে, আকাশে বিম্বে নব-জীবন-রাগের ঢেউ খেলিয়া যায়। এ শরৎ-শ্রীতে সে নবজীবনের দ্যোতনা নাই।—কল্পনায় অমরতার ছায়া আছে। মেঘগুলির কল্পনাও অলৌকিক। অলৌকিক চিত্রে যথা সে স্বাধীনতা থাকিতে পারে। এখনকার চিত্রকর প্রাচীন যুগের যথা লিখিতে পারেন, এবং সেরূপ লেকালের রীতিতে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, নন্দবাবু চিত্রে তাহার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার কালিকার সজীব সৃষ্টির আশা করি।—নন্দবাবু বহুকাল পরে শুক্লর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।—অবনীন্দ্র বাবুর 'প্যাটেণ্ট' লতানে আঙ্গুল আঁকিয়াছেন। পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন।—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' আমরা বুঝিতে পারিলাম না। চেষ্টা করিয়াও দন্তস্ফুট করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা; বাঙ্গালা হরফে লেখা; অভিধানে শব্দগুলির অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার সমবায়ে যে বাক্যগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই বাক্য-সমূহের মধ্যে যে নিগূঢ় ভাব বা লেখকের বক্তব্য—যদি কিছু থাকে—প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার নাগাল পাইলাম না। এগুলি লিখিয়া লাভ কি, ছাপিয়া ফল কি? আমরা

বোমা ও বুর্থ হইতে পারি, কিন্তু 'প্রবাসী'র বা সাধারণ মাসিকের অন্ততঃ পৌনে পনর আনা পাঠক যে রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্র শীল বা শ্যামানন্দ নন, তাহা ত নিশ্চিত! বানাইবার—বুঝাইবার—পড়াইয়া শিখাইবার ও লিখিয়া নিজের মনের ভাব পাঠককে দিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্যই ত লেখা ও ছাপা? স্বকৃত সূত্রের রচনা করিয়া পাঠক-সম্প্রদায়কে ভাবাইয়া, মাতাইয়া, কাঁদাইয়া, 'নাজেহাল' ও নিরাশ করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় কি সাফল্য ও কি আনন্দ লাভ করিবেন? পাঠককে 'ঠকাইয়া' যে সুখ, তাহা ত 'ধরা-পা-ঠকানে' প্রেমেই আবদ্ধ ছিল। তাহাই কি আমাদের সাহিত্যের আসরেও জাঁকাইয়া বসিবে? শ্রীমতী শান্তা দেবীর 'ধর্ম্ম ও সাহিত্য' 'বৈরাগ্য সাধনের' মত তত নিরাশাব্যঞ্জক নয়। ইহা কিছু কিছু বুঝা যায়। মনে হয়, 'ধর্ম্ম' ও 'সাহিত্যে'র ক্ষেত্র স্বরূপ করিয়া এক অল্প পরিসরে তাহার চৌহদ্দী নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। আজ কাল বাঙ্গালা ভাষার এক শ্রেণীর প্রবন্ধ গজাইতেছে। তাহাতে দর্শন থাকে, কাব্য থাকে, সত্যনির্দ্দেশ করিবার চেষ্টাও থাকে। কিন্তু তত্ত্ব-নির্ণয় ও তাহার নির্দ্দেশ করিতে যত যেরূপ ধরা-বাঁধা নিয়মের ভিতর থাকিতে হয়, যেরূপ ছাঁচা-ঢোলা, নিরলঙ্কার, প্রকৃত-বস্তু-নির্দ্দেশক শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়, এ শ্রেণীর রচনায় সে সকল বন্ধনের কোনও শাসন-বালাই নাই। 'লাগে তুক্, না লাগে তাক্!' হয় সত্য, নয় কাব্য। হয় তত্ত্ব, নয় কবির দেহের চুলচেরা বিশ্লেষণের চুইবার উপায় নাই। তিন পৃষ্ঠায়, সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলি শ্রুতিমধুর উক্তি শুনিয়া যাও। 'সৃষ্টির মধ্যে প্রয়োজনের অতীত যে আনন্দ সেটা যেমন জগৎস্রষ্টার বিচিত্রলীলার মধ্যে তাঁর বিশ্ব-বীণার ঝঙ্কারে তাঁর লুকোচুরী খেলার মধ্যে ভক্ত দেখতে পান'—ইহা নিশ্চয়ই দর্শনের রীতি ও ভাষা নয়, দার্শনিক সত্যও নয়; কাব্যও নয়, কাব্যিত্বও নয়। ইহাতে অনেকগুলি নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব আছে। সেগুলি কেবল বাক্য, অতিপক্ক নয়। সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ আছে কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন। প্রয়োজনের অতীত আনন্দ সৃষ্টিতে আছে কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন; থাকিতে পারে কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন। তুমি যাহাকে প্রয়োজনের অতীত মনে কর, তাহা 'প্রয়োজনের অতীত' নয়, কারণ, জগতে যাহা আছে, তাহা 'প্রয়োজনের অতীত' নয়, ইহাও একটা তর্ক। বিশ্বে 'ইচ্ছাময়ী' লীলা কিছু আছে কি না, ইহাও একটা তর্ক। এই শ্রেণীর তথাকথিত 'মিষ্টিক্' রচনায় এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না, এ সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হয় না, যুক্তি তর্কের ধার ধারিতে হয় না, ইহা কুহেলিকার মত আকাশে মিলাইয়া যায়। যদি তাহার মত ভোগ করিতে চাও, অপঘাতে মৃত দর্শনের ভূত আসিয়া ভয় দেখায়। ইহা যৎস্য-নারীর মত অর্দ্ধেক মানুষ—অর্দ্ধেক মাছ। এ হিসাবে এই শ্রেণীর রচনায় তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বিচারে বাস্তব-জগতে তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই।—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অনুভবগুলি সাহিত্যে যে স্থান পায়, তাহাতে তাহার তাহাদের জনকের গৌরব। প্রকৃতপক্ষে সে পথে দার্শনিক সত্য বা কোনও তত্ত্ব বিবৃত হইতে পারে না; চেষ্টা করিলেও তাহা সত্য-বাচনের স্থান অধিকার করিতে পারে না। 'জগৎ-স্রষ্টার বিচিত্রলীলা' ও তাঁর 'বিশ্ববীণার ঝঙ্কার' অত্যন্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে। উহার চর্ব্বিত-চর্ব্বণে বিরক্তকালেরা কি হয় পায়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু দেখিয়া আমাদের 'গা ঘিন-

ঘিন্ করে। 'বিদেশেতে বিনয় ভুবনে ভুবনে অন্তরে যে কেমন তোলে', তাহা পড়িতে মন্দ নয়; কিন্তু ইহার কোনও 'মানে' আছে কি?—আমরা এই রচনাটিকে উপলক্ষ করিয়া এই লেখার কুয়াসার টায়ার ও এঞ্জিনারের গোঁড়ুনে লেখা রচনার প্রকৃতি-নির্দ্দেশের চেষ্টা করিলাম। শ্রীমতী সীতা দেবীর 'অচিন পাখী' ভেলকি নয়। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্ম্মরাজ্যে সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ' সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ। শ্রীশান্তা দেবীর 'বাঁধনের যাত্রী' নামক গল্পটি বেশ। শ্রীনিবেদের মুখোপাধ্যায় 'ম্যালেরিয়ার বাহন-ধ্বংসের উপায়ে' যে উপদেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সেই ছাত্রপোকার মহোদয়ের মত।—এক দল বিলাসপুর জিলাস্থিত 'বাদ চাকা পাঠাও, ছাত্রপোকার প্রবন্ধে মুহোমধ পাইবে।' এক চক্ষুলোক জানাইয়া দেখিলেন,—দুই টুকরা কাঠ ও এক ছুঁচ-উপাসনা—চাকাগোটি না, একখানি কাঠে খাদ, আর একখানি কাঠ নিয়া চাকিয়া দাও।—'ঙ'—বাঙ্গালার 'ঙমাইলোঞ্জ-লোকপুরুষ' প্রবন্ধটি। অমৃতলাল বসুর 'বাবু বাহাদুর' নামক চিত্রখানি চমৎকার। এই 'বাবু বাহাদুর'-জাতীয়েরা দেশের নেতা হইবার দাবী করিতেছে। চিত্রকর তাহাদিগকে চিনাইয়া দিয়া সাধারণের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। ইন্দ্রনাথ দত্তের 'গিরিরাণী' কবিতা মৌলিকতা আছে।—ভাষার ও ভঙ্গীর [illegible] ভাব পাঠকের মন স্পর্শ করে। লেখক 'মাতুলি'র সঙ্গে 'মাতুলাই'র মিল করিয়াছেন। 'নিষ্ঠুরঃ কবয়ঃ'—তাই উৎসুককে' সম্পাদকগণের মন উঠে নাই, তাঁহাকে 'উৎসুকী' করিয়া ছাড়িয়াছেন। 'উৎসুক' চলিত বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত নয়, কিন্তু [illegible] অপ্রচলিতও নয়। অনেক 'কেন' [illegible] 'কোই আমার সরল কাব্যে Obscurity'! বিবিধ প্রসঙ্গে 'জাতির উত্থান পতন' ও 'পাশ্চাত্য ইউরো কি ভারতের বিদেশ' আমরা সকল বাঙ্গালীকে—বিশেষতঃ [illegible] পড়িতে বলি। [illegible] 'দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে আর্য্য-উপনিবেশ' [illegible] সংকলনে 'কামাইকেল-অব্যাবকের বক্তৃতার সারাংশ' বেশ গুছাইয়া দিয়াছেন। Lecture কি 'বক্তৃতা'? 'উপদেশ' নয়? অন্ততঃ—'বিবৃতি' হইতে পারে না?

ভারতী। শ্রীমতিলাল মজুমদার কর্ত্তৃক 'ভক্তির' 'ঘরের সাহিবে' নামক 'ছবি' খানি দেখিয়া আমরা সকলেই এই [illegible] 'ছবি-কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা কি ছবি? রঙ্গ যেমনই হউক, রঙ্গ বটে। সেই রঙ্গের লেপও এমন জোরদার হয়? রঙ্গকেও এমন বীভৎস-ভাবে 'ব্যাবড়ানো' যায়? তাহাও 'ছবি' হয়, এবং ছাপাইয়া দেখানো চলে? শ্রী-হীন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেয়ালি স্বাভাবিকতার শ্রী দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'দ্যৌ মে পিতা মাতা পৃথিবীর শিরোনাম লেখকের ভাষার 'হইতেছে যাহা বেশী জানা, বেশী স্পষ্ট, যার ভিতরটা [অর্থাৎ প্রবন্ধটা] সন্দেহে জানা, সেখানকার সবই ঝাপসা।' ইহা বলিলেই সকল বলা হইল। শ্রীমতী দেবীর 'যমাদি মন্ত্রে' কবিত্ব নাই। মন্ত্র সত্যই থাকে; কবিত্ব যদি থাকে, তাহা যাউ। [illegible] একটি 'কাব' হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশরৎ

কুলের প্রথম শ্লোকটি সুন্দর; অবশিষ্ট টানিয়া বোনা কষ্টকল্পনা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'শরতের গান' কল্পনায় সমৃদ্ধ—দুর্ভাগ্য। শ্রীঅমিতকুমার চক্রবর্ত্তী 'মাসকাবারি'তে 'আর্টের অভিব্যক্তি ও আধুনিক আর্টের রূপ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

সন্দেশ। আশ্বিন।—রঙীন ছবিখানি সুন্দর। সন্দেশের পাঠকগণের অভিভাবকেরাও দেখিয়া প্রফুল্ল হইবেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্ষীরপুতুলের বিয়ে' সুলিখিত। চীন দেশের গল্প—'ওয়াং' নাম নয়, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাটাও চীনে হইয়া গিয়াছে। শ্রীকুলদারঞ্জন রায় শিশুদের উপযোগী করিয়া 'চন্দ্রহংসের উপাখ্যান' লিখিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি শিশু-সাহিত্যে দান করিয়া কুন্তলীবাবু দেশের উপকার করিতেছেন। 'মেঘ-বৃষ্টি' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি ও পঞ্চতন্ত্রের গল্প 'সোমিলক' উল্লেখযোগ্য। 'আনোয়ারের খুন' আশ্বিনের 'সন্দেশে'র সেরা গল্প। প্রাণিজগতের তথ্যগুলি লেখক গল্পের মত গুছাইয়া বলিয়াছেন। 'কিম্ভূত' শিশু পাঠকদের মনোরঞ্জন করিবে।

উদ্বোধন। আশ্বিন।—স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', স্বামী বাসুদেবানন্দের 'ভারতীয় শিল্প', শ্রীবিহারীলাল সরকারের 'শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব' ও শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্রের 'শিক্ষক'—চারিটি প্রবন্ধই ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। একটি নূতন প্রবন্ধ আছে—স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের 'What is Religion' নামক উপদেশ সম্বন্ধের অনুবাদ—'ধর্ম্ম জিনিসটা কি' তাহাও অসমাপ্ত—ক্রমশঃ-প্রকাশ্য।

সৌরভ। আশ্বিন।—এই সংখ্যায় 'সৌরভে'র ষষ্ঠ বর্ষ সমাপ্ত হইল। চাণক্য বলেন—'আয়ুষের পঞ্চ ঘর্ষাণি, দশ বর্ষাণি ভাড়ুষে।'—আশ্বিনের 'সৌরভে'র বৃহত্তা, প্রগল্ভতা ও অসামান্যতা দেখিয়া মনে হইতেছে, ময়মনসিংহে চাণক্য-নীতি চর্চ্চিত নাই। তাহা হইলে সম্পাদক নিশ্চয়ই সাবধান হইতেন। মোট চব্বিশ পৃষ্ঠা কাগজে পাঁচটি গল্প। একটি ক্ষুদে কবিতা দয়িলে পত্রের সংখ্যা দেড় গণ্ডা উঠিতে পারে।—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছয় জন লেখক ও এক জন সম্পাদক এই ভেদ-ভিন্ন দেশে এমন এক-মত হইয়াছেন! গল্প-গুলি এক ছাঁচে ঢালা। যেন অদ্ভুত সাম্য এই বৈষম্যপূর্ণ জগতে প্রায় দেখা যায় না! সকলে যেন পত্রপুষ্প-সমৃদ্ধ সাহিত্য-উদ্যান ও মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার অপমান করিয়াছেন। 'শেষ অঞ্জলি' গল্পে লেখক কল্পনার 'অঞ্জলি' করিয়াছেন। নায়কের 'নিরুপম' নামটা সার্থক হইয়াছে, কারণ সত্যই তাহার উপমা নাই।—এই নূতন বঙ্কিমের 'নিরুপম' ঠিক 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপের মত। তাহারও বেলা নাম্নী এক শৈবলিনী ছিল। ময়মনসিংহের প্রতাপও শৈবলিনীকে ভুলিবার জন্য ইন্দুর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। অতএব, ইন্দুই এই অদ্ভুত চন্দ্রশেখরের সুন্দরী। প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয়-সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে কত আয়োজন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ময়মনসিংহের প্রতাপ অত্যন্ত সুবোধ ও সুশীল—সে বন্ধুগৃহে, বন্ধুর মাতার আতিথ্যের ছায়ায়, বন্ধুর ভগিনীর মুখে মোট একটিবার 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন' গান শুনিয়া তাহাকে 'মনপ্রাণ যাহা ছিল, দিয়ে' ফেলিয়াছিল! অনেক ঐতিহাসিক ও আধুনিক প্রেমের কথা শোনা গিয়াছে। কিন্তু এমন 'তড়ি-ঘড়ি' প্রেমে-পড়ার

'বিয়ে করেই পুত্র-কন্যা
আসে যেন ঐ-ধ-বস্তা!'

সুতরাং 'পাঁচটা।বছরের'র মধ্যে নায়কের 'ঘর শিশুর কলকণ্ঠে মুখরিত' হইয়া উঠিল। খোকার মা বলিতেছেন—'মা হাসতেন, ইন্দু হাসত।' আমরাও কোন মা হাসিতেছি?—সে কথা থাক, এখন গল্প শুনুন। মা বলিলেন, 'কোথা হতে একটু ঘুরে আয় না।' সুতরাং প্রতাপ পুরীধামে রওনা হইলেন। একদিন পুরীর সমুদ্রতীরে অকস্মাৎ এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ব্রাহ্মণ ডাক্তারের বাড়ী খুঁজিতেছিল। প্রতাপ হোমিওপ্যাথী শিখিত। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার হইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলিল। প্রতাপের মুখেই শেষটা শুনুন—'নিকটে একখানা ছোট সুন্দর বাসায় আমরা ঢুকে পড়লুম। দেখি, একটি যুবতী শয্যায় পড়ে আছে। দেহ অত্যন্ত দীর্ঘ, হাত ধরে বুঝলুম—নারীর অসাড় হয়ে আসছে। * * হঠাৎ 'উঃ' করে পাশ ফিরতেই মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আমার কাপড় রাঙা করে দিলে। তাড়াতাড়ি হাত ধরে বুঝলুম—সব শেষ! বৃদ্ধের নিকট যুবতীর পরিচয় পাইয়া জানিলাম—বিপদের আশু সম্ভাবনা দেখিয়া তাহার শ্বশুর শাশুড়ী একটী বৃদ্ধা ঝি ও এই মৃত কর্ম্মচারীর হাতে তাহাদের এই যুবতী বধূকে রাখিয়া আজ ভুবনেশ্বরে চলিয়া গিয়াছে। বুঝলেম, এ কে? এ যে আমারই কৃত অত্যাচারের দেবকন্যা; সে তার বুকের রক্ত দিয়ে আমায় দেব অঞ্জলি দিয়ে গেল কর্ণী!' * * * 'এইখানে নিরুপম নীরব হইল। দেখিলাম তাহার চক্ষু দুইটি ছলছল। তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। বাহিরে ঘোর অন্ধকার।' প্রতাপ ত 'বুঝলেন?' পাঠক! তুমিও নিশ্চয় বুঝিলে, এ যুবতী বৈষ্ণবিনী না হইয়া যায় না। 'কর্ণী' কে, জান? পাপ নয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খানিকটা শুনিয়াই গল্পটির শিরশ্ছেদন করিত। এ কর্ণী আমাদের প্রেমিক প্রতাপের বন্ধু। সেই কর্ণী উপসংহারে সাক্ষ্য দিতেছে।—তখন না হয় 'সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছিল।' তখন না হয় 'বাহিরে ঘোর অন্ধকার' ছিল। কিন্তু গ্রামে কি দোকান ছিল না? পর দিন কি প্রভাত হয় নাই? প্রতাপকে ময়মনসিংহে সৌরভ-সম্পাদকের বাসায় না পাঠাইয়া কর্ণী তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইল না কেন? অথবা 'সমঃ সমং সমমাভি' আসিয়াই কর্ণী তাহাকে 'সৌরভের' গারদেই পাঠাইয়াছিল? দ্বিতীয় গল্পটির নাম—'সাহিত্যে সমাজ'! ইহার প্রথম প্যারাগ্রাফেই মাতাল সম্পাদ বিমলকুমার মনোরমাকে 'পুকুরের ঘাটে' আক্রমণ করিয়াছে। মনোরমাকে রাওলপিণ্ডী সহরে তাহাদের 'বাসার পশ্চাৎভাগস্থ পুকুরের ঘাট হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া' পাষণ্ডেরা হরিয়া লইয়া যায়। তিন দিন পরে পুলিস তাহাকে উদ্ধার করে। বিচারে পাষণ্ডদের 'দশ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়।' এখন বিমলকুমার মনোরমাকে বলিল, হয় আমাকে ভয়, নয়ত গুপ্তকাহিনী প্রকাশিয়া তোমার বিয়ে বন্ধ করিয়া দিব। মনোরমা একবার ভাবিল, তাহার 'সর্ব্বনাশ যা হওয়ার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, এই পাষণ্ডের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে যদি সকল কথা গোপন থাকে, পিতা মাতাকে সমাজে অপদস্থ হইতে না হয়, তাহা হইলে সম্মত হওয়ার ক্ষতি কি?' ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে বেড়াইতে যাইয়া আসিয়াছিলাম। [illegible] কোনও ব্যবহার নাই? তার পর মনোরমা সুভাগে অনুপ্রাণিত

সহসা পশ্চাৎ হইতে গ্রামের জমীদার-পুত্র বিনোদ অতর্কিত বিমলের গ্রীবা-ধারণ। বিনোদের বিনোদ-সঙ্গীতে মনোরমা ধর্ষণের [illegible]। বিনোদের ভাষণ,—এ কথা প্রকাশ করিলে 'তোকে আমি খুন করে ফেলব'। বিমলের অস্বীকার। যথাসময়ে মনোরমার বিবাহের আয়োজন। বিবাহের রাত্রে বিমলের বর-কর্ত্তার নিকট গমন-উদ্যম। বিবাহ বন্ধ। বর লইয়া বরযাত্রীদের প্রস্থান। সেই রাত্রেই জমীদার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বিনোদের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ। এই অংশ! ইহাকে যত দূর অসম্ভব, অস্বাভাবিক ও বিরক্তি-জনক ও ন্যাকামী ধারা খচিত করা যায়, লেখক তাহার ত্রুটী করেন নাই। মনোরমা 'ক্রোঞ্চা সিংহিনীর মত গ্রীবা বক্র করে।' এক 'ক্রোঞ্চা', তাহার উপর 'সিংহিনী'; সোনায় সোহাগা। চূড়ার উপর ময়ূর পাখা আমরা জানিতাম, 'সিংহিনী' রায় সাহেব ভগবানচন্দ্রের একচেটে। কিন্তু মতিপুরের সে মৌচাক মধুমক্ষিকা-শূন্য করিল! হারাণচন্দ্রী ও দীনেশী সম্প্রদায়ের পাঠা, ধাত্র ও ভাল্লুক আসিয়া। [illegible] ভাষার ধর্ম্মাবিকরণে গাড়ু বিবাক হইয়া বসিয়া এই মতিপ্রচক্রে শান্তি বিধান করিয়া এই প্রথম আক্রমণের মত ভূগোল-বিবরণও বদলাইয়া দিতেছেন—[illegible] নদীর [illegible] বুকের। অকটারলোনী মনুমেণ্টের পার্শ্বে কুতুবমীনার! পৃথিবীর [illegible] উপর লাসা-বন্দরে জালাই-জানার ধানের গোলার পদতল প্রক্ষালিত করিয়া আটলাণ্টিক বহমান। ইনি লোক হন নৈয়ায়িক। কারণ, 'অপরন্তু' খড়ি কাড়িয়া লইয়া পরমিত্রে তাহাকে একটী 'ত' দান করিয়াছেন। কারণ, এ ক্ষেত্রে 'প্রথমোপস্থিতপ্রত্যয়ে' [illegible] প্রত্যয়-হেতুত্বে। ত-বর্ণের প্রথমেই 'ত'; অতএব, তাহাই 'প্রথমোপস্থিত'; তাহাকে নির্দ্দেশ করিবার কারণ কি? 'থ' দ্বিতীয় বর্ণ, সুতরাং সে কখনও 'পথ-ঘ' হইতে পারে না। তাহার ঘর, 'উৎকণ্ঠা', 'মিষ্টাবোম', 'ভাবে'। 'কাজাবাবু' নামক আর একটী বাবির [illegible] হইতেছে, 'লৌরভের লেখকগণ 'ঘ ভ্যাগোবৈকার' বলে বহু করিলাছেন।' ইহাতেও [illegible] 'বেড়িয়ে' আছে। উপসংহারে climax—'নগ্ন বিভিন্নের [illegible] বৃত্তিকের দর্শন ভাবনা ইহার তুলনায় পিনডেম কারড'। 'অকথা'র কবি 'এপুল-বন্ধে' বাঁধিয়াকে মিলাইয়া দিয়াছেন! 'বিদ্যুতের শেষ উক্তি 'আষাঢ়ে'র পচাবসা অকালকুষ্মাণ্ড। উপমা [illegible] 'শান্তী বিদ্যাভূষণ'। নবুনা—'পরাস্থ'! 'অপদস্থ ঘ সুরাইগালি, পরাস্থ' ভাহা [illegible] করিল! ভাষার নবুনা, 'পিকাডের অভাব নাই। পাখীর মধ্যেও বইল [illegible]' আর পর, 'গ্রাফ-যোগ্য'। শুধু 'ওকে' মন উঠিল না। 'ইন্সমোন্যাস্ত' হইতে বাজারে পাওয়া যায়। 'তবু ভরিল না চিত্ত'! এতদূর তবন পাঁচার মত 'গ্রাফ-যোগ্য' বলাইয়া দিলেন। কারণ, 'অধিকন্তু ন দোষায়।' ইনি 'গড় কটা লাগাইয়া ভাতন [illegible]। সকলে 'আলো জ্বালে, আর আগুন ধরায়; ইনি 'আলো আলো ধরান'। চারুপক্ষীরা [illegible] 'কি' কে 'কী' করিয়া তাহাতে গুরুত্বের আরোপ করেন। 'ক্রমে দুঃখে মধু আসে।' ইনি বিকটকে 'প্রোমোশন' দিয়া 'বীকট' করিয়াছেন। 'প্রোড' মানক অশ্লীল [illegible] আছে—'সিকন'! 'বাবা' [illegible] আছে—'খ্রীখ্রীভগবান-

মানব-মঙ্গল।

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণ কয়েকটি 'মঙ্গল'-গীতি রচনা করিয়াছেন—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গল, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। ঐ সকল কাব্যে কবিগণ কোনও না কোনও দেবতার মহিমা গান করিয়াছেন—ঘনরাম ধর্ম্মঠাকুরের, মাধবাচার্য্য কৃষ্ণঠাকুরের, লোচন দাস শ্রীচৈতন্যের, ভারতচন্দ্র 'অন্নদা' অন্নদার। আমি আজ মানবের মহিমা গান করিতে চাই—সাধারণ মানুষ; কবি নয়, দার্শনিক নয়, বৈজ্ঞানিক নয়, সাহিত্যিক নয়, যোদ্ধা নয়, বুদ্ধিমান্ নয়, মন্ত্রীনায়ক নয়, জননায়ক নয়,—নিরুপাধি নিরঞ্জন সাধারণ মানুষ—তাহার মহিমা গান করিতে চাই;—সে যে হেয় নয়, ঘৃণ্য নয়, পতিত নয়, হীন নয়—সে যে অতি বড় গরীয়ান্, মহীয়ান্, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চাই। বাগাড়ম্বর আমার সহায় হউক।

আমার স্মরণ আছে, একবার আমি এক পাদরী মহাশয়কে সৌজন্যের হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। পাদরী মহাশয় কে এক জন ইংরাজি-ওয়ালা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, আমাদের গ্রাম্য-গ্রন্থে, বিশেষতঃ বেদে, মানুষের মধ্যে যে পাপ (যাহাকে খৃষ্টানেরা বাইবেল original sin বলেন) উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পাদরী সাহেব নৈরাশ্যগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কারণ, একেত বাইবেলের মোজাইকে আদম কৃত original sin (আদিম পাপ), যাহা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া আমরা সকলে আদিম পাপী, ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস যদি কোনও জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে না থাকে, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের নহে ত্রাণ-অধ্যায়ের বিধিবিধানের অনুধাবনও হয় নাই। ইহা ভাবিয়া পাদরী শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'পাপের বীজ মানবজীবনের ক খ। বেদের ঋষিরা পর্য্যন্ত যখন এ পাঠ পড়েন নাই, তখন বোধ হয় ত পাপ মুক্তি দেখি না।' আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম—'ধৈর্য্য ধরুন। আপনি যাহাকে পাপের শোচনা বলিলেন, আমাদের শাস্ত্রে তাহা যথেষ্ট আছে। অধিকন্তু যাহা আপনি হয় ত কখনও শুনেন নাই, এমন কথা, অর্থাৎ আত্মা যে পাপী তাপী নহে; শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, এ মতও আছে।' তিনি বলিলেন, 'ইহা blasphemy—শুনিতে নাই—পাপের শোচনা

যে আছে, ভাই বল।' আমি তখন তাঁহাকে কয়েকটী শারীরিক ব্যায়ামের ব্যাখ্যানুবাদ শুনাইলাম। মিশনরী-প্রবর কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। ইচ্ছা করিলে আরও শুনাইতে পারিতাম। যথা, খুব প্রচলিত 'অপরাধভঞ্জন' স্তোত্র—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি॥

কি করুণ, সাগ্রহ আত্মনিবেদন! আমি কায়ের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, আত্মার দ্বারা, প্রকৃতির দ্বারা যে যে অপরাধ করিয়াছি, যা করিতে গিয়াছি, সে সমস্ত ক্ষমা করুন। আপনারই জয় হউক।'

আমরা সকলে নিত্য পাঠ করে না। কিন্তু 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত'—যে কয়টা মিনিট করেন, সেই সময়ে কি বলেন?

'অঘমর্ষণ' পাপবিনাশম্' ইহা শুনিতে যদি কাহারও আপত্তি হয় যে, সন্ধ্যার মন্ত্রের ভাষা ত ঐ রকম নহে, উহা ত বৈদিক মন্ত্র নহে, বেদ হইতে পাপবিনাশের প্রমাণ দাও, তবে সে অপৌরুষেয় খণ্ডন সৃষ্টি সইল। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজমান ইহা ভক্ষণসময়ে দোষকৃত, মনুষ্যকৃত, পিতৃকৃত সমস্ত পাপের (বৈদিক অর্থ এনস্) এই মন্ত্রে মার্জ্জন চাহিতেন:—

যৎকুর্ম্মিত এনসোঽহং যন্মনসি,
যৎকৃতঞ্চ এনসোঽহং বঙ্মনসি,
পিতৃকৃতমেনসোঽহং বঙ্মনসি।

শুধু তাই নহে। ঋক্‌বেদের শেষ অধ্যায়, যাহাকে 'ঈশ' উপনিষদ্ বলে—সেখানে ঋষি অগ্নি-দেবতার উদ্দেশে বলিতেছেন,—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে—

'হে অগ্নি! আমাদিগকে কর্ম্মফলভোগের জন্য সুপথে লইয়া যাও'; আর—

যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।

'তোমাকে বার বার নমস্কার করি, আমাদের চিত্ত-লিপ্ত সমস্ত পাপ অপসারিত কর।'

যাহারা যাহা ঋগ্‌বেদসংহিতা ভিন্ন কোনও বৈদিক সাহিত্যকেই বেদ বলিয়া মানেন না, তাঁহাদেরও নিরাশা হইবার কারণ নাই; যে হেতু ঋগ্‌বেদসংহিতার

প্রথম মণ্ডলের ২৫ সূক্তে দেখিতে পাই যে, ভৃগুনামা পাপমোচনার্থ বরুণকে আহ্বান করিতেছেন :—

বরুণে দ্রুহং মিত্র ঈশে পপাচ।
বেতং চিদ্ এনঃ প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ।

[পপাচঃ = পরাঙ্মুখং কুরু। প্রমুমুগ্ধি = মুঞ্চ কুরু।]

—'মিত্রদ্রোহকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরে অবস্থিত করাও, আমার কৃত পাপ হইতে আমাকে মুক্ত কর।' আবার—

যৎকিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনে
মিনীমসি [illegible]
মা নস্ তস্মাদেনসো দেব রীরিষো
যুয়োষ্যস্মদ্ বিষ্মতং জুহুরাণাম্।

[যুয়োষি = বিশ্লেষয়। বিষ্মতং = বিসদৃশানি কুরু।]

—'হে অসুর রাজা বরুণ! আমার কৃত যখন পাপ বিধিল কর।' ইহার পর কোন্ বলা যাইতে পারে—ঐ, আমার খ্রিষ্টনবী বলিয়াছেন, পাপের শোচনায় সাক্ষাৎ না পাইয়া যে মুরলমান হইয়াছিলেন, তাঁহার যথেষ্ট হেতু ছিল না।

অপরে হয় ত উল্টা দিক্ হইতে [illegible] বৈদিক যুগে পাপের শোচনা থাকিলেও অসবর্ণ বিবাহের ন্যায় [illegible] তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—অতএব, মিশনরীর আপত্তি নিতান্ত অমূলক নয়। এ কথাও বলা যায় না; কারণ, এখনও হিন্দুর নিত্যকর্মপদ্ধতিতে দেখিতে পাই যে, ভক্তেরা প্রতিদিন শ্রীহরির নিকট নিবেদন করেন—

পাপোঽহং পাপকর্মাঽহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো হরে।

'আমি পাপী, পাপকর্মী, পাপাত্মা, পাপোদ্ভব, হে পুণ্ডরীকাক্ষ হরি! আমাকে পরিত্রাণ কর, আমার সকল পাপ হরণ কর।' খৃষ্টানেরা ত এই কথাই বলেন, তবে খৃষ্ট-পন্থী ও হিন্দু-পন্থীদিগের মধ্যে প্রভেদ কি? বিশেষ প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ এই যে, খৃষ্ট-পন্থী মানবকে আদিতে অন্তে পাপী পাপাত্মার মত দেখেন—he is born in sin and nurtured in sin. পাপে প্রসূত হয়, পাপে লালিত পালিত হইতে। আর হিন্দু-পন্থী বলেন যে, প্রতি মানুষের একটা মানুষের দিকের ব্যাপার—মানুষ অন্তঃ স্বভাবতঃ শুদ্ধ নিষ্পাপ পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হইতে পারে না, মানুষের আত্মাতে, মানুষ প্রকৃত মানুষ, তাহাতে পাপ লিপ্ত হইতে পারে না। সেই জন্য ব্যক্তি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ—পাপী তাপী, দীন দরিদ্র, দীন দুঃখী, সমস্ত মানুষই মহীয়ান্ ও গরীয়ান্। কেহ হেয় নয়, কেহ ঘৃণ্য নয়—সকলেই সেই সচ্চিদানন্দের

নিকেতন, রসের বিভূতি। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেৎ বহু মানয়ন্।

'সমস্ত জীবকে বহুসম্মানসহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে'। কেন? ইহার উত্তর পরের চরণে রহিয়াছে—

ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।

কারণ, 'ভগবান্ ঈশ্বরই অংশ দ্বারা জীবরূপী হইয়া আছেন।' বৃহদারণ্যক উপনিষদ আরও স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম দাসাঃ

'কিরাতজাতীয় নিম্ন শ্রেণীর লোক—এমন কি, যে পাপী প্রবঞ্চক, সেও ব্রহ্ম।' শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—'প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্ম।' অর্থাৎ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত।

মানব-মঙ্গলের ইহাই মূল কথা—মানুষ যে সে নয়, মানুষ সেই অপাপবিদ্ধ ভগবান্—এ মানুষ ও মানুষ নয়, সমস্ত মানুষই ব্রহ্ম। বেদে যাহাকে মহাবাক্য বলে, অর্থাৎ চরম উপদেশ, চার বেদের-সেই চার মহাবাক্য এক সুরে জীবের ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিতেছেন—'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তুমি হও তিনি', 'এই আত্মা ব্রহ্ম', 'আমিই তিনি', 'আমি হই ব্রহ্ম'। জীব যদি ব্রহ্ম, জীব যদি সচ্চিদানন্দ, জীব যদি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব, তবে তাহার শোক মোহ কেন? তবে জীবের সংসার-গতি কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীব আত্ম-বিস্মৃত। শ্রীরামচন্দ্র যেমন বিষ্ণুর অবতার হইয়াও আত্মবিস্মৃতির ফলে সাধারণ মানবের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, জীবেরও সেই দশা। যোগ-বাশিষ্ঠে ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

হেতুরিত্যেষ তেষাং স্বাত্মবিস্মরণস্থিতে।
ন কিঞ্চিৎ বাস্তবং সাধো বিদ্ধি তেষাং ভ্রমপ্রদঃ॥

'জীবগণ যে জন্ম জন্ম দেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ, তাহাদের আত্মবিস্মৃতি। জীব অনাদিকাল হইতে মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যে দিন সে প্রবুদ্ধ হইবে, সেই দিন বুঝিতে পারিবে যে, সে-ই স্বয়ং জন্মহীন নিদ্রাহীন স্বপ্নহীন অদ্বৈত ব্রহ্ম ব্রহ্ম।

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা।—মাণ্ডুক্যকারিকা। ১।১৬

প্রাচীনেরা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা এই তত্ত্ব বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এক সিংহশাবক জন্মমাত্রে জননীকে হারাইয়া এক মেষপালকের অধীন হয়, এবং মেষের সঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া মেষের সহিত পরিপালিত হয়। সে মুহূর্তের নিমিত্তেও মেষ ব্যতীত আর কিছু জানিত, এবং মেষসাহচর্য্যে আন্তরিকে মেষধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সে সিংহ জন্তু দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করিত—সিংহ বা ব্যাঘ্রের কথনও সম্মুখীন হইতে পারিত না। একদা কেহ করুণা করিয়া তাহাকে নদীর তীরে লইয়া গিয়া জলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইল, এবং বুঝাইয়া দিল যে, সে মেষ নহে, সিংহ। তখন সেই আত্মবিস্মৃত সিংহ-শিশু নিজের স্বরূপ বুঝিয়া হস্তী ব্যাঘ্রের সহিত সম্মুখসমরে অগ্রসর হইল।

সাধারণতঃ জীবের দশাও ঠিক এইরূপ। জীব দেহযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে।

মোহাৎ অনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বৃত্তাবি শোচতি।—পঞ্চদশী।

'দেহবদ্ধ জীব মোহের বশে ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া শোকের অধীন হয়।'

দেহযোগাৎ সোপি।—বহ্মসূত্র ৩।২।৩

'দেহ-সম্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের বন্ধ ভাব।' অর্থাৎ, জীব উপাধি-সংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, এবং "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"—ঈশ্বর ভাব হারাইয়া, শোক-মোহের অধীন হয়। যদি কখনও সদ্গুরু তাহাকে বলিয়া দেন যে, 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', যদি কখনও সে বুদ্ধিতে পারে 'সোঽহম্', 'অহং-ব্রহ্মাস্মি', তবেই তাহার অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হয়, এবং সে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মর্ম্মে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন—

তয়োরেকঃ খাদতি চাশ্নন্নন্যোঽনশ্নন্ন্ অভিচাকশীতি।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥

[হংসঃ—জীবঃ। আত্মানং—ইদং। প্রেরিতারং—ঈশ্বরম্—শঙ্কর।]

'কর্ম্মফল ও পরমাত্মাকে পৃথক্ মনে করিয়া জীব এই সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে। যখন সে পরমেশ্বরের বর লাভ করে, তখন স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহার অমৃতত্ব লাভ হয়।'

এই সকল কথার সম্প্রসারণ করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব জীবের সংসার-যোগ এই ভাবে বুঝাইয়াছেন ঃ—

"পরমার্থতোঽবিকৃতম্ একরূপমপি সদ্ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাদ্ ভজত ইব উপাধিগুণান্ বুদ্ধিলাসাদীন্।—৩।২।২০ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

'সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, রোগ, শোক, এ সকল দেহ মনঃ প্রভৃতির ধর্ম্ম ; জীব (আত্মার) ধর্ম্ম নহে। কিন্তু জীব দেহ-সংযোগ হেতু নিজেকে সুখী দুঃখী, রোগী শোকী মনে করে।'

তথাপি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, আত্মাকে সেইরূপ পাপ স্পর্শ করিতে পারে না—কারণ, অনঙ্গো হয়ং পুরুষঃ। গৌড়পাদ বলিয়াছেন :—

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুধানাং আত্মাঽপি মলিনো মলৈঃ।

'যেমন বালকেরা আকাশকে মল-মলিন ভাবে, সেইরূপ জ্ঞানান্ধেরা আত্মাকে মল-মলিন ভাবে।'

গীতারও উপদেশ ঐরূপ—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।—গীতা ১৩।৩২-৩৩।

'সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ; সেই জন্য দেহস্থ হইয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ। যেমন সর্ব্বগত হইলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা উপলিপ্ত হয় না।'

এই উপদেশই মানব-মঙ্গলের মূল সূত্র। অতএব কথাটার একটু বিচার করিলে মন্দ হয় না। এই যে জীব—যাহাকে আমরা পাপী তাপী শোকী দুঃখী দীন হীন মলিন আখ্যা দিয়া থাকি, যাহাকে শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতীতে স্থাপনা করিলেন, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, জীব ব্রহ্ম-সিন্ধু—ব্রহ্ম সিন্ধু, জীব সেই সিন্ধুর বিন্দু—ব্রহ্ম অগ্নি, জীব তাহার বিস্ফুলিঙ্গ। অর্থাৎ, জীব ব্রহ্ম-কণা।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।—মুণ্ডক, ২।১।১

[ভাষ্যঃ—জীবাঃ] যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয়।'

জীব যে ব্রহ্মাংশ, এ কথা গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ;—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।—গীতা, ১৫।৭

'আমারই (ভগবানেরই) অংশ জীবলোকে সনাতন জীব-রূপে অবস্থিত।'

ব্রহ্মসূত্রেও ঐ মত ;—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ।—২।৩।৪৩ সূত্র।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ।

সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।

'জীব নিত্য-মুক্ত স্বভাব, সচ্চিদানন্দ-রূপ'। অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ, প্রকৃতিগত কোনও ভেদ হইতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের এইমাত্র প্রভেদ যে, ব্রহ্মে সচ্চিদানন্দ ভাব সুব্যক্ত, জীবে তাহা অব্যক্ত। জীব সাধনার দ্বারা ঐ অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাবকে সুব্যক্ত করিতে পারে—স্ফুলিঙ্গ অগ্নিতে পরিণত হইতে পারে, বিন্দু সিন্ধুতে বিলীন হইতে পারে, এক কথায় জীব ব্রহ্ম হইতে পারে। * তখন সে বলিতে পারে—যোসাবসৌ সাহমস্মি—খৃষ্টের ভাষায়—I and My Father are one.

এই তত্ত্ব ঋষিরা অন্য ভাবেও বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব ; ব্রহ্ম সত্য, জীব ছায়া।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।

'জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ যেন ছায়া ও আতপের সম্বন্ধ।' অন্যত্র উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ।
তথাত্মভেদেঽনেকোঽয়ং একধারোদিবাত্মবান্॥
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।—ব্রহ্মবিন্দু ; ১১।১২।

'যেমন এক আকাশ ঘটাদিভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য্য জলের আধারভেদে পৃথক্ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেহে) থাকিয়াও বিভিন্ন হইয়াছেন।'

'একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন, জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহু-রূপে দৃষ্ট হইতেছেন।' এই আভাস বা প্রতিবিম্ব-বাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ—২।৩।৫০ সূত্র।

---

* এই কথা ইংরাজিতে এক জন মনীষী লেখক এই ভাবে বলিয়াছেন—Every soul is the logos in gestation, a God in the making.

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—৩।২।১৮ সূত্র।

এই প্রতিবিম্ব বিম্বের সহিত মিলিত হইতে পারে, এই চিদাভাস চিদাকাশে সম্প্রসারিত হইতে পারে।

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।
—বৃহদারণ্যক।

এই জীব শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত হয়। পতঞ্জলি এই অবস্থাকে যোগের অবস্থা বলিয়াছেন,—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।—যোগসূত্র।

'ঐ অবস্থায় দ্রষ্টা জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়।' আর অন্য অবস্থায় ?

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।

অন্য অবস্থায় জীবের শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব শোক দুঃখ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা উপরক্ত হয়। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের সন্নিধানে রক্তজবা আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায়, নীল অপরাজিতা আনিলে স্ফটিক নীলবর্ণ দেখায়, সাদা চামেলী আনিলে শুভ্রবর্ণ দেখায়, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। স্বচ্ছ স্ফটিকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপরাগ হয় মাত্র, স্ফটিক বস্তুতঃ বর্ণান্তরিত হয় না। সেইরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধ জীব বৃত্তির প্রতিবিম্বে উপরক্ত হয় মাত্র—তাঁহার 'বেবল', চিন্মাত্র স্বরূপের কোনও রূপ ব্যত্যয় হয় না। যখনই জীব বৃত্তির উপরাগ মুছিয়া ফেলিয়া পরম জ্যোতির সহিত মিলন লাভ করিয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার পাপ তাপ রোগ শোক, দীনতা হীনতা সমস্তই স্ফটিক কালে তিরোহিত হইয়া যায়। ইহাই মানবের আশার সাফল্য ও সুন্দর।

শুধু তাহাই নহে; যাঁহারা যোগী, যাঁহারা ঋষি, সত্যের যাঁহাদের অপরোক্ষ অনুভূতি হইয়াছে, তাঁহাদের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, ঈশ্বর মানুষের মলিন দেহে বসতি করেন। সেই জন্য দেহকে ব্রহ্মপুর বলে। দেহ-রূপ পুরে তিনি পুরস্বামী।

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম।'

'এই দেহরূপ ব্রহ্মপুরে এক ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-নাম গৃহ আছে; ইহাকে চলিত কথায় হৃৎপদ্ম বলে। এই হৃৎপদ্মে এই জ্যোতির্ময় পরমদেবতা অধিষ্ঠিত আছেন।'

দহরং বিপাপং পরমেশ্বভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্।

অর্থাৎ, 'দেহ-রূপ পুরের মধ্যে একটী অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত আছে।

সেই পুণ্ডরীকে যে পরম দেবতা শোকহীন পাপহীন গগন-সদৃশ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে।' এই জন্য হৃদয়কে 'হৃদয়' বলে।

স বা এষ যদ্যপি হৃদি, তস্য এতদেব নিরুক্তম্। হৃদি অয়ম্ ইতি। তস্মাৎ হৃদয়ম্।

—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৩.

সেই পরমাত্মা হৃদয়ে বিরাজিত। তাঁহার নিরুক্ত (etymology) এইরূপ : হৃদয়ে তিনি, সেই জন্য হৃদয়কে হৃদয় বলে।'

ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন,—

'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।'

অতএব, জীবের কত দূর সৌভাগ্য, ভাবিয়া দেখ। দেহের মধ্যে পরম দেবতাকে বসাইয়াছে। সেই জন্য তাহার দেহকে ঋষিরা দেবালয় বলিয়াছেন।

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। —বৈরাগ্যশতক, ৭৯

'দেহকে দেবালয় বলে; কারণ, এখানে সদাশিব প্রতিষ্ঠিত আছেন।'

ভগবান্ যদি জীবের এত নিকট প্রতিবেশী হন যে, তাহার সহিত এক বাসায় বাস করেন, তবে তাঁহার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? তিনি শুধু আমাদের প্রতিবেশী নন, তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ সখা, অন্তরতম সুহৃদ। উপনিষদ্ রূপকের ভাষায় এই তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন :—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি, অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ। অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্ অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ।

দুইটী সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তাহারা পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে এক জন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে। একই বৃক্ষে এক জন নিমগ্ন হইয়া স্বাধীন ভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে; কিন্তু যখন সে অন্যকে দেখিতে পায়, তখন সে তাহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয়। বুঝিতে হইবে কি যে, এই বৃক্ষ আমাদের দেহ: আর বিহঙ্গমদ্বয় আমাদের আলোচ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা?

---

* খৃষ্টানদিগের ধর্মাচার্য সেণ্ট পল এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—"Know ye not that ye are the temple of God, and that the spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy which temple ye are." *1 Corinthians*, iii. 16, 17

অতএব, জীবের দৈন্যের কোনই কারণ নাই। তাহার অতি নিকটে সর্ব্বরূপে ভগবান্ অপেক্ষা করিতেছেন—সে তাঁহার সহিত মিলিত হউক। সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে, সকল পাপতাপ দূরে যাইবে, সকল দীনতা সকল হীনতা তিরোহিত হইবে। সে অমৃতের পুত্র, অমৃতত্ব তাহার অধিগত হইবে, এবং সর্ব্বকল্যাণের সংস্পর্শে তাহার পূর্ণ মনুষ্য ফুটিয়া উঠিবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দুর্গোৎসবের ব্যাপার।

১

বেগুনবাড়ীর বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা প্যালারাম মাঝি, জাতিতে সাঁওতাল, গ্রামের ষোল আনা লোককে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ হে, এ বৎসর আমি দুর্গাদেবতার পূজো করব, তোমরা কেউ মানা দিও না।'

প্যালারাম মাঝিকে বাধা দেয় কাহার সাধ্য? পূর্ব্বে কখনও বেগুনবাড়ীর পাহাড়িয়া দেশে, শালবনের মধ্যে, দুর্গোৎসব হয় নাই। দলে দলে সাঁওতালগণ নিকটস্থ গ্রাম কাল্লুদহে গিয়া বৎসর বৎসর দুর্গোৎসব দেখিয়া আসিত বটে, কিন্তু পূজার সঙ্কল্প এ পর্য্যন্ত কাহারও মনে উদিত হয় নাই। গত তিন বৎসর ধরিয়া কেবল প্যালারামের মনে জাগিত, এই যে বাঙ্গালী জাত, এরা দুর্গাপূজা করে বলিয়াই এত চালাক। দুর্গাপূজা না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। একবার বুঝিয়া দেখা যাক।

প্যালারামের আর একটা গুণ ছিল। সে কালক্রমে বাঙ্গালা ভাষা মোটামুটি শিক্ষা করিয়া, এবং বাহিরী কিছু কিছু কারবারী লোকের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মিশিয়া উচ্চদরের পূজার একটা মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহা এই যে, পূজা না করিলে মনে বল হয় না। 'এই যে জঙ্গলের বাঘ ও হাতী, তাহারা যদি পূজা করিত, না জানি কি রকমই হইত! ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মই বল।'

যেমন কথা, অমনই কাজ আরম্ভ। প্যালারামের উদ্যম তল্লাটে বিখ্যাত। প্রকাণ্ড শরীর! তাহা অপেক্ষাও দীর্ঘ লাঠী হস্তে সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ, আমরা অনেক পাপ করেছি। শরীরের শক্তিতে পাপের প্রশ্রয়, মনের বলে পুণ্য। সেই মনের বল যদি শরীরে আসে, তবেই মাহাত্ম্য। মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে হ'লে এ কাজটা শীঘ্রই সম্পন্ন করতে হবে।'

অনেকে বলিয়াছিল, 'দুর্গাপূজাতে খরচ বেশী, প্রতিমা গড়াইবার জোর নাই, পূজার মন্ত্র জানা নাই, হঠাৎ এমন একটা সঙ্গীন কাজে হাত দিতে হইলে তাহার যোগাড় এই সময় হইতেই করা উচিত।'

কেহ কেহ বলিল, 'পূজা করিতে হইলে ভক্তি চাই। কেবল নাচ গান তামাসা লইয়া পূজা হয় না।'

প্যালারাম গর্জ্জনপূর্ব্বক কহিল, 'ও সব বাজে কথা। আমি এবার পুণ্ড মশাইয়ের বাড়ীতে দুর্গাপূজা দেখিছি। সমস্ত ভট্টাচার্য্যি দু'টাকা রোজ দিলেই মন্ত্র পড়বেন। তিনি বলেন যে, শক্তিপূজার অধিকার সব জাতিরই আছে। আর ভক্তির কথা বলছ তোমরা? সেটা ঠ্যাঙ্গানীর চোটে হবে। কোনও ব্যাটারই ভক্তি থাকে না, পূজোর তিন দিন বকে নেশা খায় ও বেয়াদবী করে। আমার বোধ হয় তামাসেরও যে ভক্তি আছে, তা বাঙ্গালীর মধ্যে অনেক লোকের নাই। সেই জন্য 'মা' আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন।'

শেষ কথাতে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। 'মা যদি স্বপ্ন দিয়ে থাকেন, তবে ত কোনও কথাই নাই।' অনেকের মনে সূক্ষ্ম সন্দেহ ছিল, তাহা প্যালারামের 'মা' শব্দ শুনিয়া মিটিয়া গেল।

সাঁওতালদিগের সুমধন না থাকিলেও, তাহারা পরিশ্রমে কাজ সারিয়া লয়। সুতরাং উপায়ের অভাব ছিল না।

তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। জমিদার কৃষ্ণলাল নটবের তহশীলদার বজ্রবাহন সিং এক দিন পরিভ্রমণে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, যত সাঁওতালনী রাত্রি জাগিয়া কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা মহাজনকে বেচিয়া ফেলে, এবার বেচে নাই। পুরাতন চর্খাগুলি ঐতিহাসিক হইয়া নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। তালিবৃক্ষের বন্য পল্লীটীরের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রের সহিত চর্খার সুর গভীর ভাবে ধ্বনিত হইতেছে।

বজ্রবাহন জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার খানা কি?'

সাঁওতাল জাতির গুণ এই যে, তাহারা ঘরের কথা কাহাকেও বলে না। সে বলিল, 'এবার কাপড়ের দর চ'ড়ে যাওয়াতে আমরা নিজেই সুতা কেটে কাপড় বুনছি।'

বজ্রবাহন। অনেক যায়গায় লুটপাট হয়ে গেছে।

হাপা। সেটা ধর্ম্মের কথা নয়। ধর্ম্ম দেখতে হবে। ধর্ম্ম দেখতে হ'লে এমন কর্ম্ম করতে হবে, যাতে কেউ দোষ না ধরতে পারে।

বজ্রবাহন সিং অনেক দিনের তহশীলদার। সে মনে মনে বুঝিল, এদের একটা মতলব আছে নিশ্চয়। সাঁওতালদিগের মুখে ধর্ম্মকথা বড় সোজা কথা নয়। সে বলিল, 'যা কহিস্ বাপু! করু, কিন্তু মনে থাকে যেন যে, খাজনা দেবার সময় খুব নিকটে।'

হাসা সাঁওতাল কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে বলিল, 'তোমার মালিক্ খাজনা নিয়ে যা করেন, তা জানা আছে। আমরা কি করব, পরে জানতে পারবে।'

বজ্রবাহন গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল।

২

জমীদার কৃষ্ণলাল ঘটক তুলিনের নিজ বাটীতে একখানি পুরাতন চেয়ারে বসিয়া বিষ্ণুপুরের আট আনা সেরের তামাক বাঁধা-হুঁকা-সংযোগে টানিতেছিলেন। সম্মুখে সুবর্ণরেখা নদী বহিয়া যাইতেছিল।

ঘটক মহাশয় পূর্ব্বে ব্যবসা করিতে ছোটনাগপুরে আসেন। ক্রমে পয়সা জমিয়া যাওয়াতে, এবং দেহের কাঠিন্য দূর ও সুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি তুলিনে স্থানীয় পাথর পড়ুল করিয়া একটা বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ঘটক মহাশয়ের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধ নহে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা দেখিয়া সাঁওতালগণ ঘটক মহাশয়কে তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের বংশধরের মধ্যে কেহ, এই প্রকার বিবেচনা করিত। তাহাতে ঘটক মহাশয়ের কারবারের সুবিধা হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার হাতে কিছু সম্পত্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক ঘটক মহাশয় তুলিনে গাড়িয়া বসিলেন; এমন কি, এই বৎসর পূজোর সময় তাঁহার দারোগাহের ইচ্ছা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যাওয়াতে তিনি টাকা কড়ি ভূগর্ভের কোনও অজ্ঞাত স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়া ঘন ঘন সংবাদপত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ঘটক মহাশয়ের সম্পত্তি দশখানি গ্রাম জুড়িয়া। তাহার মধ্যে সমৃদ্ধিশালী পাঁচখানি গ্রামে প্যালাবাদ মাঝি তাঁহার আত্মীয়বর্গের চাষ ও বাস।

'গ্রাম' বলিলে আমরা যেমন বাঙ্গালা দেশের গ্রাম বুঝি, সাঁওতালদিগের তাহা নয়। গ্রামের মাটী কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব নহে। পাঁচটী গ্রামের সাঁওতাল মিলিয়া যেন একটী পরিবার। সকলে একত্র মিলিয়া চাষ করে। যদিও পরস্পরে ঝগড়া করিয়া লয়, কিন্তু যখন যে দরিদ্রের সাহায্য, সেই অনুসারে সকলে। কেহ মরিয়া গেলে তাহার কেত সকলেই করে। গ্রামে অনেক পরিবার, অথচ বেতনভুক্ত অভাব, পতিত কেহ তাহারই জন্য

গিয়া পড়ে। ক্ষেত বিক্রয় করিবার প্রথা নাই। খাজনার ভার সর্দ্দারের উপর। সকলের পরিশ্রমের এক অংশ সে সংগ্রহ করিয়া জমীদারকে দেয়। বাকী খাজনায় নিলাম হইবার সম্ভাবনা নাই। দুর্বৎসরে অনেক সময় ঘটক মহাশয়কে খাজনা ছাড়িয়া দিতে হইত, কিন্তু সুবৎসরে তাহা আদায় হইয়া যাইত। কিন্তু যদি না হয়, সেই ভয়ে অনেকবার তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে হইয়াছিল। কোনও কোনও স্থলে সর্দ্দারের জমী কাড়িয়া লইয়া ঘটক মহাশয় নিজেই চাষ করিয়া বাকী খাজনা আদায় করিতেন। তাহাতে প্রজাগণ আপত্তি করিত না। পরিশ্রমই তাহাদিগের মতে সম্পত্তি। পরিশ্রম সহিলে জমীর মূল্য নাই।

জমীদার কৃষ্ণলাল ঘটকের বাটী হইতে কিয়দ্দূরে মহাজন বনমালী কুণ্ড মহাশয়ের বাস। কুণ্ড মহাশয়ের বাটীতে পূর্ব্বে দুর্গোৎসব হইত, এ বৎসর দেশে আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ হওয়াতে তিনি কিছু দিনের মত জন্মভূমিতে গিয়া বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া গুড়ের জালা গণিতেছিলেন। এমন সময় দল-বল লইয়া প্যালারাম সর্দ্দার উপস্থিত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীর সম্মুখে বসিয়া হুঁকায় জল ফিরাইতেছিলেন। প্যালারাম সর্দ্দার প্রণত হইয়া বলিল, এবার আমরা দুর্গাপূজা করিব ঠিক হয়েছে, এই বেলা হ'তে যোগাড় করুন।

কুণ্ড মহাশয় অবাক হইয়া বলিলেন, টাকা পাবি কোথায়?

প্যালারাম। কত টাকা লাগ্‌বে?

কুণ্ড মহাশয়। অন্ততঃ পাঁচ শ' টাকা না হ'লে কি দুর্গোৎসব হয়? কারিগর এনে প্রতিমা গড়াতে হ'বে। নৈবেদ্যের সরঞ্জাম চাই, সাজসজ্জা চাই, ভাল ঢাকী ও তুলীর বন্দোবস্ত চাই, বলিদানের পাঁঠা চাই। তোদের দেশে পূজার কোনও উপকরণই ত পাওয়া যায় না। আমি বৎসর বৎসর পূজা করবার সময় আমাকে বাঙ্গালা দেশ হ'তে অনেক খরচপত্র ক'রে মালমশলা সংগ্রহ করতে হ'ত। হাজার টাকার উপর পড়ে যেত। তোদের তত দূর শক্তি না থাকলেও অন্ততঃ অর্দ্ধেক খরচ হবে ত?

প্যালারামের দলবলের বুক দমিয়া গেল, কিন্তু প্যালারাম বলিল, 'কুণ্ড মশাই, আমাদের পাঁচ শ টাকা আপনিই ধার দিন, সেই টাকা দিয়ে বাঙ্গালা দেশ হ'তে মালমশলা আনিয়ে দিন। আমরা পরিশ্রম ক'রে টাকা শোধ দিতে পারব, কিন্তু মালমশলার তত্ত্ব জানিনে। যদি একবার কেউ এসে দিয়ে যেত

তবে আমরা নিজেই ও সব তৈরী ক'রে নিতে পারি। ঢাক ঢোল আছে, তবে সে রকম বাজনদার নেই। ডাকের গহনা কিনতে হবে। বাঙ্গালা হ'তে সোবিগর আর রং আনতে হবে। আপনি কিছু ভাল খাবার বর্দ্ধমান থেকে পাঠিয়ে দেবেন। আমার মেয়ে সন্দেশ তৈরী করতে শিখেছে, কিন্তু কল্‌কেতার মত হয় না। সেই গরুর দুধের ছানা, সেই চিনি, অথচ হয় না, এটা কি সামান্য দুঃখের কথা! এই দুঃখেই দুর্গাপূজো করছি। আর একটা বিশেষ কথা, সস্তা দরে একটা যাত্রার দল আনবেন, তার খরচ আমি নিজে দেব। আমরাও একটা যাত্রার দল রেঁধেছি, কিন্তু আপনাদের মত হয় না। এই সব দুঃখেই দুর্গাপূজো করছি।

৩

কুণ্ড মহাশয় ভক্ত লোক। প্যালারাম সর্দ্দারের মহাজন। মঙ্গলের উৎসাহে বাধা দেওয়া তিনি ন্যায্য বিবেচনা করিলেন না। বাঙ্গালা দেশে দুর্গোৎসব প্রজাদের মধ্যে দারিদ্র্যবশতঃ এক রকম উঠিয়া যাইতেছে, যদি সাঁওতালরাই আরম্ভ করে, তবে মন্দ কি? এক জাতির পতন হইলে অন্য জাতি উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ বত টাকা লাগে, তাহা ধার দিয়া দেশ হইতে সরঞ্জাম পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রামযদু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও আশা প্রদীপ্ত হইয়া পড়িল। রিক্তহস্তে কুণ্ড মহাশয়ের বাটী রক্ষণ করিয়া এ বৎসরটা কাটাইতে হইবে, ইহা মনে করিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সম্প্রতি অনিদ্রা বাড়িয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্দ্দারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'সর্দ্দার, তুমি বেঁচে থাক।' বৎসর বৎসর দুর্গোৎসব কর, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। বাঙ্গালা দেশ হইতে লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছেন। এখন এই দেশে অবতীর্ণা নিশ্চয়।'

সর্দ্দার বড় খুসী হইয়া গেল। 'আচ্ছা ভটচায্ মহাশয়! আমাদের মত ছোট জাত্ দুর্গাপূজো ক'ল্লে কোনও পাপ হবে না ত?'

ভট্টাচার্য্য নস্যগ্রহণান্তর কহিলেন, 'আমি অনেকবার বুঝিয়ে দিয়েছি যে, দৈত্যদানবেরাও এক কালে দুর্গোৎসব করত। কেবল মধ্যে তাদের ভক্তি লোপ পাওয়াতে তারা রামচন্দ্রের হাতে মারা গিয়েছিল। শক্তিপূজা হ'তে আর বড় পূজা নাই।'

প্যালারাম বিদায় লইয়া দলবল সমেত জমীদার কৃষ্ণলাল ঘটকের বাটীতে উপস্থিত হইল। ঘটক মহাশয় হঠাৎ দুরন্ত প্রজা প্যালারাম সর্দ্দারকে দেখিয়া

মনে প্রমাদ গণিবেন, এই রকম চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তহশীলদার বজ্রবাহন সিং বলিল, 'আমি বলতে ভুলে গেছিলেম যে, এবার সাঁওতালরা দুর্গোৎসব করবে, বোধ হয় আপনার অনুমতি নিতে আসছে।'

ঘটক মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'তাও কি কখনও হয়? তোমাদের জাতির মধ্যে কখনও সে ব্যাপার হয়েছে?'

বজ্রবাহন তহশীলদার তাহার সম্মুখের বৃহৎ দন্তযুগল বিকাশপূর্ব্বক বলিল, 'আমাদের ভুঁইয়া জাতির মধ্যে কখনও দুর্গোৎসব হয়েছে কি না—মনে পড়ে না, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কেই কেই কালীপূজা ক'রত। সে ওরফ পূজা এখনও খেড়ে ও মাহতোরা মধ্যে মধ্যে করে। ডুমেতি কবার বড়ক থাকলেও মানস ক'রে পূজা দেয়।'

সম্প্রতি চতুর্দ্দিকে ডাকাতি প্রবণ হওয়াতে ঘটক মহাশয়ের মনে বিলক্ষণ আতঙ্ক জাগ্রত হইয়াছিল। তাহার মনে হইল, সাঁওতালদেরও একলাটা বড় ভাল নয়! প্যালারাম সর্দার দলবল সত্ত্বেও আত্মপ্রাধান্য প্রকাশ করাতে, ঘটক মহাশয় বুঝাইয়া বলিলেন, 'দেখ প্যালারাম! পূজার অধিকারী সকলে হ'তে পারে না। এতে তোমরা ছোটি জাত, তাতে এটা দুর্ব্বৎসর। খাজনা দিতেই তোমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বরং এখানে একটা মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি হচ্ছে, সেইটে যদি কোনও রকমে খাড়া করতে পার, তবে তোমাদেরও উন্নতির পথ হবে, আর আমিও তোমাদের চেয়ারম্যান্ হয়ে একটা অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাব, এমন আশা করি।'

প্যালারাম। তার মানে কি?

ঘটক। তোমরা যে ক'খানি গ্রামের পত্তন করেছ, সেগুলি আমাদের এই প্রধান গ্রামের নিকট। সব গ্রামগুলিই জঙ্গলময় পরিপূর্ণ হ'চ্ছে। ব্যাঘ্রের বেড়েছে! রাস্তাগুলো ভেঙ্গে গেছে। গাড়ী চলে না। তোমাদের মত চালান হয় না। তোমরা খেয়ে খেয়ে মোটা হ'চ্ছ, কিন্তু তাতে কি লক্ষ্মীশ্রী হয়?

প্যালারাম। তবে কিসে হয়?

ঘটক। সভ্যতায় হয়। জিনিসগুলো চালান দিলে দাম হয়। টাকা আসে। সেই টাকাতে রাস্তা ঘাট আরও প্রস্তুত করা যায়। দশ জন ভদ্রলোক দেশে আসে। ময়লা বের হ'বার ড্রেণ হয়। মশা কম হয়। জ্বর থাকে না। জ্বর হয় না। ক্রমে তোমরা অপরের মধ্যে টেক্স বসিয়ে গ্রামের শোভা বৃদ্ধি করবে, ল্যাম্প-পোষ্ট দাঁড় করাবে, ময়লা-ফেলার গাড়ী

বলদ জোটাবে। ক্রমে তোমাদের চেহারা ফিরে যাবে, স্কুল খুলে লেখা পড়া শিখবে, দেশের শাসন নিজেই করবে, মানুষ বেছে নিয়ে তাকে ভোট্ দেবে, সে গিয়ে কৌন্সিলে বসে' বক্তৃতা করবে। তোমাদের নাম জাগতে থাকবে, সেই কাজে বেরিয়ে এদেশে এসে এক পয়সার উপকার হবে। দুর্গোৎসব ক'রে আমরা কি? কেবল লোক জড়ো করে' ছেড়ে যাবে এই ত নয়? কেবল ময়লার বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে তোমাদের মৃত্যুসংখ্যা বাড়লে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, আর রিপোর্ট না দিলে ডাক্তারগুলোর প্রাণ যাবে। এই দেখ, পঞ্চায়েতের সর্দ্দার হয়ে আমাকে কত বাজে না সঙ্গ করতে হচ্ছে। তুমি প্রজাদের সর্দ্দার, একটু বিবেচনা ক'রে দেখ, আমি এর অধিক আর কি বলব? আর এ কথাও বলে দিচ্ছি। এবার হতে আমি তোমাদের মাল ক্রোক করি না, এবার তাও করব। অনেক খাজনা বাকী পড়েছে। অনেক।

৩

ইহা বলিয়া ভূতক মহাশয় উঠিয়া গেলেন। প্যালারাম উত্তর না দিয়া সদলে গ্রামে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া বাপকে জড়াইয়া বলিল, 'বাপা, ব্যাপার-খানা কি বল ত?'

বাপা। এ সব বজ্জাতি।

প্যালারাম। তা ত বুঝি। কিন্তু তোমাদের মতে দুর্গাপূজোটা ত বৎসর বৎসর করে' ফেলা ভাল নয় কি?

বাপা। যখন আপনি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট, তখন এর একটা মানে আছে। তবে কি জানেন, যদি সত্যি সত্যিই গ্রামে ময়লার বৃদ্ধি হয়, টিনের গাইখানা বড়, তবে পূজোর পরে ব্যাপারটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বিশু মোক্তারের পরামর্শটা নিলে হয়।

প্যালারাম গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'রেখে দে তোর বিশু মোক্তার। আমরা পাহাড়ে জাত। হাজার বৎসর ধরে নিজের কাজ স্বাধীনভাবে করেছি, কোনও আপদ বালাই হয় নাই। এর একটা উপায় আমরাই ক'রব। আমি নিমেষের মধ্যে এ সব কথার আদি অন্ত ভেবে নিয়েছি। দেখ, আমি স্বীকার করি যে, গ্রাম পত্তন ক'রে আমরা যে ময়লা জড় করেছি, সেটা আমাদেরই দোষী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগুলো দূরে দূরে থাকত, আর মাঠে মাঠে কাজ শেষ কর'ত। আমরা এক পা হেঁটে যেতে কাতর হই ব'লে এই বিপদ ঘটেছে। এখন আমার প্রথম হুকুম যে, সাত দিনের মধ্যে এই গ্রামগুলো ভেঙে

সাফ্ করে ফেল, আর আমাদের বাস আগে যেখানে ছিল সেইখানে খড় ও বাঁশগুলো নিয়ে ঘর বেঁধে ফেল। দেখি, কোন্ বেটা ময়লার সন্ধান পায়।'

সকলে প্যালারামের বুদ্ধির বাহাদুরী দিয়া বলিল, 'ঠিক কথা। ময়লার সন্ধান না পেলে টেক্স বসাবে কি ক'রে?'

প্যালারাম। বেশ! আমার উপর হুকুম যে, দুর্গাপূজোর জন্য কাদের উপর একটা যায়গা ঠিক কর। পূজো অর্চ্চা লুকিয়ে করাই ভাল, নয় ত বাহিরের লোকের হিংসা হয়। বড় বড় গাছ কেটে ফেল। আইনে ঠিক হয়ে গেছে যে, দরকার হ'লে আমরা জঙ্গলের বড় গাছ কাটতে পারি। তার জন্য গোলমাল হয়, তবে আমি দায়ী। গাঁছ কেটে বড় দুটো মণ্ডপ তৈরী কর। যদি কারিগর আসতে দেরী হয়, তবে একটা মণ্ডপে আমরা আপাততঃ মহিষাসুর, কার্ত্তিক, গণেশ, এঁজোকে গ'ড়ে ফেলিব। দুর্গার প্রতিমা পরে বস্‌বে। কাজ এগিয়ে থাকলে চমৎকার হবে।

সর্দ্দারের হুকুম অলঙ্ঘনীয়। অল্পক্ষণ প্রচার হওয়ায়, দলে দলে সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল। প্যালারাম উৎসাহ দিয়া বলিল, 'ভাঙ্গ, সকলে ভাঙ্গ! ইতিহাস ব'লে একটা বহি আছে, সেটাতে মাষ্টর এ সব কথা লিখ্‌বে, আর ছেলেরা পড়্‌বে। ভাঙ্গ!'

দুই দিবসের মধ্যে গ্রামগুলির কোনও চিহ্ন রহিল না। ঘুন ধ্বান্ত, তরিতরকারি, ঘটী বাটী, লাঙ্গল ও টাঙ্গী লইয়া, এবং মস্তকে বাঁশ ও খড় বহন করিয়া, সাঁওতালগণ তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ভিটাস্থান অনায়াসে আবিষ্কারপূর্ব্বক পুরাতন বাঁশ খড়ে নূতন ঘর বাঁধিয়া ফেলিল। প্যালারাম খুসী হইয়া বলিল 'সাবাস! তোরা এখানে আর কোনও ময়লার চিহ্ন পাচ্ছিস?'

সাঁওতাল। মোটেই না। কেবল ভাঙ্গা ইট পাটকেল পাওয়া যাচ্ছে।

প্যালারাম। সেটা বেশী দিন থাকবে না। এখন আমরা দূরে দূরে থাকব। ক্ষেতগুলো এখন বরং কাছে হবে। এতে আমাদের শরীরের বল বাড়্‌বে। এতে আমাদের ভালবাসা ও বেড়ে যাবে বই কমবে না। যখন আমরা ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকতেম, তখন রোষারুষি ক্রমে বাড়ছিল, চুরী চামারী হচ্ছিল, পুলিসগুলো এসে দৌরাত্ম্য করছিল, তহশীলদার এক যায়গায় বসে সকলকে ডেকে 'শালা' বলে' গালাগালি দিচ্ছিল। একটা ছেলে মরে গেলে চৌকিদার বই নিয়ে এসে তদ্বি হুদ্বি করত। এখন দেখি, সবলে বাঁচলে কোন

প্যালারামের অসাধারণ কূটবুদ্ধির প্রতিভা পূর্ব্বে অনেকবার প্রতিপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং কেহই বিশেষরূপ আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া কেবল সাধুবাদ দিতে লাগিল।

সকলে নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেলে, প্যালারাম তাহার প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া পড়িল। বকুল বৃক্ষ প্রায় দশ বৎসরের। অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাতে ফুল হইয়াছিল। বৃক্ষতলে প্যালারামের দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা চম্পী গত দিনের শুষ্ক ফুল কুড়াইয়া অঞ্চলে বাঁধিতেছিল।

হঠাৎ প্যালারামের চক্ষে জল আসিল। সে তাহা মুছিতে গিয়া দেখিল যে, লক্ষ্মী তাহা দেখিয়াছে। সুতরাং লুকাইতে গিয়া পুনরায় হাসিল। তাহা দেখিতে পাইয়া লক্ষ্মীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া পড়িল। প্যালারাম তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'আমি মা, আমি কাঁদিতে কিছু না। এই যে বকুল ফুল, এর গন্ধ কত দিন? তোর বিয়া হয়ে গেলে আমি এ গাছের নিচে চৌবাচ্চা বাঁধিয়ে দেব. তোরা মধ্যে মধ্যে বেড়াতে, এসে তোর বুড়ো বাপের কীর্ত্তি দেখ্‌বি। দুরে থাকাই ভাল।'

কুণ্ড মহাশয়ের বড় বড় গুড়ের কলসী মস্তকে বহন করিয়া সাঁওতালগণ পাহাড়ের উপর লইয়া গিয়াছে, এবং সেখানে খই ভাজিয়া ও মুড়কী প্রস্তুত করিয়া বাণিজ্যার্থ করিয়াছে।

গহন বনের মধ্যে দুর্গম ও অজ্ঞাতপথ। কিন্তু সাঁওতালদিগের অজ্ঞাত নহে। সন্ধ্যাবের মতে পথ ও বাসস্থান লোকের নিকট অজ্ঞাত থাকাই ভাল। কেবল সাধু পথিক ও বন্ধু নিকটে উপস্থিত থাকিবে না।

সে নিয়মের গ্রাসগুলি আজ নাই। কুণ্ড মহাশয়ের প্রেরিত কারিগর মাল-মসলা লইয়া বহু কষ্টে পর্ব্বতের উপর উঠিল। সঙ্গে কুণ্ড মহাশয়ের পুত্র হরিনাথ। হরিনাথ এবার এফ. এ. পাশ করিয়াছে। তাহার পাহাড় পর্ব্বত দেখিবার বড় সখ্। প্যালারাম তাহাকে সাদরে স্কন্ধে লইয়া বাঁশের মঞ্চের উপর বসাইয়া দিল। সেখানে বালিকার দল চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া হরিনাথকে দেখিতে লাগিল।

সাঁওতালগণ পূর্ব্বেই মহিষাসুর গড়িয়া রাখিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর কর্ম্মকার কৃষ্ণনগরের কারিগর। সে চমৎকৃত হইয়া বলিল, 'তোমরা যদি এত ভাল গড়াতে পার; তবে আমাকে ডাকা কেন?'

প্যালারাম। ঐ পর্য্যন্ত। মহিষাসুর আমরা দেখেছি, কিন্তু মা'কে দেখি নাই। সেই অভাবটুকু পূরণ করবার জন্য আপনাকে নিয়ে আসা।

বিশেশ্বর ভক্তিভরে প্রতিমা গড়িয়া তুলিল। সে রূপে সকলে মোহিত হইয়া বলিল, 'ভবিষ্যতে আমরা ঐ রকম প্রতিমা গড়িব।'

হরিনাথ। তার কোনও আশ্চর্য্য নাই। এদের মধ্যে মুখের গড়ন এত সুন্দর আছে যে, আমাদের দেশে সে রকম একটাও দেখা যায় না।

হরিনাথ লক্ষ্মীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মী পলাইয়া গেল। সেই রঙ্গ দেখিয়া সাঁওতাল রমণীগণ হাসিয়া খুন। হরিনাথ তাহাতে অতিশয় লজ্জিত!

প্রতিমার গঠন সম্পূর্ণ হইলে দুর্গা মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্যালারামের একটু ভয় হইল। সে বলিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়, দেখবেন যেন পূজোর কোনও বিষয়ে অঙ্গহীন না হয়ে পড়ে।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার পূজাপদ্ধতির পাঁতরা পুঁথি বাহির করিয়া খুঁটানুপুঙ্খরূপে সব সরঞ্জামগুলি মিলাইয়া লইলেন। অবশেষে বলিলেন, 'তোমরা শাক্ত মতে পূজা করিবে ত?'

প্যালারাম। সে কথা আমরা ভেবে দেখেছি। আমার ইচ্ছে যে, বৈষ্ণব মতেই হ'ক।

ভট্টাচার্য্য। কেন? তোমরা ত মাছ খাও না?

প্যালারাম। আমরা মাংস পেলে পুড়িয়ে খাই, ঝোল ক'রে খাই না, আর মাছ সেও ঠিক খাই, ভাজা নয়, সেদ্ধ খাই। কিন্তু তাতে আমাদের এত দুর্দ্দশা হয়েছে যে, বলা কঠিন। একবার হেসব আবগারির দারোগা এসে ভাদাচরো কলসী ঘরে দেখে তো সেই জাকতকিকে বেঁধেইনা মদ চুলাইবের অপরাধে চালান দেয়। সাফাইনা দিতে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি। সেই জন্য এবার প্রতিজ্ঞা করেছি যে, শাক্ত মতের দিকে যাব না। আপনি বৈষ্ণব মতেই পূজো করুন।

ভট্টাচার্য্য। তবে কুমড়োর ও আখের বলিদান দিতে হবে।

প্যালারাম। কুমড়ো নেই, তবে লাউ আছে, তাই দিয়ে কাজ সেরে দিন। আর আখের বদলে কচি বাঁশ হ'লে চলবে না?

ভট্টাচার্য্য পুঁথি দেখিয়া বলিলেন 'দরিদ্রের পক্ষে সবতাই চলে। তোমাদের পুঁথি যখন আছে, তখন কোনও অমঙ্গল হবে না।

প্রতিষ্ঠা সাঙ্গ হইয়া গেলে, প্যালারাম ষোল আনা গ্রামবাসীকে লইয়া প্রতিমার শোভা দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। প্যালারামের হৃদয়ে ভক্তি উথলিয়া উঠিল, এবং তাহারই আবেগে সে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, 'মা দুর্গা! আমাদের বিদ্যে বুদ্ধি কম, তবে ভক্তি আছে। শাস্তে বলে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গাছে থাকত, আমরা নীচে এসে মানুষ হয়েছি। কিন্তু তাদের মত ভক্তি আমরা এখনও পাইনি। যারা জ্ঞানের পথে গেছে, লেখাপড়া শিখেছে, সভ্য হয়েছে, তাদের অহঙ্কার বড়, কিন্তু সে অহঙ্কার আমরা চাইনে। সে পথে তারা তোমার কোনও হদিশ পাচ্ছে না, চুরী চামারী, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যে কথা ক'য়ে নিজের পায়ে নিজে টাঙ্গী মেরে অনুতাপ ক'চ্ছে। আমাদের পূজো নিও, তা হলেই জীবন সার্থক হবে।

'মা দুর্গা! আরও একটা কথা! আমরা এক সময় উলঙ্গ ছিলাম, মধ্যে মোটা কাপড় পরেছি, কিন্তু আজ আমরা আবার উলঙ্গ। তাই, গাছের পাতার লজ্জা নিবারণ ক'রে তোমার পূজো ক'রব। যাদের সেটুকুতে লজ্জা যায় না, তারা সহরের লোক হয়েও হতভাগা। তাদের জন্য আমরা কাপড় বুনেছি। উৎসর্গ হয়ে গেলে সেগুলো গ্রামে গ্রামে বিলোবার জন্য পাঠিয়ে দেব। আমাদের পরিশ্রম তাতে সার্থক হবে। আমাদের চর্খা আছে, তুলো আছে, জোলা আছে। আমাদের মধ্যে কলিকাতায় যারা গিয়েছিল তারাও ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে কাপড়গুলো বুনেছে, সেগুলো তোমাকে দেখাব!'

খুব উৎসাহিত হইয়া প্যালারাম সকলকে বলিল, 'তোরা এখন সেগুলো নিয়ে আয়।'

সর্দ্দারের হুকুম পাইয়া স্ত্রী পুরুষ সকলে বড় বড় মোট বহিয়া বেদীর সম্মুখে লইয়া আসিল। সহস্র সাঁওতাল মিলিয়া নানা বর্ণের পঞ্চ সহস্র বস্ত্র বুনিয়াছিল, সেই সকল শাড়ী ও ধুতির মূল্য এখনকার বাজারে প্রায় বিশ সহস্র টাকা! নিষ্টান্নের মূল্য প্রায় পাঁচ সহস্র! ইহা ছাড়া কত প্রকার ফল মূল, তাহার সংখ্যা নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বিশ্বেশ্বর ও হরিনাথ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। কত হরিণের সিং, ধূপ ও মধু! কত বাঘ-ছাল! বন্য সম্পত্তিরও একটা শোভা আছে, সার্থকতা আছে। প্রস্তর ও লাল কাঠের দুর্গের মধ্যে বাস করিয়া সাঁওতালগণ যে সুখে সুখী, সে সুখ কোন্ মহানগরীতে আছে?

বিশু কারিগর বলিল, 'এ সঙ্গীন ব্যাপার! এ জঙ্গলীগুলোর মধ্যে এত যোগাড় ছিল, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই।'

প্যালারাম সর্দ্দার বলিল, 'দাদা, পরিশ্রমে কি না হয়? আমরা গড়ে দু ঘণ্টাও পরিশ্রম করিনে। তাতেই দিন চলে যায়। কখনও ছাতাটা বা জুতোটা কেম্‌বার জন্য, কিংবা জমীদারের খাজনা দেবার জন্য টাকা ধার করলে পরিশ্রম একটু বাড়িয়ে দিতে হয়, তার ফলে সকলের কর্ম্মভোগ। যদি বুদ্ধি থাকত, তবে এই জঙ্গলে বসেই আমরা কলের কাজ সেরে নিতে পারতেম। কিন্তু শেখাবার লোক নেই। বাঘের ছাল, হরিণের ছাল, মহিষের ছাল, এ সব জিনিসের কি অভাব এখানে আছে? এই পাহাড়ে এত কাঠ ও এত রকম পদার্থ আছে যে, সেগুলো ভৈরী ক'রে একত্র করলে আমাদের কুঁড়ে ঘরগুলো কলকেতার বাবুদের বাগানবাড়ীর মত সুন্দর হয়ে পড়ে। এই পাহাড়ের উপর দূরে দূরে সারি সারি ঘর তৈরী করলে কোন্ দিক দিয়ে ময়লা দুর্গন্ধ বেরিয়ে যায়, তার ঠিক থাকে না। একটা বর্ষার ওয়াস্তা। সেই বর্ষার জল পাথরের বাঁধের মধ্যে জমা করলে বড় বড় পুষ্করিণী হয়ে পড়ে, তাতে কমল ফুল কোটাতে কতক্ষণ? সহরে গিয়ে সমাজ পেতে যে বেয়াকুফী, তা আমরা ক্রমে বুঝতে পেরেছি। বোধ হয়, দুর্গা মা তাই বোঝাবার জন্য বৎসর বৎসর ড্যাঙ্গায় নেমে আসেন। তোমরা সহরে কেবল মন ভোগাবার জন্য পরিশ্রম করছ। সেই জন্য তোমাদের বেখাপ্পা। সে পরিশ্রম সার্থক হয় না, কেবল শরীর নষ্ট, মনে কষ্ট, আর খুনোখুনি। আমরাও প্রায় অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ছিলেম, কিন্তু ক্রমে চোখ ফুটছে।'

ঢাক বাজিয়া উঠিল। দলে দলে সকলে ধূপ ঢালিয়া বন ছাইয়া ফেলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মন্ত্র আওড়াইয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেবল পাঁচ গ্রামের নয়, প্রায় একটা পরগণার লোক আসিয়া সাঁওতালদিগের সেই প্রথম পূজা দেখিয়া গেল। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথি ক্রমে একে একে সুখে কাটিয়া গেল। কেহ দিবা, কেহ রাত্রি জাগরণ করিল। সকলেই আনন্দ-উৎসবে মত্ত!

বর্দ্ধমান হইতে যাত্রার দল যথাসময়ে আসিয়াছিল। তাহারা পর্ব্বতের এক পার্শ্বে বৃক্ষপল্লবের রামিয়ানার তলে বসিয়া সীতার বনবাসের ও রাবণবধের যাত্রা জুড়িয়া দিল।

ন্যাপারায় চুপ করিয়া মন্ত্র শুনিতেছিল। প্যালারাম বলিল, 'ওরে ন্যাপা, এ মন্ত্রের কিছু বুঝিস্?'

ভাগ্য। বুঝি না কিন্তু লাগছে ভাল।

প্যালা। এ মন্ত্রের যে অর্থ, তা এখনকার লেখাপড়াওয়ালারা কিছুই ঠিক করতে পারে নাই। তারা অনেক চেষ্টা ক'রে অনেক অর্থ বের করেছে, কিন্তু এর নাড়ীর কথা বড় চাপা, এ জন্মে যে কেউ বুঝতে পারবে, তা বোধ হয় না। পরিশ্রম না করলে কি অর্থ বোঝা যায় রে ভাই? যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের মত ল্যাংটা হয়ে বনে বেড়াতে না পারবে, ততক্ষণ এর অর্থ বোঝে কার সাধ্য? আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে হনুমান বলে এক জন মহাবীর ছিল, আমরা তার নাম দিইছি সেই লোকটা এই মন্ত্রের খানিকটা বুঝত। সেই বলেই রামচন্দ্র সীতার উদ্ধার করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরগুলোও উদ্ধার হয়ে গেল। সেই সময় মা দুর্গা এ দেশে প্রথমে আসেন। তোকে আমি বুঝিয়ে দিই, শোন্। আমাদের যে শক্তিটুকু আছে, তার অপব্যয় করিস্ নে। খুন খারাপি করিস্ নে, হিংসা দ্বেষ করিস্ নে। আমরা যেমন সকলে মিলে জমীগুলো চাষ ক'রে পরস্পরকে পালন করি, সেই রকম সকলে মিলে পৃথিবীটাকে চাষ করলে, আর যার যতটুকু দরকার, সেই মাফিক্ ভাগ করে নিলে, কোনও গোলমাল থাকে না। মানুষের কদর পরিশ্রমে। আমি তোদের সর্দ্দার, ইচ্ছা করলে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকলে তোরা বাধ্য হয়ে আমার সেবা করবি, কিন্তু সেটা ধর্ম্ম নয়। তোদের জন্য আমি যত মেহন্নত করি, তোদের জন্য আমি যত ভাবি, তা যদি তোদের বলি তা হলে তোরা উঠবি। এক এক জন লোক এই রকম পরিশ্রম ক'রে এই মহাযজ্ঞিতে আপনাকে বলিদান দিয়ে যায়, আর যেটুকু যে না করে, তাদের পাঠার মত ঘাড়ি বাঁকে পড়তে হয়।

বক্তৃতা সাঙ্গ হইতে না হইতে লক্ষ্মী আসিয়া বলিল, 'বাবা, কাপড় বিলোবার সময় হয়েছে, অনেক লোক এসে উপস্থিত।'

৭

প্যালারাম সর্দ্দারের তুলার চাষ বিখ্যাত। তাহার জঙ্গলের কুসুম-রঙও বিখ্যাত। তাহার গ্রামের জোলাদের বস্ত্রবয়নীও প্রসিদ্ধ। সে অঞ্চলে তুলারের অভাব ছিল না। লক্ষ্মীর মা পাড় বুনিতে সিদ্ধহস্তা। সাত দিনের মধ্যে সে নিজেই এক মোড়া মোটা কাপড় বুনিয়া ফেলিত।

অন্যান্য বৎসর সে সকল বস্ত্র চালান হইত। এবার তাহা বিতরিত হইল। দূর দূর হইতে অনাথ আতুর আসিয়া বস্ত্রলাভ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। যাহারা

অনন্দে আত্মীয় নহে, তাহারাও এ বৎসর বলীয়ান হওয়াতে নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের হস্তে প্যালারাম কাপড়গুলি দিয়া বলিল, 'তোরা এবার ভাল ক'রে পরিশ্রম করিস্, আস্‌ছে বৎসর আমরা এর দ্বিগুণ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ক'রব। কলের জিনিস ও কলের মানুষ, এ দুটোই ভুয়ো। কলের গন্ধে মাথা ঘুরে। কলের তেলে পেটে বেদনা হয়। কলের কাপড় ছ' মাস টেঁকে না। কলে যারা লেখাপড়া শেখে, তাদের মাথা খুন্ খুন্ ক'রে ঘোরে, তারা পাগলের মত বকে। আইন কানুন, ওষুধ ও পাইখানা, সবই কলে হ'চ্ছে, কিন্তু মনে রেখ' যে, নিজে মেহনৎ করে' ঘাম না ঝরালে মানুষ ঠিক সেই কলের মত অপদার্থ হ'য়ে পড়ে। কলে কমী চাষ করলে সে জমী মাটী হয়ে যায়। মানুষের নিজের পরিশ্রমের মধ্যে তার প্রাণ থাকে, সেই প্রাণের মধ্যে ভগবান্ থাকেন। যদি কলে কাজ চল্‌ত, তবে পূজো অর্চ্চাও কলে হ'ত। কিন্তু তা হয় না। আপনি যদি পরিশ্রম করি, আর সেটুকু যদি সকলের মঙ্গলের দিকে চেয়ে করা যায়, সেইটুকুই পূজো। ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে তাই ব'লে দেবার জন্য মা দুর্গা আসেন।

'এই যে জানোয়ারগুলো, এরাও চর বেতায়, তারা কলের পশু। জোহার কল তাদের চেয়েও খারাপ। মানুষ যতদিন কল না এড়াতে পারবে, ততদিন কলেতে পেট ও মাথা চালিয়ে পশুর চেয়েও হিংস্রক হ'য়ে পড়বে। আমি সেটাকে সভ্যতা বলি না। আমরা তাদের বৎসর ধ'রে এ কলের সংস্রব এড়িয়েছি। তোমরা যেন কলের হাতে ধরা দিও না।'

সকলে বলিল—'না।'

হরিনাথ লক্ষ্মীর সঙ্গে বসিয়া মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছিল। বন্য সাঁওতাল কন্যার সঙ্গে সহরের শিক্ষিত যুবার দানে একাগ্রচিত্ততা লক্ষ্য করিয়া দলে দলে সাঁওতাল অধিবাসিগণ স্মিতমুখে প্রসন্নবাদ করিয়া চলিয়া গেল। জনৈক বালক, 'বাঙ্গালীদের মা দুর্গা খুব জাগ্রত ঠাকুর। যখন বনের রাজার সঙ্গে ভগবান রামচন্দ্র মিশেছিলেন, তখন কুণ্ড মশাইয়ের ছেলে সাঁওতালদের সঙ্গে মিশ্‌বে, তার আর আশ্চর্য্য কি?'

হরিনাথ ইহারই মধ্যে অনেক মনের কথা বলিয়াছিল। সে বি. এ. পাশ করিয়া এই বনেই দেহ ও মন উৎসর্গ করিবে, ইহাই তাহার সঙ্কল্প। সে তাহার মত আরও চারি পাঁচ জন শিক্ষিত যুবক লইয়া আসিবে। কি করিয়া এই অরণ্য ও অরণ্যচারিকে বৈজ্ঞানিক মত দাঁড় করান যায়, তাহার চিন্তা করিবে।

প্যালারাম সর্দারের কথাগুলি হরিনাথের মনে লাগিয়াছিল। যদি বরুনা না কবিয়া সাঁওতালদিগের শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা যায়, তবে এখনও তাহার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। নিম্নভূমি হইতে বাছা বাছা লোক এই ব্রত গ্রহণ করিয়া অরণ্যে চলিয়া আসুক। সেখানে অকর্ম্মণ্য না হইয়া ভবিষ্যৎ যুগের সূত্রপাত করুক, এবং আত্মরক্ষা করিতে শিখুক। পল্লীগ্রামের পূতিগন্ধময় কর্দ্দমের মধ্যে দল না পাকাইয়া, তাহারা একবার বাহির হইয়া পড়ুক। এ সংসার এমনই স্থান যে, সৎ সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়া পড়িলে কখনই সে অন্নাভাবে মরে না, বরং সে ভবিষ্যতের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে।

হরিনাথ ভাবিতেছিল। লক্ষ্মী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

হরিনাথ বলিল, 'আজ দশমী। কাল আমি বাড়ী ফিরে যাব।'

লক্ষ্মীর মুখ ভার হইয়া পড়িল।

'আপনি আর এখানে আস্‌বেন না?'

হরিনাথ। আস্‌ব বই কি।

লক্ষ্মী। তা হ'লে আমাকে 'চাকরাণী করে' রাখবেন, আমি মাইনে নেব না।

হরিনাথ হাসিল।—'চাকরী ছাড়া কি আর কোনও সম্বন্ধ নাই লক্ষ্মী? মানুষ কেহ কারও দাস নয়। যারা বেশী অলস ও অকর্ম্মণ্য, তারাই পেটের দায়ে সহায়হীন হয়ে চাকরী করে। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মের খাতিরে এক দল আর এক দলের চাকরী ক'রত। তোমার যান আমার চেয়ে বেশী। যখন আমাকে তোমার সমান দেখ্‌বে, তখন আমিই তোমার চাকরী করব, আর তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তখন আমারও চাকরী করিও। চাকরীর বদলে চাকরীই চলে। 'মাইনে' জিনিসটা অপমান ও কষ্টের বই আর কিছু নয়। যখন আমি ফিরে আস্‌ব, তখন আমার প্রাণ ও শরীর তোমাদেরই জন্য উৎসর্গ ক'রব।

লক্ষ্মী কথাগুলির অর্থ ভাবিতে ভাবিতে বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

বজ্রবাহন সিং শুনিয়াছিল যে, প্যালারাম সর্দার জমীদারের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া দুর্গোৎসব করিয়াছে। এই সুযোগে বাকী খাজনার উৎপীড়নটা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিয়া, নটক মহাশয়কে বলিল, 'শুনেছেন ত?'

নটকলাল। কি?

বজ্রবাহন। প্যালারাম সর্দারের দুর্গোৎসব। [illegible]

[illegible] পঞ্চাশ টাকা ধার করেছে। এখন ধানের অবস্থা বড় ভাল নয়।

কৃষ্ণলাল। এখন উপায়?

বজ্রবাহন। এই বেলা যা কিছু মাল সমান, ঘরী বাটী পাওয়া যায়, তা আগে ক'রে রাখুন সাবধানে মুটিয়ে রেখো।

কৃষ্ণলাল। আমি ত কিছুই বুঝে উঠি নাই। কেষ্ট ক'বব কেমন ক'রে?

বজ্রবাহন। চৌকিদারী টেক্স ত দিয়েছই, জলী পড়েছে; আপাততঃ আমই ভাল ক'রে ক'রে দেবে। কিন্তু একটু সাবধানে কাজটা সেরে ফেলা ভাল। পোটাকতক পাইক নিয়ে চলুন।

কৃষ্ণলাল ঘটক মহাশয়কে বলিলেন, 'এসুন।'

নবনীর বিল মহাশয়ে অন্য কোনো কথা না কহিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এক ক্রোশ যাইয়া ঘটক মহাশয় ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া পড়িলেন। তিনি চতুর্দিকে চাহিয়া, 'হুঁ, হুঁ, কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।'

বজ্রবাহন সর্দার বড় নিশ্চিন্ত। পাইকদিগের মধ্যে এক জন পাকটি সঙ্গে জোড়িতেছিল, সে বলিল, 'আমি ও কেলুখোলা এসেছি, এখানেই গ্রাম ছিল, বোধ হয় তারা ভেঙ্গে গেলে যুদ্ধে গিয়ে কাটা পড়েছে।' ঘটক মহাশয় ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া কথায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। 'তাই ত। এ ত বড় মুস্কিল দেখছি!'

এক জন চৌকিদার বলিল, 'পাইকের ঘোড়া ঐ চড়ুরিতে চুড়িয়ে পড়েছে। তবে পাতিবোনা বাজারের আস্তাবলে যে ঘোড়া আছে, সে ঘোড়া বড় ভাল।'

ঘটক মহাশয় বলিলেন, 'চল।'

পাহাড় বড় নিকটে নয়। তিনটি ক্রোশ পথ যাইতে বেলা ১০টা হইয়া গেল। পাহাড়ে উঠিলে সন্ধান হইতে পারিবে। কিন্তু কোনও সন্ধান না পাইয়া ঘটক মহাশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। পাইক ও চৌকিদার বলিল, 'হুজুর, ঘোড়া-গুলোও ঘেমে গিয়েছে।'

কৃষ্ণলাল। তাই ত! এখন উপায়? ওরা চলে, তা মনে করি নাই।

পাহাড়ের নিকটে একটি নদী হইতে পাড়িয়া বিনর্তিত দিয়া ফিরিতেছিল। ঘটক মহাশয় তাহা দিতে দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। জলে তাহারা নিকটে আসিল। দলের নায়ক—গুণিনাথ দুলে।

চন্দ্র-রশ্মি

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে; নানা প্রকার অভিনব যন্ত্রাদির উদ্ভাবনার ফলে পূর্ববর্ত্তী অনেক সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে অনেক নূতন তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উন্নত পাশ্চাত্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের মতে, চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই; চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যের কিরণে আলোকিত হয়; চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ কঠিন, সূর্য্যের কিরণ ঐ কঠিন ভাগে প্রতিহত হইয়া, পৃথিবীতে পতিত হয়, এইরূপে দিবাভাগের ন্যায় রাত্রিকালেও সূর্য্যকিরণের দ্বারাই পৃথিবী আলোকিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতেও এ তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল না। সূর্য্যের কিরণেই চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত হয়, চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই, এ কথা অতি পুরাতন সময় ভারতীয় মনীষিগণ জানিতেন। নিরুক্তকার মহামুনি যাস্ক লিখিয়াছেন;—

"অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে ইতি ব্রাহ্মণাদিতোঽস্য দীপ্তিরভবতি।

—নিরুক্ত, ২য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

এই সূর্য্যের একটী রশ্মি (রশ্মিসমূহের একাংশ) চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়, ... চন্দ্রের দীপ্তি সূর্য্য হইতেই হইয়া থাকে।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-বাজসনেয়ি সংহিতা-সংহিতায় ১৮ অধ্যায়ের ৪০ কণ্ডিকাতেও এই বিষয় সূচিত হইয়াছে। তথায় 'সূর্য্যরশ্মি' পদ 'চন্দ্রমা'র বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১) এই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত 'সূর্য্যরশ্মি' শব্দটী বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন। (২) উহার অর্থ, সূর্য্যের রশ্মিই যাহার রশ্মি। মহীধরের মতে, ঐ স্থলে 'সূর্য্যরশ্মি' শব্দ 'চন্দ্রমা'র বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, সূর্য্যের রশ্মি দ্বারাই চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত হয়, ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। (৩)

এই 'সূর্য্য-রশ্মি' শব্দটীর অন্য প্রকারে ব্যাখ্যাও হইতে পারে; উহার অর্থ, 'সূর্য্যের রশ্মির সদৃশ যাহার রশ্মি'—এরূপও করা যায়। শুক্লযজুর্ব্বেদ-মাধ্যন্দিন

---

(১) সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যাপোঽস্যো ভেকুরয়ো নাম।
দ ম ইমং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা॥

(২) সূর্য্যো রশ্মির্যস্য স সূর্য্যরশ্মিঃ।—সপ্তমীবিশেষণে ব ব্রীহৌ। ২ অং।

(৩) অতএব আপোঽস্যাপোঽরূপাঃ ইতি ভাষ্যে ... ভেকুরয়ো নক্ষত্রাণি ...।

(৪) তুলনা—নিরুক্ত, ২য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

সায়ণের ভাষ্যকার উব্বট ও মহীধর এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। (৪) এই অর্থে ব্যাকরণানুসারেও কোনও দোষ হয় না। (৫) কিন্তু বেদ-ব্যাখ্যায় নিরুক্ত-কার যাস্কের প্রামাণ্য সর্বাপেক্ষা অধিক, ইহা স্বীকার করা যায় না। উব্বট ও মহীধরের ব্যাখ্যায় আদর করিলে, 'চন্দ্রমাঃ রশ্মি সূর্য্য-রশ্মির সদৃশ' এইমাত্র সিদ্ধ হয়; যাস্কের অভিপ্রেত সূর্য্য-রশ্মির সহিত চন্দ্র-রশ্মির অভিন্নতা সিদ্ধ হয় না। এই কারণে, উব্বট মহীধরের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাস্কের মতানুসরণে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাই করা উচিত।

শতপথ ব্রাহ্মণে (৯।৪।১।৯) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'সূর্য্য-রশ্মি' শব্দটী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৬) উব্বট ও মহীধর শতপথের অনুসরণ করিয়াই এই 'সূর্য্য-রশ্মি' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শতপথের ব্যাখ্যানের সহিত উব্বট ও মহীধরের ব্যাখ্যান অভিন্ন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ অর্থ লইয়াছেন। তাহার কারণ আছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা মন্ত্রের অনুসরণ করিয়াই করা উচিত। যে স্থলে সেই নিয়মের সহায়-রূপে অন্য মন্ত্র পাওয়া যায় না, সেই স্থলেই ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিতে হয়। ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রের অনুসরণ করিয়া, যাস্ক শতপথের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। (৭)

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োদশ অনুবাকের অন্তর্গত একাদশ সূক্তের একটী মন্ত্রে এই চন্দ্র-বিষয়ক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই সূক্তটী গোতম ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সেই স্থলে বলিতেছেন;—

---

(৪) সূর্য্যস্যেব হি চন্দ্রমসো রশ্ময়ঃ।—উব্বট। সূর্য্যস্যেব সম্বন্ধিনো রশ্ময়ঃ কিরণাঃ যস্য।—মহীধর।

(৫) সদৃশানুপমানপূর্ব্বপদস্যোত্তরপদলোপশ্চ।—কাত্যায়নবার্ত্তিক, মহাভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ২য় পাদ, ২য় আহ্নিক, ২৪ সূত্র।

(৬) সূর্য্যরশ্মিরিতি সূর্য্যস্যৈব হি চন্দ্রমসো রশ্ময়ঃ।—শতপথ।

(৭) শতপথের সহিত উব্বট ও মহীধরের একবাক্যতা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। কোনও কোনও স্থলে উপমান এবং উপমেয় অভিন্ন হইলেও, উপমা হইয়া থাকে, এরূপ দেখা যায়;—

সানন্দ চাদ্যপ্রভৃতি ত্বমেবং সাপত্রপমম্।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব॥

—রামায়ণ, যুদ্ধ (৬ষ্ঠ) কাণ্ড, ১০৯ সর্গ। ৫২-৫৩

শতপথ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যানে,—"সূর্য্যস্যেব হি চন্দ্রমসো রশ্ময়ঃ" এই স্থলে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ না থাকিলেও উপমা করিতে হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে, ঋগ্বেদের মন্ত্রটীর সহিত একবাক্যতা হইতে পারে।

অত্রা হ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।
ইথা চন্দ্রমসো গৃহে॥

যাস্কের ব্যাখ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ ;—আদিত্য-রশ্মি-নিচয় সূর্য্য হইতে চন্দ্রমণ্ডলে অন্যের অলক্ষিতভাবে পতিত হয়, এই বিষয় ঐ আদিত্য-রশ্মি-নিচয়ই সম্যক্ অবগত আছে। (৮)

'আদিত্য-রশ্মি-নিচয়ই সম্যক্ অবগত আছে', এইরূপ বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। চন্দ্র-রশ্মির এই রহস্য সাধারণ-জন-সমাজে প্রচারিত হয় নাই ; সাধারণের দৃষ্টিতে চন্দ্র-রশ্মি চন্দ্রের নিজেরই অসাধারণ সম্পত্তি। এই জন্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন,—'আদিত্য-রশ্মিগণই সম্যক্ অবগত আছে' ; অর্থাৎ, অন্য কেহ এই রহস্য অবগত নহে।

চন্দ্রের নিজের কোনও কিরণ নাই, চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্য-রশ্মি-দ্বারাই আলোকিত হয়,—এইটুকুমাত্র বৈদিক গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায়। চন্দ্র-মণ্ডলের উপরিভাগ কঠিন অথবা কোমল, জলময় অথবা শুষ্ক, আমরা এ বিষয়ের কোনও প্রমাণই বৈদিক গ্রন্থে দেখি নাই। পরবর্ত্তী ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহির প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ চন্দ্রকিরণে শীতলতা অনুভব করিয়া কল্পনা করিয়াছেন, চন্দ্র জলময় ; সূর্য্যের যে রশ্মিধারা চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, উহা চন্দ্রমণ্ডলের জলরাশির সংস্পর্শে শীতল হইয়া পৃথিবীতে আইসে। (৯) বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ও নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য—ইঁহারা উভয়েই ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তি-যুক্ত মনে করিয়া উহারই অনুসরণ করিয়াছেন। (১০)

---

(৮) "অত্র হ গোঃ সমমংসতাদিত্যরশ্ময়ঃ ত্বষ্টুঃ নামাপীচ্যমপচিতমপগতমপিহিতমন্তর্হিতং বাঽমুত্র চন্দ্রমসো গৃহে॥"—নিরুক্ত, ৪র্থ অধ্যায়, ২৫ খণ্ড।

(৯) তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো দিনকর নিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদবিশি বালাকুন্তলভ্রামলশ্রী ঘট ইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপঘ্নঃ॥ ১
—ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি ; গোলাধ্যায়—ভূগোলাতিবাসনা।
সলিলময়ে শশিনি রবে র্দীধিতয়ো যুচ্ছি তশ্চমো নৈশম্।
ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদর নিহিতা ইব মন্দিরস্যান্তঃ॥ ২
—বরাহমিহির-কৃত-বৃহৎসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়। বরাহমিহিরকৃত-পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৩শ অধ্যায়।

(১০) উদকময়ে স্বচ্ছে চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলন্তি।—সায়নের ঋগ্বেদ-ভাষ্য, ১ম অষ্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৭ম বর্গ।

অম্বময় হি চন্দ্রমসো মণ্ডলম্।—দুর্গাচার্য্য-কৃত টীকা-নিরুক্ত ; ২য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

আমাদের দেশের মহাকবিগণ চন্দ্রকিরণের এই মহত্ত্ব স্বীকার করিতেন। সূর্য্যমণ্ডল হইতে কিরণ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত ও শোভিত হয়, ইহা কালিদাস রঘুবংশে (১১) এবং শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতে (১২) উল্লিখিত করিয়াছেন।

অতি পুরাতন যুগে ভারতে সত্যের আলোচনা অনেক দূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল। আধুনিক যুগে উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, বহু পূর্ব্বে স্মরণাতীত প্রাচীন কালে ভারতীয় ঋষিগণ তাহাই স্থির করিয়া গিয়াছেন; আমরা তাঁহাদের প্রতিভা ও সত্যালোচনার কথা যতই চিন্তা করি, ততই বিস্ময়ে অভিভূত হই।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

আমাদের শিক্ষা।*

সমবেত মহোদয়গণ,

আপনারা আমাকে অকস্মাৎ কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন, আমি আনন্দ সহকারে আসিয়াছি। আপনারা যেরূপ আদর ও যত্ন করিতেছেন, তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু তার সঙ্গে যেরূপ সম্মান করিয়াছেন, তাহাতে আমি লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা আমার পক্ষে অতি সম্মান, বিশেষ যখন মনে করি যে, আমার পূর্ব্বে দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আপনাদিগের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পাশে আমার স্থান উপযুক্ত নহে। আমি আমাকে মান্যবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার যশোহর-খুলনার মূল্যবান ইতিহাসখানি দান করিয়াছেন। তিনি যার মহাশয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তাহাই আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি।—

---

(১১) বিভুঃ প্রয়ত্নাৎ স মমত্রসম্ভবঃ শুচেঃ পরীতাবয়বৈরিবাংশুভিঃ।
পুপোষ বৃদ্ধিং পরিদর্শনোন্মুখৈঃ রঘুপ্রকারৈরিব বালচন্দ্রমাঃ॥
—তৃতীয় সর্গ; ২২ শ্লোক।

(১২) অথাসসৌ সারথিনা সনাথাং রাজাহবর্ত্মাধ্যাসু পুরং বিবেশ।
নির্গচ্ছতা বিদ্যুদিব জ্বলদ্ভ্যাৎ সৌধাকরং মণ্ডলমংশুমদ্ভ্যঃ॥—৬ষ্ঠ সর্গ, ৭৯ শ্লোক।

* বাগেরহাট শিক্ষক-সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি রায় আশুতোষ চৌধুরী কে, টি, এম, এ, মহোদয়ের অভিভাষণ।

"ডাক্তার [illegible] ও অধ্যাপক [illegible] সাহেব সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, তিনি [illegible] ও [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া [illegible] আরম্ভ করিলেন। তাহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই, [illegible] ও [illegible] ভারতের [illegible] আনয়ন করিতে [illegible] হইয়াছে, সেই চিকিৎসার [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] সভাপতি মহাশয় [illegible] বলেন, "D. Sc. Ph. D., C. I. E., F. C. S."

এইরূপ বেশের পরে আমাদের [illegible] হইল। আমার [illegible] সভাপতির আহ্বান পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। আমি [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] ভবে [illegible], আমি আসিলাম কেন? তাহার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম ও প্রধান কারণ, আমি আমাদের [illegible] নিতান্ত আপনার মনে করি। আমাদের [illegible] পারি। তাহাদের [illegible] পাই নাই, [illegible] আমাদের [illegible] মনে করি, সেই জন্যই [illegible] আমাদের ছেলেরা [illegible] পড়ে, কিন্তু তাহারা যে [illegible] তাহা, তাহারা কণ্ঠস্থ করুক, [illegible] পরের সেবা করিতে [illegible], তা [illegible] পারে না। তাহাদের এই সঙ্কীর্ণতার [illegible] হয়, তাহা আমাদের [illegible]। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] নাই। অনেকে তাহা দেখিতে [illegible]। পাশ্চাত্যের [illegible] চাকচিক্য ছাড়া [illegible] দেখি নাই। [illegible] [illegible] হয় তাহাকে [illegible] ভাবে, [illegible], কিন্তু আমার [illegible] হয়, তাহারা দেশকে [illegible] করিবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ঘরের চালের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার তাহার উপযোগী নহে। তবে আমাদের অনেকেই নিজের ভাষা আদর করিয়া শিক্ষা করেন নাই। নিজের মাকে মা বলিয়া ডাকিতে যে পারে না, সে মানুষই নহে। পিতাকে 'গভর্ণর' ও মাতাকে 'মাম্মা' বলা ঘৃণের। তবে কোনও কোনও পরিবারে ইহাই এক সময়ে চলিয়াছিল। তখন নাম ধামানে বিদেশী চেহারা দিবার জন্যও অনেকে সচেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজি কালি সে ভাবটা চলিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য দেবতাকে প্রণাম করা উচিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিখি না। আজ কাল বাঙ্গালাতে কিছু পরীক্ষা হইতেছে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বাটীতে বাঙ্গালা সম্বন্ধে প্রস্তরে খোদাই এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়—"মা সৎমার ঘরে স্থান পাইয়াছেন" (In the step-mother's Hall) সৎমার স্থান মার ঘরে না হওয়াই উচিত, তবে যদি সৎমা থাকেন, তাঁহার স্থান মার ঘরে হওয়ায় তত দোষের হয় না। তবে মার স্থান সৎমার ঘরে হইয়াছে মনে করিলে মাথা নীচু হইয়া যায়, সেই জন্যই আমাদের মধ্যে অনেকেরই এইটা মনে হইয়াছে যে, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বাঙ্গালা হওয়াই উচিত। যারা স্থান সম্বন্ধে প্রথম—তাহার স্থান তাহার নীচে, ইহা তোমার আমার ঘরে দেখে ঐ একই কথা। বিদ্যাতে French কি German ভাষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা করিবার কথা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। কখনও সম্ভব ছিল কি না। আমার ত মনে হয়, বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের না হওয়া কলঙ্কের কথা। আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিব, তাহাতে অপরের কি বলিবার থাকিতে পারে? (বন্দে মাতরম্ ধ্বনি।) তবে আমরা তাড়াতাড়ি খানিকটা ইংরাজী খিচুড়ি ফেলিয়াছিলাম। কবিয়া খাইবার জন্য চাকুরীর প্রলোভন হইয়া পড়িয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরাজীর স্থান প্রধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু চিরদিনই তাহা থাকিবে কেন? দেশের মান চাও, গৌরব চাও, স্বরাজ চাও, রাজস্ব শাসন চাও, আর নিজের ভাষাকে সৎমার ঘরে স্থান দিবে, ইহা অন্যায় কথা। এইখানে একটী কথা মনে হইল, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। জাপানের বিখ্যাত লেখক 'ওকাকুরা' (Okakura) এখানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, অনেক দিন এখানে ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের গুন কয়েকের কতকটা ঘনিষ্ট ভাব হইয়াছিল। তাঁহাকে আমরা ইংরাজী কায়দায় সম্মান করিবার জন্য Dinner দিই। তাহাতে বড় বড় সুপণ্ডিত ইংরাজী ভাষাতে বক্তৃতা

আমাদের কেহ কেহ করিয়াছিলেন, ওকাকুরা বড় এক জন লেখক। ইংরাজী ভাষার উপর তাহার দখল অসাধারণ ছিল। কিন্তু উত্তর দিবার সময় তিনি বলেন আমি ইংরাজীতে আপনাদের মত সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিব না। কিন্তু তাহার জন্য আমি লজ্জা অনুভব করি না, ইংরাজী আমার ভাষা নহে, আমার রাজার ভাষা নহে। ঈশ্বর করুন আপনাদিগের মত পরের ভাষা এত সুন্দর শিখিতে আমাদের কখনও যেন প্রয়োজন না হয়।" তবে কথা এই যে, আমরা কতদূর পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চালাইতে পারি। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে বলেন যে, I. A., I. Sc. পর্য্যন্ত সব বিষয় বাঙ্গালাতে চলে। তাঁহার সহযোগীদের সেই মত। আমারও তাহাই মনে হয়। ক্রমে বাঙ্গালাকেই শিক্ষার জন্য উপযোগী করা উচিত। কিরূপে তাহা হইতে পারে, আপনাদিগের আলোচনায় সেই জানিতে পারিব, আশা করি। ইংরাজী বিদ্যালয়ে French ও German text book পড়িতে ক্রমান্বয়েই বলে। আমাদেরও ইংরাজী Text book পড়িতে কোনও বাধা হইতে পারে না। Text book ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং ইংরাজ শিক্ষকের উপদেশ বুঝিতে পারা যায় তাহার জন্য যথেষ্ট ইংরাজী শিক্ষা উচিত। তাহা ইংরাজী Second Language করিলেও হইতে পারে।

ইংরাজ শিক্ষকের কথা বলিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় যে, প্রধানতঃ আমাদের শিক্ষা আমাদের দেশের লোকের নিকট হইতে হওয়া উচিত। যাহারা আমাদের আপনার, তাহারাই শিক্ষকের উপযুক্ত। ডাক্তার রায়কে দেখুন। তিনি ভিন্ন অন্য অনেক উপযুক্ত দেশের লোক আছেন। তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা উচিত। না পাইলে প্রস্তুত করা উচিত। বিদেশকে সব বিষয়ে আপনার করিয়া তুলিতে চাও, যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি? উত্তর দেওয়া কঠিন। উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। University Commission-এর প্রথম পরের এই যে উত্তর দিয়াছি, তাহাই আপনাদিগকে শুনাইতেছি। কলিকাতা ও অপর অঞ্চলের শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা ভাল জানেন, এবং শিক্ষা কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই আমার সহিত একমত বলিয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি।

Q. Do you consider that the existing system of University Education affords to young Indians of ability full opportunity of obtaining

the highest training? If not, in what main respects do you consider the existing system deficient from this point of view?

A. I do not. Training depends upon what one is being trained for, but the existing system is without an ideal, or a definite ultimate aim. The country wants education to enable the people to stand on their own legs in every respect, "to prepare them for complete living," to develop their work-power and character-power; to give them all round strength. A system originally meant for obtaining efficient clerks and now to a limited extent, for vocational works, is failing to meet the progressive needs of our people. Our University has failed to appreciate that it ought to help the process of nation-building. "It is not inspired by motives which answer to deeper things in human nature and the higher things in human aspiration." It is not based upon things which lie close to the hearts of our people. It has little regard for our permanent environments. It is a makeshift and without a corporate life. It has not been allowed sufficient freedom of growth.

Its utility is doubted and it is viewed with suspicion, as tending to disloyalty. Educational institutions are now subjected to undue political surveillance. There is want of a sufficient number of proper teachers. In Govt. Colleges the foreign element is placed on an undeserved and undesirable basis of superiority. The Indian teacher occupies an inferior position. It is believed that benefaction which favour the employment of Indian teachers even of undoubted merit and ability are not adequately supplemented by Govt. grants. They are not sympathetically treated and the work suffers in consequence. Most of the teachers are too poorly paid. It does not seem to have been realised that the teacher ought to be freed from pecuniary anxiety so as to be able to consecrate his life to his work.

আমাদের শিক্ষা উচ্চ-আদর্শ-বিহীন। "মানুষ" করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। আত্ম-নির্ভর,—নিজের ভার সম্পূর্ণরূপে নিজে বহন করিতে হইবে—এই মহা শিক্ষার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। কার্য্যবল, চরিত্রবল, সর্ব্বাঙ্গীন বল যাহাতে পাওয়া যায়, তাহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেরাণি কিংবা আইন-ব্যবসায়ী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। দেশ দিন দিন অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, অনেক নূতন জিনিস প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে, সে প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা চলিতেছে না। আমাদের জাতিকে জাতীয় ভাবে শিক্ষা দেওয়া, আমাদিগকে nation করিয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মানব-প্রকৃতির যে গভীর ভাবগুলি আছে, তাহার বিকাশ করা, মানব-হৃদয়ের যে সর্ব্বোচ্চ আশা, তাহা পরিপূর্ণ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহা নিতান্ত

আমাদের মর্ম্মের ভিতর, তাহারই প্রকাশ প্রয়োজন। দেশের অবস্থা, চারি দিকে আমাদিগকে যাহা বেষ্টিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষার প্রণালী নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। যাহা চিরদিন আমাদিগের থাকিবে, যাহা ছাড়িয়া আমরা যাইতে পারিব না, যাহা আমরা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তাহা বিবেচনা করিয়া শিক্ষা-প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত। এই কথা আমার মনে হয়। ছাড়া-ছাড়া না হইয়া, আমাদের আশা ভরসা, যাহা কিছু সম্বল আমাদের আছে, তাহা একীভূত হওয়া উচিত। তাহারই জন্য শিক্ষা করিতেছি—জীবনের শেষ লক্ষ্য কি তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছি—ইহাই মনে রাখা উচিত।

Emersonএর কথায় "Education should be as broad as man"—মানব-জীবন যতটা প্রশস্ত, শিক্ষাও ততটা প্রসার হওয়া উচিত। মানব-জীবনের একটা চরম উদ্দেশ্য আছে, যাহাকে ধর্ম্ম বলা যায়। সে ধর্ম্মের ভাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায়? হিন্দুর হৃদয় ধর্ম্মভাবপূর্ণ, আমাদের শিক্ষায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কি? তাহার কোনও বিকাশ হইয়াছে কি? তাহা প্রকাশ হইতে পারে কি? না, তাহা একেবারে প্রচ্ছন্ন ও লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, দেশের ধর্ম্মভাব মরিয়া যায় নাই, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় আছে। জাগাইয়া দিতে সময় লাগে না। তবে খুব পাকা লোক কর্ত্তব্য নহে। কবি বলেন, "নিমন্ত্রণবাসিসে অলস বেখো—যজ্ঞাগ বেখো ঘুমায়ো না"। এ দেশে শিক্ষা দীক্ষা কথা দুইটী সংলগ্ন। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আমাদের শাস্ত্রীয় স্বারাজ্য-সিদ্ধি—এখানে Home Ruleএর কথা বলিতেছি না, এক জন বন্ধু যাহাকে Spiritual Autonomy বলিয়াছেন, তাহারই কথা বলিতেছি। নিজকে আমাদের মধ্যে আনার শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা। এ বিষয় এখন আর বিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজন মনে করি না। তবে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও দৈন্য সম্বন্ধে দিন দিন ছাত্রেরা জীবনের ভার চালাইতে অসমর্থ হইতেছে। আমাদিগের আত্মীয়-স্বজন থাকিতে পারে—Home-Rule ভাবে আস্থা অধিকৃত হইতে পারে, কিন্তু নিজের ছেলের খাওয়া পরা কিসে চলে, তাহার উপায় করিতে পারি না। যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ-লক্ষ্য-বিহীন, সেইরূপ জীবিকা-নির্ব্বাহ কিরূপে হইতে পারে, সে লক্ষ্যও বিশেষ কিছুই নাই। অধিকাংশই আইন-ব্যবসায়ী হইতেছে। ব্যবসায়ী আইনজ্ঞ প্রস্তুত করা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। যখন Senateএ ছিলাম—সরকার হইতে অনুযোগ এখন তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন—তখন University Law Collegeএর পক্ষে।

নাই, বলিয়াছিলাম। স্যার গুরুদাস, ডাক্তার রাসবিহারী প্রভৃতি ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কথা খাটিল না। এখন যে Law Collegeএ শুনিতে পাই ২৫০০ ছেলে। সেখায় মহকুমার দেখিতে পাই, শত শত উকীল। তাঁহারা সবাই করিয়া খাইতে পান না, তাহা সকলেই জানেন। তবুও দিন দিন দল বাড়িতেছে, আর গ্রামে গ্রামে দৈন্য বাড়িতেছে। মধ্যবিত্ত লোকের ঘর দুঃখসমাচ্ছন্ন। দেশ নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে—আর আমাদিগের শিক্ষা—বড়, মধ্যবিত্ত, ছোট, সকলকে চরিয়াছে। অন্য কোনও স্থানে এরূপ নাই। Cambridgeএ [illegible]—৩০০০ মাত্র ছাত্র সেখানে—তার মধ্যে ২০০০ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। ২য় Termএর পরেই Cricket, Boating, Footballএ মজা করিয়া Degree না লইয়াই চলিয়া যাইত। বিলাতে Oxford, Cambridgeএ অর্থশালী লোকের সন্তানেরাই প্রধানতঃ আসিয়া থাকে। বাৎসরিক আয় ১০০০ পাউণ্ড, তাহার দুই পুত্র থাকিলে, এক পুত্রকে করিয়া University তে পাঠায়, অন্যটকে School হইতে কার্য্য করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু আমরা সবাই এক রকম প্রণালীতে চলি। ইংরাজেরা [illegible] অতি অল্প বয়স হইতেই ছেলে কি করিবে, তাহা ঠিক করে, আমরা তাহা কখন ঠিক করি না। কপালের উপর নির্ভর করি। তাহার কপালে আসুক বা না হউক পারে। কাজের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। [illegible] যাইতেছি। অতএব আপনাদিগের নিকট এই আবেদন যে শিক্ষার [illegible] করুন, যাহাতে সকলের আহারের উপায় হয়। প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্যবিত্ত শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একই শিক্ষার প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র। [illegible] এক একটী সার্ব্বাঙ্গীন, সম্পূর্ণ হওয়া উচিত—Complete in itself হওয়া উচিত। কোন্ সময় পর্য্যন্ত কিরূপ শিক্ষা চলিবে, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। আপনারা এই বিষয় আলোচনা করিবেন, আমরা আশা।

আইনজ্ঞ বাড়িয়া চলিতেছে, কিন্তু Malaria-পীড়াক্রান্ত দেশে ডাক্তারের অভাব। দুইটীমাত্র কলেজ আছে। আজ কাল দুই একটী ছোট School হইয়াছে, কিন্তু আরও অধিক Medical College, School হওয়া উচিত। এই Agricultural দেশে Agricultural School, College, বলিবার মত কিছুই নাই। Engineering অতি কম আছে এবং Technological শিক্ষার থাকিবার কোনও আয়োজন নাই। এ সব লজ্জার কথা।

আপনারা আমার কাছে একটী লিখিত অভিভাষণ আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সময় ও স্বাস্থ্যের অভাবে লিখিতে পারি নাই। অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা বলিবার অবসর আপনাদিগের আলোচনার সময় পাইব, আশা করি। সেই জন্য এইখানেই শেষ করিলাম। শেষ করিবার পূর্ব্বে, আপনারা যে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। *

সপ্ত-সিন্ধু।

ঋগ্বেদে নদীদিগের সাধারণ নাম ছিল—নদী ও সিন্ধু; কোনও কোনও স্থানে ধুনি ও সীরা শব্দ দ্বারাও নদী বুঝাইত। বেদের বহু স্থানে সপ্ত সিন্ধুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) কোনও কোনও ঋষি ইহাদিগকে সপ্ত-যহ্বী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (২) ঋষিগণ মনে করিতেন, পৃথিবীতে যেরূপ দিব্যলোকেও সেইরূপ সপ্ত-সিন্ধু আছে। (৩) আকাশের ছায়াপথকেই

---

* বাগেরহাটের "আগরণ" ব্রহ্মচারী ধীরেন্দ্র মহাশয়ের এই বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।—আমরা "আগরণ" হইতে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।—সাহিত্য-সম্পাদক।

(১) অস্য। শ্রবঃ। নদ্যঃ। সপ্ত। বিভ্রতি।—১।৩৫।৪

ইঁহার কীর্ত্তি সাত নদী ধারণ করে।

যঃ। হত্বা। অহিং। অরিণাৎ। সপ্ত। সিন্ধূন্।—২।১১।৪

যিনি অহিকে বধ করিয়া সপ্ত সিন্ধুকে প্রবাহিত করাইলেন।

অস্মে। আপঃ। মাতরঃ। সপ্ত। তস্থুঃ।

নৃভ্যঃ। তরাং। সিন্ধবঃ। সুপারাঃ।—৮।৫৪।১

সাত মন দেবমাতা ইঁহার নিমিত্ত ছিলেন। সুখে পারকারিণী সিন্ধু সকল নেতাদিগের উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত।

(২) অবধয়ন্। সুভগং। সপ্ত। যহ্বীঃ।

যেতং। অজানং। অরুষং। মহিত্বা।—৩।১।৪

সাত যহ্বী (অর্থাৎ মহতী নদী) শুভ্রবর্ণ, অরুষ, সুভগ, উৎপাদিত (অগ্নিকে) মহত্ত্ব দ্বারা বর্দ্ধিত করেন।

(৩) যত্র। রাজা। বৈবস্বতঃ। যত্র। অবরোধনম্। দিবঃ।

যত্র। অমূঃ। যমস্তীঃ। আপঃ। তত্র। মাম্। অমৃতং। কৃধি।—৯।১১২।৮

একাকারে দিন-সিন্ধু মনে করা হইত। পৃথিবীতে যেমন সপ্ত-সিন্ধুর মধ্যে একটীকে সিন্ধু বলা হইত, সেইরূপ আকাশের সিন্ধুদিগের মধ্যেও একটী সিন্ধু নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১) সেইরূপ অন্য একটীকে বিপাশ ও অন্যকে অংশুমতী নাম দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায়। (২) অন্যগুলির নাম পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর সপ্ত-সিন্ধু দুই ভাগে বিভক্ত; উহাদের বর্ত্তমান সিন্ধুনদীর দুই দিকে শৈলবদ্ধ শাখানদী-রূপে প্রবাহিত। এই দ্বি-সপ্ত নদী ও আকাশের সপ্ত-সিন্ধু লইয়া তিন সপ্ত-সিন্ধুর উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। (৩) ১০ম মণ্ডলের

যে লোকে বৈবস্বত (যম) রাজা, যেখানে দিব্যলোকের প্রবেশদ্বার, যেখানে ঐ সকল মহৎ জল সকল, তথায় আমার অমর কর।

বৈশ্বানরস্য। বিমিতানি। রোচনা।
নাকস্য। পৃষ্ঠঃ। অমৃতস্য। নাভিনা।
তস্য। ইৎ। উ। বিশ্বা। ভুবনা। অধি।
অগ্নিনা। রয়িঃ ইব। শ্রবঃ অশ্বিতম্। সমুদ্রঃ—৬।৭।৩

আমর বৈশ্বানরের (অর্থাৎ অগ্নিত অগ্নির) তেজোরূপ প্রভাব দ্বারা দিব্যলোকের উন্নত প্রদেশ সকল নির্ম্মিত; সকল ভূতগ্রামের মস্তকের উপর যাহার সপ্তদশ উজ্জ্বল নদী উঠিয়াছে।

(১) অগৃভ্ণা। সিন্ধুং। দিবি। অশ্বত্থাম্। ঋ—১।১৪৭।২৫।

অগস্ত্য দেব দ্বারা সিন্ধুকে দিব্যলোকে লম্বিত করা হইয়াছে।

(২) ঊতয়ে। আসাং। অনু। সূরে। উদিতৌ। বিপাশি। আ।
অয়ার। সীং। পরাবতঃ। সুতঃ। ঋ—৮।৬।১৮

এই তাহাদের (অর্থাৎ উষার) পরে, বিপাশা-তীরে সুপ্ত হইয়া শায়িত রহিয়াছে; (তিনি) দূর দেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

প্রপাসু। অপ্যাং। সিন্ধুষু। চরথম্।
উপরেষু। সদ্মসু। বংকয়ন্তা। ঋ—৮।৬।১৪

পারস্যবর্ত্তী নদীর নিকটবিস্তৃত দেশে তোমাদের বিচরণ করিতে দেখিয়াছি।

—অংশুর্ন। সোম। সঃ। তে। মদেষু। কৃধি। অস্মাভ্যঃ। ঋ—১০।৯৭।১২

(৩) ত্রি। সপ্ত। সপ্ত। বঃ। আপঃ। মধু। বিদ্যুতঃ। উদ্ধাম্।
কারুঃ। বোচাতি। সদনে। পৃথিব্যাঃ।
ত্রি। সপ্ত। সপ্ত। ত্রেধা। হি। চক্রুঃ।
ত্রি। রোচনাসঃ। অতি। সূর্য্যম্। যন্তি। ঋ—১০।৭৫।১

হে দেবীগণ! তোমাদিগের মধুর, উজ্জ্বল মহিমা বিবরণের (অর্থাৎ প্রমাণের) বস্তুভূত হইল (অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী) বলিতে হইবে (তোমরা) সাত সাত হইয়া তিন ভাবে

৭৫ সূক্তের মধ্যে ত্রি-সপ্ত নদীর কথা বলা হইয়াছে; ইহার অর্থ ঋগ্বেদে কেবল দুই-সপ্ত-নদী ও ইরাণে একবার, তৃতীয় সপ্ত-সিন্ধু ও দিব্যলোকের, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ১ম ঋকে 'সিন্ধু'কে অন্যান্য নদীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ২য় ঋকে, বরুণ 'সিন্ধুর পথ সকল কাটিয়াছেন, এবং 'সিন্ধুই' অপর নদীদিগের অগ্রে গমন করিতেছে, এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। (১) ৩য় ঋকে, 'সিন্ধু'নদীর বেষ্টনগুলি সদৃশ শব্দ ও প্রেচণ্ড বেগের উল্লেখ আছে। (২) এই সকল বিশেষত্ব দ্বারা যাস্কের ইহাকে বর্ত্তমান সিন্ধুনদী ভিন্ন অপর কোনও নদী বলিয়া মনে করিতে পারি না। পরবর্ত্তী ঋক সকল হইতে আমরা জানিতেছি যে, 'সিন্ধু'নদীর দুই দিকে দুই শ্রেণীর নদী আসিয়া উহাতে পতিত হইয়াছে। (৩) এক দিকে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী,

---

প্রবাহিত হইয়াছে; শ্বেতবিন্দুদিগের মধ্যে সিন্ধু বলবতী। (অপর নদীদিগকে) অতিক্রম করিয়াছে।

(১) প্র। তে। অরদৎ। বরুণঃ। যাতবে। পথঃ।
সিন্ধো। যৎ। বাজান্। অভি। অর্ষসি। ত্মনা।
ভূম্যাঃ। অধি। প্রবতা। যাসি। সানবি।
বৎ। এষাং। অগ্রম্। জগতাম্। ইরজ্যসি। —১০।৭৫।২

হে সিন্ধো! বরুণ তোমার যাইবার নিমিত্ত পথ সকল কাটিয়া দিয়াছেন। অতএব তুমি বেগের (বা অন্নের) অভিমুখে দ্রুত আসিতেছ। (তুমি) ভূমির উপর উন্নত (পথ) দিয়া গমন করিতেছ। যেহেতু এই সকল গমনশীলদিগের অগ্রে গমন করিতেছ।

(২) দিবি। স্বনঃ। যততে। ভূম্যা। অধি।
অনন্তম্। শুষ্মম্। উদ্। ইয়র্ত্তি। ভানবে।
রজাংসি। অপ। স্বনয়ন্। সিন্ধবঃ। অর্ণবং।
বৃষা। এতি। বৃষভঃ। নৃ। চক্রবৎ। —১০।৭৫।৩

দ্যুলোক হইতে (সিন্ধুর) শব্দ বিস্তৃতভাবে উপরে শুনা যাইতেছে; দীপ্তির সহিত অনন্ত বল উদ্গত হইতেছে; সিন্ধু যখন বৃষভের মত গর্জ্জন করিয়া গমন করেন, মেঘ হইতে যেন বৃষ্টি পড়ে। (তখন) রথধ্বনি করিতেছেন।

(৩) অভি। ত্বা। সিন্ধো। শিশবঃ। ইব। মাতরঃ।
বাশ্রাঃ। অর্ষন্তি। পয়সা। ইব। ধেনবঃ।
রাজা। ইব। যুধ্বা। নয়সি। ত্মনা। ত্বম্। ইৎ। সিচৌ।
বৎ। আসাম্। অগ্রম্। প্রবতাম্। ইনক্ষসি। —১০।৭৫।৪

হে সিন্ধো! শব্দকারিণী (নদী) মাতৃগণ শিশুগণ তোমার অভিমুখে গমনশীলা গাভীর মত, আগমন করিতেছে। রাজা যেরূপ যুদ্ধে (দুই সৈন্যদলকে) মেলান ও দেন এই দুইটী (নদী শ্রেণীকে) মিলিত হইতেছ, যেহেতু এই সকল প্রবাহশীলদিগের অগ্রে গমন করিতেছ।

শুতুদ্রী, পরুষ্ণী, অসিক্নী-যুক্তা মরুৎবৃধা, বিতস্তা ও সুসোমা-যুক্তা আর্জীকীয়া। (১) অপর দিকে তৃষ্টামা, সুসর্ত্বা, রসা, শ্বেতী, কুভা, গোমতী, ক্রুমু ও মেহৎন্বু। (২) পাছে আমরা অপর নদীদিগের মধ্যে 'সিন্ধু'কে হারাইয়া ফেলি, সেই জন্য ঋষি ৭ম ঋকে পুনরায় ইহাকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। এই বিশেষণসমূহের মধ্যে 'অপসাং অপঃতমা' বিশেষণটী আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

উপরি-উক্ত সূক্তেই কেবল গঙ্গা-নদীর নাম ঋগ্বেদে বর্ত্তমান। * ইহাকে সিন্ধু নদীর শাখারূপে উল্লেখ করার দেখা যাইতেছে, গঙ্গার বিষয় ঋষি অতি অল্পই জানিতেন। তিনি এই নদীর নামটী জানিয়াছেন, এইমাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু যমুনা নদীর নাম ঋগ্বেদের ৫ম ও ৭ম মণ্ডলেও প্রাপ্ত হওয়া

---

(১) ইমম্। মে। গঙ্গে। যমুনে। সরস্বতি
শুতুদ্রী। স্তোমম্। সচত। পরুষ্ণি। আ।
অসিক্ন্যা। মরুৎবৃধে। বিতস্তয়া
আর্জীকীয়ে। শৃণুহি। আ। সুসোময়া॥—ঐ।৫

হে গঙ্গে, যমুনে, সরস্বতি, শুতুদ্রি, পরুষ্ণি, অসিক্নীযুক্তা মরুৎবৃধে, বিতস্তা ও সুসোমাযুক্তা আর্জীকীয়া। আমার এই স্তব গ্রহণ কর; শ্রবণ কর।

(২) তৃষ্টাময়া। প্রথমম্। যাতবে। সজুঃ
সুসর্ত্বা। রসয়া। শ্বেত্যা। ত্যা।
ত্বং। সিন্ধো। কুভয়া। গোমতীম্
ক্রুমুম্। মেহৎন্বা। সরথম্। বাজিনীবতি। ঐয়সে॥—ঐ।৬

হে সিন্ধো! তুমি প্রথম যাইতে চাহিতে তৃষ্টামার সহিত মিলিত হইলে; তৎপরে সুসর্ত্তু, রসা ও শ্বেতীর সহিত যুক্তা (হইলে); তুমি কুভার সহিত গোমতীকে, মেহৎন্বুর সহিত কুভাকে (মিলিত করিয়াছ), এবং ইহাদের সহিত একই রথে গমন করিতেছ।

ঋজীতি। এনী। রুশতী। মহিত্বা
পরি। জ্রয়াংসি। ভরতে। ব্রজাংসি।
অদক্ষা। সিন্ধুঃ। অপসাং। অপঃতমা
অশ্বা। ন। চিত্রা। বপুষী ইব। দর্শতা॥—ঐ।৭

ঋজুগামিনী, শ্বেতবর্ণা, দীপ্যমানা, সিন্ধু মহত্ত্ব দ্বারা বেগবান্ জল সকল পূর্ণ করিতেছেন (বা আনিতেছেন)। অপরাজিতা সিন্ধু কর্ম্মকারিণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, অশ্বের মত বিচিত্র-গতিবিশিষ্টা, দেখিতে বিপুলকায়া বামাসদৃশী।

* অন্য এক ঋকে গাঙ্গ্য শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যায়। (১) যমুনা তীরে সুদাসের সহিত ভেদের যুদ্ধ বশিষ্ঠ ঋষি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (২) অতএব ঋগ্বেদের কালে আর্য্যগণ যমুনার তীরে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, দেখা যায়। কিন্তু ইহাকে সিন্ধুর এক শাখা বলিয়া গ্রহণ করায়, তাঁহারা যে যমুনা নদীর তীরে অধিক দূর গমন করেন নাই, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

শুতুদ্রী নদীর নাম শুধু এই সূক্তে নহে, ৩য় মণ্ডলের একটী সূক্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সূক্ত বিশ্বামিত্র ঋষির রচিত। তিনি দূরবর্ত্তী মাতৃতমা সিন্ধুর অভিমুখে গিয়াছিলেন; তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুতুদ্রী ও বিপাশের তীরে আসিয়াছেন। (৩) তাঁহার সঙ্গে শকট, রথ ও অশ্বাদি বর্ত্তমান। আসিয়া দেখেন, নদীর জল বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। (৪) কিরূপে পার হইবেন, এই সমস্যা। তখন তিনি নদীদ্বয়ের আরাধনা করিলেন।

---

(১) যমুনায়াং। অধি প্রতরং। উষু। যুধ্যতঃ। গব্যন্তা। সুজে।
নি। রাযঃ। অশ্বান্। যুজে॥—৩।৫৩।১১

যমুনাকূলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গোসম্বন্ধীয় ধন পাইবার আশা হইয়াছে, তাই অশ্বসম্বন্ধীয় ধন লাভ করি।

(২) আবৎ। ইন্দ্রং। যমুনা। তৃৎসবঃ। চ
প্র। অত্র। ভেদং। সর্বতাতা। সুমায়বঃ॥—৭।১৮।১৯

যমুনা ও তৃৎসুগণ ইন্দ্রকে তুষ্ট করিয়াছিল। এই স্থানে যুদ্ধে ভেদকে (ইন্দ্র) দূর করিয়াছিলেন।

(৩) অচ্ছ। সিন্ধুং। মাতৃতমাং। যযাসম্
বিপাশং। উর্বীম্। সুভগাং। অগন্ম।
বৎসং ইব। মাতরা। সংরিহাণে
সমানং। যোনিং। অনু। সঞ্চরন্তী॥—৩।৩৩।৩

(আমি) মাতৃতমা সিন্ধুর অভিমুখে গিয়াছিলাম। সুভগা, মহতী বিপাশা নদীতে (আসিয়া) আসিয়াছি। বৎস লেহন করিতে ইচ্ছুক (গাভী) মাতৃদ্বয়ের মত, একই গৃহ অভিমুখে গমনকারিণী হয় (অর্থাৎ বিপাশা ও শুতুদ্রী)।

(৪) প্র। পর্বতানাম্। উশতী। উপস্থাৎ
অশ্বে ইব। বিষিতে। হাসমানে।
গাবা ইব। শুভে। মাতরা। রিহাণে
বিপাট্। শুতুদ্রী। পয়সা। জবেতে॥—৩।৩৩।১

বন্ধনরজ্জু, ঘর্ষণকারিণী, কামাতুরা অশ্বীদ্বয়ের মত, (বৎস) লেহন করিতে (ধাবমানা) দুইটী শুভ্র গাভী মাতার মত, পয়োযুক্তা বিপাশা ও শুতুদ্রী (নদীদ্বয়) পর্বতদিগের ক্রোড় হইতে (বহির্গত হইয়া) বেগে গমন করিতেছে।

নদীদ্বয় বিশ্বামিত্রকে এই সত্য করাইলেন যে, তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ যজ্ঞ সকলে তাঁহাদিগের নামে স্তোত্র রচনা করিবেন। (১) তিনি যে দূর হইতে শকট, রথাদি লইয়া আসিতেছেন, এবং উহাদের পার করিবার জন্য নদীকে নিম্ন হইতে বলিতেছেন, তাহা ৯ম ও ১০ম স্তক্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। (২) এই আরাধনার ফলে নদীদিগের জল কমিয়া গিয়াছিল, এবং বিশ্বামিত্র ভরতদিগের সহিত পার হইয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের বিপাশা পার হওয়া বৈদিক ইতিহাসের একটী প্রধান ঘটনা। কারণ, তিনি নদী পার হইয়া, হয় সুদাস রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ-রূপে, কিংবা সুদাস রাজার পুরোহিত-রূপে যমুনাতীরে অবস্থিত ভোজকে সংহার করিতে গমন করিয়াছিলেন। (৩) পূর্বে ভেদ সম্বন্ধে যাহা উদ্ধার করা গিয়াছে।

---

(১) এতৎ বচঃ। অরিচঃ। মা। আপ। মৃষ্টাঃ।
আ। যৎ। তে। সোমাৎ। উপো। যুগানি।
উরুষ্যেম্। কারো। প্রতি। নঃ। সুকর্ম।
মা। নঃ। নি। কঃ। পুরুষত্রা। নমঃ। তোকায়। তনয়ায়। শং। ৩।৩৩।৮

হে স্তোত্রকারি! এই বাক্য যেন বিস্মৃত না হও। ভবিষ্যতে তোমার যে সকল স্তোত্র ঘোষিত হইবে, হে কারো! (সেই) উত্তম সকলে আমাদিগকে তুষ্ট করিও। আমাদিগকে পুরুষ সমূহ (বর্ণনা) করিও না। তোমাতে নমস্কার।

(২) ও। সু। রমায়ঃ। রাঘবে। শৃণোত।
যগো। বঃ। দূরাৎ। অবসা। বসিষ্ঠঃ।
নি। সু। নমাম্। ওদকে। ন। সাধুঃ।
অধঃ। অক্ষাঃ। নি। ষদন্। ত্রোতারঃ।—৩।৩৩।১

হে সুন্দর অগ্নিনীগণ! রাঘবের স্তবন শ্রবণ কর। যজ্ঞ (ও) রক্ষা সহিত দূর হইতে (আসিয়া) তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুন্দরমতি নম্র হইয়া রথে পারবারিণী হও। হে বিদুগব! স্তোত্র সকলের সহিত (রথ-চক্রের) অধঃ দিয়ে (গমন কর)।

আ। তে। কারো। শৃণবাম। বচাংসি।
যযাথ। দূরাৎ। ন্যনসা। হরিভ্যাম্।—৩।৩৩।১০

হে কারো! তোমার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াছি। (তুমি) দূর হইতে শকট (ও) হয় সহিত আগমন করিয়াছ।

(৩) কাম্। নদীঃ। সুরাধাঃ। দেবয়ন্তঃ।
অযুক্ষত। সিন্ধুং। অর্ণসে। গৃণানাঃ।
বিশ্বামিত্রঃ। যৎ। অবহৎ। সুদাসম্।
অপিয়ানে। সুশিবাসঃ। ইজঃ।—৩।৩৩।১১

আমরা দেখাইয়াছি, নদীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান কালের সিন্ধুনদ, বৈদিক যুগেই, সিন্ধু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নদীদিগের সাধারণ নাম সিন্ধু ছিল বলিয়া, পাছে উহা অন্য সিন্ধুকে বুঝায়, সেই জন্য উহাকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছিল, এবং উহার আর একটী নামও দেওয়া হইয়াছিল। সেই নাম কি, এক্ষণে আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে 'সরস্বতী' নাম ৫ম ঋকে উক্ত হইয়াছে। এই সরস্বতী নদী কোন্ নদীর নাম? ঋগ্বেদে সরস্বতী নদীর অন্য ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন সূক্ত রচিত হইয়াছিল, দেখা যায়। ২য় মণ্ডলে গৃৎসমদ ঋষি কতকগুলি ঋকে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, তিনি এই নদীকে মাতৃতমা, নদীতমা ও দেবিতমা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (১) ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ভরদ্বাজ ঋষি ইহাকে সপ্ত-ভগিনী-যুক্তা, রিপ্রাদিগের মধ্যে প্রিয়া, সোমপানার্থী ও অপসাম্ অপোভনা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২) দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে

মহান্, ঋষি, দেবজাত, দেবপুত্র, নৃচক্ষা যিনি মিত্র ও বরুণকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সুদাসকে পালন করিতেছিলেন; ইন্দ্র কুশিকদিগের সহিত প্রিয়তর আলাপ করিয়াছিলেন।

উপ। প্র। ইৎ। কুশিকাঃ। দেবরন্ধম্
যযুঃ। রাধে। প্র। মন্দত। সুদাসঃ।
রাজা। বৃত্রম্। জঘনৎ। প্রাণী। নপ্রাক্
ঔক্। অব। যজ্যাতে। বরু। বা। পৃথিব্যাঃ।—৩।৩৩।১১

হে কুশিকগণ! (অন্যের) নিকট (তোমরা) গমন কর, আমাকে ধনলাভে চেতনা দাও, এবং পোষণ কর; সুদাস রাজা পূর্ব্বে, পশ্চিমে (ও) উত্তরে দ্বিষ্ বৃত্রকে সংহার করিয়াছেন; যম-কর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশে যজ্ঞ করিতেছেন।

(১) অম্বিতমে। নদীতমে। দেবিতমে। সরস্বতি।—২।৪১।১৬

হে মাতৃতমে, নদীতমে, দেবিতমে সরস্বতি!

(২) উত। নঃ। প্রিয়া। প্রিয়াসু। সপ্তস্বসা। সুজুষ্টা।
সরস্বতী। সোম্যা। সু ভূৎ।—৩।৬১।১০

এবং আমাদিগের প্রিয়াদিগের মধ্যে প্রিয়া, সপ্ত-ভগিনী-যুক্তা সুন্দররূপে সেবিতা সরস্বতী সোম-পানার্থ হইয়াছেন।

প্র। যা। মহিত্রা। মহিনা। যাস্থ। চেকিতে
দ্যুভক্তিঃ। অক্তাঃ। অপসাম্। অপস্তমা।
বৃষঃ ইব। বৃহতী। বিভুনে। কৃতা
পয়স্বতী। চিকিতুষী। সরস্বতী।—৩।৬১।১৩

যিনি মাহাত্ম্য দ্বারা মহতীদিগের মধ্যে বিখ্যাত হন; (যিনি ...) অন্ন প্রভৃতির দ্বারা,

'সিন্ধু'র ঠিক এই বিশেষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ৭ম মণ্ডলে বশিষ্ঠ ঋষি সরস্বতীকে একটী স্তোত্রে আহ্বান করিয়াছেন। উহার প্রথম ঋকেই সরস্বতী ও সিন্ধু যে একই নদীর নাম, তাহা সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। (১) ২য় ঋকে, সরস্বতী নদীই গিরি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃতা বর্ণনা করায়, ইহা যে বর্ত্তমান সিন্ধু ভিন্ন অপর নদী হইতে পারে না, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। (২)

পার্ব্বতীয় নদীগণ অত্যন্ত শব্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হয়। এই শব্দ দূর হইতে মেঘগর্জ্জনের মত শ্রুত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, ইহারা এত খর-স্রোতা যে, উহাদের বিপরীত দিকে গমন করা বা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সরস্বতী নদীর এই সকল গুণ ঋষিদিগের স্তোত্র হইতে জানিতে পারা যায়। (৩) সরস্বতীর দুই পারে পর্ব্বতশ্রেণী আছে বলিয়া ইহা অন্নোদয়পুরীযুক্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে 'পারাবতঘ্নী' বলায় বুঝা যাইতেছে যে, এই নদী পার হইতে চেষ্টা করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য জ্ঞান করা হইত। ইহার স্রোত এত প্রবল যে, পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে পতিত হইয়া উহাকে অতি সহজেই ভগ্ন করিয়া ফেলে। (৪) পার্ব্বতীয়া গিরিদিগের শব্দ হইতেই প্রাচীন কালে ঋষিগণ

অপর সকল কর্ম্মকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; বিভুর নিমিত্ত কৃতরথ সদৃশ, বৃহতী সরস্বতী জ্ঞানীর দ্বারা উপাস্যতা হন।

(১) প্র। ক্ষোণীভিঃ। ধায়না। যাতে। অধ্বা।
সরস্বতী। বধূমতী। আয়তী। পূঃ।
প্রবাবধানা। বিষ্যা ইব। বাজি। বিশ্বাঃ।
অপঃ। মহিনা। সিন্ধুঃ। অন্যাঃ॥—৭।৯৫।১

এই অন্নোদয়-পুর-যুক্তা সরস্বতী বিভুর জল সহিত ধারক (সমুদ্র) অভিমুখে শীঘ্র গমন করিতেছেন; অপর সকল জলকে সিন্ধু মহিমা দ্বারা বাজ দিয়া রথী সদৃশ গমন করিতেছেন।

(২) একা। অচেতৎ। সরস্বতী। নদীনাম্।
শুচিঃ। যতী। গিরিভ্যঃ। আ। সমুদ্রাৎ।
রায়ঃ। চেতন্তী। ভুবনস্য। ভূরেঃ।
ঘৃতম্। পয়ঃ। দুদুহে। নাহুষায়॥—৭।৯৫।২

নদীদিগের মধ্যে শুদ্ধা, গমনশীলা সরস্বতী একাই গিরি সকল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছেন। বহু লোকের ধনপ্রদানকারিণী (সরস্বতী) নহুষের নিমিত্ত ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।

(৩) যস্যাঃ। অনন্তঃ। অহুতঃ। ত্বেষঃ। চরিষ্ণুঃ। অর্ণবঃ।
অমঃ। চরতি। রোরুবৎ॥—৬।৬১।৮

যাঁহার অনন্ত, অপরাজিত, দীপ্ত, চলিষ্ণু, বেগযুক্ত জল গর্জ্জন করিয়া চলিতেছে।

(৪) ইয়ং। শুষ্মেভিঃ। বিসখা ইব। সরুহৎ
মামৃ। গিরীণাং। তবিষেভিঃ। ঊর্ম্মিভিঃ।

সাধারণতঃ নদীদিগকে এবং প্রধানতঃ সরস্বতীকে বাক্যের দেবীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে সপ্ত-ছন্দ প্রসিদ্ধ। মনে হয়, পঞ্জাবের সপ্ত-সিন্ধুই সপ্ত-ছন্দ বা বাণীর দেবীরূপে গৃহীতা হইয়াছিলেন। এই সাত বাণী দিব্যলোকের সপ্ত-সিন্ধুতে বাস করেন। দিব্যলোক হইতে তাঁহারা যখন নামিয়া আসেন, তখন এই সপ্ত-সিন্ধুতে প্রবাহিতা হইয়া তাঁহাদের সপ্ত-বাণী শ্রুতিগোচর হয়। (১)

পুরুষ্ণী নদীর নাম ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম মণ্ডলেও দেখিতে পাই। এই নদী সুদাস রাজার রাজত্বকালে একটী যুদ্ধে বিখ্যাত হইয়াছিল। ইহার তীরের বীর যোদ্ধৃগণের শত্রুগণ তয় পাইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া দিয়াছিল। (২) উহাদিগকে সুদাস সংহার করেন। যে কালে পরুষ্ণী নদীর তীরবর্ত্তী দেশের মেষ ও অশ্ব প্রসিদ্ধ ছিল। (৩) সরস্বতী নদীর পর পরুষ্ণী নদী বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধি লাভ

গায়ন্নাবতন্নীং। অবসে। সুবৃক্তিভিঃ।
সরস্বতীং। অ। বিবাসেম। ধীতিভিঃ॥—৬।৬১।১২

ইনি (অর্থাৎ সরস্বতী) গিরিদিগের উচ্চ স্থান, বল (৩) প্রভৃতি উর্দ্ধি সকল দ্বারা মুখালবণ্ডকারীর মত ভঙ্গ করিয়াছেন। পারগমনকারীকে নমস্কার, নদী সরস্বতীকে রক্ষার্থ স্তব ও যজ্ঞ কর্ম্ম সকল দ্বারা সেবা করি।

(১) বরাজ। সীং। অনন্তীঃ। অপকাঃ।
দিবঃ। যহ্বীঃ। অবসানং। অশ্বিনগ্মাং।
পনাঃ। অত্র। যুবতয়ঃ। সয়োনীঃ।
একং। গর্ভং। দধিরে। সপ্ত। বাণীঃ॥—৪।৩।৬

নেই অভক্ষণকারিণী, অহিংসিতা, অনাচ্ছাদিতা, (কিন্তু) অনগ্না, দিব্যলোকের যহ্বীগণের দিকে (অগ্নি) গমন করিতেছেন। সনাতনী, যুবতী, এক স্থানে অবস্থিতা, সপ্ত বাণী একই গর্ভ (অর্থাৎ অগ্নিকে) ধারণ করেন।

(২) দুঃআধ্যং। অদিতিং। ত্রৈষ্টুভেন। ছন্দসা। অচেতসঃ। বি। অজগৃভ্রে। পরুষ্ণীম্॥—৭।১৮।৮

অনবুদ্ধি অজ্ঞানগণ অখণ্ডিতা পরুষ্ণীকে (কুলভেদ করিয়া) রজ্জু বন্ধনের মত গ্রহণ করিয়াছিল।

ঈয়ুঃ। অর্থং। ন। ঘৃতং। পরুষ্ণীম্।
অতঃ। চন। ইৎ। অভিপিত্বম্। জগাম॥—৭।১৮।৯

(শত্রুগণ) অগন্তব্য পরুষ্ণীকে অর্থসদৃশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; শীঘ্রগামী (অশ্বযুক্ত রথ) যেমন গমনার্থ গমন করিয়াছিলেন।

(৩) ইত। স্ম। তে। পরুষ্ণ্যাম্। ঊর্ণাঃ। বসত। সুপ্রায়ঃ।—৪।৫২।৯

এবং তাঁহারা (অর্থাৎ মরুৎগণ), ঊর্ণা (বা মেষ) ও অশ্বীগণ পরুষ্ণী নদীতীরে বাস করে।

করিয়াছিল। সেই জন্য একটী নাম ইহাকে 'মহেনদি' বলিয়া সাহান করিতে দেখি। (১) পরুষ্ণী নদীর বর্ত্তমান নাম রাভী। গ্রীকগণ ইহাকে Hydrotes নাম দিয়াছিলেন। পুরাণে ইহা পরোষ্ণী নামে বিখ্যাত। (২)

পরুষ্ণীর পরে অসিক্নীযুক্তা মরুদ্বৃধার নাম শোনা হওয়া গিয়াছে। ইহার নাম ৭ম মণ্ডলের একটী ঋকেও বর্ত্তমান। (৩) অসিক্নী নদীর তীরবর্ত্তী প্রজাগণ সুদাস রাজার সময়ে পুরুরাজার অধীনে বাস করিত। যখন সুদাস পুরুকে জয় করেন, তখন তাঁহার প্রজাগণ সুদাসের ভয়ে পলায়ন করে, এই ঘটনা উক্ত ঋকে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক ঋকেও এই ঘটনা সমর্থিত হয়। (৪) ৪র্থ ও ৮ম মণ্ডলের এক একটী ঋকেও অসিক্নীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (৫) ইহার বর্ত্তমান নাম চেনাব। গ্রীকগণ ইহাকে আকেসিনে

সায়নাচার্য্য এই ঋকে উর্দ্ধাঃ অর্থে দীপ্তাঃ এবং উন্নাবঃ অর্থে প্লাবিকাঃ অপঃ করিয়াছেন, কিন্তু ১০।৭৪।৮ ঋকে উর্দ্ধাবতী অর্থে উর্দ্ধাঃ ধারার সোমতিঃ কর্ত্তৃকঃ ক্রিয়তে ইতি সায়ন। ৮।৫৮।১ ঋকে উন্নাবঃ অর্থে প্লাবিকাঃ অধরিত্র। অনুসরণ করি, তথা সপ্তম বচনে উন্নাবঃ ও উন্নাবঃ দুই পদই হইল।

প্রিয়ে। পরুষ্ণীঃ। উন্নাবঃ। উন্নাবু
যসাঃ। পর্বাণি। সখ্যায়। বিব্যে।—৮।৫২।২৭

ঋষিগণ পরুষ্ণী উর্দ্ধাকে (বর্ষাকে) সখিরূপে (ব্যবহার করিত); তাহার পর্ব্ব সকল সখিরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

(১) সত্যং। ইৎ। তাঃ। নরুষ্ণীঃ।
পরুষ্ণি। পরঃ। দেদিশ্ম।—৭।১৮।৮

হে মহাকায়ে পরুষ্ণি। তোমাকে সত্যই নির্দ্দেশ করিতেছি।

(২) ইরাবত্যাং বিতস্তায়াং চন্দ্রভাগায়াং দেবিকায়াং।—বনপর্ব্ব, ৩১৩

(৩) ত্বং। ভিন্ধি। বিষঃ। আরুজঃ। পরিষ্ঠীঃ।
অসমনাঃ। অহভ্যঃ। ভরন্তবাদি।
বৈশ্বানর। পুরবে। সোহ্যায়ঃ
পুরঃ। বং। অগ্নে। দরয়ন্নমিত্রান্। অথর্বাণে।—৭।৫।৩

হে বৈশ্বানর অগ্নে! তোমার তেজে অসিক্নী (নদীর) অধিবাসিত প্রজাগণ ভোজ্য দ্রব্য ত্যাগ করিয়া দিয়াছে, যখন পুরুর দীপ্যমান পুর সমস্ত বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশিত করিয়াছ।

(৪) ভেদ্য। পুরুষু। বিদথে। সুদ্রবাচ্য।—৭।১৮।১৫

সুশ্রবাক্য পুরুতে যুদ্ধে ভেদ করি।

(৫) যৎ। সিন্ধৌ। যৎ। অসিক্ন্যাম্। যৎ। সমুদ্রেষু।—৮।২০।২৭

যাহা সিন্ধুতে, যাহা অসিক্নীতে, যাহা সমুদ্র সকলে।

অসিক্ন্যাং। যজমানঃ। ন। হোতা।—৮।১৩।১৫

অসিক্নী তীরে যজমান হোতা নহুষ।

(Akesines) বলিতেন। অসিনীর একটী শাখাকে মরুদ্বৃধা বলিত, মনে করি। পঞ্জাবের মানচিত্রে বীদ্বন্ (wadwan) নামে চেনাবের যে শাখা দেখা যায়, তাহাই সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে মরুদ্বৃধা নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু রোথের মতে, চেনাব ও বেহৎ মিলিত হইয়া যে নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই মরুদ্বৃধা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

এক্ষণে আমরা বিতস্তা ও সুসোমাযুক্ত আর্জীকীয়া নদীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পঞ্জাবের মানচিত্রে ঝিলম্ নদীর পশ্চিম ভাগে সুহোম নামে এক নদী দেখিতেছি। উহাই প্রাচীন সুসোমা নদী বলিয়া অনুমান করি। যাস্কের মতে, সিন্ধুনদীর আর এক নাম সুসোমা। কিন্তু উহার মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এখনও সুহোম নামে এই নদী বিতস্তার নিকটবর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং উহা সিন্ধুতেই পতিত হইতেছে। ইহাই সুসোমার পৃথক্ অস্তিত্বের প্রধান নিদর্শন। বর্ত্তমান ঝিলম্ নদীই বিতস্তা। ইহাকে গ্রীকগণ হাইদাস্পেস্ বলিতেন। ইহার আর এক নাম বেহৎ।

কিন্তু আর্জীকীয়া নদী কোন্‌টী? যে দেশ দিয়া আর্জীকীয়া প্রবাহিত, তাহাকে আর্জীক দেশ বলা হইত; এবং সে দেশের লোকদিগকে আর্জীক বলিত। আর্জীক দেশে ও সুন্দর সোমযুক্ত শর্ষণাবৎ হ্রদে যাইতে হইলে, চক্রহীন রথ আবশ্যক হইত। (১) সম্ভবতঃ ক্রিমিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের 'স্লেজে'র মতই এই চক্রহীন রথ। বরফের উপর ইহার ব্যবহার হইত। অতএব শর্ষণাবৎ হ্রদ ও আর্জীক দেশ অত্যন্ত শীতপ্রধান হইবার সম্ভাবনা। ঋগ্বেদের যুগে তিনটী দেশের সোম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল; যথা, শর্ষণাবৎ হ্রদের, আর্জীক দেশের, এবং সুসোমা নদীর তীরবর্ত্তী দেশের সোম। (২) মনে রাখিতে

---

(১) সুসোমে। শর্ষণাবতি। আর্জীকে। পক্তবতি
যযুঃ। নিচক্রুষঃ। মরুতঃ—৮।৭।২৯

সুন্দর সোমযুক্ত শর্ষণাবৎ (হ্রদে), যজ্ঞগৃহবতী আর্জীক দেশে মরুদ্গণ চক্রহীন রথে গমন করিয়াছিলেন।

আর্জীকে কর্জীকানাং দেশে ইতি সায়ণ।

(২) শর্ষণাবতি। সোম। ইন্দ্রঃ। পিবতু। বৃত্রহা।—৮।১২৩।১

আ। পবস্ব হিরণ্যং। পয়ঃ। গাব্যং। সোম। যবঃ।—৮।১১৩।৫

বৃত্রহননকারী ইন্দ্র শর্ষণাবৎ (হ্রদের) সোম পান করুন। হে দিব্যপয়ঃ সোম! আর্জীক (দেশ) হইতে (আসিয়া) ক্ষরিত হও

(Gluzar) বা গিলগিট (Gilgit) হইতে কারণাই (Karnai), এই নদীচতুষ্টয়ের সহিত ইহা ক্রমান্বয়ে যুক্ত হইয়াছে। অতএব অনুমান করি, এই নদীগুলিই যথাক্রমে বেদোক্ত তৃষ্টামা, সুসর্ত্বা, রসা ও শ্বেতী।

গ্রীকগণ বর্ত্তমান কাবুল নদীকে কোফেন (Kophen) বলিতেন। অতএব, ঋষি-কথিত কুভা নদীই বর্ত্তমান কাবুল নদী। কাবুল নদী স্বাৎ নদীর সহিত মিলিত হইয়া সিন্ধুতে পতিত হইতেছে। ঋষি বলিয়াছেন,—কুভার সহিত গোমতীকে সিন্ধু সঙ্গ করিয়াছে। অতএব, বর্ত্তমান স্বাৎ নদীই গোমতী নামে পূর্ব্বে বিখ্যাত ছিল। মফস্‌লের গোমতী নদীকে বর্ত্তমান গোমাল মনে করেন। বোধ হয়, নামসাদৃশ্যে এইরূপ অনুমান করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে যাহাকে

---

(১) যে। গোমাসঃ। পরাবতি। যে। অর্বাবতি। সুনিরে।
যে। বা। সুষ্বঃ। শর্ষণাবতি।—১০।৬৪।৯

যে সকল সোম পরাবতে (স্থিত), যাহারা অর্বাবতে অবস্থিত, কিম্বা যে সকল এই শর্ষণাবতে আছে, (ইন্দ্রের জন্য) অভিষব করিতেছে।

যে। আর্জীকেষু। কুত্সহ। যে। মঞ্জে। পরুষ্ণ্বে।
যে। বা। তুর্বশে যদৌ। পক্থেষু।—৮।৬৫।৩০

আর্জীক দেশ সকলে, কুৎসনিবাস মধ্যে, পরুষ্ণী নদীর তীরে, বা তুর্বশ ও যদুর মধ্যে যে সকল (সোম) আছে। এই কয়েকটী যে তমদগ্নি ঋষি কর্তৃক রচিত, তাহা ২৪শ ঋকে প্রকাশিত হইয়াছে। তমদগ্নি ঋষি শর্ষণাবৎ হ্রদের নিকটে বাস করিতেন, বা তথায় গিয়া এই সোম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর্জীকদেশ যে পঞ্চ-জনপদের দেশ হইতে ভিন্ন তাহাও বুঝা যাইতেছে।

হইবে, সোমলতা পর্ব্বতে জন্মায়। (১) অতএব, শর্যণাবৎ হ্রদ, আর্জীকীয়া নদী পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত, ইহাই যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। সায়নাচার্য্য শর্যণাবৎ হ্রদকে কুরুক্ষেত্রের মধ্যস্থিত একটী পুষ্করিণী মনে করেন। তথায় পর্ব্বত কোথায়? সোমলতা সেখানে জন্মাইতেই পারে না। ঋগ্বেদের ঋষির মতে, আর্জীকীয়া নদী বিতস্তার সহিত যুক্ত বা তাহার সহিত মিলিত ছিল। যাস্কের মতে, আর্জীকীয়া বিপাশার আর এক নাম। তাহা হইলে আর্জীকীয়া কিরূপে বিতস্তার নিকটে অবস্থিত হইবে? এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, শর্যণাবৎ হ্রদ বা শর্যণাবস্থিত উহার কুল ভিন্ন অপর সরোবর হইতে পারে না। এই হ্রদ হইতেই বিনশ্ বা বিতস্তা উৎপন্না, এবং ইহারই সন্নিকটে কিষণ্-গঙ্গা নাম্নী এক নদী প্রবাহিতা হইয়া, উচ্চরে সিন্ধু-নদীতে পতিত হইয়াছে। এই কিষণ্গঙ্গাই প্রাচীন আর্জীকীয়া নদী বলিয়া মনে হয়। উহার হ্রদের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা অবস্থিত। এই হ্রদের তীরে সোমলতা জন্মিত। ঋগ্বেদে একটী ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্র ঋষিচি ঋষির আশ্রম শিব প্রথম পর্ব্বতে অন্বেষণ করেন; পরে উহা শর্যণাবৎ হ্রদে প্রাপ্ত হন। (২) বৈদিক যুগে একটী গল্প প্রচলিত ছিল যে, অথর্ব্ব-পুত্র দধীচি ঋষি অশ্বের শির প্রথম পর্ব্বতে অন্বেষণ করেন; পরে উহা শর্যণাবৎ হ্রদে প্রাপ্ত হন। (৩) ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া ঋষির অশ্ব মস্তক

সায়ন শর্যণাবৎকে "কুরুক্ষেত্রস্থ সরোবর বিশেষ" বলিয়াছেন।

কুরম্ নদী বলে, উহাই প্রাচীন কুমু। ঋষি বলেন, কুমু ও মেহৎনু যুক্ত হইয়া সিন্ধুতে পড়িয়াছে। তাহা হইলে, বর্ত্তমান তোচী নদীর নাম প্রাচীন কালে মেহৎনু ছিল।

কুভা, কুভা ও গোমতী নদীর নাম ৫ম মণ্ডলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) কিন্তু এই ঋকে সরযু নামে এক নদীর উল্লেখ দেখিতেছি। ৪র্থ মণ্ডলেও সরযুর উল্লেখ আছে। (২) কুমু, কুভা প্রভৃতির সিন্ধুর পশ্চিমদিকস্থ শাখা নদী-গুলির সহিত একত্র উল্লেখ দেখিয়া সরযুকে পশ্চিম দিকের কোনও নদী বলিয়া অনুমান করি। বর্ত্তমান কালে পোয়ণ ও ঝব (Zhob) নামক নদীদ্বয় মিলিত হইয়া সিন্ধুতে পড়িতেছে। মনে হয়, ইহাদের একটীকে সরযু বলা হইত।

ঋগ্বেদে উপরি-বর্ণিত নদী ভিন্ন আরও কতকগুলি নদীর নাম পাওয়া যায়। যথা, সীরা, (১) শিফা, (২) অঞ্জসী, কুলিশী, বীরপত্নী, (৩) ষষ্যাবতী, (৪)

(১) মা। বঃ। রসা। অনিতভা। কুভা। কুমুঃ
মা। বঃ। সিন্ধুঃ। নি। রীরমৎ।
মা। বঃ। পরি। ষ্ঠাৎ। সরযুঃ। পুরীষিণী।
অন্যে। অস্মৎ। সমরে। রপন্ত। বঃ।—৫।৫৩।৯

(হে মরুৎগণ!) দীপ্তিমতী রসা, কুভা, কুমু যেন তোমাদিগকে, সিন্ধুও যেন তোমাদিগকে নিকৃষ্টভাবে রমণ না করে। উদকবতী সরযু তোমাদিগকে যেন নিরুদ্ধ করিয়া না রাখে। তোমাদিগের সুখ আমাদিগের হউক।

(২) উত। ত্যা। সদ্যঃ। আর্ণা। সরযোঃ। ইন্দ্রা। পারতঃ।
অর্ণ। চিত্ররথা। অবধীঃ।—৪।৩০।১৮

হে ইন্দ্র! সরযু নদীর পারে নিবাসকারী সেই অর্ণ ও চিত্ররথ আর্য্যদ্বয়কে সদ্যঃ বধ করিয়াছিলে।

(১) তং। ধুনিঃ। ইন্দ্র। ধুনিমতীনাং। ঘৃণোঃ
পারঃ। সীরাঃ। ন। সবয়াঃ।—৪।১৭।৯

হে ইন্দ্র! শব্দবতী প্রবাহিতা সীরা (অর্থাৎ নদী) সকলের মত ধুনি তুমি জল সকলকে প্রবাহিত কর।

পরিস্থিতাঃ। অতৃণৎ। বতবানাঃ।
সীরাঃ। ইন্দ্রঃ। স্রবিতবে। পৃথিব্যা।—৪।১৯।৮

আবদ্ধা, চতুর্দ্দিকে বেষ্টিতা সীরাদিগকে ইন্দ্র পৃথিবীতে প্রস্রবণরূপে (বা প্রবাহিত হইবার জন্য) ছিদ্র করিয়াছিলেন।

সীরীনদীঃ সীরা ইতি নদীনামৈতৎ ইতি সায়ন।

অহং। অপ্সু। প্রবতঃ। যাবয়ম্। বৃধা।
প্রতিস্থঃ। পৃথিব্যাম্। সীরাঃ। অধি।—১০।৪৯।৮

দৃষদ্বতী, ও আপয়া। (১) বিশ্বকোষে ইহাদের প্রথমগুলিকে স্বাৎ ও কাবুল নদীর শাখা নদীরূপে ও দৃষদ্বতীকে যমুনার শাখারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। উদ্ধৃত ঋক্ সকলে 'সীর' শব্দ নদীদিগের সাধারণ নামরূপে বেদে ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, প্রাক্-বৈদিক যুগে ঐ নদী আর্য্যদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। আমরা এক্ষণে আমুদরিয়া ও সীরদরিয়া নামে যে দুই নদীকে আরাল হ্রদে নিপতিত হইতে দেখি, উহাদের একটীকে প্রাচীন সীরা নদী বলিয়া অনুমান করি। আমুদরিয়া নাম সম্ভবতঃ অম্বু বা অম্বা দরিয়া ছিল। দরিয়া শব্দ দৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কারণ, আর্য্যগণ মনে করিতেন, বরুণ বা ইন্দ্র বজ্র দ্বারা নদীদিগের খাত বিদারণ করিয়া দিয়াছেন। আমুদরিয়ার আর এক নাম অক্সুস্ (Oxus)। বোধ হয়, উহা অক্ষ বা অক্ষি শব্দের অপভ্রংশ।

কেহ বলিতে পারেন, সিন্ধু বা সরস্বতীর পূর্ব্ব দিকে সিন্ধুকে লইয়া দশটী নদীর উল্লেখ ১০ম মণ্ডলে দেখিতে পাই; উহার পশ্চিম দিকে আটটী নদীর নাম প্রাপ্ত হইতেছি। অতএব, ইহাদিগকে দ্বি-সপ্ত নদী কিরূপে বলা যাইতে পারে? অনুমান করি, 'সপ্ত-নদী'র সন্ধান যখন আর্য্যগণ লাভ করিয়াছিলেন, তখন গঙ্গা ও যমুনার সন্ধান তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। এমন কি, আর্য্যগণ তখন শুতুদ্রী ও বিপাশ নদীও জানিতেন না। কারণ, বিশ্বামিত্র ঋষিই এই দুই নদীকে স্তবার্হা করিয়াছেন, দেখা যায়। তাহা হইলে, পরুষ্ণী, অসিক্নী, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা,

---

বৃষ (অর্থাৎ পুরুষ) আমি পৃথিবীর উপরে সাতটী নদীভূতা, প্রবাহিনী সীরাদিগকে (অর্থাৎ নদীদিগকে) ধারণ করি।

সায়ন সীরা অর্থে এখানে 'সরণশীলা' বলিয়াছেন।

(২) হতে তে। স্যাতাম্। প্রবণে। নিষাদাম্।—১।১০৪।৩

শিকার গভীর দেশে তাহারা হত হউক।

(৩) অঞ্জসী। কুলিশী। বীরপত্নী। পয়সা
হিন্বানা। উদ্ভিঃ। তরন্তে।—১।১৬৬।৪

অঞ্জনী, কুলিশী, বীরপত্নী জলপ্রাপ্তা হইয়া জলে পূর্ণ হইতেছে।

(৪) ত্রিংশৎশতং। বর্মিনঃ। ইন্দ্র। সাকম্
যষ্যাবত্যাম্। পুরুহুত। প্রবস্যা।—৬।২৭।৩

হে পুরুহুত ইন্দ্র! যষ্যাবতী-তীরে ১৩০ বর্ম্মধারীকে এক সঙ্গে যশ ইচ্ছা করিয়া।

(১) দৃষদ্বত্যাং। মানুষে। আপয়ায়াম্
সরস্বত্যাং। রেবৎ। অগ্নে। দিদীহি।—৩।২৩।৪

হে অগ্নে! দৃষদ্বতী তীরে, আপয়া তীরে, সরস্বতী তীরে মানুষদিগের মধ্যে ধনযুক্ত হইয়া দীপ্যমান হও।

সুষোমা, যাক্সিকীয়া ও সরস্বতী, এই সপ্ত নদীর নাম আর্য্যগণ ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম অবগত হন। অপর দিকে রসা, শ্বেতী, কুভা, গোমতী, ক্রুমু ও মেহৎন্ নদীগুলিকে, বোধ হয়, আর্য্যগণ প্রথম জানিয়াছিলেন। তৃষ্টা ও সুসর্ত্তুকে পরে জ্ঞাত হন। আকাশে সপ্ত-সিন্ধুর কল্পনা আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া করিয়াছেন। সেই জন্য সিন্ধু, বিপাশা ও শুতুদ্রী (বা সুসোমা) নদীর নাম উহাদের মধ্যে দেখিতে পাই।

বেদ-প্রসিদ্ধা ও ঋষিদিগের অতি প্রিয়া সরস্বতী নদীই যে বর্ত্তমান কালের সিরসা, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যখন আর্য্যগণ পরবর্ত্তী যুগে গঙ্গানদীর উপকূলে উপনীত হইয়া উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অতি প্রিয়া সরস্বতী নদীকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া, কেহ কেহ গঙ্গানদীর সহিত তাহার তুলনা মিলাইয়া শ্লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কেহ বা প্রাচীন সরস্বতীর নাম অপর নদীতে আরোপ করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞ কর্ম্মের সুবিধা করিয়াছিলেন। ক্রমে আর্য্যগণ সরস্বতী অপেক্ষা গঙ্গার প্রাধান্য স্বীকার করিতে লাগিলেন। সেই জন্য মহাভারতে পাইয়া দেখিতে পাই :—

পুরা হিমবতঃ পৃষ্ঠাৎ হেমশৃঙ্গাৎ বিনিঃসৃতা।
গঙ্গা গত্বা সমুদ্রান্তং সপ্তধা সমবর্দ্ধত ॥১৯
পদ্মাক্ষ যমুনৈকেব প্লক্ষজাস্যা সরস্বতী।
রথস্থা সরযূশ্চৈব গোমতী গণ্ডকী তথা ॥ ২০

—আদিপর্ব্ব; ১৭০ অধ্যায়।

অর্থ,—পূর্ব্বকালে হিমালয়ের হেম-পৃষ্ঠ হইতে এই গঙ্গা নির্গতা হইয়া সমুদ্রজলে যাইতে যাইতে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পদ্মা, যমুনা, প্লক্ষ-(অর্থাৎ বটবৃক্ষ)-জাতা সরস্বতী, রথস্থা সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকীকে (সপ্ত ভাগ জানিবে)।

উদ্ধৃত শ্লোক দেখা যায়, যেমন প্রাচীন সরস্বতী নামে গঙ্গার এক শাখা-নদীর নামকরণ হইয়াছে, সেইরূপ সরযূ ও গোমতী নামও অপর দুই নদীতে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, সরযূ ও গোমতী নদীদ্বয়ও আর্য্যদিগের প্রিয় ছিল; সেই জন্য উহাদের নাম নূতন নদীতে আরোপিত হইয়াছে।

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়।

স্বাভাবিক রঙে আলোকচিত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন নীয়েপ্‌সে * (Niepce), ডাগুর (Daguerre) প্রভৃতি ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আলোকচিত্র-বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তখন সাধারণ চিত্রকরেরা একবার বড়ই বিব্রতে অভিভূত হইয়া পড়েন; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহারা নবীন উৎসাহের উল্লাসে কহিলেন, না, এই বিদ্যা আমাদের পতনসাধন করিতে পারিবে না। ইহারা বিবেষ বর্ণ-বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিসমূহ কেবল সাদা ও কালোর সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। ইহাদের কল্পনাও নাই, চিত্রণশক্তিও নাই। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইবার পূর্ব্বেই স্বাভাবিক রঙে আলোকচিত্র পাইবার সম্ভাবনা দেখা গেল, এবং যদিও ইহাতে প্রকৃত চিত্রশিল্পীর কোনও ক্ষতি হয় নাই, এবং আশা করি, কোনও কালে হইবে না। আলোকচিত্র-বিদ্যার এই নূতন শাখাটী এখন অনেকপরিমাণে পূর্ণাবয়ব ধারণ করিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ১৮৫০ সালে বৈজ্ঞানিক এড্‌মণ্ড বেকারেল (Becquerel) সূর্য্যরশ্মিকে ত্রিশিরকাচের (Prism) সাহায্যে সপ্তবর্ণে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার কয়েকখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে দুই একটী আলোকচিত্রে কেবলমাত্র সাদা ও কালোর পরিবর্ত্তে কোনও কোনও অংশে স্বাভাবিক রঙের আভা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বেকারেল ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। প্রায় ত্রিষষ্টি বৎসর পরে অপর এক জন বৈজ্ঞানিক, সেঙ্কার (Zenker) ইহার ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রায় আরও বিশ বৎসর কাল কোনও উন্নতি সাধিত হয় নাই।

বেকারেলের আবিষ্কারের চল্লিশ বৎসর পরে ১৮৯১ খৃঃ অব্দে লীপ্‌মান্ (Lippmann) স্বাভাবিক রঙে আলোকচিত্র গ্রহণ করিবার একটী উপায় প্রদর্শন করেন। তাঁহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আইভ্‌সের (Ives), উডের (Wood) এবং অপর এক জন বৈজ্ঞানিকের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি পরে আলোচিত হইয়াছে।

---

* ১৭৯৮ খৃঃ অব্দের পর হইতে ওয়েজ উড (Wedgewood), ডেভী (Davy), সীবেক (Seebeck), হার্শেল (Herschel) প্রভৃতি অনেকে সাধারণ ও স্বাভাবিক রঙে আলোকচিত্র সম্বন্ধে নাড়াচাড়া করেন, কিন্তু তাঁহাদের কৃতি স্থায়ী হয় নাই।

দীপ্যমানের প্রক্রিয়া বুঝিতে হইলে, আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটী কিছু জানা আবশ্যক। এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, আলোক এক প্রকার অতিসূক্ষ্ম স্পন্দনমাত্র; কিন্তু সে স্পন্দনটা কিসের, তাহা আমাদের জানিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই; এইমাত্র জানিলেই হইল যে, সেই তরঙ্গটা, আমরা যে সকল জিনিসকে স্বচ্ছ বলি, তাহাদের ভিতর দিয়া সহজে চলিয়া যায়, এবং অস্বচ্ছ দর্পণ-গাত্রে প্রতিহত হইলে সেগুলি ফিরিয়া আসে। এই স্পন্দনটার মাত্রার উপর আমাদের বর্ণানুভূতি নির্ভর করে, এবং এই স্পন্দনের ফলে সেই অজ্ঞাত পদার্থ বা প্রকৃতিতে যে ঢেউ খেলিতে পারে, তাহারও দৈর্ঘ্যের তদনুযায়ী বিভিন্নতা ঘটে। সেই জন্যই লাল, নীল, হরিদ্রা প্রভৃতি বর্ণের অনুযায়ী তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন। এই দৈর্ঘ্যের সাম্যের উপরেই দীপ্যমানের প্রক্রিয়া নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ায়, সাধারণ আলোকচিত্র তুলিবার জন্য আলোকচিত্র-যন্ত্রটী (Camera) যেরূপ ঠিক করিয়া রাখা হয়, সেইরূপই করিতে হয়। কিন্তু আলোকচিত্রের মশলা-মাখান কাচখণ্ডটী (Plate) একটী বিশেষভাবে নির্ম্মিত কাঠের খাপে রাখা হয়। সেটী এরূপ ভাবে গঠিত যে, কাচের যে দিকটী মশলা-মাখান (Film Side), তাহারই গাত্রে এবং ঠিক পারদ রাখিতে পারা যায়। তাহার ফলে কাচের গায়ে যে জিলাটীন ও মশলা (gelatine) মাখান থাকে, তাহার বাহিরের স্তরটী একটী দর্পণের কাজ করে। যে বস্তুটীর আলোকচিত্র লওয়া হয়, কাচের পরিষ্কার দিকটী সেই দিকে রাখা হয়; সুতরাং তাহার প্রতিবিম্বটী মশলার ভিতর দিয়া আসিয়া এই দর্পণের উপর পড়ে, এবং তাহার ছাপটী মশলাতে লাগিয়া যায়। কিরূপে ছাপটী পড়ে, বুঝিতে হইলে, তরঙ্গের দুইটী, সাধারণ গুণ জানা আবশ্যক। স্থির জলে ঢেউ খেলিলে, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের নিস্পন্দ সমতলের এক স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হয়, এবং তাহারই পাশে আর একটী স্থান সমানপরিমাণে নিম্নে যায়। এই উচ্চতাটীকে আমরা চূড়া ও নিম্নতাটীকে খাদ বলিতে পারি। একটী চূড়া ও তাহারই পাশের একটী খাদ লইয়া একটী পূর্ণ তরঙ্গ হয়। এটী যে দৈর্ঘ্য অধিকার করে, তাহাকেই আমরা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলিয়া থাকি। অতএব, যখন একটী পূর্ণ তরঙ্গের অর্দ্ধাংশ পূর্ব্বের সমতল হইতে উচ্চে, ও তাহার অপরার্দ্ধ সমানপরিমাণেই নিম্নে থাকে, তখন ঠিক এই দুইয়ের মধ্যাংশ পূর্ব্বের সমতলেই রহিয়া যাইবে; তাহা হইতে বিচ্যুত হইবে না। এইটীকে আমরা তরঙ্গের নতীদেশ (Node) বলিতে পারি। সুতরাং যে কোনও স্থান দিয়া একটী

কম্পিত তরঙ্গ-স্রোত প্রবাহিত হইলে, সেই স্পন্দনশীল পদার্থে অর্দ্ধ-তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অন্তরে অন্তরে পূর্ব্বের সমতল হইতে অবিচ্যুত কটীদেশ-শ্রেণী উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণ তরঙ্গের ন্যায় আলোকতরঙ্গেরও প্রত্যেকটী একটী চূড়া ও খাদের সমন্বয়ে গঠিত। যখন একটী আলোক রশ্মি দর্পণে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, তখন পূর্ব্বে যে দিকে তরঙ্গগুলি যাইতেছিল, তাহার বিপরীত দিকে তাহারই সদৃশ আর একটী তরঙ্গ-স্রোত বহিতে থাকে। ফলে, একই স্থলে দুইটী বিপরীত দিকে দুই সম তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। একেবারে দর্পণের গাত্রে কোনও রূপ গতি থাকে না; সুতরাং দর্পণের গাত্রটীকে দুই শ্রেণীর তরঙ্গেরই একটী কটীদেশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু তরঙ্গ-স্রোতের কটীদেশগুলি অর্দ্ধ-তরঙ্গ ব্যবধানে সৃষ্ট হয়। অতএব দর্পণের গাত্র হইতে সমান দূরে, এই দুই শ্রেণীর তরঙ্গেরই আর একটী নিঃস্পন্দ কটীদেশ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তরঙ্গ না থাকিলে, ঐ স্থলে যে অবস্থা ঘটিত, তরঙ্গ সত্ত্বেও তাহাই ঘটে।

এই রূপে অর্দ্ধ-তরঙ্গ অন্তরে অন্তরে এক একটী নিঃস্পন্দ সমতল সৃষ্ট হয়, এবং অবশিষ্ট সমস্ত স্থানটীতে আলোকের আলোকস্পন্দন হইতে থাকে। এক্ষণে মনে রাখিতে হইবে, কাচের গায়ে জিলাটীনের সহিত যে মশলা মাখান হয়, তাহা অধিকাংশ স্থলেই রৌপ্যবিকারঘটিত পদার্থ (Silver Compounds); এই মশলার গুণ এই যে, আলোকতরঙ্গের আঘাতে রৌপ্যের বিকার সরিয়া যায়, কিন্তু যে স্থলে আলোকস্পন্দনের অভাব, সে স্থলে ইহা স্বচ্ছ বিকৃত অবস্থাতেই রহিয়া যায়। সুতরাং উপরি-বর্ণিত ধাবনের প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত কাচের গায়ে যে মশলা-মিশ্রিত জিলাটীন মাখান থাকে, তাহার মধ্যে অর্দ্ধ-তরঙ্গ অন্তরে অন্তরে পর্য্যায়ক্রমে রৌপ্য বিকৃত ও অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আলোকচিত্র পরিস্ফুট করিবার (Develope.) সময় বিকৃত রূপার অংশ দ্রবীভূত হয়, কিন্তু শুদ্ধ রৌপ্যটী থাকিয়া যায়। ফলে সমব্যবধান অন্তরে অতিশয় পাতলা রূপার পাতের সৃষ্টি হয়। এগুলি প্রায় স্বচ্ছ বলিলেও চলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন বর্ণের আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। সুতরাং কাচটীর উপর কোনও বিচিত্র-বর্ণময় প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে, প্রত্যেক বিভিন্ন রঙ্গের আলোকের জন্য বিভিন্ন রূপার পাতের শ্রেণী সৃষ্ট হইবে। এইরূপ বিভিন্ন-স্তরপূর্ণ আলোকচিত্রটীকে হারিত্র প্রদান করিয়া (Fix) সেটীকে প্রতিফলিত (Reflected) আলোকে দর্শন করিলে, চিত্রটী

স্বাভাবিক রঙে সৃষ্ট হইবে। কারণ, সাধারণ সাদা আলো যখন এইরূপ কাচে লাগান জিনিসটিতে প্রবেশ করে, প্রত্যেক বিভিন্ন শ্রেণীর রূপার পাতগুলি কেবলমাত্র তাহারই সৃষ্টিকর্ত্তা রংটীকে ফিরাইয়া দেয়, বাকীগুলিকে হয় তাহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে দেয়, নতুবা চুষিয়া লয়। ফলে, কাচটীর যে স্থানে যে রঙের আলো পড়িয়াছিল, সে স্থানটীতে ঠিক সেই রঙটীই দেখা যায়। সুতরাং ছবিটী স্বাভাবিক রঙে রঞ্জিত হয়।

এই সম্পর্কে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই প্রবন্ধে জিনিসটীর কেবলমাত্র একটী মোটামুটি পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দীপ্যমানের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ার প্রণালী ও ফলাফল এখনও খুব ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই।

উল্লিখিত উপায়টী অতিশয় কঠোর হইলেও, উহাই সোজাসুজি উপায় (Direct Process)। অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প আয়াসে কৃতকার্য্য হইবার জন্য মিঃ আইভস্ (Ives) কিছু মারপ্যাচ করিয়া একটী সরল পন্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উপায়টী আমাদের চোখের বিভিন্ন রঙ অনুভব করিবার শক্তির উপর নির্ভর করে। ইয়ং (Young), হেল্‌মহোল্‌ৎস্ (Helmholtz) প্রভৃতির মতে আমাদের চক্ষে তিনটী রঙের যৌলিক অনুভূতি আছে ;—লাল, সবুজ ও বেগুনী (Violet)। বাকী রঙগুলির অনুভূতি এই তিনটীর বিভিন্ন-পরিমাণে সংমিশ্রণমাত্র। সুতরাং যে কোনও রঙীন পদার্থকে আমরা কল্পনার চক্ষে কেবলমাত্র তিনটী রঙে রঞ্জিত দেখিতে পারি, এবং অন্য রঙগুলিকে কেবল এইগুলির বেশী ও কমের ফল মনে করিতে পারি। সুতরাং যদি মশলা-মাখান কাচটীর সম্মুখে একবার লাল রঙের কাচ বা স্বচ্ছ পর্দ্দা, (Transparent Screen or Filter) ধরিয়া, তাহার পর সবুজ ও পরিশেষে বেগুনী রঙ ব্যবহার করিয়া, রঙীন বিষয়টীর তিন রকম আলোতে তিনখানি ছবি তোলা হয়, তাহা হইলে প্রতি কাচেই তাহার সহিত ব্যবহৃত রঙের আলো ও ছায়ার অনুপাত ফুটিয়া উঠিবে। অতএব, যদি প্রতি কাচখণ্ডে তাহার অনুযায়ী রঙীন আলো ফেলিয়া তিনখানিই একসঙ্গে দেখা যায়, তাহা হইলে আমাদের চক্ষে এক কালে ঐ তিন রঙেরই আলো ও ছায়ার অনুপাত অনুভূত হইবে। সুতরাং আমরা ছবিটী স্বাভাবিক রঙেই দেখিতেছি, এইরূপ অনুভব করিব।

একই সময়ে তিন রঙে রঙীন করিয়া ছবি তিনটী দেখিবার নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। ফ্রান্সের লিঁ নগরীর লুমিয়ের কোম্পানীর (Lumiere et ses fils)

পদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইঁহারা তিনখানি কাচ ব্যবহারের আবশ্যকতা দূর করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রক্রিয়াতে প্রথমে অনেক শ্বেতসারের দানাকে (Starch granules) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া খণ্ডিত করা হয়, এবং যখন সেগুলি এত ছোট হইয়া পড়ে যে, এক মিলিমিটার (Millimetre, প্রায় একটী ধানের প্রস্থ) দৈর্ঘ্যে চল্লিশ পঞ্চাশটী দানা পাশাপাশি সাজাইতে পারা যায়, তখন সেগুলি তিন ভাগ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী মৌলিক রঙ্গে রঞ্জিত করা হয়। তাহার পর রঞ্জীন শ্বেতসারের দানাগুলি এইরূপ পরিমাণে মিশান হয় যে, মিশ্রটী দেখিতে সাদা বোধ হয়। তখন একটী সমতল কাচখণ্ডে অল্প স্বচ্ছ আঠা মাখাইয়া তাহার উপর এই মিশ্রটী সমানভাবে ছড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং যাহাতে কেবলমাত্র একটী করিয়া দানার স্তর পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। রঙ্গীন দানাগুলির মধ্যে যে ফাঁক পড়িয়া থাকে, সেগুলি অতি সূক্ষ্ম কাঠ-কয়লার গুঁড়া বা সম্পূর্ণ কাল রঙ্গের অপর কোনও চূর্ণ দিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর সমস্তটী স্বচ্ছ আঠা দিয়া সমতলভাবে আবৃত করা হয়। আঠাটীর এইটুকু বিশেষত্ব থাকে যে, ইহার ভিতর দিয়া জল যাইতে পারে না, (Impermeable)। ইহার উপর সাধারণ আলোকচিত্র তুলিবার মশলা মাখান হয়। লীপ্‌ম্যানের প্রক্রিয়ার মত, ছবি তুলিবার সময় কাচের পরিষ্কার দিকটী আলোকচিত্রের বিষয়টীর দিকে রাখিতে হয়। সুতরাং বিষয়টীর প্রতিবিম্বটী তিন রঙ্গে রঞ্জীন স্বচ্ছ শ্বেতসারের দানার মধ্য দিয়া যাইয়াই তবে মশলার উপর পড়িতে পায়। রঙ্গীন স্বচ্ছ দানাগুলি ঠিক রঙ্গীন স্বচ্ছ পর্দ্দার কাজ করে, এবং তাহার ফলে এই একটী কাচখণ্ডই ঠিক তিনটী বিভিন্ন রঙ্গীন আলোকে ব্যবহৃত তিনখানি কাচের সমান-গুণযুক্ত হয়। এইবার ছবিটী পরিস্ফুট করিতে হয়। এখানেও অল্প বিশেষত্ব আছে। পরিস্ফুটন ও স্থাপন কার্য্য শেষ হইলে কাচের পরিষ্কার দিকটী আলোতে ধরিয়া ছবি দেখিতে হয়। তাহা হইলে আলোটী স্বচ্ছ রঙ্গীন পর্দ্দার ভিতর দিয়া আসিয়া প্রতি রঙ্গের অনুরূপ প্রতিবিম্বের অনুরূপ অংশে পড়িবে, এবং তাহার ভিতর দিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। কিন্তু ছবিটী সাধারণ আলোকচিত্রের মত পরিস্ফুট করিলে, ছবি তুলিবার সময় মশলার যে অংশে আলো পড়িয়াছিল, সেই অংশে অস্বচ্ছ রূপার স্তর সৃষ্ট হয়; ছায়ার ভাগটী স্বচ্ছ থাকে। সুতরাং দেখিবার সময় বিষয়টীর রঙ্গীন অংশগুলি ছবিতে বর্ণহীন দেখাইবে, এবং বর্ণহীন অংশটি রঙ্গীন দেখাইবে। সেই জন্য, ছবিখানি পরিস্ফুট করিয়া স্থাপন করিবার পূর্ব্বে, একটি বিশেষ

দ্রবে ডুবাইতে হয়। ঐ দ্রবের গুণে রূপার পাতগুলি গলিয়া যায়। তাহার পর ফুলদার ছবির যাহা অর্থাৎ ছায়ার ভাগটি পরিষ্কার করিতে হয়। এইবার ছবিটি আলোর দিকে ধরিয়া দেখিলে, ঠিক স্বাভাবিক রঙ্গে দেখা যাইবে; কারণ, ছবিটির যে অংশে আলো পড়িয়াছিল, সেই স্থানগুলি এইবার স্বচ্ছ থাকিবে, এবং ছায়ার স্থানগুলি ছায়ার অনুপাতে অস্বচ্ছ থাকিবে।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়াতে একটি কাচে একটিমাত্র ছবি হইবে। কিন্তু উপযুক্ত কাগজে তাহা স্বাভাবিক রঙ্গে মুদ্রিত করা যায় না; কাচে পাওয়া যাইতে পারে। কাগজে স্বাভাবিক রঙ্গে আলোকচিত্র মুদ্রিত (Print) করিবার একটি উপায় অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেটিও আমাদের বর্ণানুভূতি-শক্তির উল্লিখিত বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। প্রক্রিয়াটির নাম বিবর্ণীকরণ প্রক্রিয়া (Bleach out Process)।

এই প্রক্রিয়াতেও প্রথমে তিনটি মৌলিক রঙ্গের আলোকে তিনখানি কাচ ব্যবহার করিতে হয়। প্রভেদ এই যে, সবুজ ও বেগুনীর পরিবর্ত্তে নীল ও হরিদ্রা ব্যবহৃত হয়। লাল রঙ্গ ও বেগুনের এই দুইটি রঙ্গেরও উপযুক্ত মিশ্রণে সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক বর্ণ পাওয়া যায়। এমন কি, অনেকের মতে এই তিনটিই মৌলিক রঙ্গ বলিয়া গণ্য। এইরূপে তিন রঙ্গের আলো ব্যবহার করিয়া তিনটি ছবি তোলা হইলে পর, মুদ্রণ কার্য্যের জন্য কাগজটি ঠিক করিতে হয়। আলোক-চিত্রের জন্য এক প্রকার বিশেষ বসন কাগজ পাওয়া যায়; তাহার এক খণ্ডে কয়েকটি আরক মাখাইতে হয়; তন্মধ্যে লৌহবিরল-ঘটিত একটি পদার্থের দ্রব (Iron Compound) থাকে। সেই জন্য সাধারণ সাদা ও কালো ছাপের পরিবর্ত্তে, নীল ও সাদা ছাপ পড়ে। কাগজটির উপরে প্রথমে হরিদ্রা রঙ্গের আলোতে তোলা ছবির কাচখানি রাখিয়া ছাপ লইতে হয়। এই কাগজ-খানিতে তাহার পর জিলে পাকা হরিদ্রা রঙ্গ গুঁড়া মাখাইয়া দিতে হয়। এই কার্য্যের জন্য ওরান্‌শিয়া (Aurantia) প্রস্তুত। এইবার কাগজখানি একটি বিবর্ণ করিবার (Bleaching Solution) আরকে ডুবাইতে হয়। বিভিন্ন মশলা অনুসারে বিভিন্ন আরক ব্যবহৃত হয়। আরকের গুণে নীল রঙ্গটি বিবর্ণ হইয়া যায়। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, নীল রঙ্গটি কোনও একটি ক্লোরীন পদার্থের দ্রব। সুতরাং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঐ দ্রবটি গলিয়া যাইলে, ঐ অংশে যে হরিদ্রা রঙ্গ লাগিয়াছিল, তাহাও চলিয়া যাইবে। কিন্তু

* British Journal of Photography, 1917.

যে স্থানে নীল রঙ্গ ছিল না, সে স্থানে কোনও স্তর উঠিয়া যাইবে না ; সুতরাং সে অংশে হরিদ্রা বর্ণের ছাপ রহিয়া যাইবে। ফলে কাগজে ঠিক কাচখানির আলোক ভাগের অনুযায়ী হরিদ্রা রঙ্গে ছাপ পড়িবে। অপর অংশ সাদা হইয়া থাকিবে।

এইবার কাগজখানিতে পুনরায় পূর্ব্বের নীল ছাপ তুলিবার দ্রবসমূহ মাখাইতে হইবে। এইবারে লাল রঙ্গের আলোকে তোলা ছবির কাচখানি ব্যবহার করিতে হইবে। মুদ্রণের পর ছবি পরিস্ফুটন করিয়া কাগজের উপর এক ছোপ লাল রঙ্গ বুলাইয়া দিতে হইবে। লাল রঙ্গের মধ্যে ইয়োসিনই (Eosin) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার পর পুনরায় পূর্ব্বের মত নীল রঙ্গের ছাপটিকে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে গলাইয়া ফেলিতে হইবে।

এইবার শেষ রঙ্গের নিমিত্ত কাগজখানিতে সেই নীল ছাপ তুলিবার দ্রবসমূহ মাখাইতে হইবে। এইবার কাগজখানিতে মুদ্রণ, পরিস্ফুটন ও স্থাপন কার্য্য সাধারণ নীল ছাপের (Blue Print) ছবির মতই হইয়া থাকে। সুতরাং কাগজখানিতে তিনটি কাচের অনুযায়ী আলো ও ছায়ার বিকাশ ঘটে এবং ঐ আলো ও ছায়াতে বর্ণ-সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়। ফলতঃ, ছবিখানি ঠিক স্বাভাবিক রঙ্গেই দেখা যায়।

এই প্রক্রিয়ার উত্তরোত্তর যেরূপ উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অতি অল্প কালের মধ্যেই একেবারে আলোকচিত্র-যন্ত্রেই কাগজে স্বাভাবিক রঙ্গের ছাপ, অতি সহজে লইতে পারা যাইবে। তিনখানি কাচ ব্যবহার করিবার ও তিনখানি ছাপ লইবার কোনও প্রয়োজন হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উঠিতে পারে যে, তিনবার ছবি তুলিতে হইলে, রঙ্গীন পর্দ্দার পরিবর্ত্তন প্রভৃতির ফলে ছবি তিনটির ইতরবিশেষ ঘটিতে পারে। সুতরাং একই কাগজে ছবি তিনটি ছাপিলে, একটি ছাপের এক অংশের উপর আর একটি ছাপের অপর অংশ পড়িবে, এবং ছবিটি ঝাপসা দেখাইবে। এ জন্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুবিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহাদের এক জন, সাঙ্গার শেফার্ডের (Sanger Shepherd) যন্ত্রে এই তিন রকমের ছবি একখানি বড় কাচে, একই সময়ে, পাশাপাশি লওয়া হয়। সুতরাং ছবির বিষয় অল্প নড়িলেও, ছবি তিনখানিতেই সমান পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া, কোনও ক্ষতি হয় না। ছাপ লইবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ফলে, ছবিতে কোনও রূপ ঝাপসা ভাব দেখা যায় না। বেলীর (Bailey) ফটোগ্রাফী ইন্ কালার্স (Photography

in Colours) প্রবন্ধে, ফিলাডেলফিয়ার আইভ্‌সের লৈখিক প্রবন্ধসমূহে (Journal of the Frank Instt) এবং ব্রিটিশ জার্ণাল্ অফ্ ফটোগ্রাফীতে (British Journal of Photography) এই সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণী পাওয়া যাইবে। শেষোক্ত বার্ষিক পত্রে পরিস্ফুটন, স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য রাসায়নিক দ্রবসমূহের পরিমাণ ও প্রয়োগের সবিশেষ বিধান আছে।

প্রবন্ধ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে প্রফেসর রবার্ট উডের (Prof. Robert Wood) * আবিষ্কৃত একটি অতি সুন্দর প্রক্রিয়ার সামান্য পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রফেসর উডের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে, আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু বেশী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশদভাবে উপায়টির আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে; কিন্তু অন্যের উপর নির্ভর করিলে, বিষয়টি সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অবোধ্য হইবে। কেবলমাত্র এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এই প্রক্রিয়ায়ে ডিফ্র্যাক্‌শন্ গ্রেটিং নামক যন্ত্রের (Diffraction Grating) † তিনটি নাম বর্ত্তমান থাকে। একটি "জাফরী যন্ত্র" (Grating) ‡ ছবিতে লাল রঙের অনুভূতি উৎপন্ন করিবার শক্তি প্রদান করে; আর একটি সবুজ ও অপরটি বেগুনী রঙের সংযোগ করে। তাহাদেরই সাহায্যে রঙীন বিষয়টি মৌলিক রঙ তিনটিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া পুনরায় একটি ছবিতে একত্রিত করা হয়, এবং তাহার ফলে ছবিটি স্বভাবানুযায়ী রঙ প্রকাশ করে।

এই প্রক্রিয়ায় সাজসরঞ্জামের মূল্য একটু বেশী হইলেও, ছবিগুলি এত সুন্দর হয়, এবং একবার একটি ছবি ঠিক তৈয়ারী করিলে, তাহা হইতে এত অধিক ছবি এত অল্প আয়াসে ছাপিয়া লওয়া যায় যে, এই প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাভাবিক রঙের আলোকচিত্র বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর দ্রুতগতিতে উন্নতি সাধিত হইতেছে; তাহা সত্ত্বেও এখনও প্রক্রিয়াসমূহে অনেক দোষ আছে। কিন্তু সেগুলি নিবারণের জন্য গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

* Nature, June, 1899.

† সমান্তরাল, সম-ব্যবধানযুক্ত সূক্ষ্ম রেখাময়, সমতল কাচখণ্ড; ইহার দ্বারা সাদা আলোকে বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট করিয়া, রশ্মিগুলিকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে বাঁকাইয়া দেওয়া।

‡ জাফরীর এক দিক অতিশয় সূক্ষ্ম হইলে যন্ত্রের রেখা করের ruling) যত দেখান হইয়া, এবং কর্ণে ও শাদা ইংরাজী বাকাটীর সহিত কিঞ্চিৎ মিল আছে বলিয়া, আমি এই পরিভাষাটী ব্যবহার করিয়াছি।

সে কৌশল, কেবলমাত্র অধ্যবসায় ও অভ্যাসের ফলেই জন্মে। যাঁহারা আলোকচিত্র-বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা তুরূহ নহে; কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় ও উদ্যমের অপেক্ষা মাত্র। সেইজন্য আমার বোধ হয়, আমাদের দেশে ইদানীং যে সকল ব্যক্তির ছবি তুলিবার সখ জন্মিয়াছে—তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে—তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যের সহিত মিষ্টার আইভ্‌সের প্রদর্শিত পন্থায় স্বাভাবিক রঙ্গে আলোকচিত্র তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের নিজেদেরও যথেষ্ট আনন্দবর্দ্ধন হইবে, এবং আলোকচিত্র-বিদ্যার স্বাভাবিক ভাব দিকে ক্রমবিকাশেরও যথেষ্ট অবকাশ ঘটিবে।

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ঈথার।

এই ঈথারের মধ্যে আলোকের গতি কিরূপে সাধিত হয়, এখন তাহার আলোচনা করিব। সাধারণ পদার্থের অণু-স্পন্দন দ্বারা শব্দ-তরঙ্গ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। যে বস্তু শব্দ উৎপন্ন করিতেছে, বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই বস্তুটি কাঁপিতেছে। কাজেই যেটি কাঁপিতেছে, সেটি তৎসংলগ্ন বায়ুসের অণুগুলিকে কাঁপাইবে। ফলে সেই কম্পিত বায়ু-অণুগুলি তৎপার্শ্বস্থ অণুগুলিকে আন্দোলিত করিবে। এইরূপে সেই কম্পন চারি দিকে চলিয়া যাইবে, দূর হইতে দূরান্তরে গমন করিবে, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এইরূপে শব্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। সেই কম্পিত বায়ুকণাগুলি যখন আমাদের কানের পাতলা (ঝিঁ ঝিঁ পাতের ন্যায় পাতলা) চামড়ার (tympanum) উপর ঘাত প্রতিঘাত করে, তখন কর্ণস্থ শব্দবাহী স্নায়ুমণ্ডল শব্দের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। আলোকের গতিবিধি কিন্তু এরূপ নহে। কোনও পদার্থ শব্দ-তরঙ্গের ন্যায় আলোক-তরঙ্গকে বহিয়া লইয়া যায় না। কারণ, (১) আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩×১০১০ সেণ্টিমিটার বা ১৮৬০০০ মাইল। পদার্থ দ্বারা প্রবাহিত কাহারও এত দ্রুতগতি নহে। ইহাই প্রথম কারণ। (২) যে স্পন্দন দ্বারা আলোক-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সে স্পন্দন লম্বালম্বি ভাবে না হইয়া, আড়া-আড়ি ভাবে হইয়া থাকে। পোলারিজেসন আলোকের আড়া-আড়ি স্পন্দনেই তাহার প্রমাণ। তরল ও বায়বীয় পদার্থের

অণুগুলি অসংলগ্ন, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন—অর্থাৎ অণুদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক আছে (intermolecular space)। সুতরাং তরল বা বায়বীয় পদার্থের অণু দ্বারা আলোক-স্পন্দন প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নহে। যদি কোনও প্রকার অণু দ্বারাই আলোক-স্পন্দন স্থানান্তরিত হইতেছে, এরূপ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে বরং কঠিন বস্তুর অণু দ্বারা তাহা সম্ভব। এখন কঠিন কাহাকে বলে, বুঝিতে হইবে। বস্তুর কাঠিন্য গুণ বলিতে কি বুঝায়, তাহা ভাল করিয়া প্রণিধান করিতে হইবে। যে গুণ থাকাতে বস্তু তাহার আকার পরিবর্ত্তনের পথে বাধা দেয়, তাহার নাম কাঠিন্য। যে বস্তুতে এই গুণ আছে, তাহাকে বৈজ্ঞানিকগণ কঠিন শব্দে অভিহিত করেন। ইহাকে স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) বলিতে পারা যায়। স্থিতিস্থাপকতাই কঠিন বস্তুর বিশিষ্টতা। ইহা দ্বারাই কঠিন বস্তুকে সরিল (fluid) পদার্থ হইতে পৃথক করিতে পারা যায়। স্পন্দন-প্রবাহী হইতে হইলে বস্তুটির (Inertia) থাকা চাই। যে বস্তুতে স্থিতিস্থাপকতা ও Inertia গুণ আছে, কেবল সেই বস্তুর অণু দ্বারাই আড়াআড়ি স্পন্দন প্রবাহিত হওয়া সম্ভব। পদার্থমাত্রই Inertia গুণে বিভূষিত; কিন্তু সরিল পদার্থে কেবলমাত্র Volume elasticity আছে, কাজেই তাহা দ্বারা লম্বালম্বি স্পন্দনই প্রবাহিত করা যাইতে পারে। আড়াআড়ি স্পন্দন হইতেই আলোকের উৎপত্তি। বায়ু, জল প্রভৃতি সরিল পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা গুণ নাই। অতএব, তাহারা স্বচ্ছ, অর্থাৎ আলোক-স্পন্দন তাহাদের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঈথার সকল দ্রব্যের মধ্যে ও বাহিরে ওতঃপ্রোত-ভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। সুতরাং বায়ু, জল প্রভৃতি সরিল পদার্থের মধ্যে যে ঈথার আছে, সেই ঈথারই আলোক-স্পন্দন বহিয়া লইয়া যায়। ঈথার যদি কোনও পদার্থই হয়, তবে তাহাকে আমরা কাঠিন্য ও Inertia গুণে ভূষিত করিব। বিরলীকৃত বায়ুর এই দুই গুণ থাকে না; সুতরাং তাহাতে আমাদের কাজ চলিবে না। ঈথার নিশ্চয়ই সরিল পদার্থ হইতে বিভিন্ন। গ্রহনক্ষত্রপূর্ণ বিশ্ব আকাশেও বায়ু থাকিতে পারে। এবং যদি থাকে, তবে তাহা অতি পাতলা, অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকিবে। ঈথারের আপেক্ষিক গুরুত্ব আমাদের ঠিক জানা নাই। কেহ বলেন, খুব বেশী; কেহ বলেন, খুব কম। একবার ঈথারের আপেক্ষিক গুরুত্ব জানিতে পারিলে, তাহার স্থিতিস্থাপকতা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারা যায়; কেন না, স্থিতিস্থাপকতা ও আপেক্ষিক গুরুত্বের অনুপাত আড়াআড়ি তর

গতির বর্গের সহিত সমান। মনে কর, স্থিতিস্থাপকতাকে যদি 'ক' ও আপেক্ষিক গুরুত্বকে 'অ' ও আড়াআড়ি তরঙ্গ-গতিকে (Velocity of transverse wave) যদি 'গ' বলা যায়, তবে

$$গ^২ = \frac{ক}{অ}$$

এই সমীকরণ হইতে ঈথারের স্থিতিস্থাপকতার (rigidity) পরিমাণ = ৯ × ১০^২০। সকল পদার্থের মধ্যে কঠিনতম পদার্থ হইতেছে ইস্পাত। তাহার স্থিতিস্থাপকতা = ৮ × ১০^১১ সেঃ গ্রাঃ সেঃ (C. G. S.) পদ্ধতি-অনুযায়ী মাপ। ইস্পাতের মধ্য দিয়া আলোকের গতিতে কোনও স্পন্দন চলিয়া যাইতে পারে না; কাচের মধ্য দিয়াও আলোকের গতিতে কোনও স্পন্দন প্রবাহিত হইতে পারে না। না পারিবার কারণ তাহাদের অনমনীয়তা, অর্থাৎ তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক বলিয়া আলোকের ন্যায় অত বড় গতিতে কোনও স্পন্দন তাহাদের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। ক্রাউন কাচের মধ্য দিয়া আড়াআড়ি স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ লক্ষ সেণ্টিমিটার গতিতে প্রবাহিত হয়। খুব বড় গতি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কাচের মধ্যস্থ ঈথার তদপেক্ষা ৪০,০০০ গুণ অধিক গতিতে আড়াআড়ি স্পন্দন প্রবাহিত করিতে পারে। অর্থাৎ, তখন ঈথার ২ × ১০^১৫ সেণ্টিমিটার গতিতে আড়াআড়ি স্পন্দন-বহনে সমর্থ। কাচের বাহিরে স্থিত ঈথার তদপেক্ষাও অধিক গতিতে আড়াআড়ি স্পন্দন বহন করিতে পারে। অর্থাৎ, ইহার স্পন্দন-বহন-গতি—৩ × ১০^১০ সেণ্টিমিটার; এখন কথা হইতেছে, কাচস্থ ঈথার ও বাহিরের ঈথারের এই প্রভেদ কেন? কাচস্থ ঈথার বাহিরস্থ ঈথার অপেক্ষা ঐ গতিতে আড়াআড়ি স্পন্দন বহন করে কেন? কাচের মধ্যস্থ ঈথার কি পার্শ্বস্থ ঈথার অপেক্ষা ঘনীভূত হইয়াছে? অথবা, ইহার স্থিতিস্থাপকতা কমিয়া গিয়াছে? কি হইয়াছে, কেন এরূপ তারতম্য দৃষ্ট হয়? এ প্রশ্নের সমাধান সহজে হইবে না। এ প্রশ্ন বড় জটিল। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়ের সম্পর্কে আসিয়া ঈথারের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আরও বলিতে পারা যায় যে, জড়স্থ ঈথারের আপেক্ষিক গুরুত্ব জড় পার্শ্বস্থ ঈথারের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক; জড় ঘন হইলে, তন্মধ্যস্থ ঈথারও তদনুযায়ী ঘন হইবে।

বিজ্ঞান-জগতে ফ্রেনেলকে (Fresnel) বড় উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছে; তাঁহার মতটা এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না;

তাহা হইলে, ঝড় যে দিকে যাইতেছে, শব্দ সেই দিকে খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে। আর তার ঠিক বিপরীত দিকে খুব আস্তে আস্তে যাইবে। আলোকের বেলা কি এ তর্ক খাটে না? ঝড়ের দিকে কি আলোক দ্রুতপদে গমন করে? যদি বাতাসের সহিত ঈথর চলিয়া যাইতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই আলোক দ্রুতপদে গমন করিবে। আর যদি ঈথার স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, ঝড়ের সহিত ঈথার চলাফেরা না করে; ঝড় চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু ঈথার নড়িতেছে না—যদি এরূপ হয়, তবে আলোক-গতির কোনও তারতম্য হইবে না। যদি আমরা Fresnelএর মত মানিয়া লই, তাহা হইলে বলিতে হয়, ঈথার একেবারে অচঞ্চল অবস্থায় থাকে না, আবার সবটা চঞ্চলও হয় না। মুক্ত ঈথার অচঞ্চল, স্থির; তাহার নড়ন-চড়ন নাই। বাঁধা ঈথারের ঝড়ের সহিত গতি আছে; সুতরাং তাহা চঞ্চল; স্থির নহে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, আলোক-গতি ঝড়-গতির $\left(1-\frac{1}{\mu^2}\right)$ হারে বাড়িবে।

Fizean, Arago, Maxwell প্রভৃতি মনীষিগণ নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা Fresnelএর সিদ্ধান্তে উপনীত হন। জগতে Fresnelএরই জয়-জয়কার ঘোষিত হয়।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। কার্ত্তিক।—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'বাঙ্গালার প্রাণ' ও 'বাঙ্গালী' সাহিত্য প্রবন্ধে স্বদেশপ্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত নানা কথার অবতারণা ও সমালোচনা করিয়াছেন, এবং উপসংহারে প্রতিপক্ষদিগকে শাসাইয়াছেন,—'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্।' নরেশবাবু আমাদের দেশে একটা 'উৎকট স্বদেশপ্রেম' দেখিয়াছেন; হয় ত তাহার অস্তিত্ব আছে। হয় ত তাহা অস্ত বস্তু। হয় ত তাহা এক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমের অভাবের ফল—অন্য ক্ষেত্রে গোঁড়ামীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। নরেশবাবু সেই ভাবের আতিশয্যকেই 'স্বদেশপ্রেমের উৎকট রূপ' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু 'উৎকট স্বদেশপ্রেমে'র বিচারও তাঁহার উদ্দিষ্ট নহে। 'এই স্বাদেশিকতার হাওয়া সাহিত্যের গোপদে ভয়ানক তোলপাড় লাগাইয়া দিয়াছে।' এই স্বাদেশিকতার প্রবক্তাদের বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালার একটা প্রাণ আছে—যাহার সন্ধান তাঁহারা ছাড়া আর কেউ জানেন না।' সাহিত্যের 'গোপদই' বটে। নতুবা এমন সম্বন্ধহীন, মূলসূত্রশূন্য, বিচ্ছিন্ন বক্তব্যের ডোঙ্গা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষিত ছাত্র ও অধ্যাপক তাহাতে নামিতেন না। বাঙ্গালার 'একটা' প্রাণ আছে কি না, জানি না; তবে বাঙ্গালার প্রাণ আছে, জানি ও মানি। তাহার সন্ধান কে জানে, কে না জানে, তাহা জানি না। তবে প্রাণের সন্ধান প্রাণের আধারেই করিতে হয়; অন্যত্র, মিশরের মমীতে বা অন্য দেশের বিগ্রহে বাঙ্গালার প্রাণের সন্ধান করিবার প্রয়োজন প্রকৃতিস্থের হয় না, তাহাও অবশ্য জানি। 'সাহিত্যের ভিতর বাঙ্গালার "বিশেষ সংস্করণে"র প্রাণ থাকিলেই সেটা সাহিত্য', এ কথা লেখককে মানিতে বলিব না। তাহাও নিশ্চয়ই 'সাহিত্য', কিন্তু 'বাঙ্গালার বিশেষ সংস্করণে'র না হউক, অন্ততঃ 'সাধারণ সংস্করণের প্রাণ' না থাকিলে, তাহা 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নয়, ইহা আমরাও বলিয়া থাকি। 'সাহিত্য', 'বিশ্বসাহিত্য', 'বড় সাহিত্য', 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য' প্রভৃতি এ সকল বড় বড় কথার 'বল্' লইয়া আজকালকার কলেজের 'বহির্মুখ' ছাত্রেরা লোফালুফি

করিতেছেন, সকল দেশেই 'জাতীয় সাহিত্য' হইতেই সেই উচ্চ সাহিত্যের—সার্বভৌমিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সাহিত্য সর্বপ্রথমে দৈশিক, জাতীয়। তাহার পর তাহা দেশ-কালের অতীত হইতে পারে। কোনও 'সাহিত্যের আলোপাতই 'বিশ্বসাহিত্য' বন হইতে পারে না; হয় না। জাতীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ ও স্বাভাবিক হইলে তাহাতে মানব জাতির আরাধ্য ভাব-সম্পদের উদ্ভব হইতে পারে, তাহাতে 'বিশ্ব সাহিত্যে'র উদ্ভব হইতে পারে। 'বিলাতী শিক্ষাজাত কোনও সংস্কারের গন্ধ থাকিলেই, তাহার আভ্রাণমাত্র এ যুগে 'নিঠাবান সাহিত্য' 'পিরালী' হইয়া যায় না, তাহা আমরাও মানি। কিন্তু 'বিলাতী শিক্ষা'র সঙ্গে 'বিলাতী সাহিত্যই থাকে; 'বিলাতী সাহিত্য' থাকিবে। 'বিলাতী শিক্ষা' ও 'বিলাতী সাহিত্য' বাঙ্গালা অক্ষরের পোষাক পরিয়া স্বদেশী হইতে পারে না, পারিবে না —লেখক যে বিশ্বসাহিত্যের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তেমনই একটা বিশ্বশিক্ষাও আছে। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সীমার আবদ্ধ শিক্ষা আবশ্যকতানুসারে প্রয়োজনে ও প্রেরণায় জাতীয় সংস্কারের ও দেশ-কালের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও সাহিত্যের সৃষ্টি করে। শিক্ষাও সার্বভৌমিক হইতে পারে। সেই সার্বভৌমিক ও দেশ-কালের অতীত 'শিক্ষার গন্ধ' বিশ্বসাহিত্যে থাকিতে পারে। বড় বড় জাতির বড় বড় সাহিত্যে, বিশেষের শিক্ষার, দেশ-কালের সাহিত্যের গন্ধ আছে; তাহাও সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই 'গন্ধই' 'নিষিদ্ধ' নহে। 'লেখকের বিশেষত্বই হয় ত সাহিত্য। কিন্তু Out-landish উদ্ভট 'বিদেশিত্ব', জাতীয় প্রকৃতির ও জাতীয় সংস্কারের ও জাতীয় ভাবের বিরোধী, বিদেশের আমদানী 'কিম্ভূত' কোনও সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিতে পারে না। না বলিয়া 'কি সাহিত্য' হইতে গৃহীত গ্রন্থ ও গল্প ও বিদেশস্থ সংগ্রহমাত্র; 'সৃষ্টি' নহে। তাহা বিশ্বসাহিত্যের অনুসরণ। কোনও সাহিত্যে তাহার আমদানী করিলে, সে সাহিত্য পুষ্ট সমৃদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সেই সাহিত্য 'বিশ্বসাহিত্য' বলিয়া দাবী করিতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের কত কি, কোথারও আমদানী হইতেছে; কিন্তু তাহা বাঙ্গালা সাহিত্য 'বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উঠিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর প্রাণ হইতে যদি বিশ্বের বরেণ্য ভাব-সম্পদের উদ্ভব হয়, তবে বাঙ্গালা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নিশ্চয়ই আপনার স্থান অধিকার করিবে। 'বিলাতী সাহিত্যে যে কোন মাথা কিছু ভাল ও বড় বলিয়া সকলের কাছে, এমন কি সমস্ত পৃথিবীতে, আদর পাইতেছে, সে সমস্তই এই "বিলাতী আবহাওয়া"র রচিত বলিয়া একবারেই বাতিল ও নামঞ্জুর—"সেটা বাঙ্গালী" সাহিত্য নয়'—পড়িয়া আমরা সত্যই বিস্মিত হইলাম। বাঙ্গালা সাহিত্য যাহা কিছু বড়, সবই 'বিলাতী আবহাওয়ায়' রচিত? যাহা দেশের আবহাওয়ায় রচিত নয়, এবং যাহা একান্তভাবে বিলাতী, তাহা নিশ্চয়ই বাতিল ও নামঞ্জুর। 'পৃথিবীতে', এমন কি, লোকে ও পাতালে 'আদর পাইলেও' তাহা 'বাঙ্গালী' সাহিত্য নয়, সাঙ্গালা সাহিত্য নয়। 'ইলিয়াড' কি 'বিলাতী আবহাওয়ায় রচিত?' ম্যাক্‌বেথের ডাইনী বুড়ীদের 'আবহা বো কুয়া দিয়া কিছু নিরক্ষর' মনে পড়ে। সেই 'আবহাওয়া' ও 'কুয়া'র কি 'গীতাঞ্জলি'র গানের মত ফুটিয়াছে, যা ফুটিতে পারে? 'পৃথিবীর আদরের' আশায় কোনও সাহিত্যিক পৃথিবীর সাহিত্য ছাঁনিয়া তিলোত্তমার মত বরোত্তমা সাহিত্য-হীর সৃষ্টি করিবেন না। বিলাতী আবহাওয়ায় অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সৃষ্টি হয় নাই, মেঘদূতের সৃষ্টি হয় নাই: তবু তাহা বিশ্বসাহিত্য, আশা করি, লেখকও তাহা অস্বীকার করিবেন না। সেদিনও রবীন্দ্রের যে গীতগোবিন্দ গাহিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, আর্নেল্ড তাহাকেও বিশ্বসাহিত্য বলিয়া বরণ করিয়াছেন। 'বিশ্বসাহিত্য' নামক কথাটার সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বে রামায়ণ মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারও নিশ্চয়ই বিশ্বসাহিত্য। আর একটি কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বিশ্বসাহিত্যের এই সকল 'পরিকল্পকের 'বিশ্ব' কি জানেন? একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। আমাদের বাঙ্গালার জাতির বাসভূমি। তাঁহাদের বেদিনকার দ্বৈপায়ন সাহিত্যই তাঁহাদের বিশ্বসাহিত্য, এবং সেই দ্বৈপায়ন-সমাজের ভেতরে, তাঁহাদের মতে, সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও পরম পুরস্কার। নাগাদ বিলাতী কুকুর ও ইংরেজ বিলাতী কুকুর পর্যন্ত তাঁহাদের দৌড়। পৃথিবীর মধ্যে ঐ দ্বীপটিতেই মানবের মন যেন উপাদানে গঠিত যে, তাহার

অন্য জাতিকে বাড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের সাহিত্য বুঝিবার বিষয়েও তাহাদের পক্ষে উহা একটা খুব বড় বাধা। 'বিলাতী হাঁড়িমালি রচিত' সাহিত্য তাহাদের পক্ষে সহজ, অতএব, তাহাই কখনও কখনও তাহাদের আদর পায়; তবে সে আদর অরোরা-বোরিয়ালিসের মত ছ' মাস থাকিবে, অথবা বিদ্যুতের মত নিমেষে মিলাইবে, তাহা বলা যায় না। অথচ, এই আদরের লোভে আমাদের সাহিত্য তাহার স্বাতন্ত্র্য ছাড়িবে, জাতীয় ভাব ছাড়িবে; বাঙ্গালীর মানসী শাড়ী ফেলিয়া গাউন ধরিবে। উড়িষ্যুবিজেতা চণ্ডীদাসের প্রসাদী তুলসীর মালা ফেলিয়া দিয়া বনেট পরিবে। কথা-সরিৎসাগর ও অর্দ্ধাধিক-সহস্র-রজনী প্যাণ্টোমাইমে নাচিতে আরম্ভ করিবে। নতুবা 'বিশ্বসাহিত্যে' আমার সাহিত্যের আদর হইবে না। পক্ষান্তরে, তোমার আধুনিক সাহিত্যই বা কতটুকু! সেই স্বপ্নপ্রাণ সাহিত্যকে জাতীয়তার ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিয়া, বিদেশী আদর্শের দাস করিয়া, এবং মৌলিকতার স্বপ্ন পর্য্যন্ত ভুলাইয়া যদি 'বিশ্বসাহিত্যে'র সৃষ্টি করিতে পার, কর। কিন্তু বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালা ও তোমার মতে 'বাঙ্গালী' সাহিত্যের সৃষ্টি করিবার জন্য প্রাণপণ করে, তাহাতে আপত্তি করিও না। তুমি যে 'শিক্ষা' পাইয়াছ, তাহার ধর্ম্মই এই যে, তাহা স্বদেশকে দেখিতে দেয় না, বিদেশকে দেখিবার চক্ষু ও চশমা দুই-ই দান করে। স্বদেশী সাহিত্যের গৌরব বুঝিবার বুদ্ধি স্বদেশী সাহিত্যই দিতে পারে। বিদেশী সাহিত্যের চিনির বলদের পক্ষে স্বদেশী সাহিত্য, স্বদেশী তত্ত্ব, স্বদেশী ভাব অজ্ঞেয়! বিশ্বের সাহিত্যে বিশ্বমানবের সঙ্গে তোমারও সমান অধিকার। কিন্তু প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব সাহিত্য আছে, এবং তাহাই সেই জাতির সাহিত্য; এবং জাতির জীবনের পক্ষে বিশ্বসাহিত্য অপেক্ষা তাহার প্রয়োজনও অল্প নহে। বোধ করি, বিশ্বসাহিত্যে'ও এমন উপদেশ আছে।—'যাহা কিছু "বাঙ্গালীর" তাহাই জগতের সার' নিশ্চয়ই নহে; কিন্তু তাহাই 'বাঙ্গালীর সার'। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী বলিয়াই আমার; সুইনবর্ণ আমার নহেন। বিশ্বসাহিত্যও কি মমতাবুদ্ধির বিনিময়ে, জাতি-প্রীতির নিষ্ক্রয়ে, স্বদেশী সাহিত্যের মূল্যে 'সার্ব্বভৌমিকতা' ক্রয় করিবার পরামর্শ দেয়?—বলিতে পারি না। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘানী-গাছে যে দুর্গন্ধ তেল পেষা হইতেছে, তাহা যে বিশ্বসাহিত্যের দানা হইতে নিঃসৃত হয় নাই, এই নমুনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।—লেখকের অনেক মতই এইরূপ। সর্ব্বোপরি প্রাচীন সাহিত্য ও নবীন 'বাঙ্গালিকতা'র অর্চ্চি লেখকের ঘৃণা দেখিয়া দুঃখ হইতে হয়।—যে 'বিশ্ব-সাহিত্য অর্থাৎ ফোলদীঘীর বিশ্ব-বিদ্যুৎ উদার সাহিত্য এমন নহীনতার সৃষ্টি করে, তাহাকে বারবার নমস্কার করি। 'বাহির হইতে কিছু আনিলেই যে আমরা বাহিরের দাস হইয়া যাই, এমন কথা সাহিত্যে খাটে না।' কিন্তু 'দাস হইয়া' বাহির হইতে কিছু আনাকেই যদি বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যের চরম লক্ষ্য বলিয়া ভাবি, তাহা হইলে, আমরা যে নিত্যসত্যই 'দাস', তাহা নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। বাহির হইতে আনিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক তর্জ্জমা-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের বা বিশ্বসাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। বাহিরের ভাবের আঘাতে অন্তরে প্রতিঘাতের সৃষ্টি, এবং সেই প্রতিঘাত হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু 'বাহির হইতে' আনা কোনটি বস্তুই 'সাহিত্য' নহে। ভিতর হইতে যাহা আসে, তাহাই সাহিত্য—অন্ততঃ পুরাতন ঘরের এইরূপই প্রতীতি। যাহার নিজের ঘরে ও ঘটে কিছু নাই, সেই বাহির হইতে আনে। কেহ বলিয়া আনে, কেহ না বলিয়া আনে। যে না বলিয়া আনে, তাহাকে চোর বলে। আমাদের দেশে এমন বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় দিবার জন্য 'চোর-পঞ্চাশৎ' লিখিবার সময় আসিয়াছে।—দেড় শত বৎসরের অধীনতার ও রাজকৃত অবজ্ঞা-স্বীকার্য্য বিদেশী শিক্ষার ফলে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের বরেণ্য প্রতিভাও বিদেশী সাহিত্যের ছায়ায় মলিন হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা আশা করি, কেটে যাবে মেঘ; নবীন পরিমার আলোকে স্বাতন্ত্র্যে আমাদের সাহিত্য কালে রাহু-মুক্ত সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে; তখন আমরা বিলাতী 'আবহাওয়া ও কুয়াশা' কলিকাতার পণ্ডশ্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব, এবং সেই প্রতিভাশালী মহাপুরুষের স্মরণে বলিতে পারিব, —'ওমর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' শ্রীসীতা দেবীর 'ভ্রষ্টতারা' গল্প, তবে

গ্রন্থের পূর্ণ অঙ্গ। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায়ের 'ব্যঙ্গ চিত্র' সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত সুকুমার চক্রবর্ত্তীর 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুলনা' নামক প্রবন্ধে অনেক তথ্য আছে। সংক্ষেপে লেখকের মতের আলোচনা করিবার উপায় নাই; ইহার অন্যান্য পক্ষে একটা সঙ্গতি আছে: কোনও একটা মতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। ইউরোপের সাহিত্যে যাহা আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা নাই,—এ কথা লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন; এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপের যে সকল বস্তুর আমদানী হইয়াছে, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। ইউরোপের সাহিত্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও কারণপরম্পরার ফলে, বাঙ্গালায় তাহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে তত সবের আশা কি স্বাভাবিক?—অন্য দেশের সাহিত্যে যাহা আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যেও ঠিক তাহাই থাকিবে, বা তাহা না থাকিলে চলিবে না, এ ধারণাই কি সমীচীন? শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'চিত্র-প্রতিমূর্ত্তি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার ঠাকুরের 'পল্লী-প্রশস্তি' তথৈবচ।

ভারতী। কার্ত্তিক।—'হরপার্ব্বতী' এখানি প্রাচীন চিত্রের প্রতিচ্ছবি।—ইহাতে অঙ্কিত পুরুষ ও নারী হর ও পার্ব্বতী হইলেন কেন, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই; বোধ হয়, কিম্বদন্তী এই চিত্রে এই অভিধার আরোপ করিয়া থাকিবে। অঙ্কিত নর-নারী বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, রাজা ও রাণী হইলেও আপত্তি করিবার কারণ নাই। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'শরৎ-সুন্দরী' নামক ছড়াটি তরল ছন্দে রচিত। শরৎ সুন্দরী 'যেতে মুখ নাড়ান ঘরে' এবং 'পথের বাঁক দিয়ে' কেন চলিবেন, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না; তাঁহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাঁহাকে না জানিয়া কেন, তাহাই বা কে বুঝিবে? 'শরৎ-সুন্দরী' অত্যন্ত 'ভাবুকা', উদ্ভট ও খোলো কল্পনা। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কিঙ্করী' একটি বিশেষত্বরহিত ক্ষুদ্র উপাখ্যান। ইহাতে কিঙ্করীর পাঁচ বৎসর বয়স হইতে, বোধ হয়, শেষ বয়স পর্য্যন্ত একটা জীবনচরিত আছে। মেয়ে-বাজার বিশ্বস্তীর সৌন্দর্য্যের সূচনা, থিয়েটারে তাহার নিকাশ, বাৎসল্যে তাহার পরিণতি। কিন্তু সমস্তটাই যাত্রার ও থিয়েটারের নাটুকে 'চঙে' বিড়ম্বিত। ইহা 'ছোট গল্প' নয় বড় গল্পের হিসাবেও সুখপাঠ্য ও সুসঙ্গত নয়। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বর্ষা-যাপন' নামক সুদীর্ঘ পদ্যটি বোধ হয় প্রথমশ্রেণিকা। ইহাতে অনেক কাব্যিকতা আছে, কিন্তু কবিতা নাই, কবিত্ব নাই। দুই একটি সুন্দর চরণ আছে,—'মাথার পরে মেঘ-নগরে বজ্ররথে ঐরাবতে আষাঢ়।' আবার 'ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকে' সেই বোকামী আছেও আছে। কিন্তু সমস্ত কবিতাটির বক্তব্য কি, তাহাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের 'সভ্যতা বনাম পল্লীজীবনের শিরোনামা খুব ভালো হইলে, কিন্তু বস্তু অত্যন্ত অল্প। ত্যাগ, ভোগ প্রভৃতি কয়েকটি মামুলী শব্দের চর্চ্চড়ী। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাঙ্গালার ব্রত' উল্লেখযোগ্য—অনেক নূতন তথ্য আছে। শ্রীকালিদাস রায়ের 'বুকো ধনে' এক বুড়ীর মুখে বাৎসল্যের কথা আছে। শ্রীশরাৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সে দিন একটি ছোট পাখী এই ভাবেই বুঝাইয়াছেন। কবি কালিদাস পরবর্ত্তী। সেই বুড়ীর মনের কথাই ছন্দোবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু মনের ইচ্ছা কবিতায় সফল হয় নাই; বিড়ম্বনারই সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'মাসকাবারি'তে 'আধুনিক সাহিত্য কি অবনতিশীল?' এই প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রধানতঃ আর্থার সাইমন্স ও বার্ণার্ড শ'র মতের পরিচয় দিয়াছেন।

চন্দ্রের বঙ্গ-বিজয়। (ইতিহাস)

চন্দ্র নামক কোনও 'ভূমিপতি' খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শত্রুভূত বাঙ্গালীকে সমরে পরাভূত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এই পরাভব-কাহিনী প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাষাণে নয়, তাম্রপট্টে নয়,—লেখটিকে চিরস্থিতিশীল করিবার অভিপ্রায়ে কোনও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মহাপ্রতাপ মহারাজাধিরাজ সম্রাট্ তাঁহাকে বহু-ব্যয়ে উত্থাপিত একটি উচ্চ লৌহ-স্তম্ভে (১) উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লী নগরীর নাভিস্থলে মেহরৌলী নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ কুতুব-মীনারের নিকটে এই লৌহস্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান আছে। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত-ছন্দে বিরচিত তিনটি শ্লোকেই লিপিটি সমাপ্ত। শ্লোকের বাচ্যার্থ লইয়া বড় বেশী গোলযোগ ঘটিবার কথা নহে। কিন্তু তথাপি বাচ্যার্থের সাহায্যেই লিপির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইবে। সেই জন্য বঙ্গবিজেতা চন্দ্রের পরিচয় পাওয়া কঠিন। তাঁহার পরিচয় লইয়া অদ্যাপি তর্কের অবসান হয় নাই—হয় হইবারও আশা করা যাইতে পারে না। 'চন্দ্র' বিষ্ণুভক্ত ছিলেন—বিষ্ণুদেবে মতিস্থাপন করিয়া তিনি বিষ্ণুপদ-গিরিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই লৌহস্তম্ভ উত্তোলন করাইয়াছিলেন। কিন্তু গুপ্তাক্ষরে লিখিত ত্রিশ্লোকাত্মক প্রশস্তি-লিপিটি তিনি নিজ আদেশে উৎকীর্ণ করান নাই—তাহার প্রথম দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত চন্দ্রের "কর্ম্ম-জিতাবনীতে গমনে"র কথা, অর্থাৎ তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তির পর, যখন তিনি "ক্ষিতিতে কীর্ত্তিরূপে স্থিত" ছিলেন—তখন তাঁহার পরবর্ত্তী কোনও 'ভূমিপতি' পূর্ব্ববর্ত্তী 'ভূমিপতি' চন্দ্রের অবদান শ্লোকে আবদ্ধ করাইয়া লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ করাইয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সেই ভূমিপতিই বা কে—তাঁহার পরিচয় বাহির করাও কম কঠিন নহে।

পরলোকগত ডাঃ ফ্লীটের মতে, (২) লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপির অক্ষরের সহিত এলাহাবাদে স্থিত সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়-কাহিনীর ঘোষণা-লিপির অক্ষরের স্পষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।—তাই তিনি মনে করিতেন যে, কোন্

(১) Fleet—*Corp. Insc. Ind.* Vol. III, No. 32.

(২) *Ibidem*—P. 140, Foot-note (পাদটীকা)।

গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে (খৃঃ ৩২০—৩৩৫), এই লৌহস্তম্ভ-লিপির 'চন্দ্র' বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তিনি তাহাতে বিরক্ত হইবেন না। ডাঃ হর্ণলির মতে (৩) লিপি-লিপির কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর-প্রারম্ভে নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। এই মতের অনুসরণ করিয়াই ঐতিহাসিক স্মিথ মহোদয় (৪) স্বরচিত "ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে"র দ্বিতীয় সংস্করণে, লৌহস্তম্ভের 'চন্দ্র'কে বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ধার্য্য করিয়া তাঁহাকেই বঙ্গবিজেতা মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই (খৃঃ ৩৮০—৪১৪) সপ্তমুখ-সমরে সমবেত বঙ্গবাসীর বিপ্লব পরাভূত করিয়াছিলেন। যদি স্মিথের মতের অনুসরণ করিতে হয়, তবে "ভারতীয় মুদ্রামালা"র সঙ্কলয়িতা অন্ এলানের একটি কথা (৫) যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে। কথাটি এই—তিনি মনে করেন যে, মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন নগর হইতে দিগ্বিজয়ের জন্য বহির্গত হইয়া পশ্চিম দিকে মালব, গুজরাট, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যহকাল-প্রতিষ্ঠিত শত্রুপ-সাধনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সেই সেই দেশ আত্মসাম্রাজ্য-ভুক্ত করিতেছিলেন, তখন অবসর পাইয়া বাঙ্গালীরা সমুদ্রগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবার আবশ্যকীয় প্রয়াসের বিরুদ্ধে সপ্তমুখ-সমরে সমবেত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আত্মবাহুবলে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যদিও আমরা সমুদ্রগুপ্তকে কোনও প্রসঙ্গেই বঙ্গবিজয়ী বলিয়া দেখিতে পাই না—তথাপি তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে বঙ্গবিজেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এলান মহোদয়কে বিনা প্রমাণে বঙ্গদেশকে সমুদ্রগুপ্তের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু স্মিথ পরে তদীয় গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতাবলম্বী হইয়া মনে করিতেছেন যে, লৌহস্তম্ভ লিপির 'চন্দ্র' গুপ্তবংশীয় কোনও সম্রাট নহেন; কিন্তু এই 'চন্দ্র' ও সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপিতে উল্লিখিত চন্দ্রবর্ম্মা অভিন্ন ব্যক্তি। তথায় উল্লিখিত আছে যে, সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়কালে চন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের রাজগণকে স্ববলে উন্মূলিত করিয়া আত্মপ্রভাব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী

(৩) *Indian Antiquary*—Vol. XXI, pp. 43-44.

(৪) *Early History of India*—2nd Edition, p. 275.

(৫) *Indian Coins—Gupta Dynasties*—Introduction, p. XXXVI

মহাশয় এই দুই ব্যক্তির অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আরও দুইটি প্রাচীন লিপির তাৎপর্য্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথমটি প্রাচীন দশপুরে (বর্ত্তমান মন্দোসরে) আবিষ্কৃত (৬) ৪৬১ মালব-সংবতে প্রদত্ত মহারাজ নরবর্ম্মার রাজত্বসংঘের পাষাণ-লিপি; দ্বিতীয়টি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শুশুনিয়া-পর্ব্বতগাত্রে গুপ্তযুগের অক্ষরে খোদিত পুষ্করণাধিপতি মহারাজ সিংহবর্ম্মের পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার (৭) উৎসর্গ-লিপি। উল্লিখিত প্রথম লিপি হইতে আমরা এইমাত্র ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি যে, প্রাচীন দশপুর-অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিম-মালবাঞ্চলে যখন 'নরেন্দ্র' নরবর্ম্মার পৌত্র, 'কিত্তীশ' সিংহবর্ম্মার পুত্র, 'পার্থিব' মহারাজ নরবর্ম্মা ৪৬১ "মালব-গণাম্নাত" সংবতে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৪০৪ সংবতে, রাজ্য পরিচালন করিতেছিলেন, তখন "মহাকারুণিক সত্যধর্ম্মার্জ্জিত-যশোধন স্বকুলের সৎকর্ত্তা" কোনও ব্যক্তি "শরণ্য বিভু বাসুদেব"কে আশ্রয় করিয়া কোনও পুণ্যোদ্দেশে এই লিপির সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমরা জানি যে, এই সময়ে মগধের গুপ্ত-সিংহাসনে বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাযেই বিনা সংশয়ে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, এই মহারাজ-নরবর্ম্মা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামন্ত-রূপে মালবাঞ্চলে সম্ভবতঃ দশপুর রাজধানী হইতে রাজ্য-পরিচালন করিতেন। অন্য দুইটী প্রাচীন লিপির (৮) সাহায্যেও অবগত হওয়া যায় যে, নৃপ নরবর্ম্মার পুত্র নৃপ বিশ্ববর্ম্মা, এবং তাঁহার পুত্র নৃপ বন্ধুবর্ম্মা প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে মালবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং তাঁহাদের রাজধানী দশপুরনগরে সংস্থাপিত ছিল। উল্লিখিত প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে উৎকীর্ণ শুশুনিয়ার লিপি পাঠে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, চক্রস্বামিদেবের উদ্দেশে পর্ব্বত-গুহায় উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রের উৎসর্গ পুষ্করণাধিপতি মহারাজ সিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার পুণ্য কার্য্য ("কৃতিঃ") ৮ বিষ্ণুচক্রের নিম্নে দুই পংক্তিতে কেবল এইমাত্র লিখিত আছে:—

১। "পুষ্করণাধিপতের্ম্মহারাজ-শ্রীসিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য

২। মহারাজ-শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ।"

গুপ্তযুগের লিপি সকল হইতে বুঝা যায় যে, সে কালে 'মহারাজ'-উপাধি

(৬) *Epi. Ind.*—Vol. XII, No. 35, p. 315 ff.

(৭) *Ibidem*—Vol. XIII; এবং *Proc.* of the *A. S. B.* 1895, p. 180.

(৮) Fleet—*Corp. Insc. Ind.* Vol. III, Nos. 17 and 18.

সমুদ্রগুপ্তের নামের সহিতই প্রযুক্ত হইত। সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা হিন্দুসাম্রাজ্যের পূর্ব্বে, বোধ হয়, পুষ্করণ [মান্দোয়ারের অংশবিশেষ] রাজ্যও একটী স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রথম লিপিতে আমরা হরিবর্ম্ম-নরবর্ম্মাকে "বিক্রান্ত" সিংহবর্ম্মার পুত্র-রূপে উল্লিখিত পাইয়াছি, এবং দ্বিতীয় লিপিতে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মাকে মহারাজ সিংহবর্ম্মার পুত্র-রূপে নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা লক্ষ্য করিয়া মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় নরবর্ম্মা ও চন্দ্রবর্ম্মাকে ভ্রাতা (৯) ধার্য্য করিয়া বাস্তবিক একটী নূতন তথ্যের উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ নরবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক সামন্তরাজ ছিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রবর্ম্মা [সমুদ্রগুপ্ত] কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিলেন, (সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং চন্দ্রবর্ম্মাকে নরবর্ম্মার অগ্রজ বলিয়া ধার্য্য করা অযুক্তিযুক্ত হইতে পারে। সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে উল্লিখিত আর্য্যাবর্ত্তের রাজ্যবিশেষের অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মাকে, তদ্ভিন্ন পর্ব্বত-লিপিতে উল্লিখিত পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা মনে করা শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তগণের অধিগতি এই চন্দ্রবর্ম্মাকে এবং দিল্লীর লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত ভূপতি চন্দ্রকে এক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত করা কঠিন ব্যাপার। লৌহস্তম্ভ-লিপির চন্দ্রকে দিগ্‌বিজয়কারী বলিয়া বর্ণিত দেখিয়া, পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মাকে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত-বিজয়ী বলিয়া মনে করা [illegible] শাস্ত্রী মহাশয়ের ও তদীয় মতাবলম্বী শাস্ত্রের ঐতিহাসিক [illegible] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. মহাশয়ের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। মহারাজ নরবর্ম্মার সময়ের দশপুরের লিপির সাহায্যে [illegible] লিপির কতকটা 'গ্রন্থভেদ' হইয়া থাকিলেও, শেষোক্ত লিপির সাহায্যে লৌহস্তম্ভ-লিপির 'চন্দ্রের' পরিচয়-রহস্য

(৯) আলোচ্য বংশের পূর্ব্বাপরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের বংশাবলী এরূপ করা যাইতে পারে, যথা,—

[illegible]

সিংহবর্ম্মা

[illegible] (৪৭৫) | পুষ্করণী (মালবাব্দ ৩০১)

বিষ্ণুবর্ম্মা (ঐ ৪০০)

[illegible] (ঐ ৪২৫)

(১০) প্রবাসী—১৩২০ বঙ্গাব্দ, [illegible] ৪১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভিন্ন হইয়াছে কি? আমাদের মনে হয়, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতি যে সকল আর্য্যাবর্ত্ত-নরপতি সমুদ্রগুপ্তের হস্তে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হয় ত, গুপ্তসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে পর, সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদিগকে সামন্তরাজ-রূপে স্ব স্ব রাজ্যের শাসনভার হইতে বিচ্যুত করেন নাই। চন্দ্রবর্ম্মার পিতা মহারাজ সিংহবর্ম্মা ও তাঁহার পিতা জয়বর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষের সময়ে, পুষ্করণের স্বাধীন নরপতি ছিলেন, এবং পরে সমুদ্রগুপ্ত, হয় ত, চন্দ্রবর্ম্মাকে দিগ্বিজয়ের পর পুনরায় রাজ্যভার না দিয়া, তদীয় অনুজ নরবর্ম্মাকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দশপুর হইতে মালব প্রদেশের শাসন পরিচালিত করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে যে, চন্দ্রবর্ম্মা অপুত্রক অবস্থায় পরলোকে গমন করিলে পর, সমুদ্রগুপ্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্ম্মাকে সামন্ত-রূপে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন-লিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই নরবর্ম্মার পুত্র বিশ্ববর্ম্মা ও তৎপুত্র বন্ধুবর্ম্মা যথাক্রমে ৩৮০ ও ৪০৩ মালবাব্দে প্রথম কুমারগুপ্তের সামন্ত-রূপে মালব প্রদেশের শাসনভার পরিচালিত করিতেন।

গঙ্গধারের প্রস্তর-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, ৪৮০ মালবাব্দে মালবাঞ্চলে বিশ্ববর্ম্মা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি অল্প বয়সেই শাস্ত্রানুসারে বুদ্ধিবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত করিয়া রাজগণের মধ্যে "সদ্ধর্ম্মমার্গ" প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং

"তস্মিন্ প্রশাস্তি মহীম্ নৃপতিপ্রবীরে স্বর্গং যথা সুরপতাবমিতপ্রভাবে।
নাভূদধর্ম্মনিরতো ব্যসনাম্বিতো বা নো বেদবর্জ্জিতমনাঃ পুরুষোঽত্র কশ্চিৎ॥"

"সুরপতি ইন্দ্রের স্বর্গপ্রশাসনের ন্যায় অমিতপ্রভাব এই নৃপতিশ্রেষ্ঠের মহী-প্রশাসন-সময়ে পৃথিবীতে কখনও কোনও ব্যক্তি অধর্ম্মনিরত, ব্যসনগামী, বা সৎবর্জ্জিত ছিল না।" আবার মন্দসোরের প্রশস্তিলিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, [প্রথম] কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে ("কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি") পার্থিবললামভূত এই বিশ্ববর্ম্মা সেই অঞ্চলের পালনকর্ত্তা ("গোপ্তা") ছিলেন, এবং তাঁহার যুবা বীর-পুত্র নৃপবন্ধুবর্ম্মাও (৪৭৩ মালবাব্দে) সম্যক্ সমৃদ্ধ দশপুর নগরের পালয়িতা ছিলেন ("তস্মিন্নেব ক্ষিতিপতিবৃষে বন্ধুবর্ম্মণ্যবাপ্তে সম্যক্ শীতং দশপুরমিদং পালয়ত্যুন্নতাংসে")। এই দুইটি লিপির সাহায্যে বলিতে পারা যায় যে, পার্গিটর মহাশয় যে লিখিয়াছেন (১১) যে, তাঁহার মতে-

(১১) *Indian Antiquary*—1914, p. 218.

মন্দোসরকে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত বলিয়া মানচিত্রে প্রদর্শন করা স্মিথ সাহেবের ভুল হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসহ নহে। তিনি যে এই মতের পোষণার্থ আরও বলিয়াছেন যে, নরবর্ম্মা ও বিশ্ববর্ম্মাকে গুপ্ত-প্রভাব স্বীকার করিতে দেখা যায় না, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, উপরি-উল্লিখিত লিপিদ্বয়ের প্রমাণ বিপরীত মতেরই সমর্থন করে।

পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মাকে অরিষ্টাদিত্যরূপে লৌহস্তম্ভের 'চন্দ্র' বলিয়া প্রমাণিত করিতে হইলে, ইহাও সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, চন্দ্রবর্ম্মা দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং সেই প্রসঙ্গেই বঙ্গবিজয়ও করিয়াছিলেন। কিন্তু শুশুনিয়া-লিপিতে পুষ্করণাধিপতি কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের কোনরূপ উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল তিনি বিষ্ণুচক্রের উৎসর্গরূপ পুণ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন—ইহাই সেই লিপির প্রতিপাদ্য। শাস্ত্রী মহাশয় যে দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন যে, পুষ্করণের চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই উক্তির সমর্থক প্রমাণ শুশুনিয়া-লিপি হইতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ শুশুনিয়া পর্ব্বতের সেই গুহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই চক্রস্বামীর (বিষ্ণুর) কোনও তীর্থরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা হয়ত সেই তীর্থে আগমন করিয়া স্বীয় বিষ্ণুভক্তির পরিচয় রাখিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে চক্রস্বামীর উদ্দেশ্যে চক্র উৎকীর্ণ করাইয়া তাহার উৎসর্গরূপ পুণ্য কার্য্য প্রকৃতি বলিয়া লিপিতে উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। তবে যদি বলা যায় যে, শুশুনিয়ার চক্র ও লৌহস্তম্ভ-রূপ ধ্বজ, এই উভয় বস্তুই বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, অতএব চক্রদাতা চন্দ্রবর্ম্মা ও ধ্বজ-প্রতিষ্ঠাতা 'চন্দ্র' একই ব্যক্তি হইতে পারেন, তাহা হইলে, এইরূপ উক্তির বিরুদ্ধে এই প্রত্যুক্তিও হইতে পারে যে, গুপ্তবংশীয় নরপতিগণও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; তাঁহারা আপনাদিগকে 'পরমভাগবত' বলিয়া পরিচিত করিতেন। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, দিল্লীর লৌহস্তম্ভ-লিপিতে কি কি ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তৎপাঠে দেখা যায় যে, যিনি

(১) বঙ্গদেশে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান শত্রুদিগকে যুদ্ধে উন্মূলিত করিয়াছিলেন।

(২) যিনি সিন্ধুর সপ্তমুখ অতিক্রম করিয়া সমরপ্রাঙ্গনে বাহ্লিকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

(৩) যাঁহার বীর্য্যবায়ুতে অদ্য পর্য্যন্ত [অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পরেও] দক্ষিণসাগর সুবাসিত আছে; অর্থাৎ, যিনি দক্ষিণেও বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়া রাখিবেন।

(৪) যিনি স্বমূর্ত্তিতে কর্ম্মার্জ্জিত [স্বর্গ] লোকে চলিয়া গেলেও এখন কীর্ত্তিরূপে [illegible] রহিয়াছেন [অর্থাৎ এই লিপির সম্পাদনসময়ে যিনি স্বর্গগত।

(৫) [illegible] করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা পাই নাই। বরং খৃষ্ট পুরাণ দামোদরপুরের তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, প্রথম কুমারগুপ্ত এবং তাঁহার পরবর্ত্তী গুপ্তনরপতিগণের সময় পুণ্ড্রবর্দ্ধনে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের এইরূপ বোধ হয় যে, মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যলাভের কিছুদিন পরেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন, এইরূপ বিস্তীর্ণ গৌড়রাজ্য উচ্ছেদ করিয়া স্বরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত পিতার বিজয়ের স্মরণার্থ [illegible] নির্দ্দেশ করিয়া তাহা সেই স্থানে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিগণ কেবল মগধরাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলিয়া, সমুদ্রগুপ্ত হয় ত তাঁহাদের কোনও পরিচয় লিপিতে উল্লেখ করিবার প্রয়োজনবোধ করেন নাই। তাই ইহাতে বৈশালীর কোনও উল্লেখ বর্ণন নাই। ডাক্তার হর্ণলের মতের সমর্থন করিয়া আমরা গৌড়রাজ-লিপি হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রথম মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের [illegible] বলিয়াই মনে করি। এই কারণেই সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপির সহিত গৌড়-লিপির এতটা অক্ষর-সাদৃশ্য।

এস্থলে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা। পুরাণ-সঙ্কলনের কাল নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পার্জ্জিটার মহোদয় লিখিয়াছেন যে, পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, গুপ্তবংশীয়গণ মাগধ (মগধের) গুপ্ত ও প্রয়াগ পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয়পার্শ্বস্থ দেশ ভোগ করিবেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন (১২) যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ী পুত্র সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে গুপ্তসাম্রাজ্য যত দূর বিস্তৃত ছিল, তাহা উল্লেখ করিয়াই পুরাণে এই রাজবিস্তার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুরাণে সমুদ্রগুপ্তের বা গুপ্তসাম্রাজ্যের কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া পার্জ্জিটার মহোদয় মনে করেন যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মগধ হইতে বিহার, তীরভুক্তি, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে রাজ্যবিস্তারের পর, এবং সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক দিগ্বিজয়-যাত্রার পূর্ব্বে, পুরাণের এই রাজবংশ-বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপও মনে করা যাইতে পারে যে, তদীয় রাজত্বের শেষ-ভাগে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বঙ্গ-বাহ্লিক প্রভৃতি দেশ জয় করিবার পূর্ব্বেই পুরাণের রাজাবলী-বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, পুরাণের মগধে রাজধানীর অংশবিশেষও অন্তর্গত ছিল, তাই তাহাতে বিভিন্ন

(১২) Pargiter—*Dynasties of the Kali Age*—Introduction, p. XII, § 20.

বাঙ্গালা দেশের কোনরূপ স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। বাঙ্গালা এক সমুদ্রগুপ্তের ভাগে পতিত হইলে, তাহা তাঁহার বিস্তৃত এলাহাবাদ-লিপিতে উল্লিখিত হইত। বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে সমুদ্রগুপ্তের ও তাঁহার উত্তরপুরুষগণের রাজত্ব-সময়ের নানা-লাঞ্ছন-যুক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাকেও কতকাংশে বাঙ্গালার গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভুক্তির প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থাপত্য ও শিল্প।

পূর্ব্বে প্রবন্ধক্রমে সৌধের অন্তর্নিহিত আকৃতিগত উৎকর্ষের কথা বলিতে গিয়া মহামতি বার্জিনের মতের উল্লেখ ও তাহার আলোচনা করা হইয়াছে; বলিয়াছি যে, তাঁহার মতে প্রকৃতিবিধান হইতে আকৃতিগত উপকরণ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতি হইতে সুন্দর আকৃতি লইয়া তাহাকে সুন্দরভাবে যোজনা না করিলে সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা। কলিকাতার কোনও পল্লীস্থ একখানি বাটীকে দেখিলাম যে, মৎস্যপল্লের ন্যায় এক প্রকার বাঁকা বহির্বর্দ্ধিত আবরণ দ্বারা তাহার গাত্র সুশোভিত। ইহা দেখিলে এমনই পীড়াদায়ক বোধ হয়, যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, এই অলঙ্কারটি গর্হ্য বা ঘৃণার উপরই যোজনা বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সৌধের গাত্রে ইহার উপযোগিতা কোথায়? সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, প্রকৃতিবিধান হইতে অনুকরণ করিলেই সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না। তবে সৌন্দর্য্যের সন্ধান কোথায়? এ কথা আমি সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। আমি বলিয়াছি যে, ক্রমিক উন্নতি ভঙ্গি (gradation) ও বৈপরীত্য (contrast) এই দুইটি নিয়মও সামঞ্জস্য করিয়া প্রদর্শন করিতে পারিলে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইবে।

মানুষ সকল সময়েই উত্তেজনার প্রিয় নহে; কেন না, উত্তেজনা স্নায়ুগুলিকে টানিয়া ধরে। যাহার কার্য্য টানিয়া ধরা, তাহা স্বভাবতঃ সর্ব্বসময়ে প্রিয় হইতে পারে না; এই কারণে যাহা শিথিল করিয়া দেয়, বা এলাইয়া দেয়, তাহাও আলোচনীয়। সুতরাং যাহাতে উত্তেজিত করে, এবং তৃপ্তিসাধন করে, এমন দুইটির সংমিশ্রণ আছে, তাহা প্রিয় বোধ হইবে। যে নেশায় শুধু মদিরার উত্তেজনা আছে, তাহা সর্ব্বসময়ে কখনই প্রিয় হইতে পারে না; আর যাহাতে উত্তেজনা

হয় না, শুদ্ধ মদিরার মিষ্ট উপভোগ করা যায়, তাহাও মদ্যপায়ীর নিকট আদৃত নহে। কিন্তু যাহা ভোগযোগ্য পেয়, অর্থাৎ যাহাতে উত্তেজনা ও মধুরতার মিশ্রণ আছে, শুনিয়াছি, তাহার আস্বাদে মর্ত্তে স্বর্গের আবির্ভাব হয়; প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলেও ইহা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ক্রমিক উদ্গমে চিত্তে তৃপ্তি আনিয়া দেয়, এবং বৈচিত্র্য তা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু দেখিলে মানব-মন যেন তাহাদের জন্য শিহরিয়া উঠে; মনের যে পথে ছিল, বাধা পাইয়া যেন ভিন্ন পথে চালিত হয়; কিন্তু ক্রমিক উদ্গমে এ প্রকার ভাবের বিকাশ করে না; ইহার গতি যেন অপ্রতিহত। সঙ্গীতে ও চিত্রে আমরা বৈপরীত্য ও ক্রমিক উদ্গম, এই দুই প্রকার ভাবেরই বিশেষ লীলা দেখি। চিত্রে আমরা দেখিয়াছি, একটা রঙ যেখানে শেষ করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে পরিমার্জ্জিত সহসা ও সহজে নিষ্পন্ন হয় না। গাঢ় হইতে ক্রমশঃ, ক্রমশঃ উদ্বৎ গাঢ় করিয়া শেষ করিয়া দেওয়া হয়; ইহাকে ইংরাজিতে vanish করিয়া দেওয়া বলে, এবং ইহা নিতান্ত সহজ নহে। যাঁহারা রামধনু উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার বক্তব্যটি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিবেন। একণে মনে করিয়া দেখা যাউক যে, রামধনুর বর্ণগুলিকে ক্রমিক ভাবে না দেখিয়া ঠিক সম্মুখে বিভক্ত দেখিতে হইলে; ইহাতে মনে বর্ণের ক্রমিক বিন্যাসজনিত যে তৃপ্তি আসিত, তাহার আবির্ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। যে রামধনু দেখিয়া মানব-মন উল্লাসে পুলকিত হয়, যাহা কবি ও ভাবুকগণের মন আবেগে মুগ্ধ করে, তাহার কারণ কি বিচিত্র বর্ণগুলির সমাবেশ, ক্রমিক উদ্গম ব্যাপারটি যে মনে তৃপ্তির সঞ্চার করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলা হইতে কতকটা বুঝিলাম। সঙ্গীতেও এইরূপ। যে সঙ্গীতের সুরে সুরে মধ্যে ক্রমিক বিকাশ ও লয় আছে, তাহা যে প্রকার তৃপ্তিপ্রদ, যে সঙ্গীতের সুরের সহসা উত্থান-পতন দৃষ্ট হয়, তাহা সে প্রকার মনোজ্ঞ নহে। যে সঙ্গীতে সুরের উত্থান-পতনের মধ্যে ক্রম দৃষ্ট হয় না, সুতরাং ইহা অতি উত্তেজক; কিন্তু ইহা কখনই অতিশয় তৃপ্তিপ্রদ নহে। স্থূলতঃ এই যুক্তির সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সঙ্গীত কেন সাধারণ সঙ্গীত অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজক।

আলো ও আঁধারের বিচিত্র সমাবেশে সহসা করে বর্ণিত ও ক্রমিক উদ্গম বৈপরীত্য অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ। আমার এই পাঠাগারের সম্মুখে ব্যাপটিষ্ট মিশন (Baptist Mission) , জানুয়ের শীর্ষ বা গম্বুজের উপর

প্রাতঃসূর্য্যের আলোকরশ্মি কেমন বিচিত্র ছায়ালোকের সমাবেশ করিয়াছে; এই শীতের সাহাই দোষ থাকুক না কেন, ইহাতে আমার কর্ম্মক্লান্ত অবসন্ন মনে তৃপ্তি আনয়ন করে; আর তাহারই সন্নিকটে ঐ যে য়ুনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ (University Institute) গৃহ রহিয়াছে, উহার উপর কই আলোকছায়ার কোনও খেলাই ত দেখি না; দেখি, এক পার্শ্বে প্রখর আলোকে আলোকিত ও তৎসংলগ্ন আর এক পার্শ্ব তাহার বৈপরীত্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা এইবার সৌধের আকৃতির সহিত ক্রমিক উদ্গম ও বৈপরীত্যের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিব। বৃত্তাকার খিলান অপেক্ষা শ্রেপণীর (parabola) আকার-যুক্ত খিলান যে অধিকতর মনোজ্ঞ, তাহার কারণ এই যে, শেষোক্তটি প্রথমোক্তটি অপেক্ষা অধিকতর ক্রমিক রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ। যে সকল বক্র রেখা সরল রেখায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা কল্পিত কোনও ক্ষেত্র বা তদুপরি স্থাপিত সৌধের অঙ্গ যে তেমন মনোহর হইতে পারে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে; যেখানে বক্র রেখার শেষ হইয়া, সরল রেখার আরম্ভ হইল, সেখানে বক্রতার ক্রমের সহসা পরিবর্ত্তন হইয়া লোপ সাধিত হইল বলিয়া, চক্ষুর উপর, সুতরাং ইহার নিয়ন্তা হিসাবে মনের উপর, একটা বিষম আঘাত লাগে। এই জন্যই যে সকল খিলানে বক্র ও সরল রেখার মিশ্রণ দেখি (যেমন ত্রিকেন্দ্রাভিমুখী বা Three-centred কিম্বা stilted arch), তাহারা আদৌ মনোজ্ঞ নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যেখানে বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ক্রমিক উদ্গম ও বৈপরীত্যের মিলন দৃষ্ট হয়, তাহা মনোহর না হইয়া যাইতে পারে না। যে সকল গম্বুজ বৃত্তাংশাকারে নির্ম্মিত, তাহা অপেক্ষা একটু চাপা গম্বুজ যে অধিকতর সুন্দর দেখায়, তাহা পাঠান গম্বুজ ও মোগল গম্বুজ নিরীক্ষণ করিলেই বুঝা যায়। তাজমহলের গম্বুজের আকৃতি যদি পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠান নরপতিদিগের আদর্শানুযায়ী নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ইহা কখনই এমন নয়নানন্দকর হইত না। দাক্ষিণাত্যস্থ দ্রাবিড় স্থাপত্যের মন্দির বিমানের শিখরগুলি একটু চাপা বলিয়া বোধ হয়; আমার বোধ হয়, দক্ষিণদেশীয় স্থপতিরা ক্রমিক উদ্গম ও বৈপরীত্যের নিয়মগুলি বুঝিতেন।

বৃত্তাংশ হইলেই যে গম্বুজের আকৃতি বিসদৃশ দেখাইবে, এমন কোনও কথাই নাই। যে সকল গম্বুজ অর্দ্ধবৃত্ত অপেক্ষা বৃহত্তর বৃত্তখণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহারা সুন্দর; কেন না, এ স্থলে এই বৃত্তখণ্ডে আমরা বৈপরীত্যের পরিচয়

পাই, এই প্রকারের ভাস্কর্য্যবিশিষ্ট অনেক গম্বুজের উদাহরণ দেখিতে পাইতে পারে। বিজাপুরে ইব্রাহিম আদিল শাহের সমাধিমন্দিরের গম্বুজটির আকৃতি স্থূলতঃ অর্দ্ধবৃত্তাপেক্ষা বৃহত্তর বৃত্তাংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং এই কারণেই ইহা দেখিতে মনোহর। একই নগরে অবস্থিত আদিল শাহের পরবর্ত্তী নরপতি মহম্মদ শাহের সমাধিহর্ম্ম্যস্থ গম্বুজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা পূর্ব্বোক্তটি অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট।

গোলাকার গম্বুজকে মনোহর দেখাইবার আর একটী কারণ আছে; ইহা আমাদের চক্ষুর সাধারণতঃ বিকৃত দর্শন; চক্ষুর দোষ এখানে গুণে পরিণত। পরিপ্রেক্ষিত বা Perspective দৃষ্টি দ্বারা গোলাকার বস্তু অর্দ্ধবৃত্তাকার (elliptical) বা কেপ্লারের ন্যায় (Kepler's) প্রতীয়মান হয়। এই প্রকার দৃষ্টিবিভ্রমজনিত দোষ দ্বারা বৃত্তের দোষ অনেকটা খণ্ডিত হইয়া যায়।

মন কখনই এক রকমের ভাবে প্রীতিলাভ করে না, সে ভাবের সহিত বৈচিত্র্যের অন্বেষণ করে। যাহাতেই একত্বের আধিক্য বহুত্বের বা বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণ, তাহাতেই মানব-মন সংবদ্ধ; পূর্ব্বোক্ত পরিপ্রেক্ষিত বা দৃষ্টিবিভ্রম আমাদের বৈচিত্র্য জ্ঞানবিশেষের সহায়তা করে, এবং এ হিসাবে ইহা সৌন্দর্য্যবোধের চরিতার্থতা নিষ্পন্ন করে। দুইখানি সোজা রেখার দূরে অবস্থিত বেশের লাইনকে একত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে; পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টিতে দেখিবে যে, সম্মুখে ইহারা সমান দূরে অবস্থিত বটে, দূরে যেন তাহারা মিশিয়া গিয়াছে; এই যে তাহাদিগের মধ্য-স্থানের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া মিলনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই, এবং এই কারণেই ইহারা সুন্দর দেখায়। পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টি ছাড়িয়া দিলে বৃত্তের বক্র রেখার মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, কেবল একত্ব বা সাম্য, কেন না, ইহার সীমাবদ্ধ রেখাটির বক্রতার হার বা নম্রতার মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য নাই। এই কারণেই বৃত্তাকার ক্ষেত্র বা বর্ত্তুলাকার গম্বুজ নয়নের তত তৃপ্তি প্রদ নহে।

প্রাচীন গ্রীক্ স্থপতিরা বিলক্ষণ জানিতেন যে, কেবলমাত্র একত্ব বা সাম্য সাধনে কখনই সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না; তাঁহাদের আপোলনিক্ সাধনস্তম্ভের উৎকীর্ণ কোঁচিকাসংলগ্ন ব্যাবর্ত্তিত রেখা বা spiral বা volute-এর মধ্যস্থ বক্র রেখাগুলি সমদূরে অবস্থিত নহে, অর্থাৎ এগুলি arithmetical spiral নহে।

স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য রক্ষা বিষয়ে কেবিক উদ্যম ও বৈপরীত্য স্বতন্ত্র ভাবে ও মিশ্র ভাবে কিরূপ কার্য্যকারী, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা গেল, আমরা এই ও

দেখিয়াছি যে, বৈপরীত্য দ্বারা নানা কারণে দর্শকের মন কিরূপ ভাবে উত্তেজিত হয়। আমাদের ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যবিদেরা বৈপরীত্যের আদর বিলক্ষণ বুঝিতেন, এবং সৌন্দর্য্যসাধন ব্যাপারে ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করিতেন; তাহা না হইলে বৈপরীত্যের প্রকৃষ্টতম উদাহরণস্থল আয়ত বা চতুরস্র ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত সৌধের এত প্রশংসা করিতেন না। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, রেখায় রেখায় মিলিত হইয়া যেখানে সমকোণ উৎপন্ন করে, সেখানে বৈপরীত্যের লীলা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকটিত, ইহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। এই হিসাবে আয়ত বা চতুরস্র ক্ষেত্রের উপর যে সৌধ নির্ম্মিত হয়, তাহা বৈপরীত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ। রাজমার্ত্তণ্ড-কার ভোজরাজ ষোড়শ প্রকার সৌধের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"আয়তে সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বাশ্চতুরস্রে ধনাগমঃ"। অর্থাৎ, আয়তক্ষেত্রের উপর সৌধ নির্ম্মাণে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রাপ্তি, এবং চতুরস্রাকার ক্ষেত্রের উপর করিলে ধনাগম হয়।

বৈপরীত্য ও ক্রমিক উদ্গমকে স্থাপত্যের বীজস্বরূপ স্বীকার করিয়া আমরা দেখিব যে, কত প্রকারে গৃহবিন্যাস করা যাইতে পারে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে নিম্নলিখিত চারি প্রকার ক্ষেত্রে গৃহবিন্যাস হইতে পারে; (ক) সমকোণ-উৎপন্নকারী সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, (খ) সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর কোণ উৎপন্নকারী সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, (গ) বৈপরীত্য-রহিত বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, (ঘ) বৈপরীত্য ও ক্রমিক উদ্গমযুক্ত বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র; শেষোক্ত ঘ শাখাকে দুইটি উপশাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) একই বক্রতাযুক্ত রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, এবং (২) দুইটি বিভিন্ন বক্রতাযুক্ত রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে সকল সৌধের চতুঃসীমা সমকোণিক সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ, তাহাদের বহিরাকৃতিতে যেরূপ দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব মুদ্রিত থাকে; বক্র-রেখাবদ্ধ ক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত সৌধে এরূপ হয় না; সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ উৎপন্নকারী সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র সম্বন্ধেও এই মত প্রযোজ্য।

ভারতের প্রাচীন স্থপতিরা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগের মূলতত্ত্বগুলি যে অবগত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের গৃহবিন্যাসের শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা ষোড়শ প্রকারের গৃহবিন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজমার্ত্তণ্ড-কার বলিতেছেন—

আয়তং চতুরস্রঞ্চ বৃত্তঞ্চ ভদ্রাসনন্তথা।
চক্রং বিষমবাহুঞ্চ ত্রিকোণং শকটাকৃতিম্।
দণ্ডং পণবসংস্থানং মুরজঞ্চ বৃহন্মুখম্।
ব্যজনং কূর্ম্মরূপঞ্চ ধনুঃ স্বস্তিক ষোড়শঃ।

অর্থাৎ, আয়ত, চতুরস্রাকার, বৃত্ত, ভদ্রাসন, চক্র, বিষমবাহু, ত্রিকোণ, শকটাকৃতি, দণ্ড, পণব, মুরজ, বৃহন্মুখ, ব্যজন, কূর্ম্মরূপ, ধনুঃ, স্বস্তি।

পূর্ব্বোক্ত ষোড়শাকৃতির মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি বক্র রেখা বা সরল রেখা ও বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ; (১) বৃত্ত, (২) চক্র, (৩) পণব, (৪) মুরজ, (৫) ব্যজন, (৬) ধনুঃ, (৭) স্বস্তি। রাজমার্ত্তণ্ড-কার একমাত্র বৃত্ত ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত সকল ক্ষেত্রকেই কুফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ স্থলে আর একটী বিষয়েরও উল্লেখ আবশ্যক। সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কোণ উৎপন্নকারী রেখাদ্বারা বহুক্ষেত্রে বৈপরীত্যের লীলা তেমন প্রকটিত নহে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; রাজমার্ত্তণ্ড-কারও ত্রিকোণ, শকটাকৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রকেও কুফলপ্রদ বলিয়াছেন। নিম্নে ফলনির্ণয়সম্বন্ধীয় সমস্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আয়তে নিত্যং সর্ব্বশ্চতুরস্রে ধনাগমঃ।
বৃত্তে পুষ্টিশ্চ বৃদ্ধিশ্চ ভদ্রাসনে কৃতার্থতা।
চক্রে দারিদ্র্যমেবোক্তং শোকো বিষমবাহুকে।
নৃপতীতিস্ত্রিকোণে চ শকটে চ ধনক্ষয়ঃ॥
দণ্ডাস্যে পণবো দণ্ডে পণবে লোচনক্ষয়ঃ।
মুরজে স্ত্রিয়ত ভার্য্যা বৃহন্মুখে॥
ব্যজনে বিত্তনাশঃ স্যাৎ কূর্ম্মে বন্ধনপীড়নম্।
চাপে চৌরভয়কাপি স্বস্তে চ ধনসংক্ষয়ঃ॥

উল্লিখিত শ্লোকগুলি হইতে আমরা দেখি যে, দণ্ডাকার সৌধ অর্থাৎ ব্যারাকের আকারে নির্ম্মিত সৌধকে কুফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; ব্যারাকের ন্যায় গৃহ যে নিতান্ত অশোভন, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনও মতদ্বৈধ নাই।

গৃহস্থাপন বা বিন্যাসের যে পূর্ব্বোক্ত চারিটি শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বব্যঞ্জক; দ্বিতীয়টী পূর্ব্বোক্তটী অপেক্ষা অল্প দৃঢ়তার নির্দ্দেশ করে; এই প্রকারে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীবিভাগে দৃঢ়তার মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত লক্ষিত হয়; কিন্তু সৌধের সকল স্থানে দৃঢ়তা দেখাইবার আবশ্যকতা নাই। কোনও স্তম্ভের "যাতুলা" বা মৌধিকার (capital) কল্পনা

করিতে হইলে তাহাতে দৃঢ়তা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এই জন্যই এ স্থলে সমকোণিক ও সরল-রৈখিক ক্ষেত্রের ব্যবস্থা অপেক্ষা বক্র রেখার কল্পনার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। এ স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখি; কোনও সৌধের সকল স্থান আমরা সমান ভাবে দেখি না; প্রথম তলকে যেরূপ ভাবে দেখি, দ্বিতীয় তলকে সে ভাবে দেখি না, ইত্যাদি; অর্থাৎ, সৌধের উচ্চতা আমাদের দৃষ্টি ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে; সুতরাং প্রথম তলে যতটা দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলে ততটা প্রয়োজন নাই; অর্থাৎ, প্রথম তলে যদি সমকোণিক ও সরল-রৈখিক ক্ষেত্রের কল্পনা লক্ষিত হয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলে বা সৌধশেখরে সে প্রকার না করিলেও চলে। আবার ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সৌধের সকল অংশগুলির সমান গুরুত্ব নাই; এ কথা আমি ইঙ্গিতে বলিয়াছি। কথাটা এই যে, গৃহভিত্তি বা গৃহকোণে যেরূপ গুরুত্ব প্রদর্শিত হওয়া উচিত, তাহার মধ্যস্থ বা গাত্রস্থ স্তম্ভের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকিলেও, সেই পরিমাণে গুরুত্ব প্রদর্শিত হইবার প্রয়োজন নাই; এই জন্য স্তম্ভকে ভূয়োধর্ম না করিলেও চলে; এই কারণেই স্তম্ভকে নলাকৃতি (cylindrical) অথবা খাঁজযুক্ত (with flutings) ইত্যাদি নানা ভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজনীয় মনে করি। স্তম্ভের গৃহভিত্তির ন্যায় সমান গুরুত্ব না থাকিলেও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে; এই কারণেই হিন্দুস্থপতিরা চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানাবিধ সরল-রৈখিক-ক্ষেত্রযুক্ত স্তম্ভের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, য়ুরোপে সামান্য বহিঃবর্দ্ধিত স্তম্ভের অনুকরণে নির্ম্মিত বুড্যস্তম্ভ * (pilaster) ভিন্ন কোনও স্তম্ভকে সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত হইতে দেখা যায় না; এ বিষয়ে হিন্দুস্থপতিরা য়ুরোপীয় স্থপতি অপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। মানসার প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্র পাঠ করিলে আমরা স্তম্ভের সুন্দর শ্রেণীবিভাগ ও পারিভাষা দেখিতে পাই, যথা—

চতুরস্র স্তম্ভ—ব্রহ্মকাণ্ড।
পঞ্চবাহু স্তম্ভ—শিবকাণ্ড।
ষড়্‌বাহু স্তম্ভ—স্কন্দকাণ্ড।
অষ্টবাহু—বিষ্ণুকাণ্ড।
দ্বাদশ বাহু—রুদ্রকাণ্ড।
বর্ত্তুলাকৃতি—চন্দ্রকাণ্ড, ইত্যাদি।

* কোনো গ্রন্থে pilasterকে বুড্যস্তম্ভ বলা হইয়াছে।

এ স্থলে আর একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। হিন্দুস্থপতিরা বুঝিতেন যে, স্তম্ভে যে প্রকার দৃঢ়তার প্রকাশ আবশ্যক, উপপীঠে তদপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা প্রদর্শিত হওয়া প্রয়োজনীয়; এই জন্য তাঁহারা স্তম্ভ যে প্রকার আকারের হউক না কেন, উপপীঠ চতুরস্র ভিন্ন অন্য কোনও আকারে নির্ম্মিত করেন নাই; এমন কি, নলাকৃতি বা চন্দ্রকাণ্ডেরও উপপীঠ চতুরস্রাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি মহিসুরস্থ হৈসল বল্লাল নরপতিদিগের নলাকৃতি স্তম্ভগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। পাঠকগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, য়ুরোপীয় অনেক স্তম্ভের (যেমন ডোরিক স্তম্ভ) উপপীঠমাত্রই দৃষ্ট হয় না।

আমাদের বঙ্গদেশস্থ সপ্তরথায় দৃষ্ট একশীর্ষ চৌচাল মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা দেখি যে, মন্দিরটি একটী চতুরস্র ক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত; মন্দিরের চারিটি পার্শ্ব চারিটি সমকোণ উৎপন্নকারী ক্ষেত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহার শীর্ষদেশে চারিটি ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্র মিশিয়াছে; ইহার চারিধারের বক্রাকৃতি কর্ণিস্ পূর্ব্বোক্ত চারিটি ক্ষেত্রের নিম্নতম অংশ দ্বারা গঠিত। এই সামান্য মন্দিরে গৃহবিন্যাস ও নির্ম্মাণকার্য্যে যে নিয়মগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কেমন সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষিত হয়!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নিম্নতলে সৌধের অঙ্গগুলির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বব্যঞ্জক আকৃতির অবস্থা থাকা প্রয়োজন, এবং উপরিভাগে এ প্রকার আকৃতির আবশ্যকতা নাই। উপর তলে অল্প-দৃঢ়তাব্যঞ্জক আকৃতিযুক্ত অঙ্গের সংস্থান করিয়া তদুপরি পুনরায় অধিকতর দৃঢ়তাব্যঞ্জক অঙ্গের স্থাপন করিলে সৌধের সৌন্দর্য্যহানি হয়। এ বিষয়ে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থাপত্যশিল্পি-চূড়ামণি সার্ক্রিষ্টোফার্ রেনকে (Sir Cristopher Wren) সেণ্ট্ পল্ গির্জ্জার গম্বুজের উপর সরল রৈখিক সীমাবদ্ধ অঙ্গের কল্পনা ও নির্ম্মাণ করার জন্য বিশেষ দোষ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এ বিষয়ে তাঁহার সেণ্ট্ ষ্টিফেন্স্ গির্জ্জা (St. Stephens, Walbrook) এই দোষ-বর্জ্জিত। আমাদের দেশস্থ প্রাচীন সৌধেও যে এই দোষ বর্ত্তমান, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু ইহা অতিশয় মারাত্মক নহে। উড়িষ্যাস্থ ভুবনেশ্বরের মন্দির বা আর যে কোনও মন্দির, বা বুন্দেলখণ্ডস্থ খাজুরাহোর শিবমন্দির নিরীক্ষণ করি, আমরা দেখি যে, বিমান শেখরের চারি কোণে আমলকাকৃতি অঙ্গের উপর সরল-রৈখিক অঙ্গের ক্রমান্বয়ে সমাবেশ রহিয়াছে। আমাদের বঙ্গদেশীয় মন্দিরও এ দোষ হইতে মুক্ত নয়।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সঙ্গীত শাস্ত্রের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য এখন বিশ্বের ভাষারাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; কিন্তু আজও তাহার কোনও প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয় নাই। সুপণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক উপাদেয় গ্রন্থ দুইখানি বিরচিত হইবার পূর্ব্বে, প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীর যে আদৌ কোনও সাহিত্য ছিল, তাহাও অনেকের জানা ছিল না। সুখের বিষয়, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কল্যাণে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে লোকের মন হইতে সে ভ্রান্ত ধারণা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অধিকন্তু তৎপ্রতি দিন দিন লোকের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতেছে। তথাপি সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, উক্ত গ্রন্থ দুইখানিতে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান নিহিত থাকিলেও উহাদিগকে কোনক্রমেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বলা যাইতে পারে না। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদের অধিকাংশই আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে সমস্তের সংগ্রহ ও উদ্ধার ব্যতীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হওয়া অসম্ভব। এই গুরুতর কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ রঙ্গের স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বহু দিন হইতেই প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সংগ্রহ-ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেরও সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য এই প্রাচীন সাহিত্যের সংগ্রহ ও উদ্ধার। এই দীন লেখকও আজ প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া এই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। আমার চেষ্টায় কত প্রাচীন গ্রন্থ ও কবি আবিষ্কৃত হইয়া বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী পাঠকদের মধ্যে অনেকেরই অবিদিত নহে। আমার আবিষ্কৃত অসংখ্য গ্রন্থের বিবরণ ও প্রাচীন কবিতা ও পদাবলী বঙ্গের নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আমার সংগৃহীত কতকগুলি পুঁথির বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক 'প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ' নামেও প্রচারিত হইয়াছে। আমার সে সব গ্রন্থরাজির মধ্য হইতে 'রাগমালা' নামক একখানি প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের বিষয় সাহিত্য-সমাজের গোচর করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

চট্টগ্রামে প্রাচীন কালে সঙ্গীতের বড়ই আদর ও চর্চ্চা ছিল। তাহার

সঙ্গীত-গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, মুসলমান-সমাজই এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রণী ছিলেন। অনেক মুসলমান পণ্ডিতের আবাসে সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় থাকিত। তথায় সকল জাতীয় শিক্ষার্থীরাই সঙ্গীত-শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিতেন। সে কালের পেশাদার বাদ্যকরগণ (হাড়ীগণ) প্রায় সকলেই মুসলমান পণ্ডিতদের শিষ্য ছিল। হিন্দু পণ্ডিতেরও যে একবারে অভাব ছিল, এমন নহে। কেবল সঙ্গীত-শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটিত না; তাঁহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যাদির বাদনেও পারদর্শিতা লাভ করিতে হইত।

প্রাগুক্ত সঙ্গীত গ্রন্থগুলিতে সঙ্গীতের উৎপত্তি-রহস্য এবং রাগতালের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক রাগ ও তালের ধ্যান সংস্কৃত ভাষায় রচিত; বাঙ্গালা পদ্যে তাহার অনুবাদ আছে। প্রায় সকল গ্রন্থেই রাগ-তালের ধ্যান ও পয়ার-(অনুবাদ)-গুলি একই রকম পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক রাগের ধ্যান-পয়ারের নীচে সেই রাগে গেয় এক বা ততোধিক গান বা পদ, এবং প্রত্যেক তালের ধ্যান পয়ারের নীচে সেই তালের 'গৎ' দেওয়া আছে। উক্ত গান বা পদগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন কবির রচিত প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সব পদাবলীর অধিকাংশই মুসলমান কবিগণের রচিত। এই সকল পদাবলীর লেখক কবিরাই হিন্দু লেখকগণ কর্ত্তৃক 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' খ্যাখ্যায় আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিলেও তাঁহারা সকলে বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন কি না, তাহার বিচারের স্থান ইহা নহে।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি এইরূপ একখানি প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থ। ইহার নাম 'রাগমালা'। এতদ্বিষয়ক অন্যান্য সকল গ্রন্থেরই প্রায় এই নাম দেখা যায়। কেবল আলী রাজা ওরফে কানু ফকীরের রচিত গ্রন্থের নাম 'ধ্যানমালা'। বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত এরূপ অনেকগুলি 'রাগমালা' আমার নিকট সংগৃহীত আছে। কাজিল নাহির মোহাম্মদ নামক জনৈক পণ্ডিত আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা। এ গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার রচিত বৈষ্ণব পদাবলীও পাওয়া গিয়াছে।

"প্রণমি পরম তত্ত্ব প্রভু দাতা পরমার্থ
অনাদি পুরুষ নিরাকার।
নাহি তান আদি অন্ত সে জে ত্রিজগত কান্ত
সৃষ্টিকর্ত্তা নিরঞ্জিনি হার (?)।" *

* এখানে বলিয়া রাখা উচিত, উদ্ধৃতাংশগুলির পাঠে স্থানে স্থানে বর্ণবিন্যাসে ভিন্ন

ইত্যাদিরূপ বাক্যে জগদীশ্বর, হজরত মোহাম্মদ, খলিফা-চতুষ্টয় এবং হজরত ইমাম হাছন ও হোছেনের বন্দনা করিয়া কবি স্বীয় পিতামাতার বন্দনা করিয়াছেন। তার পর জান মোহাম্মদ নামক স্বীয় পীরের বা দীক্ষাগুরুর বন্দনা করিয়া তিনি নিজের জন্মস্থান চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ সুলতানপুরের একটা ক্ষুদ্র গুণ-ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, তখাকার ভূম্যধিপতি পরমগুণবান ওয়াহেদ মোহাম্মদের ইচ্ছায় ও আদেশক্রমেই তিনি এই দুরূহ গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার দুইটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল :—

(১) "শ্রীযুত ওআহিদ মোহাম্মদ নরবীর। সর্ব্ব গুণে বলয়ন্ত মহিমা সাগর।
তান কুমারতি গাহে কবি দ্বিজ হীন। দিনদিন বাঢ়ি যাউ সুকৃতি প্রবীন।

(২) "ধৈর্য্যে ধীর জ্ঞানে গুরু শাস্ত্রে অনুপাম। তান কুমারতি গই ভজি নিরূপাম।
হিরি ওআহিদ মোহাম্মদ নাম। করে শ্রীনাথিয় নাছির মোহাম্মদ।"

তাঁহার বা তাঁহার আদেষ্টার সম্বন্ধে আর কোনও কথা গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কবির উক্তি এরূপ :—

"সতরিছ রাগ আদি সমাপ্ত হইল যথি। পৌন মাস বহি গেল সংবাদি দিবস ভেল
এবে কহি সাকের নির্ণয়। বিষে দণ্ড সনিবার দিবসে।
যখত হোছন সমে জোহর হৈল সমুদয়ে
সমাপ্ত হইল রাগমাল।
মধি সন পরিমাণ হাজার নবশি তথি পূর্ব্বাসাঢ়া ঋক্ষ স্থিতি সিদ্ধি কুম্ভ চুর্দ্দশি
সকাদা সোলস চল্লিসে। মধ্যবিস সুমারির আইআল।"

ইহা হইতে জানা যায়, ১০৮৮ মঘী সনে, বা ১৬৪০ খৃষ্টাব্দায় কৌবসকোষ্ঠি শনিবার দিবস জোহরের সময়ে তাঁহার রাগমালা গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ইহা ১৯১ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

এই গ্রন্থে কেবল রাগরাগিণীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎপত্তি-রহস্য ও তাহার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। তালের সম্বন্ধে যে বিবরণ ইহার শেষাংশে লিখিত পাওয়া যায়, তাহা ভিন্ন হাতের লেখা, এবং এই গ্রন্থের অন্তর্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, আপাততঃ তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই। অন্য 'রাগমালা'র সাহায্যে আমরা পরে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিব। ইহাতে প্রথমেই ৪২ রাগ ও রাগিণীর নাম প্রদত্ত হইয়াছে; যথা :—

"শ্রীরাগ মল্লার শ্রী বসন্ত উপাম। এহি সপ্ত রাগ আদি সুত্র যে করিআ।
হিন্দোল কর্ণাট এহি সপ্ত রাগ নাম। একাএকে কহিআম আর যেই প্রিআ।

পাহাড়ি মালসি আরাবলি রামক্রিয়া। বসন্তের প্রিয়া তুরী এ পটমঞ্জরী।
সিন্ধুরা ভৈরবী দেবী মানবের প্রিয়া। পঞ্চম মল্লিকা আর বিভাস গুজরী।
বেলাবলি কেদারিকা কানেড়া মাধবী। হিল্লোলের প্রিয়া দেবী মাধুর বরাড়ি।
মল্লার প্রিয়া কোড়া আওর * পুরবী। দীপিকা পাহিড়া মহারটি দেসকারী।
সুওগা সারাঙ্গ সুমারবা বেলোআর। কর্ণাটের প্রিয়া নট পরা রামকেলি।
শ্রীরাগ প্রিয়া গৌরী আওর গান্ধার। কামোদ কল্যাণ দেবী আওর ভূপালী।"

তার পর কোন ঋতুতে কোন রাগ গেয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে; যথা :—

"অগ্রাণ পনর শেষ পৌষ দুই মাঘ। অর্দ্ধ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ অর্দ্ধভক।
হেমন্তের ঋতু (ঋতু) বহে মাঘব ফরা। পাউকে † গাহিতে শ্রী অধিক রুচক।
শেষ মাঘ ফাগুন চৈত্রের পক্ষদুই। শ্রাবণের শেষ ভদ্র অর্দ্ধেক আশ্বিন।
বসন্তের ঋতু এহি বসন্ত সরস। হিল্লোল সময় ঋতু (ঋতু) অতি প্রবীণ।
শেষ চৈত্র মাধবী জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধ দুই। আশ্বিন কুমার অগ্রাণের এক পক্ষ।
গাহএ মল্লার রাগ সময় নিদাঘ। গাহএ কর্ণাট রাগ শিশিরের লক্ষ্য।"

অত রাগের ধ্যান ও পয়ার। আগেই বলিয়াছি, ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সকলেই বোধ হয় জানেন, সে কালের লিপিকরেরা কলমের মুখে যাহা আসিত, তাহাই লিখিয়া যাইতেন। বর্ণবিন্যাস-পদ্ধতির কোনও ধারই তাঁহারা ধারিতেন না। তাঁহাতেই বাঙ্গালা হাতের লেখা পুঁথিগুলিতে এরূপ কিম্ভূতকিমাকার বানান পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধেই যখন এই ধারা, তখন কঠিন সংস্কৃত ভাষার যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা আর কি বলিব? যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগকে সংস্কৃত বলিয়াই বুঝিবার উপায় নাই। সেগুলি অবিকল নকল করিয়া দিলে তাহার এক বিন্দুও কেহ বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। সে জন্য আমরা সংস্কৃত শ্লোকগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাঙ্গালা পয়ারগুলিই উদ্ধৃত করিতেছি।—

১। মালব রাগের পরায়। প্রসন্ন হইয়া অতি করএ চুম্বন॥
আইন মালব রাজ মন কুতুহল। উত্তম বসন পরি নৃত্য গীতে মন।
শুক্লবর্ণ দেহকান্তি রুচাক্ষ কুন্তল। এতেক প্রতিষ্ঠা রাগ মালব রাজন॥
মল্লোপবদন সে হে গলে-পুষ্পমালা। গায়ন সময় দিবা দশ দণ্ড অন্ত।
প্রদোষ সময়ে প্রবেসন্ত গীতশাল॥ রাত্রিত গাহিব দণ্ড দশম পর্য্যন্ত॥
দেখিআ মহিণী সব মদনমোহন।

এই কথাগুলি আবার ত্রিপদীচ্ছন্দেও বর্ণিত দেখা যায়।

---

* আওর—আর; পাদপূরণার্থ এরূপ করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

† পাউক—বর্ষাকাল।

ইহার নীচে মালবের প্রিয়া ধানশী, মালসী, রামক্রিয়া, গিরুয়া, আসাবরী, ভৈরবী—এই ছয় রাগিণীর ধ্যান ও পয়ার যথাক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল মালবের নহে, অপর সকল রাগরাগিণী সম্বন্ধেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে। রাগিণীর ধ্যান ও পয়ারগুলি প্রদান করিতে গিয়া কবি যে ক্রমে রাগিণীগুলির নাম দিয়াছেন, এবং যাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ না করিয়া তিনি যথেচ্ছভাবে রাগিণীগুলির স্থাপনা করিয়াছেন। পদ্য মিলাইবার জন্যই তাঁহাকে ঐরূপ ক্রম করিতে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কি ক্রমে রাগিণীগুলির ধ্যানাদি প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা যথাস্থানে তাহা প্রদর্শন করিব। সকল রাগিণীর পয়ারগুলি উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিবে। তবে রাগের পয়ারগুলি উদ্ধৃত না করিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি ঘটিবে। এ জন্য আমরা সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম। লোভসংবরণ করিতে পারিলাম না।

২। মল্লার রাগের পয়ার।

শ্যামল সুন্দর অতি রঙ্গ রসে ধীর।
কামিনীমোহন রূপ পুলক শরীর।
সহজে বিহারযুক্ত সহজিল মন।
তা সঙ্গে কামরঙ্গে কৌতুকে মিলন॥
দেহ গীতিয়-নেত্র গুহ্যের বচন।
মল্লার রাগিক রাগ পঞ্চেন্দ্রমোহন॥

ইহার রাগিণীগুলির পয়ার-প্রদানের ক্রম এইরূপ :—বেলাবলী, পুরবী, কানোড়া, মাধবী, কোর্ড্যা ও কেদার (?)।

৩। শ্রীরাগের পয়ার।

এ নব যৌবনী সব সঙ্গে নারীগণ।
কামকেলি কুতুহলে গেলে বৃন্দাবন॥
নানান সুগন্ধি পুষ্প কৌতুকে তুলিআ।
অন্তে দুন্তে প্রেম-সুখে যামিনী গোঙাআ।
আগুসেস সমপূর্ণ দেখিব দণ্ডি ধরে।
এ প্রতিজ্ঞা শ্রীরাগের পৃথিবী ভিতরে॥

রাগিণীগুলির বর্ণনা-ক্রম :—গান্ধারী, গৌরী, ধানুসী (?ধানুষারিকা), সুহি (সুহগা?), বেলোয়ার ও বৈরাগী (সাবরী?)।

৪। বসন্ত রাগের পয়ার।

পরম সানন্দ মনে খেলে ঋতুরাজ। ধু।
আইলেন্ত ঋতুরাজ কবিআ সম্পূর্ণ সাজ।
কর্ণযুগে শোভে চু তাঙ্কুর।
পীতবস্ত্র পরিধান হেমবর্ণ দেহ তার
দীপ্তিমান পরম নিকোর (?)॥
দেখি যুগ প্রভাবস্ত ঘূর্ণিত মদন শর
প্রিয়াগণ সঙ্গে করি সাজ।
চারি পাশে সখীগণ হই অতি মন সুখী
খেলে বিতি বৃন্দাবন মাঝ॥

রাগিণীগুলির বর্ণনা-ক্রম :—তুরী, পঞ্চম, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুণকরী ও বিভাসা।

৫। হিন্দোল রাগের পয়ার।

রাস-বিলাসে কৃষ্ণ পূর্ণিমা। ধু।
সঙ্গে সুনাগরি সব দেখি যাএ মনোভব
হিন্দোল রসের তরঙ্গিআ।
প্রিয়াগণ নিজ পাশে মদনমোহন জাসে
বহুবীত পড়ে ঢলিআ॥

তা দেখি যুবতী সবে গীত গাহি মনোমতে যে যে বিলাস-রাশি একেক অভিষ্ঠা ধনী
পতি তোহে আলিঙ্গন দিয়া। শান্ত মন সদাএ সুপ্রিয়া॥

রাগিণীগুলির বর্ণনাক্রম ঃ—বায়ুর, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ি ও মহারাষ্ট্র।

৩। কর্ণাট রাগের পয়ার। বিপঞ্চি শিখীর পুচ্ছ শিরেত শোভন॥
আইস কর্ণাট রাগ হরষিত মন। যুগল যমান জিনি যুগল লোচন।
তেলিকলা কুচযুগ সমে নারীগণ॥ কদলী জিনিয়া গ্রীবা অতি সুগঠন॥
হস্তেত কৃপাণ দুই অশ্বে আরোহণ।

রাগিণীগুলির বর্ণনাক্রম ঃ—নট, ভূপালী, রামকেলি, গরা, কামোদ ও কল্যাণ।

অতঃপর কোন্ ঋতুতে কোন্ রাগ গেয়, তাহা আবার বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে ইহা কতকটা অন্যরূপ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যনিচয়ে প্রতিভাত হইবে, যথা ঃ—

"হেমন্তে সাজন মুক্ত বসন্তে বসন্ত যুক্ত সুখী গাউক কাল শরৎ হিল্লোল ভাল
নিদাঘেত মিল্লার সুহৃদ। শিশিরেত কর্ণাট সানন্দ॥"

ইহার পর প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীতে গেয় এক বা ততোঽধিক গীত প্রদত্ত হইয়াছে। আগেই বলিয়াছি, সে সকল গীত প্রায়ই বৈষ্ণব পদাবলী ও বিভিন্ন দেবদেবীর বিভিন্ন বিবরণের রচিত। এই অংশই 'রাগমালা'গুলির সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ। গীতগুলি এ ভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা এতগুলি কবির সুন্দর পদাবলীর মধুর রসাস্বাদন করিতে পারিতেছি। 'রাগমালা'-সমূহের এরূপ পদগুলি সংগ্রহ করিয়া আমি বঙ্গের নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছি। তাহা হইতে অন্যূন্য হিন্দু কবি ও পঞ্চাশ জনেরও অধিক বৈষ্ণব-পদাবলী-রচয়িতা মুসলমান কবির অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। এই গ্রন্থে অনেক নূতন ও সুন্দর সুন্দর গীত ও পদ আছে, এবং অনেক নূতন কবির নাম পাওয়া যায়। এই সকল গীত ও পদের মধ্যে অনেকগুলি ইতিপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মত সুন্দর জিনিস বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া' তুলিতে পারে, এমন সুধাস্রাবী ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী ভিন্ন বাঙ্গালায় আর কিছুতেই নাই। সে মধুর রসাস্বাদন হইতে 'সাহিত্যে'র পাঠকবৃন্দকে বঞ্চিত করিব না। এ জন্য আমরা প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীতে গেয় এক একটি পদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

রাগ—মালব।

মজনি গো সই ভুলি না কি আঁধারে রোধা।
কালিআ কানুর বাঁশি বোলে কথ রোল॥ ধু॥
দেখা নাহি শুনা নাহি নাহি পরিচয়ে।
তেকারণে কানাইর বাঁশি রাধার নাম লএ॥
চূড়াএ শিখণ্ডি পুষ্প গলধএ কালা।
কথনি গুরল বাঁশি কদম্ব সে হেলা॥
শুনিতে বাঁশির ধ্বনি পিকরব জিনি (জিনি?)
দেখাএ হরল মন কুলের কামিনী॥
ছৈয়ল গর্ব্বজাএ বহে আধা সোণা রাধা।
নাম ধরি ডাকে বাঁসি মোর নাম রাধা॥

১। রাগিণী—ধানশী।

পাকল পৃথা হামো না বোলাএ।
দারুণ প্রিট মোর বাদ না জাএ॥ ধু॥
এতহি যৌবনি মোর বহুল সঙ্কিন।
সব ভেল ভাগাবতী হাম ভেল হীন॥
দিন চারাইতু অঙ্গ মুড়াইম কেস।
তবে ঘরে যাআ লাগি করিমু উদ্দেস॥
সিআ যুকিমু রে দুমুহ বাআইতু।
যেলে লেলে পুআর লাগি ভিক্ষা মাগি খাইমু॥
বিদ্যা গর্ব্বা কহে হাম অভাগিনী।
কীন নহ সাধ নাই তেজিমু পরানি॥

ধানশী রাগিণীর পরে নিম্নলিখিত রাগিণীগুলির গীত বা পদ দেখিতে পাওয়া যায়:—১। ধানশী ভাটিয়ালী। ২। ধানশী দীপিকা। ৩। ধানশী গুজরী। ৪। ধানশী বেহাগড়া। ৫। ধানশী রেবাবতী। ৬। ধানশী পরছ। ৭। ধানশী কেদার। ৮। ধানশী ভটিয়ানি ভাঙ্গা।

এই সকল রাগিণীর অনেকগুলি পদ আছে। সব উদ্ধৃত করিবার স্থান হইবে না বলিয়া এখানে কেবল একটিমাত্র পদ উদ্ধৃত করিলাম:—

রাগিণী—ধানশী বেহাগড়া।

মরি না লো এথ রাত্রি কেনে।
নিবসে আসিতে ভয় তারে বাস মনে॥ ধু॥
মুখানি সুখানি আছে আসিছ ধাইআ।
কথ না পাইআছ দুঃখ আন্ধার জানিআ॥
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বরিষে হিমিরী।
কেমনে আইলা কানু পথে পথ পানি॥
যাঁহ ভালুকের বন্ধু পন্থে বড় ভয়।
বোলা ভাল যদি হৈলে গরল উপায়॥
দ্বিজ কুমুদে কহে মনে ভাবি চাহি।
অনুদিন রাধা কানু প্রেমের আরতি॥

এই রাগিণীর পর ১। মালসী ভৈরব ও ২। ঠাসা মালসী রাগিণীর দুইটির গীত দেখা যায়। একটি পদ এখানে তুলিয়া দিলাম:—

রাগিণী—ঠাসা মালসী।

সই বোলম মুই ঘরে না লো
কানু আনিআ দে।
কালার ভাবে চিত্ত বেআকুল
আকুল করিআছে॥ ধু॥
আমি দর্পণ ও নহে মুক্তি নয়ন ভরি চাইতুম।
কাম নিকর নহে রে মুক্তি তুলি দিতুম শীসে।
বড়ায় ভাবে চিত্ত বেআকুল আন চাইছে বিরে॥
চাম্পা বেঁকা কাণ বেঁকা ঐ কদমতটে।
চাম্পা কলিকার ফুল ঘড়ি ঘণ্টে ঘণ্টে॥

চূড়া নহে কলা নহে দধি মাখিআ খাইতুম।

হেথন মর্ত্তুজা কহে পঠের কামরা।
মধুনাপুরেতে গেলে পাইবা সেই জনা॥

৩। রাগিণী—রামক্রিয়া।

রূপ বড় চল দেখি গিআ।
কেমনে বরাইমু চিত্ত কালা না দেখিয়া॥ ধু।
মালতীর মালা গলে সোভি আছে ভালা।
মুখানি পূর্ণিমার শশী বরণ চিকন কালা॥
কদমের ডালে বসি বাজাএ মুরারি।
আবরিছে কদম্বের গন্ধ সারি সারি॥
মির মরজুল্লা কহে মনেত ভাবিয়া।
দেখ সখি শ্যাম রূপ কদম্বতলে গিআ॥

ইহার পর রামক্রিয়া ভাটিআল রাগিণীর একটি গীত ও গৌল সিন্ধুরা রাগিণীর একটি গীত আছে।

৪। রাগিণী—আসাবরী।

কি পেখল নাগর ব্রজ জুবরাজে।
নন্দের নন্দন রূপ মনোহর
এবেসি রহল হৃদয় মাঝে॥ ধু।
উপবনে কেলি কলাবতীগণী
মোহন মুরারি গানে।
অথেক চরাচর অন্তরে জর জর
নিসম কুসুম শর বাণে॥
বিবিধ কি বস্ত্র কুণ্ডল অলিত
কত তালি তরুনিক ভালে।
মোহনিহ গীত গুপিগণে গাইত
নাচত মদন গোপালে॥
রত্ন সে বংশীত মদনে বিরাজিত
রসভরে গগন বিলম্বে।
তাহি রসে আবেস আলস কলেবর
রহল যুবতি অবিলম্বে॥
অরুণ বরণ বর বচন মনোহর
বিধু নখ পাঁতি জোর।
ওরাণ্ড গগমণি লাগাল লোচন
শ্যাম দাস মনাতি ভোরে॥

৫। রাগিণী—ভৈরবী।

হাম ছিকারি পরম দেব দাতা।
পিট পেখাছি যেখানে মদমাতা॥ ধু।
ধিতি সিংহাসন বাসন মেরি।
অষ্ট ধর্ম্মির মোর চামরধারী॥
শ্রীনব দণ্ড ছত্র আকার।
চান্দ সুরুজ দোহো সোভএ তার॥
* * *
ভাহে কি যোগাসি কাজ অনুছারি (?)॥
* * *
শ্রীহট্ট নগার রাজএ এক ভাবে।
কহে ছৈদ হুলতানে মনে হাঙ্কারি।
পদ দাতা হুলতান পরম পরম ভিকারি॥

শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

তিনুর বুদ্ধি।

দামুর বড় দুঃখ গে, ছোট ভাই তিনুর বুদ্ধি হইল না।

মা-মরা ছেলে, সুতরাং তিনু শুধু বাপের নয়, বড় ভাই দামুরও খুব আদরের ছিল। তার পর বাপ মারা গেল, কিন্তু তাহাতে তিনুর আদরের মাত্র কম

পেনিত না। খাজনার দাখিলা অন্য লোককে দিয়া পড়াইয়া লইতে হইত। এমনি তিনু সাত বছরে পড়িল দামু তাহাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিল। এক বৎসর পাঠশালায় যাতায়াত করিয়া তিনু আঁক ও আক্ষর দাগা, এবং বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ শেষ করিল। কিন্তু যখন দ্বিতীয়, তৃতীয়, বাগ্মী'র মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল, এবং পাড়ার সহধর্ম্মক বালকগণকে কপাটী খেলা এবং পক্ষিশাবকের অপেক্ষা স্বচ্ছন্দচিত্তে দিন কাটাইতে দেখিল, তখন সে পাঠশালা ছাড়িয়া উহাদের মত স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দামু কিন্তু ছাড়িল না; নূতন কাপড় দিয়া, মোয়া বাতাসার লোভ দেখাইয়া, তাহাকে পাঠশালায় দিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু পাঠে অমনোযোগিতার জন্য যে দিন গুরুমহাশয়ের নির্ম্মম বেত্রাঘাত চিহ্ন তাহার পৃষ্ঠদেশে কালশিরা অঙ্কিত করিয়া দিল, সেই দিন লেখাপড়া অপেক্ষা প্রাণটা মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া দামু ভাইকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইল। তিনুর যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল!

দামু চাষার ছেলে, চাষই তাহার উপজীবিকা। সুতরাং তিনু একটু বড় হইয়া উঠিলে দামু তাহাকে চাষের কাজটা ভাল রকমে শিখাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। তিনু কিন্তু তখন ছিপ, বড়শি, পাখির খাঁচা, তাস ও বাগ্‌বন্দী খেলা প্রভৃতি লইয়া এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, চাষের কাজে সে আদৌ মনোযোগ দিতে পারিল না। বড় ভায়ের পাড়াপীড়িতে দুই চারি দিন মাঠে গেল বটে, কিন্তু সেই দুই চারি দিনেই রোদে জলে এমন সর্দ্দি ও জ্বরে পড়িল যে, দামুকে খোরাকীর ধান বেচিয়া ডাক্তারের দেনা শোধ করিতে হইল। ইহার ফলে তিনু মাঠের খাটুনী হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে এমনই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল যে, পাড়ার অনেককে সাশ্রু হইয়া বলিতে হইল, 'ওহে দামু, ভাইকে শাসন কর।'

দামুও যে তখন ভ্রাতার শাসনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করে নাই, এমন নহে কিন্তু শাসন করিবার উপযুক্ত সময়তা তাহার ছিল না। ভাইকে শাসন করিতে গিয়া দামু নিজেই শাসিত হইয়া পড়িত। একটা চড়া কথা বলিলেই তিনু কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত; তিরস্কার করিতে গেলে সে খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করিত। তখন এক ওণ শাসনের পরিবর্ত্তে দশ গুণ আদর করিয়া, একটা চড়া কথার বদলে দশটা মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাকে শান্ত করিতে হইত। কোনও

দিন বা মাঠ হইতে ফিরিয়া, বাসী ভাত কেলিয়া, তিনুকে পাড়ায় পাড়ায় খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত। এইরূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দামু শেষে শাসনের সঙ্কল্প ছাড়িয়া দিল। ভাবিল, 'দূর হোক, যার কপালে যা আছে, তাই হবে। আমার কেন মিছে এ কর্ম্মভোগ।'

দামু শাসনের রাশ ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু ভ্রাতার পরিণাম-চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিল না। দামু অনেক ভাবিয়া, স্ত্রীর সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিল, তিনুর বিবাহ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত; সংসারের বোঝা ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িলে তাহাকে বাধ্য হইয়া সংসারের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দামু একটী বড় গোছের মেয়ে দেখিয়া, থাকপত্র করিয়া, ভ্রাতার বিবাহ দিল। কিছু দেনাও হইল, কিন্তু দামু সে জন্য ভয় পাইল না, দুই ভাইয়ে খাটিলে দেনা শোধ করিতে কয় দিন লাগিবে? দামুর আশা কিন্তু সফল হইল না। বিবাহ হইল, বৌ ঘর করিতে আসিল, কিন্তু তিনুর স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। বরং বিবাহের পর হইতে তিনুর বাবুগিরির মাত্রা যেন একটু বাড়িল। সে একটু বেশী ফিটফাট হইল, মাথায় তেড়ী কাটিল; পাখী পোষা, কপাটী খেলা ছাড়িয়া গান বাজনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। দামু ভ্রাতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িল। কি করিলে যে ভ্রাতার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

শুধু এক জন দামুকে সহজ উপায় দেখাইয়া দিল। তিনি নিকটবর্ত্তী উমেশ ঘোষাল। গ্রামের মধ্যে ঘোষাল মহাশয়ের মত পরোপকারী ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক আর এক জনও ছিল না। তিনি দিবারাত্র গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেরই হিতচিন্তা করিতেন, এবং যাহাকেও ন্যায়মার্গ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত দেখিলেই অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া যে কোনও উপায়ে তাহাকে ন্যায়ের সুপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এ জন্য তাঁহাকে অন্যায়কারীর বিপক্ষে কত বার কিরকমার তদ্বির করিতে হইত, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সত্য মিথ্যা কত কথাই বলিতে হইত। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ ঘোষাল মহাশয় ন্যায়ের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যই এই সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেন, এবং ইহাতে তিনি যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিয়া সগর্ব্বে বলিতেন, 'উমেশ ঘোষাল বেঁচে থাকতে কেউ যে অন্যায় ক'রে পার পাবে, সেটী হচ্চে না।'

এতাদৃশ ন্যায়নিষ্ঠ ঘোষাল মহাশয় ভ্রাতার উপর অন্যায় ব্যবহারকারী তিনুর

উপর যে বিরক্ত ও দামুর জন্য ব্যথিত হইবেন, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক; সুতরাং তিনি দামুকে পরামর্শ দিলেন, 'ওহে দামু, ছোঁড়াকে পৃথক্ ক'রে দাও, টিট হ'য়ে যাবে।'

দামু কিন্তু কথাটা শুনিয়াই এমন একটা বিস্ময়মিশ্র ভীতির ভাব প্রকাশ করিল যে, তিনু ইহা অপেক্ষা শত গুণে অন্যায় অত্যাচার করিলেও সে কখনও এমন কথার কল্পনাও করিতে পারে না।

দামু কল্পনা করিতে না পারিলেও ঘোষাল মহাশয় কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না। তিনি আর এক দিন দামুকে ডাকাইয়া বেশ একটু কড়া সুরে বলিলেন, 'ওহে, ভায়ের বিয়ে দিতে টাকা ধার নিলে, কিন্তু তিন বছরেও শোধ করবার নামটী নাই যে।'

দামু সবিনয়ে জানাইল যে, দুই বৎসর ফসল ভাল না হওয়ায় সে টাকাটা দিতে পারিতেছে না, কেবল সুদ মিটাইয়া দিয়া আসিতেছে। আগামী বৎসরে ফসল জন্মিলেই সে দেনা মিটাইয়া দিবে। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু তাহার এই অনিশ্চিত আশার উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'যদি এক মাসের মধ্যে টাকা না দাও, আমাকে নালিশ করতে হবে।'

দামু কাঁদা-কাটা করিতে লাগিল। তখন ঘোষাল মহাশয় তাহার উপর সদয় হইয়া, ঋণশোধের একটা সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'এক কাজ কর না কেন? তিনু ছোঁড়া তো ব'সে আছে। তাকে আমার বাড়ীতে রেখে দাও, খোরাক পোষাক বাদ বছরে তিরিশ টাকা মাইনে হ'লে দু' বছরে তোমারও দেনা শোধ যাবে, আমারও কাজ চলবে।'

বিস্ময়ে শিহরিয়া দামু বলিল, 'কও কর্ত্তা খুড়োঠাকুর, ও হতভাগাকে রেখে আপনি করবে কি? না জানে কাজ, না জানে খাটতে, শুধু ব'সে ব'সে আপনকার ভাত মারবে।'

ঘোষাল মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'ভাত মারে মারবে, সে আমি বুঝবো।'

দামু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'ওরে বাপ রে, বাবুদের ভাত কাঁকি দিয়ে খাবে? না খুড়োঠাকুর, জেনে শুনে এমনতর কাজ আমি করতে পারব না।'

আসল কথা, ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীর ভাত খাওয়া যে কত শক্ত ব্যাপার, তাহা সে বাড়ীতে যে চাকরী করিয়াছিল, সেই বুঝিয়াছিল। এ জন্য তাঁহার কাছে চাকর প্রায় টিকিত না। দামু ইহা জানিত। জানিয়া শুনিয়া সে ভাইকে এমন জায়গায় রাখিতে পারিল না।

ঘোষাল মহাশয় ইহাতে দামুর উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তিনি যে এক মাসের মধ্যেই টাকা আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না, এমন ভয়ও দেখাইলেন। দামু অনন্যোপায় হইয়া দেড় বিঘা জমীর প্রজাই-স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ঘোষাল মহাশয়ের টাকা যোগাইয়া দিল।

ঘোষাল মহাশয় টাকা পাইলেন বটে, কিন্তু দামুর মত মূর্খ চাষাকে জব্দ করিবার উপায়-অন্বেষণে বিরত রহিলেন না।

২

'তিনে, ওরে তিনে, ও হতভাগা!'

তিনে ওরফে তিনকড়ি তখন আহারান্তে তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসিয়া খড়ের আগুন জ্বালিয়া ছিপ সেঁকিতে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় বড় ভাই দামু মাঠ হইতে লাঙ্গলটা কাঁধের লাঙ্গলটা নামাইতে নামাইতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'তিনে, ওরে তিনে, ও হতভাগা!'

তিনকড়ি তখন ডান চোখ বুজিয়া বাঁ চোখের সোজাসুজি ছিপটাকে ধরিয়া তাহার কোন্‌খানে কতটুকু বাঁক আছে, গভীর মনোযোগের সহিত তাহাই পরীক্ষা করিতেছিল। সুতরাং সে জ্যেষ্ঠের আহ্বানে কর্ণপাত করিবার অবকাশ পাইল না। ভ্রাতার এই গভীর উপেক্ষায় ক্রুদ্ধ হইয়া দামু চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওরে তিনে, ও মুখপোড়া, কাণের মাথা কি খেয়েছিস্?'

তিনকড়ি উদাসভাবে উত্তর দিল, 'হুঁ।'

দামু বলিল, 'হুঁ! নিজে পেট ঠাণ্ডা ক'রে ছিপ নিয়ে বসেছ, আর গরুগুলো এই দুপুর বেলা ঐ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে? দাঁড়াও হতভাগা, তোমাকে মাছ খাওয়াচ্ছি।'

তিনু নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিতে এক মুঠা খড় গুঁজিয়া দিয়া তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিতে করিতে বিরক্তির সহিত উত্তর দিল, 'আঃ, কেন বক্‌-বক্‌ কচ্চো?'

মাঠের খাটুনী ও রোদে দামুর মাথাটা একেই গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর অকর্ম্মণ্য ভ্রাতার বিরক্তিপূর্ণ উত্তরে তাহা আরও গরম হইয়া উঠিল। সে রাগে চীৎকার করিয়া বলিল, 'কি আমি বক্‌-বক্‌ কচ্চি? তবে রে মুখপোড়া?'

দামু দ্রুত গিয়া ছিপখানা তুলিয়া লইল। তিনুর চোখ দুইটা খড়ের ধোঁয়ায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল; সেই লাল চোখ দু'টা তুলিয়া সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'দেখ, ছিপ ভাঙ্গলে ভাল হবে না, বলচি।'

দামু দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ঘুরিয়া, এবং ছিপখানার মাঝে পা দিয়া মড়-মড় করিয়া তাহা ভাঙিয়া ফেলিল। বহু কষ্টে সংগৃহীত প্রস্তুতপ্রায় ছিপখানাকে ভাঙিতে দেখিয়া তিনু রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। সে লাফাইয়া উঠিয়া দামুকে একটা ধাক্কা দিল। দামু পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রাগে কাঁপিয়া উঠিল। সামনেই একটা বাঁশের মুগুর পড়িয়াছিল। মুগুরটা তুলিয়া লইয়া দামু সবলে ভ্রাতার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। মুগুর আসিয়া তিনুর মাথায় পড়িল। তিনু দুই হাতে মাথা চাপিয়া 'বাবা গো!' বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার হাতের পাশ দিয়া দর দর করিয়া রক্তধারা গড়াইতে লাগিল। ছোটবৌ বড়বৌ—দুই জনেই সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছোটবৌ চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে বাবারে, খুন কল্লে রে!'

দামু ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিকটেই উমেশ ঘোষালের বাড়ী। ঘোষাল মহাশয় তখন মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে আচমন করিতেছিলেন। ছোটবৌয়ের চীৎকার কাণে গেলে তিনি এক হাতে গাড়ু এবং ডান হাতে খড়ম লইয়াই ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া তিনি তিনুর অবস্থা-দর্শনে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'কি সর্ব্বনাশ! মারলে কে? দামু?'

তিনু রক্তমাখা হাত দুইটা দিয়া ঘোষাল মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'খুড়োঠাকুর গো, আমাকে খুন করেছে গো!'

ঘোষাল মহাশয় দামুর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'এ কি হে দামু, আমি তো তোমাকে সাদাসিধে লোক বলেই জানতাম। তুমি এমন খুনে বদমাস?'

ভায়ের মাথা হইতে রক্তপাত হইতে দেখিয়া দামু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। ভায়ের রক্তে তাহার রাগের আগুনটা একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছিল। এখন ঐ মুগুরটা তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিবে, কি তাহার আগে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিবে, ইহাই স্থির করিতেছিল। এমন সময় ঘোষাল মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাহার ক্রোধাগ্নিটা আবার ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাগে চোখ পাকাইয়া বলিল, 'দেখ খুড়োঠাকুর, মুখ সামলে কথা কও।'

ঘোষাল মহাশয় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'বটে? কেন হে বাপু, এটা মগের মুল্লুক নাকি? তুমি এক জনকে খুন করবে, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখব? তুমি এত বড় বাহাদুর হ'লে কবে নাকি?'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় ডাকিলেন, 'চিন্তে, চিন্তে।'

ঘোষাল মহাশয়ের চাকর চিন্তামণি ছুটিয়া আসিল। ঘোষাল মহাশয় তাহাকে আদেশ দিলেন, 'ছুটে গিয়ে একখানা ডুলী ডেকে নিয়ে আয়। যাবার সময় আমীর সাহেবকে আর নসে চৌকীদারকে ডেকে নিয়ে যাবি। শীগ্‌গীর যা।'

চিন্তামণি ছুটিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া জুটিল। নসীরাম চৌকীদার আসিল; ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট আমীরুদ্দিন সাহেব আসিলেন। ডুলী আসিয়া পঁহুছিল। ঘোষাল মহাশয় আহত তিনুকে ডুলীতে তুলিয়া মহকুমায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে নিজে ছাতা চাদর লইয়া ডুলীর অনুসরণ করিলেন।

লোক জন সব চলিয়া গেল। দামু তখনও নিঃস্পন্দভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বড় বৌ আসিয়া তাহার হাত ধরিল; বলিল, 'ঘরে এস।'

দামু শূন্য উদাসদৃষ্টিতে বড় বৌয়ের মুখের দিকে চাহিল। বড় বৌ তাহাকে টানিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিল।

দুই দিনেও তিনু ফিরিল না দেখিয়া দামু যখন তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং পরদিন সকালে উঠিয়া মহকুমায় যাইবে কি না, বড় বৌয়ের সহিত তাহার পরামর্শ করিতেছিল, তখন সন্ধ্যার সময় তিনু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া গম্ভীরভাবে বাড়ী ফিরিল। দামু উল্লসিতভাবে ছুটিয়া তাহার কুশল-সংবাদ ও বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনু বিরক্তভাবে সংক্ষেপে তাহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রিতে বড় বৌ তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিল, ছোট বৌ আহ্লাদী উত্তর দিল, 'মাথা ধরেছে, কিছু খাবে না।' দামু খোকার দুধটুকু গরম করিয়া তাহাকে দিতে বলিল।

পরদিন সকালে ঘোষাল মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে আসিয়া দামুর চালায় বসিলেন, এবং তিনুকে এক ছিলিম কড়া তামাক সাজিবার আদেশ দিয়া দামুকে জানাইলেন যে, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার নামে নালিশ রুজু করিয়াছে, এবং এই জন্যই সে আর এখানে থাকিতে উৎসুক নহে। দামু ম্লানমুখে বসিয়া কথাগুলা শুনিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় তখন ক্ষণিকালে ধর্ম্মের তিরোভাব ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন যে, তিনি এরূপ অপ্রিয় কার্য্যের সহিত লিপ্ত থাকিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক

হইলেও তিনু কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়ে নাই, ভাগ বাঁটরা করিয়া দিবার জন্য তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদা-কাটা করিয়াছে। ঘোষাল মহাশয়ের হৃদয় নিতান্ত কোমল; পরের ক্রন্দন তিনি সহ্য করিতে পারেন না, অগত্যা তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন। দামু যেন এ জন্য মনে কষ্ট অনুভব না করে।

দামু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, 'ও ছোঁড়ার কথা ছেড়ে দাও খুড়োঠাকুর, ছেলের রূপ হ'তে চল্‌ল, কিন্তু ওর বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু হ'লো না।'

গম্ভীরভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'বুদ্ধিই নাই কেন হে, মামলার আর্জ্জি লেখবার সময় মোক্তার যখন বল্লে, রাগের মাথায় ঝোঁকে ভায়ে ভায়ে মারামারি, তার এর এমন কি সাজা হবে? তাইতে ও বল্‌লে কি জান?'

সাগ্রহে দামু জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল্‌লে খুড়োঠাকুর?'

একটু সোজা হইয়া বসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'বল্‌লে, রাগের মাথায় মারামারি বলবো কেন, আমি বিষয়ের ভাগ চেয়েছিলাম, তাইতে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। দেখলে একবার বুদ্ধিটা? ২০৮ ধারা হ'তে একেবারে ১১১ ধারা।'

উৎসুকদৃষ্টিতে ঘোষাল মহাশয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রফুল্লহাস্যে দামু বলিল, 'এমন কথা বল্‌লে?'

ঘোষাল মহাশয় গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। দামু বলিল, 'তা হ'লে ওর একটু বুদ্ধি হ'য়েছে, কি বল খুড়োঠাকুর?'

তিনু কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দামু তাহার মুখের উপর প্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁরে তিনে তুই আলাদা হ'বি?'

তিনু নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। দামু বলিল, 'কিন্তু খাবি কি?'

বিরক্তির সহিত তিনু উত্তর করিল, 'ছাতী, বোড়া।'

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'আমি কি মিথ্যা বল্‌ছি হে দামু, না এতে আমার কোনও স্বার্থ আছে? তোমার মনটা কিন্তু বড় অশুদ্ধ।'

দামু মস্তক নত করিল। ঘোষাল মহাশয় তিনুর হাত হইতে কলিকা লইয়া হুঁকায় মাথায় বসাইতে বসাইতে বলিলেন, 'তিনু আমার উপরেই ভার দিয়েছে। এখন তোমার বিশ্বাসী লোক এক জন ডাকতে পার।'

ঈষৎ ভগ্নস্বরে দামু বলিল, 'আজই?'

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'হাঁ। তিনু বলছে কি জান? যখন তোমার সঙ্গে মামলা চলছে, তখন কি এক সঙ্গে খাওয়া ভাল দেখায়? এতে শুধু চক্ষুলজ্জা নয়, মামলাটাও বেলো হ'য়ে যেতে পারে।'

তিনুর এই বুদ্ধিমত্তা-দর্শনে দামু চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ঠিক কথা খুড়োঠাকুর, আমার মাথায় এতটা আসে নি।'

দামু ভ্রাতার মুখের উপর প্রেমসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তিনু মুখ ফিরাইয়া লইল। দামু বলিল, 'আমার আর কাউকে বিশ্বাস নাই খুড়োঠাকুর, তুমিই যা ভাল ক'রে দাও।'

হুঁকায় এক-টান দিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'বেশ, আমার উপরেই যখন তোমার বিশ্বাস, তখন আমিই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। পক্ষপাতটা আমার কাছে পাবে না দামু, আমার কাছে তুমিও যেমন, তিনুও তেমনই।'

সুতরাং সর্ব্বত্র সমদর্শী ঘোষাল মহাশয়ের কর্তৃত্বে বিভাগ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ভাগের সময় তিনু যেমনি উৎসাহ দেখাইল না, কিন্তু দামু খুব উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিল, এবং মনসাতলার আওল জমী তিন বিঘা ও বড় ঝোপে দামড়াটা তিনুর ভাগে ফেলিয়া দিল।

কয়েক দিন পরে দাইয়ের মাসে পরন আসিল। দামু ঢেরা সই দিয়া শমন লইল, এবং তিনুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কা'কে সড়কি দেওয়া যায় বলতো তিনু?'

তিনু দাঁতে দাঁত চাপিয়া উত্তর করিল, 'ঘাটকে।'

দামু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনু দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। বড় বৌ স্বামীকে হাসিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, 'আহা, হাসতে লজ্জাও করে না।'

দামু তথাপি হাসিয়া উত্তর দিল, 'বুঝছো না বড় বৌ, তিনুর এবার বুদ্ধি হ'য়েছে।'

'তেমনি মাথা হ'য়েছে' বলিয়া বড় বৌ স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। দামু ভাবিতে লাগিল, তিনুর বুদ্ধির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বড় বৌয়ের বুদ্ধিটা তিরোহিত হইল নাকি?

বড় বৌ কিন্তু স্বামীর ন্যায় সহিষ্ণু ছিল না, এবং তিনুর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য-দর্শনের নিমিত্তও তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সুতরাং সে তিনুর মুখেই দুগ্ধদানে পোষিত কালসর্পের সহিত তাহাকে তুলিত করিয়া যে সকল কথা বলিত, তাহাতে তিনু মনে মনে গর্জ্জন করিয়া বড় বৌকে কালসর্পের বিষের জ্বালা অনুভব করাইবার নিমিত্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত।

৪

নির্দ্দিষ্ট দিনে আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। ন্যায়পরায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের তদ্বিরের ত্রুটী ছিল না; সুতরাং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দ্বারা দামুর অপরাধ প্রমাণিত হইয়া গেল। দামুও অপরাধ অস্বীকার করিল না। সে যে ভাইকে মারিয়াছে, এবং অবাধ্য ভাইকে শাসন করিবার অধিকার তাহার রীতিমত আছে, ইহা বিচারকের সমক্ষে তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিল। বিচারক কিন্তু তাহার অধিকার অনধিকারের বিচার করিলেন না, তিনি অবৈধ প্রহারের অপরাধে দামুর ত্রিশ টাকা অর্থ দণ্ড করিলেন। অনাদায়ে ছয় সপ্তাহ সশ্রম কারাবাসের হুকুম হইল।

দামুর কাছে টাকা ছিল না। নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করায় মোক্তার তাহার উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি জামীন হইলেন না। প্রহরী দামুকে হাজতে লইয়া গেল। তিনু শুষ্কভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আদালতের বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া তিনু মাথার হাত বুলাইয়া দেখিল, সেখানে আর আঘাতের বা বেদনার চিহ্নমাত্র নাই। আজ সে শুধু বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। সে ঘোষাল মহাশয়ের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিল।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় তিনু চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, বড় বৌ আলো জ্বালিয়া দাবার উপর বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, ঠাকুরপো?'

গম্ভীর স্বরে তিনু উত্তর করিল, 'হুঁ।'

'তোমার দাদা আসছে?'

তিনু নিরুত্তরে আপনার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। বড় বৌ তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া উদ্বেগকম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার দাদা কোথায় রইলো ঠাকুরপো?'

বিকৃতকণ্ঠে তিনু উত্তর করিল, 'জেলে।'

উত্তর করিয়াই তিনু দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; বড় বৌ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছোট বৌ স্বামীর সমুখীন হইয়া শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ গা, সত্যি বড়ঠাকুরের জেল হইয়াছে?'

তিনু ঘরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে কর্কশকণ্ঠে বলিল, 'হাঁ হ'য়েছে, তার কি হবে?'

ছোট বৌ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

পরদিন সকালে ঘোষাল মহাশয় মোকদ্দমার খরচপত্র বাবদ নিজ তহবিল হইতে প্রদত্ত টাকার হাণ্ডনোট বা ভমশুক লিখাইয়া লইবার জন্য, এবং সাক্ষীদের নিকট প্রতিশ্রুত একটা বাসীর দাম আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনুকে ডাকিতে আসিয়া শুনিলেন যে, ভোরের সময় উঠিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সেই দিন কাছারী বসা হইবার পূর্ব্বেই তিনু জরিমানার টাকা জমা দিয়ে, দামু মুক্তি পাইল। বাহিরে আসিয়া দামু বলিল, 'আমি সারাটা দিন হাপিত্যেশ ক'রেছিলাম তিনু বলি তিনে এই আসে, এই আসে।'

তিনু কোনও উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইল। দামু তাহার পশ্চাৎ যাইতে যাইতে বলিল, 'কিন্তু এতগুলো টাকা তুই কোথায় পেলি? খুড়োঠাকুরের কাছে ধার দিয়েছিস্ নাকি?'

তিনু উত্তর করিল, 'না, ছোট বৌয়ের হাতের রূপোর চুড়ী ক'গাছা, পেতলের পাশা দুটা, আর কোকরের বেট ছড়াটা বাসনগয়ের ছরি পোদ্দারের দোকানে বেচে এসেছি।'

দামু বলিয়া উঠিল, 'করেছিস্ কি রে হতভাগা, একখানা জিনিস কত কষ্ট হয়, আর তুই তিন তিনখানা জিনিস বেচে এলি?'

তোর গলায় তিনু বলিল, 'বেচা করেছি—বেচেছি।' তুমি আমাকে মারতে পার, আর আমি জিনিস বেচতে পারি না? তবু এখনো খুড়োঠাকুরের কাছে সাতসিকার দেনা আছে।'

'সে দেনা শুধবি কিসে?'

'দু' কাঠা খেটে।'

উৎফুল্লকণ্ঠে দামু বলিল, 'দুদিনের পর দেখছি তোর বুদ্ধি হ'য়েছে।'

রোষগম্ভীরকণ্ঠে তিনু বলিল, 'হাঁ হ'য়েছে, কিন্তু আবার যদি মার, তা হ'লে আমার আমি—'

দামু জিজ্ঞাসা করিল, 'আর তো বৌয়ের গায়ে গয়না নাই, আর কি বেচবি?'

তিনু বলিল, 'আর কিছু না থাকে, বৌকে বেচবো।'

"দূর হতভাগা! নাঃ, তোর কোনও কালেই বুদ্ধি হবে না তিনে!'

দামুর উৎফুল্ল হাস্যধ্বনিতে প্রান্তর-পথ মুখরিত হইয়া উঠিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গোরা ও তাহার অবিনাশ।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র অবিনাশ নামে একটী প্রবল ভক্ত ছিল। গোরা যখন জেলখানা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন অবিনাশ তাহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য দলবল লইয়া হাজির। তাহারা গান ধরিল—

'মুখ দিয়ে যুগী হল বাহির ভোর,
কাটল কাটল অধীনতা ডোর।'

কিন্তু গোরার ইহা সম্পূর্ণ অসহ্য হইল। সে অবিনাশকে বকুনি দিয়া বলিয়াছিল, 'দেখ অবিনাশ, তোমরা ভক্তির জ্বালাই যীশুকে অপমান কর, রাস্তার ধারে আমাকে নিয়ে সংকীর্তন নাচাতে চাও, সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারি, এতটুকু লজ্জা সরম তোমরা আমার জন্যে প্রত্যাশা কর না? এই তো তোমরা বল মহাপুরুষের লক্ষণ?'

এই গোরার অবিনাশের ন্যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও একটী অবিনাশ জুটিয়াছে। গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এই প্রবন্ধটীতে আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মুক্তিসাধন' কবিতাটীতে লিখিয়াছেন—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত আমি পিব অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময়। প্রাণীর মতো
সরস সংসার মোর রসে রসনার
ধরণীর স্তনে যথা শিশুর আহার
তোমার বক্ষের।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
ভোগায় আমার তা'র নাহি পরিত্রাণে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে ফুটিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে টুটিয়া।'

এই কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ভক্ত অবিনাশটি কি বলেন, একবার শুনুন।

'কত শতাব্দী ধরে হিন্দুর নীরন-দেবতার মন্দিরে বিরাট তমসারূপী অপ্রবৃত্তিরূপ অসুর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল'—যেদিন রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হইল 'বাঙালী সে দিন তার চিন্তার পুরাতন ও নমাতন পথে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, মনে মনে আশ্চর্য হ'য়ে বললে—এ কি শুনি! সে দিন থেকে বাঙালীর মনের সামনে নতুন চিন্তার পথ খুলে গেল!'

অবিনাশের সঙ্গীরাও ঠিক এই সুরে গাহিয়াছিল,

'দুখ-নিশীথিনী হল যে ভোর,
কাটিল ক্লান্তি অধীনতা ঘোর।'

কেবল কি 'বাঙালী' তাহার সনাতন পথে 'থমকে' দাঁড়াইল? রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণা-বাণী শুনিয়া দিবাকর তৎক্ষণাৎ মধ্যাকাশে নিশ্চল হইয়া রহিল—পৃথিবী তাহার আহ্নিক গতি বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া পড়িল—আর সেই স্থিতি-বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া 'স্কোপেল' অর্থাৎ বাসুকি সভয়ে তাহার ফণা গুটাইয়া লইল!

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি নাকি 'এক অপূর্ব ব্যাপার, এ এক অতীতের বিরুদ্ধে জাজ্বল্যমান সংগ্রাম, ত্যাগের বিরুদ্ধে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ!' কেবল ইহাই নহে—'কত শতাব্দী ধরে হিন্দুর জীবন-দেবতার মন্দিরে যে বিরাট তমসারূপী অপ্রবৃত্তিরূপ মহা অসুর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল·····এই অপ্রবৃত্তি হচ্ছে বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠাভূমি। বৈরাগ্যের ভিতরে মানুষ কোনও দিনই আপনার জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে না। মানুষের অন্তরে অন্তরে যে চিন্ময়ী দেবী আসন পেতে বসে আছেন, সে চিন্ময়ী দেবীর আসন থেকে মানুষের মনে যে আদেশ আসছে, সে ত বৈরাগ্যের নয়, সে গ্রহণের, আলিঙ্গনের। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ দ্বেষের নয়, প্রেমের। প্রেম যেখানে, আনন্দও সেখানে।'

খুব ঠিক কথা। সেই 'আনন্দে'র সন্ধানেই 'চিন্ময়ী দেবী'র আদেশে 'চোখের বালি'র বিনোদিনী একবার মহেন্দ্রের দিকে, আর একবার তাহার বন্ধু বিহারীর দিকে, আর একবার মহেন্দ্রের দিকে, আর একবার বিহারীর দিকে ধাবিত হইয়াছিল। সেই চিন্ময়ী দেবীর আদেশেই 'ঘরে বাইরে'র বিমলা গৃহের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াই সন্দীপের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইয়া মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল।

সুরেশবাবু বলিতেছেন—

'প্রেম যেখানে আনন্দও সেখানে, কিন্তু ঐ অপরটি আশ্রয় করে আমরা এই প্রেমকে হারিয়েছিলেম, সুতরাং এ জাতে আমরা আনন্দকেও পাই নি।'

অর্থাৎ, এ যাবৎকাল হিন্দু জাতির স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ভাবটা বিকশিত হইত, তাহা প্রেম নহে, সুতরাং তাহাতে আনন্দও ছিল না। হিন্দুর সংসার এত দিন বৈরাগ্যের শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল; কেবল রবীন্দ্রনাথই উক্ত কবিতাটি রচনা দ্বারা সেখানে প্রথমে প্রেমের ফুল ফুটাইতেছেন।

পাঠক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আর ও শুনুন।

'মামুষ প্রেমকে হারাইয়াছিলাম, তাই বৈরাগ্যকেই চরম পথ মনে করে' নিশ্চিন্তকেই আমরা মোক্ষ বলে মেনেছিলাম। কিন্তু মিথ্যা যা' তা' কত কাল টিকবে? অনৃতের উপর ভিত্তি করে যে মন্দির, সে মন্দির যত বিরাটই হোক না কেন, সত্য উঁচুতেই তা' আর যে মাথা তুলুক না কেন, সত্য এক দিন তাকে নত করবেই।.....এই মিথ্যার পথ, অনৃতের পথ, মানুষের এই অকল্যাণের পথ যাঁরা মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা এ জগৎকে গ্রাহ্য করেন নি, তাই তাঁদের বংশধরেরা আজ জগতের অগ্রাহ্য।.....কবির বাণী আজ আমাদের অন্তরতম নিভৃততম প্রদেশের নিগূঢ়তম সত্যটিকে আঘাত করে' আমাদের চোখে একটা নূতন দৃষ্টি এনে দিয়েছে।'

অর্থাৎ, প্রাচীন কালে বেদের ঋষিগণ তপস্যাবলে যে নিবৃত্তিমার্গের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য, বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষি যে পথে সাধন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, গীতা-জাগরূক যে বৈরাগ্যকে শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির পরম পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আধুনিক কালে গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে বৈরাগ্যকে কল্যাণের পথ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহা আগা গোড়া সব মিথ্যা, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঐ ক্ষুদ্র কবিতাটিতে যে পথের আভাস দিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সত্য। অথবা, বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ-শঙ্কর, খ্রীষ্ট-চৈতন্যকে একটা তূলাদণ্ডের এক দিকে স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে যদি তাহার অপর দিকে বসান যায়, তবে রবীন্দ্রনাথই ওজনে ভারি হইবেন। তথাহি—

'অশ্বমেধসহস্রাণি সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাত্ত সত্যমেব বিশিষ্যতে॥'

এত দূর গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধা, এত দূর বিরাট অজ্ঞতা দেখিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কি মনে করিতেছেন, জানি না। কিন্তু আমরা আশা করি, তাঁহার সৃষ্ট গোরা তাহার অবিনাশকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথও তাঁহার এই ভক্তটিকে সেইরূপ শিক্ষা দান করিবেন।

এখন কথা হইতেছে, সুরেশবাবুর কথাগুলি গম্ভীরভাবে বিচার্য্য কি না?

ইতা-সম্পাদক ত ঐগুলিকে 'সুবেশ্‌ফুট' অর্থাৎ বেরালি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে ইহার দুই একটী কথার আলোচনা করিব।

লেখক 'বৈরাগ্য', 'নির্বাণ', 'মুক্তি' প্রভৃতি কতকগুলি কথার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহার অর্থ জানেন, এরূপ বোধ হয় না। 'হিন্দুর দেবতার মন্দিরে বিরাট তমসারূপী অপ্রবৃত্তিরূপ অসুর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল', ইহার অর্থ কি? ঋষিগণ যে প্রবৃত্তি-দমন অথবা ইন্দ্রিয়-সংযমের উপদেশ দিয়াছেন, ইহা কি তাই? তাহা অসুর হইল কিরূপে? বরং কুপ্রবৃত্তিকে অসুর বলা যাইতে পারে। মুক্তি-কামীকে প্রবৃত্তি সংযত করিতে হইবে না, কই, রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতাতে সেরূপ ভাব কোথায়? ঐ কবিতাটীর অর্থ আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহা সংক্ষেপে এই :—'হে ঈশ্বর, তোমার এই নানাবর্ণগন্ধময় পৃথিবীতে তুমি যে অমৃত ঢালিয়া দিয়াছ, তোমায় পাইতে তুমি যে লক্ষ বাতি জ্বালিয়া দিয়াছ, আমি তাহারই মধ্যে তোমাকে চাই—আমি বৈরাগ্যের পথে যা দিয়া, সংসারের মোহের মধ্যে থাকিয়াই, আমার মনের ভক্তি ফুটাইয়া মুক্তিলাভ করিব।' এ ত বেশ কথা। বাস্তবিক পক্ষে সংসারে কয় জন লোকেই বা বৈরাগ্য চায়? যাহারা মুখে 'মুক্তি' 'মুক্তি' বলিয়া চীৎকার করে, আচারে বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তাহাদের কয় জনেই বা সংসারের মোহ ত্যাগ করিতে পারিয়াছে? তাই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সংসারের ভোগের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে মানুষ ঈশ্বরকে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিন্দুর চিরন্তন উপাসনা-প্রণালীও এই ভক্তিযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ যে দেবমন্দিরকে রূপক-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, হিন্দুর সেই আসল মন্দিরে এইপ্রকার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের নিপুণ আয়োজনের মধ্যেই ত দেবতার পূজা হয়। মানুষ, ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া দেবতাকে পাইতে পারে না বলিয়া, স্বয়ং ভগবান্‌কে এই সাকার মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া মানুষের পূজা গ্রহণ করিতে হয়। মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বর্ণগন্ধময় পৃথিবীর মধ্যে, বর্ণগন্ধময় ভগবান্‌কে লাভ করা। নিরাকারবাদী ব্রাহ্মগণ সেই ভাবসঙ্গত উপাসনার পথ পরিত্যাগ করিয়া, 'অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অব্যয়কে ধরিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এত দিন পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে বুঝিয়াছেন—সংসার-মোহমুগ্ধ মানবের জন্য সে বৈরাগ্যের পথ নয়। তাই তাঁহার চিত্ত 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে', 'দৃশ্য-গন্ধ-গানের' মধ্যে ভগবান্‌কে বসাইয়া, মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ পাইতে ব্যাকুল

হইয়াছে। সুরেশবাবু বলেন, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি 'অতীতের বিরুদ্ধে আজন্মমান সংগ্রাম—ত্যাগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ (challenge)'; আমি বলি, তাঁহার এই কবিতা কৃত্রিম উপাসনা-প্রণালীর বিরুদ্ধে মানব-হৃদয়ের self-assertion (আত্ম-প্রতিষ্ঠা)।

রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্য' চাহেন না—তাহার কারণ, তিনি বৈরাগ্যের অধিকারী নহেন। শ্রুতি বলেন,—

'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মবিচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'—মুণ্ডকোপনিষৎ।

ব্রাহ্মণ বিষয় ভোগ করিতে করিতে স্বীয় কৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ করিয়া যখন উপলব্ধি করিবেন যে, কর্ম্ম দ্বারা নিত্য বস্তু লাভ করা যায় না, তখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকট গমন করিবেন। বেদান্তসার এই শ্রুতির অনুবাদ করিয়া বলেন,—'অয়মধিকারী জন্মমরণাদি-সংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।' অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির মাথায় আগুন আসিয়া দিলে, সে যেমন প্রবলবেগে জলাশয়ের দিকে ধাবিত হয়, নির্ব্বাণমুক্তির তিনি প্রকৃত অধিকারী হইবেন, তিনিও সেইরূপ জন্ম-মৃত্যু-সঙ্কুল সংসারানলে নিজকে নিতান্ত সন্তপ্ত মনে করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। বিষয়-ভোগ করিতে করিতে যখন হৃদয় সর্ব্বপ্রকার কামনা-মুক্ত হয়, তখনই মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রুতি বলেন—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।—কঠোপনিষৎ।

এখন কথা হইতেছে, বৈরাগ্যের মধ্যে কি প্রেম নাই, আনন্দ নাই? গত পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে প্রেমের বন্যা নদীয়া হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া বঙ্গদেশ ভাসাইয়া দিয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বৈরাগ্যের কঙ্কাল মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট সমগ্র বিশ্ববাসীকে যে বিশ্ব-প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মূল বৈরাগ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেবও বিশ্বজনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তাহা দূর করিবার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং বোধিদ্রুমমূলে যে মহা বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও সেই বিশ্বপ্রেম। চৈতন্য খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ কি তাঁহাদের এই বৈরাগ্যের মধ্যে তাঁহাদের জীবনের অর্দ্ধ

খুঁজিয়া পান নাই? যোগী ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে যোগসাধনা করেন, তিনি কি তাহাতে আনন্দ পান না? গীতা বলেন—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

অর্থাৎ, পাপমুক্ত যোগী এইরূপে ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া, মনকে ব্রহ্মে যুক্ত করিতে করিতে অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়াই পরমযোগী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছিলেন—

'সদাত্মন্যেবাত্মনঃ
কৌপীনবন্তো খলু ভাগ্যবন্তঃ॥'

কিন্তু এই যোগমার্গ, এই নির্ব্বাণের পথ সকলের জন্য নহে। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যেও এক জন ইহার অধিকারী কি না সন্দেহ। সাধারণের জন্য ভক্তির পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে; রবীন্দ্রনাথও সেই পথের পথিক, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিকে 'টানিয়া বুনিয়া' প্রাচীন ভাব ও সংস্কার-সমূহের লাঞ্ছনা করিবার কোনও কারণ নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বৈদিক সাহিত্যে নাটকের অভিব্যক্তি।

নাটক শব্দ প্রাকৃত ভাষার নট্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। নৃৎ ধাতু নট্ ধাতুর সংস্কৃত আকার। কেহ কেহ মনে করেন, নাটকের প্রধান অঙ্গ নৃত্য; কারণ, ইহা নট্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমরা কিন্তু অনুমান করি, নৃত্যব্যবসায়ী নটগণ যখন নৃত্য-গীত-সংযোগে নাটক অভিনয় করিত, তখনই নাটক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (১) বিভিন্ন দেশে দৃশ্য, অবস্থা ও ঘটনাচক্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ও

(১) "The name for it (drama) is Nataka, and the player is styled Nata, literally 'dancer'. Etymology thus points us to the fact that the drama has developed out of dancing, which was probably accompanied, at first, with music and song only, but in course of time also with pantomimic representations, processions, and dialogue....The prakritised form (of nrit) nat occurs for the first time in Panini, who, besides, informs us of the existence of distinct Nata-Sutras, or manuals for the use of natas, one of which was attributed to Silalin and another to Krisasva....Panini further cites the word natyam in the sense of 'natanam dharma amnayova.' In both cases, we have probably to understand by the term the art of dancing, and not dramatic art.

—*Weber*, pp. 196-197.

চরিত্রের মনুষ্যগণ যেরূপে চিন্তা ও কার্য্য করে, তাহা কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশ করাই নাটকের প্রধান অঙ্গ, বোধ হয়, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি নাটকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ; ইহাদের দ্বারা নাটক মনোরম ও সুখভোগ্য হইয়া থাকে। নটগণ যখন নাটক অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি অভিনয়ের বিশেষ অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্য প্রাচীন সংস্কৃত নাটক বিশেষভাবে নির্ম্মিত অভিনয়-গৃহে অভিনীত হইত। ঐ সকল নাটকে সুজ্ঞধরের উল্লেখ থাকায় মনে হয়, কাষ্ঠ দ্বারা অভিনয়-গৃহ নির্ম্মিত হইত। মহাকবি কালিদাসের সময়ে বা তৎপূর্ব্বেই সংস্কৃত নাটক পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নাটক রচনা ও তাহার অভিনয়ের মূল কি আর্য্যগণ বিদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিংবা ইহার বিকাশ তাঁহাদের মধ্যেই সাধিত হইয়াছিল, আমরা এক্ষণে এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে নানা শাস্ত্রের বীজ নিহিত দেখিতে পাই। নাটক রচনার বীজও ইহার কতকগুলি সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল সূক্তে কথোপকথন দ্বারা উক্তবিষয় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। একটী সূক্তে, (১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূঃ) পুরূরবা ও তাঁহার পত্নী উর্ব্বশীর মধ্যে কথোপকথন দ্বারা তাঁহাদের বিবাহ, দাম্পত্য-প্রেম, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা, মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নবরসভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। (১) অন্য এক সূক্তে (১০।১০৮), ইন্দ্রের সরমা নামে এক কুক্কুরী পণিদিগের দ্বারা অপহৃত গাভীর অন্বেষণে গমন করিয়া, পণিদিগের সন্ধান প্রাপ্ত হয়, বর্ণিত হইয়াছে। তখন সরমা ও পণিদিগের মধ্যে কথোপকথন হয়। পণিগণ সরমাকে গাভীর ভাগ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের ভগিনী হইতে বলে। কিন্তু সরমা ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের শক্তি এবং অঙ্গিরা ঋষিদিগের বলবীর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। যদিও পণিগণ গাভীদিগকে ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে ইন্দ্র ও ঋষিগণ সোমপানে মত্ত হইয়া আসিবেন; তখন তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, সে এইরূপ ভয় দেখাইল। আর এক সূক্তে (১।১৬১) দেখি, ত্বষ্টাদেব ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ঋভুদিগের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিয়া ঋভুদিগকে বলিলেন যে, দেবগণ তাঁহাকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে বলিতে বলিয়াছেন যে,

(১) সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩২৫; 'পুরূরবা ও উর্ব্বশী' সংবাদ দ্রঃ।

আপনারা যদিপি একটী চমসকে চারিটী করিতে পারেন, তবে দেবসত্রে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।' ঋভুগণ ইহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, ইতিমধ্যে আমাদের কার্য্য সারিয়া লই; তৎপরে, আপনার সহিত দেবলোকে গমন করিব। ইহারা তখন অশ্ব, গো, রথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। দেব-শিল্পী ত্বষ্টা ইহাদের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। যখন ঋভুগণ একটী চমসকেই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন, তখন তিনি দেব-দিগের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ঋভুগণ সকল কার্য্য শেষ করিয়া, দেবদূতের অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। তখন তাঁহারা আপনাদের স্বহস্তনির্ম্মিত অশ্বাদি রথে যোজনা করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। দেবগণ তাঁহাদিগকে সুরাসুরাভ্যুক্ত সোম পান করিতে দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এবং বলিলেন, এক্ষণে আপনারা বসুন, পরে সোম পান করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। আবার এক সূক্তে (১০।৫৩) যম ও তাহার ভগিনী যমীর মধ্যে কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক সূক্তে (১০।৫১) অগ্নি, বরুণ ও দেবগণের মধ্যে কথোপকথন দ্বারা আর একটী বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে।

অতএব নাটকের প্রধান অঙ্গ [illegible] ভিন্ন লোকের মধ্যে কথোপকথন দ্বারা কোনও ঘটনার অভিব্যক্তি, তাহা আমরা ঋগ্বেদের উপরিবর্ণিত সূক্তগুলিতেই প্রাপ্ত হইতেছি। সেই জন্য এই সকল সূক্তেই নাটক-রচনার বীজ উপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। সে কালে সূক্তাদিগত পৃক্ সকল যজ্ঞকালে ঋত্বিক্-দিগের দ্বারা উচ্চারিত এবং মধ্যে মধ্যে গীত হইত। ইহাকেই সামগান বলে। অতএব উপরি-উক্ত সূক্ত সকলের সহিত সামগানের রীতিও প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করি। এইরূপ ভাবে দেখিলে নাটকের সহিত গীতির যোগ ইহার প্রথম অবস্থাতেই বর্ত্তমান।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলে। এই ব্রাহ্মণে আমরা নাটক-রচনার দ্বিতীয় স্তর প্রাপ্ত হই। 'শুনঃশেপের আখ্যান' নামক গদ্যে রচিত একটি গল্প এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আখ্যানের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের মধ্যে কথোপকথনের ভাগই অধিক। ইহাতে নানা চরিত্রের সন্নিবেশ ও উহাদের বাক্তিত্বের অভিব্যক্তি অনেক স্থলে দুই একটী কথা ও কার্য্য দ্বারা অতি সুন্দর-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও রাজা রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহাকে এই আখ্যান শ্রবণ করান হইত। (১) ইহা শ্রবণ করিলে অপুত্রকের

(১) তদেতৎপরাঽবরাভ্যাং সৌমনসং বৈখ্যাখ্যানম্।
তং হৈতং রাজে হরিশ্চন্দ্রায়াচষ্ট।—৭ম পঞ্চ, ১৩ অধ্যায়। ১৮

পুত্র লাভ হয়, এ জন্য ধনী অপুত্রকগণও ইহা শ্রবণের আয়োজন করিতেন। ইহা শ্রবণ করাইবার নিম্নলিখিতরূপ পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। হোতা ও অধ্বর্য্যু নামক দুই ঋত্বিক্ হিরণ্যকশিপে (অর্থাৎ সুবর্ণসূত্রনির্ম্মিত আসনে) উপবেশন করিবেন। হোতা যাহা বলিবেন, অধ্বর্য্যু তাহার উত্তর দিবেন। হোতা ঋক্ উচ্চারণ করিলে অধ্বর্য্যু 'ওঁ' শব্দ, এবং গাথা উচ্চারণ করিলে 'তথা' শব্দ উচ্চারণ করিবেন। (১) সায়নাচার্য্য মনে করেন যে, অধ্বর্য্যু কেবল ওঁ ও তথা শব্দ বলিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণে এরূপ কোনও নির্দ্দেশ নাই। পাদটীকায় উদ্ধৃত অংশে, প্রথমে এই বলা হইতেছে যে, হোতা বলিবেন, এবং অধ্বর্য্যু প্রত্যুত্তর দিবেন। হোতা ঋক্ বা গাথা উচ্চারণ করিলে অধ্বর্য্যুর উত্তর দিবার কিছু না থাকিলেও তিনি 'ওম্' বা 'তথা' শব্দ দ্বারা প্রত্যুত্তর দিবেন, ইহাই দ্বিতীয় অংশে প্রকাশ করা হইয়াছে, মনে করি। অতএব, আমাদের মতে, আখ্যানান্তর্গত প্রধান প্রধান অংশ হোতা বলিতেন, এবং অধ্বর্য্যু অপর অংশ প্রত্যুত্তরচ্ছলে বলিতেন। এইরূপে তাঁহারা বিভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইয়া, আখ্যানান্তর্গত যে কোনও ঘটনাবলীর মধ্যে কথোপকথন হইতেছে, তাহার যেন এক প্রকার অভিনয় করিতেন। আখ্যানমধ্যে ঋক্ ও গাথা অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, হোতা এই সকল গান করিতেন। ইহাতে কিন্তু বাদ্যের বা নৃত্যের কোনও উল্লেখ নাই।

শুনঃশেপের নাম ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তে ঋষিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বরুণের পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম

এই শত ঋক্, গাথা (যুক্ত) শুনঃশেপের আখ্যান। তাহা হোতা অভিষিক্ত রাজাকে বলিবেন।

(১) হিরণ্যকশিপাবাসীন আচষ্টে; হিরণ্যকশিপিবাসীনঃ
প্রতিপৃণাতি। যশো বৈ হিরণ্যং যশসৈবৈনং তৎ সমর্দ্ধয়তি।—৬।৩৩।১৮

অর্থ:—হিরণ্যকশিপে উপবিষ্ট হইয়া (হোতা) বলিবেন; হিরণ্যকশিপে উপবিষ্ট হইয়া (প্রতিগরকারী) প্রত্যুত্তর করিবেন। যশই হিরণ্য; যশ দ্বারা ইহাকে তাহা (অর্থাৎ হিরণ্য) সমৃদ্ধ করে।

ওমিত্যৃচঃ প্রতিগর এবং তথেতি গাথায়াঃ।
ওমিতি বৈ দৈবং তথেতি মানুষং।—৬।৩৩।১৮

ঋকের প্রতিগর ওম্, গাথার (প্রতিগর) তথা। ওম্ দেবসম্বন্ধীয়, তথা মনুষ্যসম্বন্ধীয়।

সহস্রমাখ্যাত্রে দদ্যাৎ শতং প্রতিগরিত্রে...।৬।৩০।১৮

আখ্যানকারীকে সহস্র, প্রতিগরকারীকে শত দান করিবে।

মণ্ডলের ২৪শ হইতে ৩০শ সূক্ত শুনঃশেপ-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৫ম মণ্ডলের ২য় সূক্তের ৭ম ঋকে শুনঃশেপের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে সহস্র যূপ হইতে তাঁহাকে মোচনের উল্লেখ দেখিতে পাই। (১) অতএব ঋগ্বেদের কালেও শুনঃশেপের গল্প প্রচলিত ছিল। কিন্তু উহার বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার প্রথম সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত শুনঃশেপের আখ্যান এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ইক্ষ্বাকু-বংশে বেধাব পুত্র হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র হয় নাই। একদা নারদ ঋষি তাঁহার ভবনে আসিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লোকে কেন পুত্র আকাঙ্ক্ষা করে?' নারদ ইহা কতকগুলি গাথা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, আপনি দেবরাজ বরুণের নিকট পুত্র প্রার্থনা করুন, এবং তাঁহার নিকট ইহাও প্রতিজ্ঞা করুন যে, পুত্র হইলে তাহার দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করিবেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের নিকট সেইরূপ প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহার পর রোহিত নামে তাঁহার এক পুত্র হইল। পুত্র জন্মিবামাত্র দেবরাজ বরুণ হরিশ্চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার দ্বারা তাঁহার যজ্ঞ করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি দশ দিন পরে যজ্ঞ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। বরুণদেব দশ দিন পরে আসিয়া উপস্থিত; রাজা বালকের দন্তোদ্গম হইলে যজ্ঞ করিবেন বলিলে, বরুণ ফিরিলেন। এইরূপে হরিশ্চন্দ্র বালক রোহিত ধনুর্ব্বাণ ও বর্মচর্মধারী হওয়া পর্য্যন্ত বরুণকে যজ্ঞের আশা দিয়া ফিরাইতে লাগিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক্ষণে রোহিতের নিকট আপন পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলে, সে তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, এবং বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরুণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে উদরী রোগ প্রদান করিলেন। রোহিত পিতার রোগের সংবাদ লোকমুখে জানিতে পারিয়া গ্রামাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। পথে ইন্দ্রদেব ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া ভ্রমণের উপকারিতা রোহিতকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন রোহিত পুনরায় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে ফিরিয়া গেলেন।

---

(১) শুনঃশেপং। চিৎ। নিদিতং। সহস্রাৎ
যূপাৎ। অমুঞ্চঃ। অশমিষ্ট। হি। সঃ।
এবা। অগ্নে। অগ্নয়ে। বি। মুমুক্ষি। পাশান্
হোতঃ। চিকিত্বঃ। ইহ। তু। নিসদ্য॥ ৫।২।৭

হে অগ্নে! বদ্ধ শুনঃশেপকে সহস্রযূপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলে; তিনি শান্ত হইয়াছিলেন; আমাদিগকেও, হে বিদ্বান্ হোতা! পাশ হইতে মুক্ত করিয়া এই যজ্ঞে (আপনি) করুণার সহিত

প্রত্যেক সংবৎসরশেষে রোহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে গেলেই ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-বেশে আসিয়া তাহার সংকল্প হইতে তাহাকে নিরস্ত করেন, এবং তাহাকে পুনরায় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে পাঠান। এইরূপে ছয়টী সংবৎসর অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণের পর রোহিত অজীগর্ত নামক আঙ্গিরা-বংশীয় ঋষিকে বনে স্ত্রী ও তিন পুত্র সহিত ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি এক শত গোর বিনিময়ে তাহার একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন, এবং তাহার দ্বারা বরুণের নিকট হইতে আপনাকে মুক্ত করিবেন, ইহাও জানাইলেন। অজীগর্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিবেন না, বলিলেন; তাঁহার পত্নী কনিষ্ঠকে দিবেন না, জানাইলেন; ঋষি তখন মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে এক শত গোর বিনিময়ে রাজকুমারকে বিক্রয় করিলেন। রোহিত গৃহে আসিয়া রাজার নিকট ঐ ব্রাহ্মণপুত্রকে প্রদান করিয়া, আপনার পরিবর্ত্তে উহার দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা এই কথা বরুণদেবকে জানাইলে, বরুণ ইহাতে সম্মত হইলেন; কারণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা প্রশস্ততর।

এক্ষণে, রাজা হরিশ্চন্দ্র এই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বসিষ্ঠ, অযাস্য, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঋষিদিগকে ঐ যজ্ঞের ঋত্বিক্ নিয়োগ করিলেন। এই যজ্ঞের বসিষ্ঠ হইলেন ব্রহ্মা, বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, অযাস্য উদ্গাতা; কিন্তু শুনঃশেপকে যূপে বন্ধন করিতে কাহাকেও নিযোক্তা পাইলেন না।

শুনঃশেপের পিতা, আর এক শত গাভী প্রাপ্ত হইলে, ঐ কার্য্য করিতে পারে, এইরূপ প্রকাশ করিল। তাই রাজা হরিশ্চন্দ্র তাহাকে এক শত গাভী দিলেন, এবং তিনি শুনঃশেপকে দাড়ি-গোঁফ বন্ধন করিলেন। এখন উহাকে বধ করে কে? তাঁহাকে বধ করিতে কেহই অগ্রসর হয় না। তখন অজীগর্ত, আর এক শত গাভী দিলে, ঐ কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছে, এইরূপ জানাইল। আর এক শত গাভী পাইয়া সে অসি শাণাইতে লাগিল। তখন শুনঃশেপ দেখিলেন, আর তাঁহার নিস্তার নাই। এখনই তাঁহাকে পশুর ন্যায় বধ করিবে। তখন তিনি দেবতাদিগের স্তব আরম্ভ করিলেন। এই সকল স্তোত্র ঋগ্বেদের মধ্যে শুনঃশেপ ঋষির রচিত বলিয়া স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি প্রথম প্রজাপতির স্তব করিলেন; প্রজাপতি তাঁহাকে অগ্নির স্তব করিতে বলিলেন। অগ্নির স্তব করিলে, তিনি তুষ্ট হইয়া সবিতার নিকট গিয়া তাঁহার স্তব করিতে বলিলেন। সবিতা তাহাতে তুষ্ট হইয়া বরুণ রাজার নিকট গিয়া স্তব করিতে বলিলেন;

কারণ, তাঁহার জন্যই তিনি যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়াছেন। বরুণ তাঁহাকে পুনরায় অগ্নির স্তব করিতে বলিলেন। অগ্নি তাঁহাকে বিশ্বদেবগণের স্তব করিতে উপদেশ করিলেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহাকে ইন্দ্রের স্তব করিতে বলিলেন। ইন্দ্র স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হিরণ্য রথ প্রদান করিলেন। অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিবেন, ইহাও অঙ্গীকার করিলেন। এইরূপে শুনঃশেপ প্রথমে অশ্বিদ্বয়ের ও পরে যখন উষার স্তব করিতে লাগিলেন, তখন তাহার নিজের বন্ধন খসিতে ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের উদর কমিতে লাগিল। তাঁহার স্তবও শেষ হইল, শেষ বন্ধনও খসিয়া গেল, এবং হরিশ্চন্দ্রের রোগও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

ঋত্বিক্‌গণ শুনঃশেপের অত্যাশ্চর্য্য ভক্তি ও কবিত্ব দেখিয়া, তাঁহাকেই ঐ রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিলেন। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ নূতন নূতন ঋক্ রচনা করিয়া ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। ইহার পর শুনঃশেপ বিশ্বামিত্র ঋষির ক্রোড়ে উপবেশন করিলে, তাঁহার পিতা অজীগর্ত বলিলেন, 'হে ঋষে! আমাকে আমার পুত্র দাও।' বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'দেবগণ আমাকে এই পুত্র দিয়াছেন; অতএব ইনি আমার দেবরাত পুত্র; ইহাকে আমি তোমায় দিব না। এই যে কপিলবংশীয় বভ্রুগণ রহিয়াছেন, ইহারা সকলেই ইহার।' তখন অজীগর্ত শুনঃশেপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমরা তোমার পিতা মাতা—দুই জনে তোমায় ডাকিতেছি, তুমি আমাদের কাছে আইস। জন্মের দ্বারা তুমি অঙ্গিরা-বংশীয়; তুমি বেদবিদ্ ও কবি। পিতামহের বংশ ত্যাগ করিও না। আমার নিকট পুনরায় আইস।' তখন শুনঃশেপ বলিলেন, 'যে কার্য্য শূদ্রদিগের মধ্যেও দেখা যায় না, তুমি তিন শত গাভীর বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করিয়াছ, এবং বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে।' অজীগর্ত নিজের এই কার্য্যকে পাপ কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিল, এবং ঐ তিন শত গাভী শুনঃশেপকে দিবে, বলিল। কিন্তু শুনঃশেপ বলিলেন, 'যে বারংবার পাপ কার্য্য করে, সে ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতেও পাপ করিতে পারে। আর তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।' শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি অঙ্গিরা-কুলে জন্মিয়া কিরূপে আপনার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি?' তাহাতে বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'আপনি আমার পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হউন; আপনার সন্তানগণই আমার বংশে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। আমার দৈব ন্যায় আপনি প্রাপ্ত হইবেন; তাহাতেই

আপনি আমার পুত্রত্ব লাভ করিবেন।' বুদ্ধিমান ও বিবেচক শুনঃশেপ তখন বলিলেন, 'আপনি আপনার পুত্র ও অপর জ্ঞাতিদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিন—যেন তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করেন, এবং সেইরূপ কার্য্য করেন।' বিশ্বামিত্র স্বীয় এক শত সন্তানের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশ জনকে এই কথা বলিলে, তাহারা শুনঃশেপকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিল না। তাহাতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে 'চণ্ডাল হও' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। পরে অপর পঞ্চাশ জন ইহাতে স্বীকৃত হওয়ায়, বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

এই আখ্যানের মধ্যে যে অতি সুন্দর Dramatic situation বর্ত্তমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপাখ্যান-রচয়িতা যে তাহার বেশ সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারেন। অতএব বৈদিক যুগেই যে ঋষিগণ নাটক-রচনা ও উহার অভিনয়ে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, প্রথমে যজ্ঞের অঙ্গ-রূপেই এই সকল রচনার উৎপত্তি ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। (১) নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে মনে হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নিজের নিজের একটা মত-স্থাপনেই ব্যস্ত; সেই জন্য প্রকৃত ঘটনার সহিত অনেক সময়ে তাহাদের মিল থাকে না। এ স্থলে আমরা ইহার একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

(১) It has been uniformly held hitherto that the Indian drama arose, after the manner of our modern drama in the Middle ages, out of religious solemnities and spectacles (so-called 'mysteries'), and also that dancing originally subserved religious purposes. But in support of this latter assumption, I have not met with one single instance in the Srauta or Grihya-sutras with which I am acquainted (though of the latter, I confess, I have only a very superficial knowledge). The religious significance of dancing is thus, for the older period at least, still questionable; and since it is from dancing that the drama has evidently sprung, the original connection of the latter with religious solemnities and spectacles becomes doubtful also. Besides, there is the fact that it is precisely the most ancient dramas that draw their subjects from civil life; while the most modern, on the contrary almost exclusively serve religious purposes. Thus the contrary, rather, would seem to be the case, namely, that the employment of dancing and of the drama at religious solemnities was only the growth of a later age.

সহযোগী সাহিত্য।

হয়শলা রাজ্য।

হয়শলা রাজ্যের বিধিব্যবস্থা, শিল্প-সৌকর্য্য, জনসাধারণ কিরূপ ছিল, S. Srikántaiya এই সম্বন্ধে Quarterly Journal of Mythic Societyতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

রাজনীতি।

আমরা তাহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। রাজা সর্ব্ববিষয়ে প্রধান ছিলেন। রাজনীতি বা ধর্ম্ম সকল বিষয়েই তিনি কর্ত্তা। এ সব বিষয়ে রাজার উপরে কর্তৃত্ব করিবার কেহ ছিল না। সমস্ত দেশটী অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। অষ্টাদশ প্রদেশের এক এক প্রদেশে এক এক জন রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন। কোনও কোনও প্রদেশে স্বয়ং যুবরাজ ও অন্যান্য প্রদেশে রাজপুত্র বা অন্য কেহ থাকিতেন। তাঁহারা রাজভক্ত প্রজা; রাজাকে সতত ভক্তি জানাইতেন। কোনও নূতন দেশ বা রাজ্য বিজিত হইলে, হয়শলা সাম্রাজ্যের সহিত তাহা যোগসূত্র বেঁধে করিয়া দেওয়া হইত। পরিবর্ত্তন খুব কমই করা হইত। কোনও কোনও সময় পরাজিত রাজাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু তিনি সম্রাটের অধীন থাকিয়া রাজ্য করিতেন।

রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। মন্ত্রীকে 'সর্ব্বাধিকারী' কহিত। সময়ে সময়ে যুবরাজও মন্ত্রিসভায় কাজ করিতেন। প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বাধিকারী ছাড়া আরও চারি জন মন্ত্রী থাকিতেন। এই সকল মন্ত্রীকে 'মহামণ্ডলেশ্বর' কহিত। পঞ্চ মন্ত্রীতে মিলিয়া যে মন্ত্রিসভা হইত, তাহাকে 'পঞ্চ-প্রধান' বলিত। এই পঞ্চপ্রধানদের প্রত্যেকেই বংশানুক্রমিক বড়লোকদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন।

রাজকার্য্যচারীর অন্যান্য অমাত্যগণের উপরে একজন প্রধান (Chief Secretary) ছিলেন। রাজার সমস্ত হুকুমপত্র রাজার অমাত্য (Royal Secretary) এই প্রধানকে জানাইতেন। এই রাজার অমাত্যের নাম ছিল 'হুজুর'। 'প্রধান' অন্যান্য খাজনাবিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে রাজাদেশ জানাইতেন। খাজনাবিভাগের কর্ম্মচারীরা রাজাদেশ অনুসারে তখন কার্য্য করিতেন।

খাজনাকে 'হুলা' বলিত। গ্রামের লোকের নিকট এই হুলা আদায় করা হইত। প্রত্যেক কাঁড়ী শস্যের জন্য এক 'ঘনম' অর্থাৎ ৪ আনা ৩ পাই আদায় হইত। বিন্যাসের

পরিমাণ।

সময় হইতে প্রত্যেক রায়তকে এক হুলা অর্থাৎ জমীর শস্য দিতে হইত। লোকে বলিত, এই সকল শস্য একটা কূপে ফেলিয়া স্বর্ণে পরিবর্ত্ত করা হয়। খুব সম্ভব হুলা একটা ছোট কাঠীর আঠার গুণকে কহিত। যেমন আমাদের দেশে বিঘা, রশি প্রভৃতির পরিমাণ। এই হুলা ছিল খাজনা নির্দ্দেশ করিবার ভূমির পরিমাণ। অর্থাৎ, এতখানি জমী রায়িবে, এতখানি জমী অর্থাৎ হুলার শস্য দিতে হইবে। বিজয়নগরের রাজাদের সময় প্রত্যেক রায়তকে ঐরূপ ভূমিখণ্ডের জন্য একটী করিয়া প্যাগোডা দিতে হইত। বনভূমির

উৎপন্নের একপঞ্চমাংশ ও রবিশস্যের একপঞ্চমাংশ ছিল খাজনার হার। নীচু জমীকে অর্থাৎ যেখানে ধান্যাদি জন্মিত, তাহার কর ছিল উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ।

এক রকম জরিমানার নাম ছিল 'হোদেক'। এই জরিমানা দিলে কোনও লোক নাগারণের জন্য গ্রামে কোনও জমী ভর করিতে পারিত। জমীর মূল্যকে জরিধানা বলা হইত।

'হোদেক'।

তাহারই নাম ছিল 'হোদেক'। 'হোদেক' দিলে খারিজ বাবিল প্রভৃতি রাজসরকার আপনা-আপনি করিয়া লইত। নাম প্রভৃতি আঠারখানা খাতায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে থাকিত। সকল বিভাগই নাম মাফাইয়া ঠিকঠাক করিয়া লওয়া হইত। অন্যান্য প্রকার করও ছিল। দ্বিতীয় বিনয়াদিত্য ঋষিহল্লিকে যে দানপত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য করের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—গৃহ-কর, বিবাহ-কর, উল্ল-উট্টগি, টাণ্ডী, সুরাণ্ডু, ভুবাবৃত্তি, বেসি, ওমেঞ্জ, মানকরী, কুতা, কালাম্বলী, ধীরবনা (সৈন্য রাখিবার খরচ বাবদ কর), কোদাতিকর (হাতুড়ীর কর), কাট্টারীবনা (কাঁচির কর), আদিকেল বনা (হাপরের কর), হালাতেলেয়া, হাড়িয়ারামা, কুম্ভবিত্তি (কুম্ভকারের কর), কামার বিত্তি (কামারের কর) প্রভৃতি।

ওল্ক-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী সর্ব্বাধিকারীর সরাসরি অধীনে কাজ করিত। সর্ব্বাধিকারীকে সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগে তাঁহার এক জন লোক থাকিত। পাইকারী ও পুচারা, উভয় প্রকার বিক্রয়ের উপরই শুল্ক ছিল। পাইকারীর শুল্ককে 'পারজুনকা' ও পুচারার শুল্ককে 'কিরকুলা' কহিত। 'ভাণ্ডারিভুলা' নামক পোয়ে শুল্ক স্থাপিত হইত। অর্থাৎ, বেয়াল্লিশটি থানা ছিল। এই সকল থানার লোকেরা ঠিক করিত, কোন দ্রব্যের উপরে কিরূপ শুল্ক বসিবে, এবং কোন দ্রব্যের উপরে শুল্ক বসিবে না।

শুল্ক।

রাজ্যের সকল বিভাগের অপেক্ষা পূর্ত্ত-বিভাগই অধিক কার্য্যতৎপর ছিল। যুদ্ধ-বিভাগের পরই ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। এক মন্ত্রী কর্ম্মশ্রেষ্ঠ ও কর্ম্মঠ মন্ত্রীর অধীনে এই বিভাগ ন্যস্ত ছিল। নদীর বাঁধ, রাজধানী, পুষ্করিণী ও দীঘিকা খনন প্রভৃতি পূর্ত্ত-বিভাগের কার্য্য ছিল।

পূর্ত্ত-বিভাগ।

খুব সাহসী, তেজস্বী, যুদ্ধে উপযুক্ত সৈন্যের নাম হইত। সাহসী ও যুদ্ধকৌশলী লোকদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত। 'বীরকলা' ও 'মস্তিকলা' এই সকল লোককে দেওয়া হইত। এগুলি জায়গীর-জাতীয়।

যুদ্ধ বিভাগ।

রাজা নিজে বিচার-বিভাগের কাজ করিতেন। রাজ্যের পঞ্চপ্রধানরা এ বিষয়ে রাজাকে সাহায্য করিতেন। রাজার বিচারের উপর আর কাহারও বিচার করিবার অধিকার ছিল না। উহাই শেষ বিচার। বিচারপদ্ধতি বড় সুবিধাজনক ছিল না। পরীক্ষামূলক বিচারেরই প্রচলন ছিল। অনেক বিসংবাদই 'শুল্ক' মাঝে পড়িয়া মিটাইয়া দিতেন। মন্ত্রপূত ধান্য খাইতে হইত, এবং খাইবার পূর্ব্বে ভগবানের নামে শপথ করিতে হইত যে, সে দোষ করে নাই। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় এইরূপ হইত। যদি খাইবার সময় গলায় বাধিয়া যাইত, তাহা হইলে অভিযুক্ত দোষী বলিয়া গণ্য হইত। আবার আর এক সময় হয়শ্লেখরের সম্মুখে রক্ত-তপ্ত লৌহদণ্ড চাপিয়া ধরিয়া সপ্রমাণ করিতে হইত, সে দোষী

ফৌজদারী বিচার।

ছি নি য়া। ওজনে পরা পূর্ব্বের মত পণ্য করিয়া মুটে, মুটে হাত ডুবাইয়া ধরিয়া প্রমাণ করা। জলে ডুবিয়া বা ফাঁসীতে ঝুলিয়া আত্মহত্যা, বা বিধবা অন্তঃসত্ত্বা হওয়া প্রভৃতি অপরাধ রাজার নিকটে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত না। এই সকল অপরাধ সাধারণ সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। সেই জন্য এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি রাজকর্ম্মচারীরা করিতেন না; সমাজের লোকেরা করিতেন। কিন্তু চুরী, অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি অপরাধ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধে হইলে রাজসমীপে হইতে অনুসন্ধানাদি করা হইত। কারণ, ব্যক্তিবিশেষ প্রকৃত অপরাধী কি না, তাহা দেখা সরকারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুই গ্রামের সীমানা লইয়া প্রায়ই বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইত। ছোটখাটো দাঙ্গাহাঙ্গামা ও গরু চুরী হইত।

দরখাস্তের ক্ষমতা।

কোনও কর উঠাইয়া দেওয়া বা কোনও অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য রাজার নিকট দরখাস্ত করিতে হইত। যে বিষয়ে দরখাস্ত হইত, যে মন্ত্রীর হাতে সেই বিভাগের কর্ত্তৃত্ব থাকিত, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে মত দেওয়া হইত। কোনও ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্যে ভূমি হস্তান্তরিত করিতে হইলে পুরোহিত ঠাকুরের পদপ্রক্ষালন করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইত। এখন এ প্রথা নাই।

খনি।

খনির কাজ দেখিবার জন্য একটা বিভাগ ছিল। এই বিভাগ-পরিদর্শনের জন্য এক জন পরিচালক ছিলেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে বেশ দৃষ্টি রাখা হইত। ছোট সহর কিংবা অনেক আধ্যাত্মিক শাসনসংরক্ষণ-পদ্ধতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই—উহা পূর্ব্বের মতই ঠিক চলিতেছে।

অনেক সময় গ্রামের উপকারার্থ ঋণসাহায্য দেওয়া হইত। কর্ম্মচারীরা ও গবর্ণর দেখিতেন, যে, উদ্দেশ্যে টাকাটা দেওয়া হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে তাহা ব্যয়িত হইল কি না। 'পট্টনস্বামী' অর্থাৎ সহরের মেয়র রাজার নিকট সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতির কথা জানাইতেন, এবং তদনুসারে তাহার প্রতীকার হইত। সাধারণতঃ সহরের এক জন বড় শ্রেণী পট্টনস্বামীর পদ পাইতেন। গ্রামবাসীরা কতকগুলি নিয়মানুসারে চলিতে অঙ্গীকার করিলে গ্রাম সহরের পদে উন্নীত হইত।

ব্যবসায়।

বড় বড় শ্রেষ্ঠীরা ব্যবসায় চালাইতেন। ব্যবসায় দেখিবার জন্য অনেক রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। এই পদের নাম ছিল শেট্টি। বৈদেশিকেরা, তাঁহাদের মালে অন্যায় ও অসুবিধাদি না হয়, দেখিবার জন্য নিজেদের মধ্য হইতে এক জন লোক ঠিক করিতেন। তাঁহার কাজ অনেকটা এখনকার কন্‌সলের মত। ব্যবসায় শুধু যে দেশেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। মালয়ী ব্যবসায়ীদের অনেকে এখানে বাড়ী ঘর করিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এক জন শ্রেষ্ঠী রাজার এত ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন যে, কোনও সাংসারিক কার্য্যোপলক্ষে রাজা তাঁহাকে কোনও এক বৈদেশিক রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও কার্য্য সুচারুরূপে করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ীও ছিল। জনৈক ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী জাহাজে করিয়া বিভিন্ন দেশ হইতে হাতী, ঘোড়া, মণিমুক্তাদি আনয়ন করিয়া রাজসকাশে নিবেদন

রাজাদের নিকটে বিক্রয় করিতেন। গমুজওয়ালা ইহা একটি প্রবাদ নহে কি? আর এক দল ব্যবসায়ী আচী হইতে এলাচের মাল চালান দিতেন।

চিকিৎসা-বিভাগে এবদকার I. M. S দের মত সৈন্যদের জন্য স্বতন্ত্র ডাক্তার ছিল। বেঙ্গাধীতে ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনটী চিকিৎসালয় ছিল। পশুর হিতার্থ নিঃসম্বলদিগের চিকিৎসালয়কে 'কোট্টিয়ুমাধা' কহিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। ধাত্রীর জন্যও অনেকগুলি বিদ্যালয় ছিল।

চিকিৎসা বিভাগ।

শিক্ষা ও পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যের একটী মিশ্রিত বিভাগ ছিল। 'পূর্ত্তবিভাগের মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ কার্য্যের বিভাগটী এই শিক্ষা-বিভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল। কারণ, শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মন্দিরে মন্দিরে। মন্দিরে বসে পুরোহিতেরা ধর্ম্ম ও সাহসাদি, উত্তরবিব শিক্ষাই দিতেন। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য রাজসরকার হইতে প্রচুর অর্থ দেওয়া হইত। এখন এই সকল মন্দিরের শিল্পকার্য্য যেমন আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, সেইরূপ নানা উৎকীর্ণ লিপি ভাস্করশাস্ত্র প্রভৃতি হইতে তখনকার সভ্যতা ও সামাজিক জীবনের ইতিহাসও যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়।

'মজরাই'।

ব্যাঙ্কিং।

মন্দিরাদি হইতে লোককে টাকা কড়ি ধার ও সাহায্য দেওয়া হইত। এগুলি ব্যাঙ্কের কার্য্যও করিত।

ব্রহ্মচারীরা গুরুকুলে ঋষির আশ্রমে থাকিতেন। ওরুকুলে ব্রহ্মচারিগণ ১৫ হইতে ১৬ বৎসর, এমন কি, ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেন। তাঁহারা বাড়ীর দিকে যাইতেন না। তাঁহার সমস্ত কাজ করিতে হইত, এবং উত্তরীয়স্বরূপ তাঁহারা চীরবস্ত্র ধারণ করিতে হইত।

শিক্ষাদান-পদ্ধতি।

দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় তিন প্রকারের ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাবত্তা ও গুণ ও শিক্ষার উন্নতি প্রচেষ্টার জন্য 'অগ্রহার' দেওয়া হইত। বিনা অর্থে একটা গ্রাম বিনা করে শিক্ষার উন্নতির জন্য কোনও লোককে দেওয়া। ব্রাহ্মণেরা গ্রামের গ্রাম সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তা ছিলেন। সহরে যে স্থানে ব্রাহ্মণেরা বাস করিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন, সেই স্থানকে 'ব্রহ্মপুরী' কহিত। অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইত। ব্রহ্মপুরী ব্যতীত শিক্ষাদানের আরও বহু কেন্দ্র সর্ব্বত্র ছড়াইয়া ছিল। মঠে মঠে এই সকল অনুষ্ঠান ছিল। মঠগুলিকে রেসিডেন্সিয়াল কলেজ বলা চলে। ছাত্রদের বাসভবন ছিল—শিক্ষকেরাও সেখানে থাকিতেন। মঠে বসিয়া ছাত্রেরা ধর্ম্মাবলম্বন, সাংসারিক ও সামাজিক, সকল প্রকার শিক্ষা পাইত। কোনও কোনও মঠে গ্রামে ছেলেদের শিক্ষার ও ভোজনের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। রাজসরকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন।

ভাষা।

কন্নড় রাজভাষা ছিল। রাজ্যের পশ্চিম ভাগে কন্নাদের প্রচলন ছিল। তামিল পূর্ব্বে। পূর্ব্বে তামিলই রাজভাষা ছিল। ব্যাঙ্গালোর চেল্লা ও দক্ষিণ প্রদেশে তামিল যে রাজভাষা ছিল, উৎকীর্ণ-লিপিতে রাজাদের মুদ্রিত থাকাই তাহার প্রমাণ।

কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হস্তিপালকের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া

মুদ্রা। যায়। ওস্মাদ অক্ষরে লিখিত শ্রীনোরাধলাধিগোলার কাহিনীতে যে মুদ্রার (বিজুমুদ্রা) পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, তখন স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। তাহার মূল্যগুলি অল্প ছিল। মহীশূরকেশরী টিপুসুলতানের সমসাময়িক।

শক্ত ইস্পাতের যন্ত্র দিয়া তখন কার্য্য করা হইত। তখন শিল্প এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, প্রায় ভারতশিল্পের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। 'ছলা' ও ব্যাঘ্রমূর্ত্তি উৎকৃষ্ট ক্ষোদিত

তখন শিল্প। মূর্ত্তির একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। হয়শলারাজ্যের সকল মন্দিরে এমন স্থানে এই মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়, সকলের দৃষ্টি সেখানে পড়ে। ছবিটী এইরূপ।—একটা অদ্ভুত-জাতীয় পৌরাণিক ব্যাঘ্র লাফাইয়া উঠিয়া 'ছলা'কে আক্রমণ করিয়াছে। 'ছলা' হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঢাল লইয়া ব্যাঘ্রের ভীম আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে, এবং অপর হস্তে একখানা তীক্ষ্ণধার ছোরা ব্যাঘ্রের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই চিত্রটী শিল্পীর নিপুণহস্তে এমন সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলে যে, মনে হয়, সদ্য যেন এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু শিল্পের সব চেয়ে বাহাদুরী মন্দিরের নির্ম্মাণে ও কারুকার্য্যে, বিশেষতঃ ছাদের নীচের ও বাহিরের গম্বুজের। এক রকম ঈষৎ লালচে পাথরের উপর কারুকার্য্য করা—এই পাথরগুলিকে ঘষিয়া মাজিয়া নরম পাথরের মত চক্‌চকে মসৃণ করা যায়। যখন খনিতে থাকে, তখন নেহাৎ নরম, কিন্তু বাহিরে রৌদ্র বাতাস ঝড় জল যত লাগে, ততই শক্ত হইয়া উঠে। মূর্ত্তির অঙ্গের কোনও কোনও বালা নড়ান চড়ান যায়। বেলুড় মন্দিরে ফড়িংএর মূর্ত্তি কিরূপ চমৎকার, যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন। হলবিদ মন্দিরের একটা থামের সমানান্তরাল মূর্ত্তির মূর্ত্তিটি কত সুন্দর।

'করণ' ভাষায় লিখিত একটী নামমালা মুক্তকের নাম আতক-তিলক। এইখানি জ্যোতিষের পুস্তক; কবিতায় লেখা। ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রহবমনের সময় দৈব সিদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত। সিদ্ধাচার্য্য নিজে বলিয়াছেন যে, আর্য্যভট্ট তাঁহার পূর্ব্বের লোক।

সাহিত্য। আতক-তিলকে গ্রহমন্দির ও গণনার উপযোগী যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণ-প্রথার উপদেশ আছে।

ইহার পর ১১১২ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণের কর্ত্তৃক লিখিত ধর্ম্মমিত্র গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তার পর ১১২০ খ্রীঃ রাজাদিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গুপ্তরাজ বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজবর্ম্মা, ভাস্করাচার্য্যের মত তাঁহারও নাম এখনও আছে।

১১৭০ খ্রীঃ নেমিচন্দ্র গোম্মটসার, ও নেমিনাথপুরাণ নামক দুইখানি রোমাঞ্চকর ঘটনাপূর্ণ পুস্তক লেখেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে রুদ্রভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় বল্লালের মন্ত্রী চন্দ্রমৌলী তাঁহার পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'জগন্নাথবিজয়'। বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণের জন্ম হইতে বংশাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১১৬৫ খ্রীঃ লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের হরিহরের সাহিত্যিক অভ্যুদয়। তিনি গিরিজা কল্যাণ, নিজগুণাদারজনী, গণশতক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার সমসাময়িক ছিলেন

রাঘবঙ্ক। তিনি তাঁহার সময়ে যশস্বী ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রকাব্য, সোমনাথচরিত, সিদ্ধরামপুরাণ, হরিহরমাহাত্ম্য, বিবেকচরিত, শম্ভুচরিত প্রভৃতি পুস্তক রাঘবঙ্কের রচিত। রাঘবঙ্কের কোনও ব্যবহারে তাঁহার খুল্লতাত একবার এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক আঘাতে তাঁহার পাঁচটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পাঁচখানি গ্রন্থ লেখার পর সন্তুষ্ট হইয়া তিনি রাঘবঙ্কের দাঁতগুলি বাঁধাইয়া দেন।

১১৬২ খ্রীঃ কর্ণাট দেশের এক ক্ষুদ্র রাজবংশে একেক সাহিত্যিকের উদ্ভব হয়। ইঁহার নাম পম্পরাস। তিনি হুমশলা রাজ্যের খালবিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। এই বিভাগের কার্য্যে তাঁহার উপর রাজা খুব সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং রাজার নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। অনেক বড় বড় কবি সাহিত্যিক-মজলিসে তর্কে তাঁহার নিকটে পরাস্ত হইতেন।

সাধারণতঃ একখণ্ড কাপড় মাত্রেরই পোষাক ছিল। সর্ব্বদা সে সেইখানা পরিয়াই থাকিত। দেহ উলঙ্গই রহিত। এখনকার মত জামা, জুতা আঁটার ব্যবস্থা তখন ছিল না।

সামাজিক জীবন।

অবশ্য বুট ও জুতার প্রচলন ছিল; কিন্তু সর্ব্বদা এবং সকলে পরিত না। স্ত্রীলোকেরাই শুধু গহনা পরিতেন, পুরুষরা পরিতেন না। বড়লোকেরা গহনা ব্যবহার করিতেন। পুরুষরা চুলে খোঁপা বাঁধিত। স্ত্রীলোকেরা সাড়ী পরিতেন, এবং এখনকার মত বডিস ব্যবহার করিতেন। নর্ত্তকীরা পায়জামা ব্যবহার করিত। কোনও কোনও স্ত্রীলোক ভাগুল চর্ব্বী পরিতেন। বড় বড় মাকড়ীর ব্যবহার ছিল, এবং স্ত্রীলোকদের সর্ব্বাঙ্গ নানারূপ অলঙ্কারে পূর্ণ থাকিত। এখনকার গ্রামে পাঁচ বৎসরের কমবয়স্ক ছেলেরা যেমন উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়, তখনকার প্রথাও তেমনই ছিল। মেয়েরা ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন।

আস্ত একখানা কাঠ গোল করিয়া কাটিয়া গরুর গাড়ীর চাকা হইত। গরুর গাড়ীর দুইটি চাকাই হইত। স্প্রিংএর ভাঙ্গা দেওয়া চাকাও হইত, তবে খুব কম। রাজার গাড়ীর চার চাকা ছিল। চাকাগুলি ভাঙ্গাওয়ালা গাড়ীতে স্প্রিং থাকিত।

কুস্তী ও শীকারের খুব চলন ছিল। বঙ্গ রাজা ও রাণীরা যুদ্ধযুক্ত দেখিতে আসিতেন। কখনও কখনও নর্ত্তকীরা 'কোলাটাম' নৃত্য করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিত।

ক্রীড়া।

বন্দুক ছিল। একখানা ছবি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, জনৈক লোক বন্দুক দিয়া গুলি ছুড়িতেছে। পদাতিক সৈন্যরা সাধারণতঃ তীর ধনুক ব্যবহার করিত। ঘুড়সওয়ার অবশ্য আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল। সাধারণ তলোয়ারগুলি তেমন পরিচ্ছন্ন ছিল না। হয়শলেশ্বরের মন্দিরে একখানা চকচকে মসৃণ তীক্ষ্ণধার অসি আছে। বড় বড় মাথার চুল বুনিয়া বুনিয়া সৈনাদের মস্তক আঘাতের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। লম্বা বুট পরিয়া তাহারা পাদদ্বয় বাঁচাইত। অশ্বের গায়ে শিকলের জাল পরাইয়া দেওয়া হইত। অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া বর্শার সাহায্যে কদাচিৎ লড়াই করিত। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই সাধারণতঃ যুদ্ধ করিত। ঘোড়ার জীন ও রেকাবও ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যরা বুকে ধাতুনির্ম্মিত পাত পরিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন।

যুদ্ধে যখন কে জিতিবে, কে জিতিবে, এইরূপ ভাব, তখন প্রধান সেনাপতি কোনও বিখ্যাত

বলি। বীরকে আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন। এইরূপে অনুরুদ্ধ হওয়া খুব সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং নিজ হস্তে এই আত্মবলিদানোন্মুখ ভাগ্যবান পুরুষদ্বয়টীকে একখণ্ড পান দিতেন। ইঁহার পরিবারবর্গকে বিনা করে কিছু পরিমাণ ভূমি ভোগদখল করিতে দেওয়া হইত। যুদ্ধে ইঁহি প্রাণ হারাইয়া দেবলোকে গমন করেন, এইরূপ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইত। ইহাকে 'বীরস্থান' বলিত। তাঁহার স্ত্রী পতির প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার ও মহাশক্তির মিলনের আশায় আত্মহত্যা করিতেন। বীরপত্নীর মৃতিদেবতাকে 'সতীকাল' কহিত।

রাজার জীবনরক্ষার্থে, রক্ষী থাকিত। অনেক আত্মীবন রক্ষী ছিল। তাহাদিগের নাম ছিল 'গাড়ুদ।' তাহারা এই পণ করিয়া কর্ম্মে ব্রতী করিত যে, প্রাণপণ করিয়া রাজার জীবনরক্ষা করিবে। সেনাপতি হইলে তাহারা আত্মহত্যা করিত।

'গাড়ুদ।'

পুরাকালে জাপানী বীরগণ যেরূপ কারণে হারিকারি করিত, ইহারাও ঠিক তাহাই করিত। বিষ্ণুর প্রথম নাম গাড়ুদ। বিষ্ণুর রথ যেরূপ তাঁহার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ ও জীবনসাথী, গাড়ুদরাও সেইরূপ রাজার জীবনসাথী, তাহাদের ইহাই ধারণা ছিল। সেজন্য রাজার মৃত্যুতে তাহারা আত্মহত্যা করিত।

ইহা একরূপ অদ্ভুত বলিদান-প্রথা। ভক্ত একটী ত্রিস্তম্ভাকৃতি লাঠীর কাছে গিয়া বসে।

'সিপিকাকেওড়ু।'

সেই কাঠীর বাঁকাইয়া মাথাকে চুলের কুঁটীর ভিতর চালাইয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। তারপর গলা কাটিয়া ফেলিলে নীচের টান অপসারিত হইয়া যায়, এবং মুণ্ডুটা লাঠীর সহিত ঝুলিয়া থাকে উঠে।

সাল্লেখানা।

সন্ন্যাসীরা এইরূপে আত্মাহুতি দেয়। তাহারা প্রায়োপবেশনে আত্মত্যাগ করে, ইহাকে সাল্লেখানা কহে। দিনের পর দিন, স্ত্রী, পুরুষ অন্ন জল কিছুই গ্রহণ করে না; ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়।

রাজসম্মান।

বিখ্যাত ও কর্ম্মী লোককে রাজ-উপাধি ও অন্যান্য সম্মান দেওয়া হইত। সামরিক সম্মানের চিহ্নস্বরূপ সোনার চাকতী মাথায় বাঁধা হইত। সোনার চাকতীকে কি কহিত। রাজাও এরূপ চাকতী ব্যবহার করিতেন।

'মুজের।'

ব্রাহ্মণেরা রাজসমীপে যে পাত্র দিতেন, তাহা স্পর্শ করিয়া প্রত্যর্পণ করিবার প্রথাকে মুজের কহিত।

রাজ-অন্তঃপুর।

রাজ-অন্তঃপুরে কত পুরনারীর বাস ছিল, বলা কঠিন। কথিত হয়, রাজা নরসিংহের ৩৮৪ জন সদ্বংশজাত স্ত্রী ছিলেন। সে সময় রাজা নরসিংহ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মজুরদিগকে দৈনিক হিসাবে মজুরী দেওয়া হইত। মন্দিরনির্ম্মাতাদিগকে কর্ম্ম্য হিসাবে মজুরী দেওয়া হইত। যাহারা মূর্ত্তি খোদাই করিত, তাহাদিগকে আস্ত প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদাই করার পর যে সকল টুকরা পাথরাদি বাহির হইত, তাহাই ওজন করিয়া সমপরিমাণ ভাষা দেওয়া হইত। যে মূর্ত্তিগুলি খুব সুন্দর

কর্ম্ম্য।

ও বড় হইত, তাহার নির্ম্মাতাদিগকে ঐরূপ প্রথানুযায়ী ওজন করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যও দেওয়া হইত। রত্নের কার্য্যে সাধারণতঃ স্বর্ণ দেওয়া হইত।

দুর্ভিক্ষ ও রসোভাবও ঘটিত। সে জন্য ব্যবস্থাও ছিল। খাল কাটিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। দেশে অনেকবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; কিন্তু দেশের সমৃদ্ধি তবুও বৃদ্ধি পাইতেছিল। কারণ, বহু পুষ্করিণী ও মন্দির নির্ম্মাণ করান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ ছিলেন। রক্ষীরা অতুল-সাহসী ছিল। রমণীরা সুন্দরী ছিলেন। মজুররা উদ্ধত ছিল না। মন্দিরগুলি পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ বিবেচিত হইত। পুষ্করিণীগুলি বিস্তৃত ও গভীর ছিল। বনে পর্য্যাপ্ত ফল পাওয়া যাইত। উদ্যানে প্রচুর পুষ্প ফুটিত। হয়শলা রাজ্যের নগরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পময় শোভাময় উদ্যান থাকিত। বহু পুষ্করিণীতে প্রচুর পদ্ম ফুটিত। যোজন যোজন দিবের দূরত্বে সারি সারি গাছ পথিকদিগকে ছায়া দিত। জনসাধারণ অতিথিবৎসল, এক কথায় লৌক, সাবধানতাতে বুদ্ধিমান, ধর্ম্মপরায়ণ, কবিত্বময়, সম্মানী, ধাতা, উদারহৃদয়, পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা হলচালনার ধার ধারিতেন না। বেশ সুখে তাঁহারা দিন কাটাইতেন।

দুর্ভিক্ষ।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী,
লেফ্‌টেনাণ্ট।

আর্য্য ও ইব্রীয় ভূমির উদ্ভিদ-তত্ত্ব।

ঋগ্বেদে চন্দন কিংবা বন্যক বৃক্ষের উল্লেখ নাই। বন্যক ও চন্দন জাতিয় কি না, বলা কঠিন। প্রাচীন ইব্রীয় জাতির বাসভূমিতেও চন্দন বৃক্ষ উৎপন্ন হইত না। বাইবেলের 1 King 10—11, 2 Chron 2—8, 9—10 পদে চন্দনের উল্লেখ থাকিলে, ইহা ইব্রীয় দেশোৎপন্ন বৃক্ষ নহে। তৎকালে ওফির নামক কোনও দেশ হইতে ইব্রীয় দেশে চন্দন আনদানী হইত। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, চন্দন বৃক্ষের আদি জন্মস্থান কয়নগুলা উপকূল, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গুগ্‌গুল, খস্‌খস্ ইত্যাদি সুগন্ধির নাম আছে (১ম পঞ্চিকা, ৫ম অধ্যায়); কিন্তু চন্দনের নাম নাই। হিব্রু বাইবেলের বহু পদে ধূপ, ধুনা, অগুরু, গুগ্‌গুল ইত্যাদি বহু প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের উল্লেখ আছে (Song of Solomon 4—14, Proverbs 7—17)। এই সুগন্ধি দ্রব্যগুলি ইব্রীয় যাগ যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন ইব্রীয় স্মৃতির যাজক এই সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য স্বর্ণ-মণ্ডিত ধূপ-বেদীর উপর প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে যি-হোবার আঘ্রাণার্থ দগ্ধ করিত। (Exodus 30 chapter)।

চন্দন।

বৈদিক খদির শমী এই শ্রেণীর কাষ্ঠ বাণিজ্যের জিনিষ (Chiro's

প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষ লাটিনে সাধারণতঃ Acacia নামে পরিচিত। ঋগ্বেদের প্রায় সমস্ত অংশ ভারতের বাহিরে রচিত, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতে নানা-জাতীয় উত্তম উত্তম বৃক্ষ থাকিতে প্রাচীন আর্য্যগণ যে Acacia-জাতীয় খদির, শমী ইত্যাদি নগণ্য বৃক্ষের দ্বারায় রথ, শকট, যজ্ঞের প্রয়োজনীয় যূপ, পরিধি প্রস্তুত করিতেন, ইহাতে এই মনে হয়, ঋগ্বেদের জন্ম-ভূমিতে ভারতজাত শ্রেষ্ঠ বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইত না।

খদির, শমী, শিটিম।

ঋগ্বেদের ৩।৫৩।১৯ ঋকে খদির, শিংসপা ও ২২শ ঋকে 'শিম্বল' নামক বৃক্ষের উল্লেখ আছে। এই 'শিংসপা' ও 'শিম্বল' ভারতজাত 'শিশু' ও 'শিমুল' বৃক্ষ সহ অভিন্ন কি না, বিচার্য্য। শিম্ব, শিম্বি, শিম্বী শব্দে শিম লতার ফলের গুচ্ছ ও বীজ বুঝায়। খদির, শিটিম প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষের ফলের গুচ্ছ শিমের ফলের গুচ্ছের ন্যায় হইয়া থাকে। শিমুল বৃক্ষে যে ফল হয়, তাহা প্রায় কলার আকার হইয়া থাকে। উহা খদির, শিটিম ও শিম লতার ফলের গুচ্ছের ন্যায় নহে। ১০।৮৫।২০ ঋকে 'কিংশুক' ও শল্মলি, এবং ৭।৫০।৩ ঋকে 'শল্মলি' নামক বৃক্ষের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহা ভারতের পলাশ ও শিমুল সহ অভিন্ন কি না, সন্দেহ আছে।

১০।৮৫।২০ ঋকের 'কিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্' অর্থে কিংশুক ও শল্মলি বৃক্ষের দ্বারা রথের উত্তম চক্র প্রস্তুত হয়, এবং ঐ বৃক্ষ বা তাহার রথ সুন্দর ও হিরণ্যবর্ণ, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। সকলেই অবগত আছেন, পলাশ ও শিমুল কাঠ অত্যন্ত নরম। তাহা দ্বারা রথ কিংবা রথের চক্র প্রস্তুত অসম্ভব। কেবল এক জাতীয় পলাশের ফুল ব্যতীত অন্যান্য-জাতীয় পলাশ ও সর্ব্বপ্রকার শিমুল ফুল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। বৈদিক খদির ও বাইবেলের শিটিম কাষ্ঠ শক্ত, এবং তাহার ফুল হিরণ্যবর্ণ হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদে ৪।২৭।৪ ও ১০।৯৭।৫ ঋকে 'পর্ণ' শব্দ আছে। কিন্তু পলাশ শব্দ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২য় পঞ্চিকা, ১ম অধ্যায়) অভাব পক্ষে পলাশের যূপের ব্যবস্থা থাকিলেও, 'পলাশ' শব্দে পত্র ও সমস্ত-জাতীয় বৃক্ষ বুঝায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৪।৪।১) পর্ণ শব্দের যে ব্যাখ্যায় পলাশ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা আলৌকিকতাপূর্ণ। সোমের পাতা হইতে পলাশের উদ্ভব, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, সোম ও পলাশকে এক-জাতীয় উদ্ভিদ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে এই মনে হয়, আর্য্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ

করেন, তখন খদির কাষ্ঠ ভারতে সহজলভ্য ছিল না, কিংবা খদির বৃক্ষ ভারতে জন্মিত না দেখিয়া, পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণযুগে অভাব পক্ষে খদিরের পরিবর্ত্তে পলাশ-যূপের ব্যবস্থা হইয়াছে। পর্ণ-শালা শব্দের অর্থ, পত্রাচ্ছাদিত কুটীর। বস্তুতঃ আর্য্যগণ ভারতে আগমনের পর যে প্রকার 'করীর', 'সোম' ইত্যাদি উদ্ভিদের পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বৈদিক শিংশপ, শল্মলি ও কিংশুক বৃক্ষের পরিচয়ও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পলাশ-পত্র দ্বারা ভারতে গৃহ প্রস্তুত হয় কি না, অবগত নহি। কিন্তু এখনও আরব ও সিরিয়া দেশে খর্জ্জুর পত্র দ্বারা কুটীর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, যে দেশে বৃষ্টিপাত অধিক হয়, সেই দেশে, অর্থাৎ সুমাত্রা হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত, ভূ-ভাগে, পলাশ ও শিমুল বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। ইহা বালুকাময় স্থানে ও মরুভূমিতে জন্মে না। অন্য পক্ষে Acacia-জাতীয় খদির, শিটিম প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষ বালুকাময় স্থানে ও মরুভূমিতে জন্মিয়া থাকে।

ঋগ্বেদের ১০।৩১।৬ ঋকে যে 'শম্যা' শব্দ আছে, তাহা শমীবৃক্ষ কিংবা খদির-নির্ম্মিত যজ্ঞীয়-পাত্র, ইহাতে মতভেদ আছে। শমী নামক কণ্টকী বৃক্ষকেও উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ Acacia-পর্য্যায়ভুক্ত বলেন। এই শমী-কাষ্ঠ শক্ত বলিয়া ইহা দ্বারা বৈদিক অগ্নি-মন্থনের দণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। খদির কাষ্ঠ শক্ত বলিয়া বৈদিক কালে আর্য্যগণ তাহা দ্বারা রথ, শকট (ঋগ্বেদ ৩।৫৩ সূক্ত), যজ্ঞের যূপ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২য় পঞ্চিকা, ১ অধ্যায়) এবং পরিধি প্রস্তুত করিতেন।

আর্য্যদের শমী সহ ইব্রীয় ভূমির 'শমির' নামক (Isaiah 5—6, 7—23) কণ্টকী বৃক্ষের, এবং খদির শিংসপা সহ শিটিম বৃক্ষের তুলনা করিতে পারি। এই শিটিম বৃক্ষও কণ্টকযুক্ত। শিমের ন্যায় ইহার থোকা থোকা 'হিরণ্যবর্ণ' ফুল ও ফল হইয়া থাকে। শিটিম বৃক্ষ সীনাই পর্ব্বতের পাদদেশে ও যর্দ্দন নদীর তীরবর্ত্তী বালুকাময় স্থানে স্বভাবতঃ অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। প্রাচীন কালে ইব্রীয়গণ ইহার দ্বারা যজ্ঞাগারের বেদী, পরিধি, যূপ, মেরু, যিহোবা-দত্ত অনুশাসন-প্রস্তর রাখিবার সিন্দুক, শকট ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন (Exodus 25th Chapter)। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—খদির, শিটিম, বাচল, শমী প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষ Acacia-জাতীয়। খদির নানা-জাতীয়। খদির-জাতীয় 'অরি' নামক বৃক্ষের সহিত পশ্চিম-এসিয়া ভূমির 'Aror' নামক বৃক্ষের তুলনা করিতে পারি (Jeremiah 17—6)।

বৈদিক দেবদারু বৃক্ষ নিজ নামে পরিচিত। আর্য্য-চক্ষে ইহা দেবতুল্য, পবিত্র ও দেব-গৃহীত। ইহার কাষ্ঠ দ্বারা প্রাচীন কালে দেব-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত। দেবদারু কাষ্ঠ, মেষলোম ও বর্হি কোনও বিশেষ শ্রেণীর যজ্ঞে দগ্ধ করিবার বিধি আছে (শতপথ ব্রাহ্মণ ও বাজসনেয়িসংহিতা) এই দেবদারু সহ ইব্রীয় ভূমির 'এরস' (cedar) নামক বৃক্ষের তুলনা করিতে পারি। ইব্রীয়-চক্ষেও এরস পবিত্র। এই 'এরস' ইব্রীয়দের নিকট 'যিহোবা বৃক্ষ' (Psalms 80—10, 104—16) আরবীয়দের নিকট El-Eresh 'এল-এরস' নামে পরিচিত। প্রাচীন ইব্রীয় জাতির মূর্ত্তি-উপাসক কোনও কোনও শাখা এরস কাষ্ঠ দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ (Isaiah 44/13—19) করিত। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি মহাপুরুষ মুসার বিধান অনুসারে এরস কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ মেষ-লোম, এসব তৃণ (বর্হি) কোনও বিশেষ শ্রেণীর যজ্ঞে ও ক্রিয়ানুষ্ঠানে দগ্ধ (Levi 14—4, Numbers 19th Chapter) করিত।

দেবদারু ও যিহোবা-দারু।

ইব্রীয়-চক্ষে উদুম্বর বা ডুমুর পবিত্র। ইহা স্বর্গীয় বৃক্ষ বলিয়া কথিত। প্রথম মনুষ্য বা আদম স্বর্গে উলঙ্গাবস্থায় থাকার পর, জ্ঞান হইলে, যখন আপন নগ্নতা অনুভব করিলেন, তখন এই উদুম্বর বৃক্ষের পত্র দ্বারা গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করিয়াছিলেন (Genesis 3—9)।

উদুম্বর।

প্রাচীন কানান (ভূভিন্না) ভূমিতে বিনা যত্নে (বন্যজাত) ডুমুর বৃক্ষ জন্মিত। বৎসরে তিনবার ডুমুরের ফল হইত। ডুমুর ফল ইব্রীয় জনসাধারণ, বিশেষতঃ সৈন্য ও ভ্রমণকারীদের বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী (1 Samuel 25—18) ছিল। গোলা ভরা ধান যেমন আমাদের দেশে খাদ্যসামগ্রীর প্রচুরতার আদর্শ, তদ্রূপ প্রাচীন ইব্রীয় ভূমিতে ডুমুর বৃক্ষের নীচে বসা ও ফল ভক্ষণ করা তৎকালে ঐ দেশের সুখ শান্তির উদাহরণ (1 Kings 4—25) ছিল। ডুমুর ঔষধার্থও ব্যবহৃত (2 Kings 20—7) হইত।

আর্য্যদের নিকটও ডুমুর বৃক্ষ পবিত্র। ইব্রীয় জাতির ন্যায় আর্য্যগণও ডুমুর স্বর্গীয়-বৃক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। স্বর্গ হইতে অমৃতরস ভূমিতে পতিত হইয়া, তাহা হইতে উদুম্বর বৃক্ষের উৎপত্তি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৫ম পঞ্জিকা) হইয়াছে। ডুমুর ফল ক্ষত্রিয় বা সৈন্যদের ভক্ষ্যোপযোগী খাদ্য (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম পঞ্জিকা)। বৈদিক ভূমিতে উদুম্বরের তিনবার ফল হইত। উদুম্বর-শাখা রাজাদের অভিষেকে আবশ্যক হইত।

হিন্দু পাঠকবর্গের নিকট বৈদিক বর্হির (বর্হি) পরিচয়-দান অনধিকার-চর্চ্চামাত্র। কুশ নানা প্রকার। কুশ, কুসুর, ডিভ, বীরণ, মুঞ্জ ইত্যাদি (১।১৯১।৩ ঋক)। বৈদিক যাগ যজ্ঞে বর্হির বিশেষ প্রয়োজন।

বর্হি, এসব।

বৈদিক বর্হির সহিত বাইবেলের 'এসব' ও আরব জাতির 'বাইনা' (বেনাগ্) নামক তৃণের তুলনা করিতে পারি। এই 'এসব' প্রাচীন কেনান-ভূমিতে, বিশেষতঃ হি দ্রোণ ও যর্দ্দন উপত্যকায় লিবানোন পর্ব্বতশ্রেণীতে অধিকপরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই 'এসব' তৃণ বৈদিক বর্হি সহ অভিন্ন। ভস্ম অট্টালিকায় ও প্রাচীরগাত্রেও (1 Kings 4—33) এসব জন্মিয়া থাকে।

দেবদারু কাষ্ঠ, মেষ-লোম সহ বর্হি যে প্রকার বিশেষ শ্রেণীর বৈদিক যাগ যজ্ঞে দগ্ধ করিবার বিধি আছে, সেই প্রকার ইব্রীয় জাতির অশৌচঘ্ন-জল প্রস্তুত (Numbers 19—6) ও কুষ্ঠ-রোগীর প্রায়শ্চিত্ত ও শুচিতা জন্য (Levi 14—4) যাগ যজ্ঞে এরস কাষ্ঠ, সিন্দুরবর্ণ মেষ-লোম সহ এসব দগ্ধ করিবার বিধি দেখা যায়। আর্য্যজাতি যেমন যাগ যজ্ঞে কুশের ব্যবহার দ্বারা পাপমুক্ত ও শুচি হইতেন, তেমনই প্রাচীন ইব্রীয় জাতিও এসবের ব্যবহার দ্বারা পাপমুক্ত (Psalms 51—7) হইতেন। ঋগ্বেদের বহু স্থানে বর্হি 'পবিত্র' নামে পরিচিত।

প্রাচীন পারসীক জাতিও *Barsom* নামক বর্হি জাতীয় এক প্রকার তৃণ যাগ যজ্ঞে দগ্ধ করিতেন (Vendidad 9—195, Yacna 2—2)। বৈদিক ঋষিগণ বর্হি দ্বারা যে প্রকার সোমরস উৎপাদন করিতেন, (৯।৫০।৪, ৯।৫১।১, ৯।৫২।১ ঋক) তদ্রূপ ইব্রীয় জাতির যাজকগণও পাত্র হইতে এসব দ্বারা দ্রাক্ষারস তুলিতেন। যে প্রকার বিশেষ বিধিমত বৈদিক বর্হির আঁটি (Bundle) বাঁধা হইত, সেই প্রকার বিশেষ বিধিমত পারসীকদের Barsom ও ইব্রীয়দের এসবের আঁটি বাঁধা হইত। এই এসবের আঁটি দ্বারায় ক্রুশে বিদ্ধ মহাত্মা যিশুখৃষ্টের মুখে অন্তিমকালে দ্রাক্ষারস দেওয়া হইয়াছিল (John 19—29)।

ঋগ্বেদের ৭।৫৯।১২ ঋকে 'উর্বারুক' শব্দ আছে। গ্রিফিথ মহোদয় উর্বারুক শব্দের অর্থ Cucumber করিয়া টীকায় কর্কন্ধু (কুল) বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই উর্বারুক Cucumber বা Water-melon-জাতীয় লতা বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এ দেশে ইহা শশা, তরমুজ বলিয়া পরিচিত। এই জাতীয় লতার আদি জন্মস্থানে

উর্বারুক।

আফ্রিকা। পরে ইহা ক্রমে ক্রমে মিশর, কানান (পালেষ্টাইন) প্রভৃতি দেশ হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

খর্জ্জুর বৃক্ষ শাখাহীন। ইহার পাতাই শাখা তুল্য। প্রাচীন কালে খর্জ্জুর বৃক্ষ টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীশ নদীর মোহানায় পর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিত। পরবর্ত্তী কালে ফিনিশিয়া দেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে, (Wandering of Plants, 203)। গ্রীক ভাষায় Phonix শব্দের অর্থ (John 12—13) খর্জ্জুর বৃক্ষ। প্রাচীন কানানভূমিতে অধিকতর খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখিয়া জেতা আগন্তুক গ্রীকগণ ঐ দেশের নাম ফিনিশিয়া বা খর্জ্জুরপুরী রাখিয়াছেন। প্রাচীন পালমিরা নগরের নাম খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে হইয়াছে।

খর্জ্জুর ও পর্ণ।

যদিও অধুনা আরব, সিরিয়া ও পারস্য দেশের অধিবাসিগণ খর্জ্জুরফলপ্রিয় এবং খর্জ্জুর-ফল তাহাদের একটী প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত, তথাপি প্রাচীন ইব্রীয় জাতি খর্জ্জুরফলপ্রিয় ছিল কি না, বলা কঠিন। বাইবেলের শত শত পদে দ্রাক্ষা ও ডুমুর ফল ভোজনের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু একটী পদেও খর্জ্জুর-ফল-ভোজনের উল্লেখ নাই। খর্জ্জুর বৃক্ষ প্রাচীন কাল হইতে আরব ও ইব্রীয় জাতির চক্ষে পবিত্র (1 Kings 6—29)। প্রাচীন ইব্রীয় মন্দির ও বিরুনাবেশের মন্দিরে খর্জ্জুর বৃক্ষের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল (1 Kings 6—29)। খর্জ্জুর বৃক্ষ প্রাচীন কানান (জুডিয়া) দেশের রাজকীয় Symbol। ইস্রায়েল সম্প্রদায় মিশর হইতে দাসত্ব-মুক্ত হইয়া মরুভূমিতে চল্লিশ বৎসর প্রবাস বা ভ্রমণ-কালে পর্ণ-শালায় বাস করিত। পরে স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচীন পূর্ব্ব-স্মৃতিরক্ষার জন্য খর্জ্জুরপত্র প্রভৃতি দ্বারায় কুটীর প্রস্তুত ও সাত দিবস কুটীরে বাস করিয়া প্রত্যেক বৎসর কুটীর-উৎসব (Levi 23—34, Nahimia 8—14) পালন করিত। ইহা ইয়ুল' (আশ্বিন) মাসে সম্পন্ন করিতে হইত। এ দেশে কদলী গাছ রোপণ দ্বারা যে স্বাগতহস্তাভিষেক হয়, তাহা যে প্রকার শান্তি, মঙ্গল ও আনন্দ-জ্ঞাপক চিহ্ন, খর্জ্জুরপত্র হস্তে লইয়া সম্মানিত ব্যক্তির যে অভ্যর্থনা হয়, তাহাও তদ্রূপ ইব্রীয় জাতির নিকট শান্তি ও মঙ্গলের জ্ঞাপক নিদর্শন (John 12—13)। যিরুসালেমের তীর্থযাত্রীদিগকে তীর্থযাত্রার চিহ্ন-স্বরূপ একটী খর্জ্জুরশাখা অর্থাৎ পাতা দেওয়া হইত। এ জন্য তীর্থযাত্রীদের উপাধি *Palmer*।

ঋগ্বেদের ৯।২৭।৪, ১০।১৩৫।৫ মন্ত্রে পর্ণ শব্দ আছে। পর্ণ শব্দের অর্থ পলাশ

গ্রহণ করিতে যে আপত্তি, এই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে তাহার আলোচনা করিয়াছি। 'পর্ণ' বলিতে যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় উদ্ভিদ বুঝায়, তবে পর্ণ অর্থে খেজুর গাছ হওয়াই সঙ্গত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খর্জ্জুর বৃক্ষের শাখা ও পাতার মধ্যে প্রভেদ নাই। এখনও পশ্চিম এসিয়ায় খর্জ্জুর বৃক্ষের পাতা ও কাঠ দিয়া কুটীর প্রস্তুত হয়। খর্জ্জুরপত্র দ্বারা প্রস্তুত গৃহই যথার্থরূপে পর্ণ-শালা-পদবাচ্য হইবার উপযুক্ত। এই খর্জ্জুর বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট। খর্জ্জুর বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে তাহা হইতে সুমিষ্ট পানীয় বাহির হয়।

ঋগ্বেদের ১০।৯৭ সূক্ত ওষধির (Herbs) উদ্দেশ্যে রচিত। এই সূক্তের ৫ম ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধ এই—"অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা"। দত্ত মহাশয় সায়নাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া 'অশ্বত্থ' ও পর্ণ শব্দের অর্থ অশ্বত্থ ও পলাশ, এবং গ্রিফিথ 'অশ্বত্থ' শব্দের অনুবাদে *Holy Fig* (যজ্ঞডুমুর) ও পর্ণ শব্দের অনুবাদে *Parna Tree* (পর্ণ বৃক্ষ) করিয়াছেন। ডুমুর ও অশ্বত্থ যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭ম পঞ্চিকা, ৪র্থ খণ্ড) দেখা যায়। 'অশ্বত্থ' অর্থে যজ্ঞডুমুর কিংবা পিপ্পল, তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

১০।৯৭।৫ ঋকের 'অশ্বত্থ' অর্থে যদি সর্ব্বশ্রেণীর বৃক্ষ বুঝায়, তবে ঐ ঋকের 'পর্ণ' অর্থে কেবল পাতা গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু 'অশ্বত্থ' অর্থে যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় বৃক্ষ হয়, তবে ঐ পর্ণ শব্দের অর্থও কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় বৃক্ষ হওয়া সঙ্গত। ১।১৩৫।৮ ঋকে যে 'অশ্বত্থ' শব্দ আছে, গ্রিফিথ তাহার অনুবাদে *Holy Fig* (যজ্ঞডুমুর) ও দত্ত মহাশয় সায়নাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া মধু (সোম) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই অশ্বত্থের ফল বা ফলের রস আর্য্যগণ যাগ যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'অশ্বত্থ' অর্থ কোনও বিশেষ নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় বৃক্ষ। এবং ১০।৯৭।৫ ঋকের অশ্বত্থ ও পর্ণ শব্দের দ্বারায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ সূচিত হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৫।৪।১, ২) পর্ণ শব্দের এই বিবরণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়,—'গায়ত্রী যখন সোমকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন, এবং তাহা আহরণ করিতেছিলেন, তখন..... রাজা সোমের পর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাই পতিত হইয়া পর্ণ হইয়াছিল, এবং সেই জন্য তাহার নাম পর্ণ। ইহাতে যে সোমের দীপ্ত (অংশ) ছিল, এখানেও তাহা হইবে, এবং সেই জন্য পর্ণ-শাখার দ্বারা বৎসসমূহকে অপসারিত করিয়া থাকেন।'

অন্যত্র—'তিনি তাহা (পর্ণ) ছেদন করেন—'অভীষ্টের জন্য তোমাকে ছেদন করিতেছি। রসের জন্য তোমাকে ছেদন করিতেছি ..... '

এখানে রসের উল্লেখ, এবং পর্ণ-ছেদনে রস প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইত্যাদি কথা থাকায়, পর্ণ শব্দের অর্থ খর্জ্জুর বৃক্ষ হওয়াই সঙ্গত। পলাশ-ছেদনে কোনও প্রকার রস বাহির হয় না; বিশেষতঃ, পলাশের রস মিষ্ট কিংবা মনুষ্যের পানীয় নহে। অপর পক্ষে, খর্জ্জুরের ফল ও রস মিষ্ট, এবং মনুষ্যের প্রয়োজনীয় পেয়।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহম্মদ।

আলোচনা।

খোলা চিঠি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

অনেক দিন থেকেই এমন একটী কামনা মনের মধ্যে ছিল যে, আপনার হাতের মাথম-মাখানো চাবুক আমার পৃষ্ঠদেশে কোনও সুযোগে একবার পড়ুক; কিন্তু ও মনস্কামনা পূর্ণ হতে দেরী দেখে ক্রমেই হতাশ হয়ে আসছিলুম। সম্প্রতি সিদ্ধিলাভ করা গিয়েছে,—আর্ট ও কবিত্বের' দৌলতে আকাঙ্ক্ষার ধন মিলেছে দেখ্‌ছি। এইবার, যদি অধিকার দেন বারেকের জন্যে সাহিত্যের লেখক-শ্রেণীভুক্ত হয়ে ধন্য হতে পারি।

সাহিত্যিক-সম্পর্কের দিক থেকে হিসাব করতে গেলে আপনি বর্ত্তমান লেখকের ঠাকুর্দ্দার আসন পাবার যোগ্য,—কারণ আপনি যখন সাহিত্যের নেশায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যাওয়া-আসা করছেন, তখন আমরা মাতৃগর্ভে। তার পর সাহিত্যের ওপর দিয়ে একটা নতুন যুগের ঢেউ চলে গেল,—রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়-বাণীর সারা হতে আর-এক-পুরুষ কেটে গেল,—শেষে তিন পুরুষে সবুজপত্রের পাওতায় নাতি-ঠাকুর্দ্দার এই শুভদৃষ্টি!

'আর্ট ও কবিত্বের প্রতিপাদ্য আপনি বুঝতে না পারলেও ত্রুটি ছিল না—কেন না, যে বোঝা সম্প্রতি আমরা মাথায় তুলছি, আপনি তা' তার নাবাবারই যোগাড় করে' এনেছেন। এ অবস্থায় ও বোঝাবুঝির বালাই দূর করে দিয়ে আপনাদের একটু একটু পায়ের ধুলো এই সব নাতিপুতিদের মাথায় দিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু আপনি তো শুধু বুঝতে পারেননি—অনেকে আবার উল্টাও বুঝেছেন, এবং তাঁরা আমাদেরই সমবয়সী নব্য-সমালোচক! ব্যাপারটা তবে বলি শুনুন,—কিন্তু দাঁড়ান একটু গম্ভীর হয়ে নিই,—যেহেতু নবীনেরা গম্ভীর না হলে প্রবীণেরা তাদের কথাকে ছেলেমানুষী বলেই উড়িয়ে দেন।

এক গাঁয়ছাড়া এঁটে-বাঁধা চালকলার মতন একত্র থাকলেও কাব্য ও কলা যে এক বস্তু নয়, এইটী বোঝাবার জন্যে ও প্রবন্ধে যা' বলা গিয়েছিল, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে,

'কাব্য-ভোগের আনন্দ' আর 'আর্ট-ভোগের আনন্দ'। কিন্তু, দুঃখের কথা বলবো কি ঠাকুর্দা, ও কথা আজও কারুরই কাণে পৌঁছয় নি! শুনছি—ঋগ্বেদ, ওয়াইল্ড, সাইমনস্, রাস্কিন, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, রোমাঁরোলাঁ, এচ্ জি ওয়েলস্, এঁ, ই, এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' পর্য্যন্ত ও-রকম বেফাঁস কথা বলে নি; অথচ এ যুগে "বিচিত্র সমস্যা ও বিচিত্র সমাধান-কল্পনার গোড়ার পরিচয়টা উক্ত নামাঙ্কিত-চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গের 'মর্ম্মস্থানে পৌঁছিতে গেলে' অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।" (অমিতবাবুর—ভারতী)

যে পরিচয়টা গোড়াতেই আবশ্যক, সেটা যে আমি আগাগোড়াই অনাবশ্যক মনে করে ফেলেছি, তার কারণ—

(১) আর্টের মর্ম্মোদ্ঘাটন করাই আমার অভিপ্রেত ছিল; কোনও ভূতপূর্ব্ব কবির চর্ব্বোৎপাটনে প্রবৃত্তি নয়।

(২) এ-যুগ বলতে যে-যুগ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, আমার মতে সে-যুগের মোড় ফিরে যেতে বসেছে; এমন কি, সেই কথা বলেই উদ্দিষ্ট প্রবন্ধ সূচিত হয়েছিল।

(৩) সমাধানের যুগে বিচিত্র সমস্যা থাকলেও কোনও সমাধান নেই, এইটিই হচ্ছে আমার ধারণা। এ ধারণা বদলাবার কোনও কারণ আজও ঘটেনি—আশা করি, পরেও ঘটবে না।

(৪) কোনও বিষয়-সম্বন্ধে অপরে কি বলে গিয়েছেন তা' জানার চেয়ে নিজে কি বলতে চাই, তাই বোঝায় বিদ্যা-প্রকাশ না হলেও বুদ্ধি-বিকাশ হয়। এই বিশ্বাসবশেই ভারতী-মন্দিরে দেশবিদেশের মতবাদের দলীল জড়ো চিরে দেওয়া তেমন সন্তোষজনক মনে হয়নি। চিন্তারাজ্যকে কলা দেখানোই যদি অভিপ্রেত হয়, তা' হলে কাব্য ও কলা সম্বন্ধে অন্যের মতামত পিঠে করে বেড়ানো সহজই হয়ে আসে।

তবু, কিছুমাত্র লজ্জাবোধ না করেই স্বীকার করছি যে, দেশ-বিদেশের পণ্ডিতী মতভেদের ধোঁয়া আমার বুদ্ধিমূলে আবশ্যকের অতিরিক্ত ঢুকতে পায়নি; আর সেই জন্যেই এ বিষয়ে আমার এ-পক্ষে থেকে দিয়েছে যে, বিষয়-পরিচয়ের গোড়ার দিকটা অন্ধের খাতায় থাকে না, পাকে নিজেরই মাথায়। এর কারণ, সমস্যা আসে মানবসমাজে ঘটে—তার পর মানুষের রচনায় ওঠে; মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে বলেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়, আর ভগবানের হাতে-খড়ি এই বিশ্বকাব্যখানা পড়ে বলেই নিজেকে প্রকাশ করে।

অবশ্য, বই পড়ে মত গঠন করা আমার উদ্দেশ্য নয়,—কথা এই যে, গোড়া বেঁধে নেওয়াটাই সর্ব্বাগ্রে দরকার। অন্যথায় বই পড়ে আমরা বাচাল হতে পারি, শিক্ষক হতে পারি,—কিন্তু সে না বুঝে ও না শিখে। ঘটনা যখন ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, তখন তার সমস্যা-সমাধানের জন্যে কেতাবের পাতা ওল্টানার সময়, চাই কি, না পাওয়াও যেতে পারে; অথচ বুদ্ধি পরিষ্কার থাকলে দেশকালের উপযোগী করে' তার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়; এমন কি, তথাকথিত বিচিত্র সমস্যার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাড়িয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু ও কথা যাক্—যা' বলছিলুম তা' এই যে, আর্ট কোনও কবির বিশেষ সৃষ্টি নয়, তিনি বিশেষজ্ঞই কারামো। Law of Gravitation যেমন আবিষ্কৃত

হবার পূর্ব্বেও ছিল, এবং মানবজাতি বুদ্ধিবিচ্যুত হবার পরও থাকবে, Law of spirit বা আর্টও তেমনি কবিকুলের জন্মপূর্ব্ব থেকেই আছে, এবং ৫ বলে নির্দ্দেশ হয়ে যাবার পরও থাকবে। কোন্ কবি কি পরিমাণে এই নিয়মকে নিজের মধ্যে পেয়েছেন, সেইটুকুমাত্র তাঁদের যোগ্যতা পড়ে আমরা জানতে পারি—অবশ্য যদি সৃষ্টিপাঠের অধিকারের মধ্যে থাকে। ও বস্তুর অভাবে বিচিত্র সমস্যা ও সমাধানের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে 'বিচিত্র বিচিত্র' শব্দে মানুষের কানে তালা লাগিয়ে দিতে পারলেও কোনও কবির মর্ম্মস্থান নিশ্চয়ই আমরা স্পর্শ করতে পারি নে।

Artificial আর artistic পর্য্যায় শব্দ নয়, কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে আমরা যে ভাবটা প্রকাশ করে থাকি, তাতে বোধ হয় যে, ও দুটোর মধ্যে আমাদের মধ্যে বিশেষ স্পষ্ট নয়। Nature আর আর্ট এক জিনিস নয়—কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে রবিবাবুর মত পড়ে মনে হয় না যে, এ পার্থক্য তিনি মানতে চান। যা' স্বাভাবিক নয়, তা' কৃত্রিমও হতে পারে; কিন্তু যা কৃত্রিম, তাই spiritual বা real নয়, এ যে কৌশলে এই realityকে প্রকাশ করা যায়, তাকেই আমি আর্ট নামে চিহ্নিত করতে চাই। কাব্য ও কলা আমার মতে শুধু বিভিন্নই নয়, আকারে ও প্রকারে একেবারেই স্ত্রী ও পুরুষ।

রবিবাবুর একটী আধুনিক কবিতাংশ দেখুন—

"হঠাৎ আলোর ঝলকা লেগে
শিবের জটার গঙ্গা নেমে
অমনি গেল ত্রিসংসারে—"

কাব্য সম্বন্ধে কবির এই উপমাটী আমরা শিরোধার্য্য করি। এই জন্যেই কাব্যের ভেতর যখন মানব-সমাজের স্ত্রী-পুরুষ ঘুরিয়ে ওঠবার উপক্রম করে, তখন শিবকে নেমন্তন্ন করে আনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কাব্য-গঙ্গা ঘটতলে শিবের নিষ্ঠুর জটায় থাকেন, ততক্ষণই তিনি কলুষ-নাশিনী; কিন্তু কাব্য-যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ বাদ পড়ে গেলে দক্ষ-যজ্ঞের পুনরভিনয় ঘটবার সম্ভাবনা যে একেবারেই থাকে না, তা নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতার খেলখানা দেখে যে উলঙ্গ বাস্তব সন্দীপের মূর্ত্তি ধরে বেরিয়ে এসেছে, তাতে reality'র অর্দ্ধ অঙ্গহানি। সন্দীপের মতিগতি (প্রেমিকার নয়): কামিনী ও কাঞ্চনের দিকে ঝোঁক বলেই আর্টের বাস্তব তার কাছে খেলখানা ও আর্টের খেলখানা তার কাছে বাস্তব বিবেচিত হয়েছে।

সন্দীপও natural, নিখিলেশও natural, এদের একটীও আর্টিষ্টিক নয়; তবে ও দুই চরিত্রে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত natureএর ঝোঁক নিম্নাভিমুখ, আর শেষোক্তের ঊর্দ্ধাভিমুখ। আর্ট এ কাব্যের কোথাতে একেবারেই নেই। যদি কেউ বলেন যে, কাব্যে না থাকলেও কবিতে ও গ্রিনরুম আছে, তা' হলে আমার উত্তর—কর্ত্তা নয়, ক্রিয়াই এ প্রকরণের বিচার্য্য; তার কারণ কর্ত্তা ওখানে শুধু কাব্যেই প্রচ্ছন্ন নয়, কবির চেতনাতেও প্রচ্ছন্ন। আমি মানি যে, মাত্রেই প্রতিভাই কাব্যরচনায় অধিকারী, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও গ্রাহ্য করাতে চাই যে, পূর্ণচেতন প্রতিভাই আর্ট-রচনার যোগ্যপাত্র। কাব্য আর আর্টকে যে আমরা একই অর্থে ব্যবহার করি, তার কারণ, আমাদের গুরুস্থানীয়েরা এযাবৎ ও পার্থক্যটুকুকে

চট্‌কেই আনন্দনাড়ু পাকিয়েছেন, আর সে নাড়ু হাতে পেয়ে আমরাও নাড়ুগোপাল হয়ে উঠেছি। এখন এই সত্যটিই আমাদের বুঝে নিতে হবে যে 'আনন্দ' আর 'আনন্দনাড়ু' ঠিক এক জিনিস নয়। কামী ও কামিনীর দেহসর্ব্বস্ব যুগল-মিলনের ফলে যা' জন্মায়, তারি নাম আনন্দনাড়ু, কি না ছেলে মেয়ে; অপর পক্ষে, বিশুদ্ধ প্রেমিক প্রেমিকার মানস-সর্ব্বস্ব যুগল-মিলনের ফলে যা জাগে, তারি নাম আনন্দ—কি না, ছেলে মেয়ের প্রাণে যা' থাকে।

কাব্য যে ব্যোমকেশের অট্টালিকা, তার পরিচয় আকাশ থেকে মাটী পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই পাওয়া যায়। আকাশের নীল থেকেই যে বিশ্বপ্রকৃতি উদ্ভাসিত হয়েছে, আর এই বিশ্বজগৎ যে একখানি মহাকাব্য, এ কথা সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এ কাব্যের মূলে যা' আছে, তা' কাব্য নয়, আর্ট—প্রকৃতি নয়, পুরুষ—মাটী নয়, আকাশ—আসক্তি নয়, অনাসক্তি।

সোজা ক'রে পড়তে গেলে আকাশের দিক থেকেই এ কাব্যকে পড়া উচিত,—কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ মাটীর দিক থেকেই এর অর্থ্য নিয়ে আমাদের পড়তে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমিতে যা' আছে, তার নাম Natural Science, দর্শন নয়। Law of natureকেই যদি ঐশী নিয়ম বা Law of spirit বলে গ্রহণ করা যায়, তা' হ'লে কাব্য আর আর্ট অবশ্যই অভিন্ন হয়ে পড়ে,—কিন্তু গোল বিষয় এই যে, ব্যাপার আসলে তা' নয়।

আর্টের প্রতিষ্ঠাভূমিতে যা' আছে, তার নাম দর্শন, কিন্তু দর্শন আর আর্ট এক জিনিস নয়। কাব্যের উপসংহার হচ্ছে দার্শনিকতায়, কিন্তু আর্টের উপক্রমণিকাই এখানে। অসত্যকে তিরস্কার করতে করতে আত্মাকে জীবনের বাইরে project করা, অর্থাৎ আত্মাপুরুষকে খাঁচাছাড়া করে' বাইরের আকাশে উড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে দার্শনিকের কাজ; অপর পক্ষে, আর্টের কাজ হচ্ছে আকাশকে জীবন জীবনে inject করতে করতে humanityকে খাঁচার মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠ করে তোলা। অর্থাৎ চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায় বলতে গেলে, কবি-দার্শনিকের কাজ হচ্ছে 'হেগেলকে ফকির করা', আর কবি আর্টিষ্টের কাজ হচ্ছে 'শঙ্করকে মৃত্যু করা।'

রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূতে'র মুখ দিয়ে যা' বলিয়েছেন, কাব্যের গোড়ার কথা অবশ্যই তাই। কিন্তু আর্টের গোড়ার কথা শুনতে হলে পঞ্চভূতের সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ানো একেবারেই অনাবশ্যক। পঞ্চভূতের বাড়ী যদি মনের দক্ষিণ মেরুতে হয়, তো সর্ব্বভূতান্তরাত্মার বাড়ী হচ্ছে মনের উত্তরমেরুতে। কাব্য জড়তার গ্রাস থেকে আমাদের চিত্তকে চাঞ্চল্যের ক্ষেত্রে মুক্তি দিলেও চিত্তচাঞ্চল্য থেকে মুক্তি দিতে পারে না,—অথচ চিত্তচাঞ্চল্য থেকে মুক্তিলাভ না করলেও আর্ট রচনা করা যায় না। আর্টের কাজ হচ্ছে চিত্তচাঞ্চল্যের ক্ষেত্র থেকে বের করে' নিয়ে মানুষকে চৈতন্য-প্রতিষ্ঠ করে দেওয়া। একটা উপমা নেওয়া যাক্—

আকাশ থেকে মাটী পর্য্যন্ত যে ছবিখানা চোখের সামনে পাতা রয়েছে, এইটীকেই একটী মানবদেহের গণ্ডী দিয়ে ঘিরে ফেল্‌লে আকাশকে মস্তিষ্কে, বাতাসকে তন্নিম্নে বা হৃদয়ে ও মাটীকে

বেশ বোঝা যায়। এখন, মনুষ্যের মধ্যে এ ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ব্যাকরণ করবার দরকার নেই বলা যাক—আকাশ=আত্মা,—বাতাস=মন,—মাটি=মনের অপ্রগত বস্তুপুঞ্জ বা সৃষ্টিতত্ত্ব।

বাইরের দিকে চাইলে আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বদেবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাতাস অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে, আর ঐ বাতাস ঘুমিয়ে থাকলে, তৎসংলগ্ন যাবতীয় বস্তুপুঞ্জ নিঃস্পন্দ ও জড়বৎ দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে ঝড় উঠুক—সেখানে যা কিছু বস্তু আছে, সমস্তই চঞ্চল হয়ে উঠবে। কিন্তু সে ঝড়ের আর কি থাকলে, সেদিকে বাতাস দৃকপাতও করে না, কারণ সে জড়। কবির এ কথা হচ্ছে এই বাতাসের চাঞ্চল্যে মনকে চঞ্চল করে' দেওয়া, অর্থাৎ মনের মধ্যে ঝড় তুলে মনোবস্তুপুঞ্জকে নাড়িয়ে তোলা। কিন্তু আকাশের গায়ে এমন একটা সীমারেখা আছে, যার উপরে বাতাস না থাকলেও আকাশের স্বচ্ছ নিষ্কম্প আলোকের অভাব নেই। মনুষ্যের মধ্যে এই রকম যা যা থাকলে স্পন্দন-সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে, তার নাম প্রজ্ঞা, আর এই প্রজ্ঞার আলোকচিত্রই হচ্ছে আর্টের চিত্র। ঋষি পরমহংস এ তত্ত্বের দেখিয়েছেন। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, এর পর মানবচরিত্রকে দেখবার মত। উচ্চতম কিছু আছে কি না, তবে আমার উত্তর এই যে, অপেক্ষা করুন।

কথা উঠেছে আমরা আত্মসমাধিতে আত্মন দাঁড়িয়ে দেখি, তার পর নিজের নিজের রুচি অনুসারে কেউ বা দেখি, কেউ হয়, কেউ বিশ্লেষণ ইত্যাদি ইত্যাদির চর্চ্চা করতে পারেন; কিন্তু তবে থাক। ধরিত্রী যে, কবির মধ্যে যে সম্ভবতঃ ঈশ্বর ছিল। (অজিতকুমার—ভারতী।)

ও কথা সত্য হলে ঈশ্বর [illegible] কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তা' মনে করা চলে না। মাটীর ধর্ম্মে পঞ্চ, পাথর, গাছ, ঘাস ও মানুষ আছে—কিন্তু আকাশের ধর্ম্ম শূন্যমাত্র; তবু আকাশ মাটির চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বটে। পাঁচমিশালী মাটিই যে খাঁটী মাল, এ কথা খাঁটি কথা নয়, খাঁটি মিলির কথামাত্র।

যে কথা, বস্তুর-বিজ্ঞানের রাজ্যটিকে চিত্তরসে মণ্ডিত করে' রবীন্দ্রনাথ কাব্যে গাহিয়েছেন, এবং তাঁর সাধনার অন্যতম কথাই হচ্ছে পুরুষ ও প্রকৃতির, লাভা কথায় শ্রীপুরুষের সাম্য মিলন। প্রেম-জিনিসটি তাঁর চক্ষে বস্তু-নিরপেক্ষ নয়, তাই অবস্থার সঙ্গে তাঁর নায়ক-নায়িকার ক্রমাগতই বিরোধ বেধেছে, এবং মনের বিকাশের জন্যে বিদ্রোহ হয়েছে। ফলে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কেউ শ্রীক্ষেত্রে চলে গেছেন, কেউ কুলত্যাগ করেছেন, এবং অনেকেই সংসার তাল ছিন্নভিন্ন করে' তুলেছেন। এক কথায়, আনন্দকে নিজের মাঝিয়ে রক্ষা করলে জীবন-সমস্যা যে কত বিচিত্র ও জটিল হতে পারে, তারই পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়।

অবস্থা যখন এই রকম, তখন আর্ট এক কথায় সমস্ত জটিলতার চমৎ মীমাংসা করে দিয়েছে। সে সমাধান হচ্ছে এই যে, বিচিত্র ঘটনার সমস্যা-সমাধান ঘটনার মধ্যে নেই, আছে ঘটনা-দর্শকদের নিজেরই মধ্যে। ঘটনার সাগর সেঁচে তার জল নষ্ট করবার চেষ্টা বাতুলতা, 'আনন্দ' জিনিসটাকে কেউ কারুর মুখাপেক্ষী রেখো না, অনাসক্তি উপরই জীবনের ভিত গড়া কর—সমস্তই সহজ হয়ে আসবে। কথায় বলে—"আপ ভালা তো জগৎ ভালা।"

দেশী ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য 'অবিদ্যাকে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করেছে ; আর প্রমথনাথের শিল্পনৈপুণ্য ব্রহ্মবিদ্যা ও অবিদ্যাকে confusing করে' পাশাপাশি সাজিয়েছে—উদ্দেশ্য, দুয়ের মধ্য থেকে যেন ধানা বেছে নিক্। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে 'অবিদ্যার প্রকাশ' বলার অর্থ ও সাহিত্যকে খাটো করা নয়, কিন্তু যথাযোগ্য মর্য্যাদাই দান করা। অবিদ্যা অনাবশ্যক বিদ্যা তো নয়ই, পরন্তু অত্যাবশ্যক বিদ্যা ; কেন না, এ অবিদ্যায় দীক্ষিত না হ'লে পরাবিদ্যার অধিকারী হওয়া যায় না। এবম, সাহিত্যক্ষেত্রে কবি-প্রমথনাথ আমার বিচারে জয়ী হলেও, জীবন-গ্রন্থের দিকে কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই তাঁর আগ্রহ ভগবানের অম্লান পুষ্পমালা বুঝি বা দুলে ওঠে,—কেন না, আমার অন্তর বলছে যে, রবীন্দ্রনাথের শিষ্যোত্তম তাঁর গুরুর সঙ্গে কপটতা করেছেন, অর্থাৎ গুরুর ভাষ্যকার-রূপে আসরে নেবে স্তুতিচ্ছলে গুরু-নিন্দা করেছেন। কিন্তু ভয় নেই, মুক্তি অবিলম্বেই প্রেম ও ভক্তির মহাভাবময়-কল্লোলে পৃথিবীতে নেমে আসছে—নারায়ণ ও নারায়ণীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে এখন ভক্তোত্তম রবীন্দ্রনাথেরই ঘোষণা-বাণী নাতি-ঠাকুর্দ্দার রসালাপে বেজে উঠুক—

"আনন্দলোক আজ ভূলোকে, আকাশ পুষ্পময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।"

প্রণত

শ্রীবিভূতিকৃষ্ণ ঘোষ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।—শ্রীহরিশ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।—শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ ; বৈষ্ণব-সমাজের উপজীব্য ; বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য-রত্নাকরের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।—গোস্বামী প্রভু এই অমূল্য গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং সাধারণের জন্য সরল ভাবে ও সহজ ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের—ভক্তি-তত্ত্বের সার বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।—চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালার পঞ্চম বেদে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মে, ভাবে, চরিত্রে, রীতিতে, নীতিতে চৈতন্য-চরিতামৃত যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এ দেশে অন্য কোনও একখানি গ্রন্থের ভাগ্যে সেরূপ সৌভাগ্য ও সাফল্য ঘটে নাই। আমাদের মনে হয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত ও চৈতন্য-চরিতামৃত অতীতে বাঙ্গালীর চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, বাঙ্গালীকে সদ্ভাবের আধার করিয়াছে ; এবং এখনও যাহারা 'বাঙ্গালী' আছে, সেই 'গণ'কে সধর্ম্মে, সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে। বাঙ্গালীর 'গণ' যে শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াও দশরাশি-নাশী রবিদ্রের নামকে এখনও তাহার ধর্ম্মকে সাবধানে রক্ষা করিতেছে, তাহার কারণ এই কি-সাহিত্যের দীক্ষা।

জীবনচরিতের হিসাবেও ইহা অমূল্য।—বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত ও চৈতন্য-চরিতামৃত ভিন্ন আর কোনও গ্রন্থের ভাগ্যে এত সমাদর ঘটে নাই।

বটতলায় চৈতন্যচরিতামৃত প্রথম ছাপা হয়। তাহার পর ইহার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য সংস্করণই চরিতামৃতের সর্ব্বশেষ সংস্করণ। ইহাতে কবিরাজ গোস্বামীর মূল, প্রত্যেক শ্লোকের 'আনন্দচন্দ্রিকা টীকা', সরল অনুবাদ ও বিস্তৃত বিবরণ আছে। শ্লোকের পর টীকা, তাহার পর ব্যাখ্যা ও অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে টিপ্পনী দিয়া সম্পাদক ভাবার্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হরিদাস বাবুর সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উৎকর্ষ আলোচনা করিয়া মনে হয়, বাঙ্গালী ঘাসপাতার রস টিপিয়াছে; ওস্তাদ হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ মহাশয় একবার চৈতন্যচরিতামৃতের উৎকৃষ্ট সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। হরিদাস বাবু এই উৎকৃষ্ট সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা বাঙ্গালায় বটতলার সংস্করণ পড়িয়াছি। তাহার সহিত বর্ত্তমান সংস্করণের তুলনা করিতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বটতলাই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য রক্ষা করিয়াছিল। বাঙ্গালী কখনও বটতলার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু তখনকার সহিত এখনকার তুলনা হয় না। হরিদাস বাবুর সংস্করণের কাগজ যেমন উৎকৃষ্ট, ছাপাও তেমনই সুন্দর। অনেকগুলি চিত্রও আছে। তন্মধ্যে এগারখানি চিত্র, তিন বর্ণে মুদ্রিত। ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চিত্রের মধ্যে মায়াভ্রম, 'শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা', 'পালে পালে বাঘ হস্তী গণ্ডার শূকরগণ—তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন', হরিদাস ও বারাঙ্গনা ও শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই উল্লেখযোগ্য। শেষ তিনখানি, কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত সংকীর্ত্তনের ছবিখানি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির নমুনায় অঙ্কিত।

সম্পাদক গ্রন্থখানির চিত্রসমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থায় মন্ত্রিত্র পুস্তকের ভাগ্যে যেরূপ অসাধারণ মন্থর, তিনি তাহার সন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, চিত্রে প্রতিভার পরিচয় নাই। বাঙ্গালায় যে দিন ফিরে আসবে, যে দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের অক্ষর-চিত্র শিল্পীর কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিবে—যাহা অক্ষরে নাই, তাহা থাকে, সেই আত্মা চিত্রকরের তুলিকায় ধরা পড়িবে? যে ভাবের জগতের অমর ভাবগুলিকে চিত্রপটে অমর করিয়া বাঙ্গালীকে অতীত অবস্থানে উন্নীত করিয়া স্বয়ং অমর হইবেন। গৌরাঙ্গদেবের চিত্রে চিত্রিতের মুখে ভাবের আবেশ ফুটিয়াছে। মনে হয়, তাহা আরও দিব্য ভাবে ফুটিল না কেন? মানভঞ্জনের ছবির রাধা ও কৃষ্ণ স্বাভাবিক হইল না কেন?—সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গি-ভঙ্গী অপ্রকৃত হইল কেন? 'শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা' চিত্রের বিষয় বটে। কোন ভাবী শিল্পী এই ভাবের ছবি বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিয়া ধন্য হইবেন? 'পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ, তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন' দেখিয়া অরিষ্টাসুরের ছবি মনে পড়ে। চৈতন্যের জীবনের সেই আইনীর ছবির মত ছবি আঁকিয়া কবে বাঙ্গালী চিত্রকর চিরস্মরণীয় হইবেন?—সমুদ্র-বেলায় চৈতন্যচন্দ্র অঙ্কিত—কল্পনায় আঁকিয়া দেখ, এ চিত্র কত মহত্ত্বের ছবি করে।

বাঙ্গালা সেই অন্নপূর্ণাচিত্ত, বেলা অবসানে উন্মুখ, স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ভাগ্যদেব চিত্রকরের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদের সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা জননী তাঁহার সমগ্র সৌন্দর্য্যসম্ভার, তাঁহার ধর্ম্ম, ভাব ও সাহিত্য লইয়া সেই অনাগত—কিন্তু অবশ্যম্ভাবী চিত্র-প্রতিভার মূর্ত্ত বিকাশের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

হরিশ বাবু যাহা দান করিলেন, তাহা সেই সৌভাগ্য-যুগের সূচনা বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম। তিনি চৈতন্যচরিতামৃতকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। বাঙ্গালীর সমাদরে তাঁহার চেষ্টা সাফল্য লাভ করুক,—তিনি অন্যান্য গ্রন্থের এইরূপ সংস্করণ প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। —গ্রন্থের প্রথমে স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের একখানি ছবি আছে। এখনকার বাঙ্গালী তাঁহাকে চেনেন না। কিন্তু তিনি বাঙ্গালীর অপরিচয়।—'বরদা মজুমদার' অনেক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ও উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্যকাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপিয়া সেই কেতাবের দুর্ভিক্ষের দিনে বহুগ্রন্থ সুলভ করিয়া, শ্রীনিবাসের পিতৃশ্রাদ্ধের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। অগ্রহায়ণ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'কাশ্মরী নৃত্য' নামক একখানি চিত্র—কেন না, ইহা চিত্রিত। অবনীন্দ্র বাবুরও পবন বাবুর মত ছবির উপর 'ফিক্রপ-বন্ধ' হানিবার সাধ হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু 'কাশ্মরী'র গানে, সুরে, নৃত্যে, এমন কি, 'নাম-পরিচয়ে' তার মনে যে ছবির উদয় হয়, অবনীন্দ্রনাথের ছবি-খানিকে তাহার caricature বলিলেই মনে হয়। ইহা যদি sublimeকে ridiculous করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে, তাহা সফল হইয়াছে। 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি' কখন কি ভাব ধরে তাহা আমরা বাস্তবিকই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কাশ্মরী নাচে বিবাহার কমনীয় সৃষ্টি নারী কি এমন অষ্টাবক্র-ভাব ধারণ করে?—মেঘের মিছিলের ময়ূরপঙ্খীতে যে নৃত্য এখনও দুর্ভাগ্যক্রমে পথিকের চোখে পড়ে, অবনীন্দ্রনাথ কি তাহা হইতে model সংগ্রহ করিয়াছেন? পৃষ্ঠাবস্থিনীর বেণী ও পৃষ্ঠে একটু ছবি আঁকা যায়, অবশিষ্ট সবটুকু 'কি আর বলিব আমি!'—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 'জীবন-শিল্পে' গল্প-প্রহেলিকার নমুনা দিয়াছেন। দর্শন-শূন্য দার্শনিকতা আজ কাল বাঙ্গালা সাহিত্যে অত্যন্ত সুলভ হইয়াছে। এই সকল 'তাত্ত্বিক' যাহা মনে আসে, তাহাই পাঠকের পাতে নিবেদন করেন। 'শিল্পী ভাস্করের কাছে পাথরখানি যেমন শুধুই পাথর নয়, জড়বস্তু নয়, পাথরের মধ্যে তিনি কি একটা অর্থ, কি একটা জীবন্ত সত্তা দেখিতে পান, তাঁহার উপলব্ধিতে উহা বোধ হয় যেন প্রকাশেরই স্বচ্ছ উন্মুক্ত যন্ত্র।' শিল্পী পাথরে জীবন-সত্তা দেখিতে পান, না তাঁহার কল্পনায় যে 'জীবন-সত্তা' থাকে, তাহা দ্বারা সেই জড়-

বঙ্গকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন? ঐ পাঁচ শিবলিঙ্গের মধ্যে 'যন্ত্র' নয়, ইহা কোথায় হইতে পারে, সাংস্কৃতাপন্ন বিশেষেষ্টনপূর্বক নামনির্ণয়-প্রবর্তনের চেষ্টা যদি হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই কোন্ধর ও তাহা বেরিয়া মনে হয়, প্রত্নতত্ত্বের ভিন্ন শাখা ও তাহার অন্য কোনও বাহন আমাদের ভাগ্যে নাই। ডিরেক্টর চক্রবর্ত্তীর 'পঞ্চপাণ্ডব' উড়ে পল্ল। শিবলিঙ্গের আকারগুলি মন্দ হয় নাই। কিন্তু গল্পটি একবারে গোঁজা, উহার কৃত্রিমতায় মন বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িত হয়। ঐরাবত বাহে বাসবের 'ত্রৈলোক্যবিজয়ী বিজ্ঞান-কর্ণোজন' সুধায় প্রবন্ধ। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'রাজা গণেশ ও মহেন্দ্র দেব' প্রবন্ধ হইতে আমরা উদ্ধৃত করিলাম—যদু ১৩৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং মুসলমান লেখকদিগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি প্রথমতঃ হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। নবজাগ্রত হিন্দুশক্তি তাহা নীরবে সহ্য করিল না। ১৪১৪, ১৪১৫ এবং ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবদমে ব্যস্ত হইয়া তাহারা কি বা যদু বাঙ্গালাদেশ হইতে তাড়িত হন। ১৪১৬ ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবীর দনুজমর্দন যদুকে তাড়াইয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা গণেশের বংশের সহিত ইঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানিবার উপায় নাই। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব হইতে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে দনুজমর্দন অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে যদুজয়ের পরে মহেন্দ্রদেব কয়েকবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সহিত দনুজমর্দনের সম্পর্ক কি ছিল তাহা জানা যায় না। তবে তিনি দনুজমর্দনের বংশীয় এবং ভক্তাবিকারী, এ বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই। তিনি কয়েক মাস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দেই যদু বা জলালুদ্দিন ইঁহাকে তাড়াইয়া দেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হন। এখন এই যে, যদুজয়ী বাঙ্গালায় অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, টাকশালে, সুবর্ণগ্রামে, এবং পাণ্ডুয়া হইতে টাকা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার পুত্র মদন এক কি না? ভক্তাবিপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দনুজমর্দন নামে যে ব্যক্তি ছিলেন তিনি কি না? এখন প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, মোটামুটি দনুজমর্দন যে কোন বিশেষ চক্রবংশীয় রাজা হইয়া এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। তবে এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে এই বলিতে হয় যে, রাজা গণেশ এবং ইনি একই ব্যক্তি নহেন। দনুজমর্দন নামে অন্য এক ব্যক্তি হিন্দুর ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে যে হঠাৎ রাজা হইয়াছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, মুদ্রা-লেখকেরা, জনপ্রবাদ ও কথোপকথন প্রমাণ। তিনি তাহার অন্য কোনও পরিচয় দিয়া যান নাই।' শ্রীমতী সীতা দেবী কর্ত্তৃক Chronicle Gaurier হইতে অনূদিত 'গৌড়রাজ চুরণ-কথা' অনুত্তরাপ্রিত হইয়া গিয়াছে।

ভারতী। অগ্রহায়ণ।—প্রথমেই শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের লেখনীর 'সচকিতা' দেখিয়া 'সচকিত' হইতে হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ পড়িবেন, সচকিতা—তাহার 'সচকিতা' বোধ হয় 'চোখেতে' যবনিকার রচনা আঁকা' হয়, বা করিতেছে। এই 'চোখে' যবনিকার সম্পূর্ণ মৌলিক, তাহা আমরা স্বীকার করিব না। ইংরেজের লেখা [illegible]

কৈন, কতকটা পড়া-পুঁথির পাতায় অনুভূত পীড়।—'বসুধের বনবাস, ছিল যথা বারো মাস, আর সেই বেলোয়ার চীন' তুষারদেশের ছবিতে দেখিয়াছি, হিমালয়েও তাহা নহে।—'ফুলবন আঙ্গিকে উপাড়ু' হইতে 'ফোটে না তাম্বূল-রাগ দন্তিদের ফুল' পর্য্যন্ত—বাঙ্গালার শীতের পুষ্পদৈন্য সত্য নয়। কিন্তু বাড়িদের ফুলের রঙ্গিমার তুলনা থাকে-চুন-সুপারী-ইত্যাদি-মিশ্র পানের গিলির রাঙ্গা কয়? উপমাটা নিতান্ত বৈঠকী, এবং অত্যন্ত বিপিনচলা অর্থাৎ, 'বয়-তরা' নয়? ৺অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাঙ্গালার ব্রত'—দ্বিতীয় পর্য্যায় এবারকার 'ভারতীর সংযোজিত প্রবন্ধ। ইহাতে ব্রতের ইতিহাস আছে,—এসম্পর্কে অনেক নূতন কথাও আছে। শ্রীযুক্ত কুমার সরকার 'বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক'-এর প্রথম প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী শক্তি নহে; ইহারা পরস্পরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে ও একযোগে মানবজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তীর 'রাজা রামমোহন রায়ের স্বরূপ' উল্লেখযোগ্য। অতি বাবু বলিয়াছেন,—'কোন সময়ে ভারতবর্ষকে ক্যানাডা প্রভৃতি কলোনির মত self-government বা স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারী হইতেই হইবে, রাজা রামমোহন রায় ইংরাজ-শাসনের সেই প্রারম্ভ-কালেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন সুপ্রিমকোর্ট ও ভারতেশ্বরের নিকট তাঁর আবেদন-পত্র হইতেই দেখি যে, রাষ্ট্রীয় অধিকারে ভারতবাসীকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত, অসম্মান ও বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তিনি কি অগ্নিময় বাণীই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরকে তিনি লিখিতেছেন, 'They appeal to you by the honour of that great nation which under your royal auspices has obtained the glorious title of Liberator of Europe, not to permit the possibility of millions of your subjects being wantonly trampled on and oppressed.' গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে license না পাইলে এদেশে কোন সংবাদপত্রাদি বাহির হইতে পারিবে না, প্রধানতঃ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যদি ঐরূপ উক্তি বাহির হইতে পারে, তবে আজ রাজা রামমোহন জীবিত থাকিলে এবারকার প্রেস-আক্ট সম্বন্ধে কি বলিতেন এবং কি করিতেন, তাহা আপনারা কল্পনা করিয়া দেখুন। * * কোথায় কোনে নিরঙ্কুশ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, তাতে তাঁর একেই আনন্দ যে তিনি পটা করিয়া টাউনহলে এক ভোজ দিয়া বসিলেন। আবার নেপল্‌সে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলিতেছে, এবং সে সংগ্রামে নেপল্‌সের লোকদের পরাভব ঘটিয়াছে, এই সংবাদে তিনি এমনি ভ্রিয়মাণ হইলেন যে, সেদিন মিঃ বকিংহাম নামক ইংরাজ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই যাইতে পারিলেন না। তাঁকে চিঠি লিখিলেন—'এক দুর্ঘটনার সংবাদে আমার মন এমনি বিচলিত হইয়াছে যে, আপনার সহিত আমি দেখা করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে, সকল ইউরোপীয় ও এশিয়ার জাতিরা স্বাধীন হইল, এ দৃশ্য আমার জীবিতকালে আমি দেখিয়া যাইতে পারিব না।' 'Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful'। ইংলণ্ড যাইবার পথে নেপল্‌সে

[illegible] [illegible] [illegible] [

কামরূপের ইতিহাসের একাংশ।

[কোচজাতি।]

হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নতিস্পৃহা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, অনেক সম্প্রদায় আপন আপন ইতিহাসের আলোচনায় মনোযোগী হইয়াছেন। তার প্রায় প্রত্যেক অসভ্য, প্রাকৃতিক সম্প্রদায়েরও এক একটী উৎপত্তি-বিবরণ আছে। লিখিত গ্রন্থ অথবা বংশপরম্পরাগত কথা বাচনিক উক্তি তত্তাবতের ভিত্তি। Ethnology (জাতিতত্ত্ববিদ্যা) ও Philology (শব্দতত্ত্ববিদ্যা) দ্বারা জাতিনির্ণয়ের চেষ্টা নিতান্ত আধুনিক। ইউরোপীয় ধর্ম্মের প্রচারকগণ এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অধীন হইতে সর্ব্বদাই অনিচ্ছুক। ভারতীয় জাতি বা রাষ্ট্রবিশেষের ঐতিহাসিক উপকরণ কত দূর সহজ সভ্য ও জঞ্জালবর্জ্জিত, এ স্থলে তাহার আলোচনা বাহুল্যমাত্র। অনুচিত উচ্চাভিলাষ ও ন্যায্য অধিকারদানে দৃঢ়া সাম্প্রদায়িক-ইতিহাস-সঙ্কলনের পক্ষে একটী গুরুতর অন্তরায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক উভয়বিধ প্রমাণ যথাসাধ্য উপস্থিত ও আলোচনা করিয়া কামরূপের প্রাচীন অধিবাসী 'কোচ' নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের জাতি-নির্ণয়ের চেষ্টা করা গিয়াছে। কত দূর কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য।

রাজা সমুদ্রনারায়ণ কুমারের (দরঙ্গ) বংশাবলী পুস্তকে লিখিত আছে,—রাজা হৈহয়ের পুত্র 'সহস্র' পরশুরাম কর্ত্তৃক হত হইলে, সহস্রের পুত্রগণ পরশুরামের পিতামহ বধ করেন। এই কারণে পরশুরাম ক্ষত্রিয়-বধে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক ক্ষত্রিয় পলায়ন করেন, এবং উপবীত ত্যাগ করিয়া, গুপ্তভাবে বেচের ন্যায় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁদের বংশে উত্তরকালে হিদরী নামে এক জন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিদরীর দ্বাদশ পুত্র হইতে বারটী বংশের সৃষ্টি হয়। ইহারই এক বংশে হরিদাস বা হাড়িয়া মণ্ডলের উৎপত্তি। হরিদাসের স্ত্রী হীরা শাপগ্রস্তা পার্ব্বতী ছিলেন। এই পার্ব্বতীর গর্ভে মহাদেবের সংযোগে বিশ্বসিংহের জন্ম। প্রসিদ্ধনারায়ণ ও খড়্গনারায়ণের বংশাবলী পুস্তকে উপরি-উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে।

কোচবিহার, বিজনী, দরঙ্গ, বেলতলা ও লাতর্থারের রাজবংশ এই বিবরণে

বংশধর। জলপাইগুড়ির বারকত-বংশ বিশ্বসিংহের ভ্রাতা শিবসিংহ হইতে উৎপন্ন। বিশ্বসিংহের পিতা হরিদাস মণ্ডল ও মাতামহ হাজো, মতান্তরে রমা, উভয়েই রাজা ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কোচবিহারের ইতিহাস ও উপরি উক্ত বংশাবলী পুস্তকে হাজোর কোনও উল্লেখ নাই। লাটিন তাঁহার 'ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া' পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ রাজা হাজো (The valiant chief) কর্ত্তৃক মুসলমানেরা রঙ্গপুরের উত্তরাঞ্চল হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে, গৌড়ের আলালুদ্দিনের (হু) ৩য়ে, ১৫শ শতাব্দীতে, অনেক হিন্দু কামরূপ রাজ্যে আশ্রয় ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্টের মতে, উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে তাৎকালিক গৌড়ের অধিপতি মহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক, অনেক হিন্দু রাজা বিনষ্ট ও সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন,—হাজো হাজো (a famous leader) কাছাড়ীদিগকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন; * পূর্ব্বে রঙ্গপুর, আসাম, ত্রিপুরা ও কাছাড় লইয়া কাছাড় রাজ্য গঠিত ছিল। † অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ রঙ্গপুর ও কোচবিহার অঞ্চলের 'কোচাড়' নাম অবগত ছিলেন। ‡ দক্ষিণ বঙ্গের অধিবাসিগণ এখনও 'কোচাড়' দেশের নাম ভুলেন নাই। কোনও এক সময়ে কুশী ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ, নেপালীগণের নিকট কাছাড় নামে পরিচিত ছিল।

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে মোদাগিরির (মুঙ্গের) পরে, এক কৌশিকী-কচ্ছ দেশের নাম আছে। § রত্নাক্ষরে লিখিত 'কোছাড়' ও 'কোচাড়' শব্দের অনৈক্য অতি সামান্য। স্থানীয় নামের স্থলে, অর্থাৎ ব্যাকরণ-সম্মত শব্দ না হইলে, পার্সী নকলকারকের পক্ষে যুগেস উচ্চতা রক্ষা করা প্রায় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই ইহা অবগত আছেন। কাছাড় ব্রিটিশ শাসনাধীন হইবার পরেও উহার দেশ নামে পরিচিত হইত। কাছাড়ী জাতির নাম হইতে কাছাড় জেলার নামকরণ হইয়াছে। কাছাড়ীরা মেচ জাতি হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে কাছাড় অঞ্চল 'ত্রিবেগরাজ্য' নামে পরিচিত ছিল। সে সময় কাছাড়ীরা অপেক্ষাকৃত উন্নতির বার করিতেন। § পুরাণোক্ত

---

* আইন-ই-আকবরী ১ম, ৬৯৩ পৃঃ টীকা।

† বিশ্বকোষ কাছাড়।

‡ Mr. Glazier's Report, Eastern India III. P. 42 &

§ বিশ্বকোষ; রঙ্গপুর ১৩ পৃঃ; Gait's 'History of Assam' P. 42

ডেড়ম দেশ এখন নাগা-হিলের অন্তর্গত। আসামে এখনও 'হোজাই কাছাড়া' নামে এক জাতি বাস করে।

রাজা মানসিংহের কোচবিহারে আগমন (১৬শ শতাব্দীতে) প্রসঙ্গে উল্লিখিত 'কোচাড়' নাম, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন 'কাছাড়' হইবার উপক্রম হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে মানসিংহের বর্ত্তমান কাছাড় পর্য্যন্ত গমনের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বুকাননের মতে 'কোচবিহার' ও 'কোচাড়' (Kuch-vihar বা Kochar) ভিন্ন নহে। হাজোর সমসময়ে ও পরে, উত্তর-ময়মনসিংহ কোচরাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। ইহা প্রকৃত হইলে হাজো অথবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ, পূর্ব্বোক্ত মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক রাজ্যহীন হইয়া, উত্তর-পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, মনে করা কষ্ট-কল্পনা নহে।

নীলাম্বরের পর কামরূপ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, যে সময় ভুঁইয়া রাজাদের কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল, সেই সময় কোচরাজগণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতেছিলেন। ভুঁইয়া বা ভৌমিক নামক সামন্ত রাজপদ, গৌড়ের চক্রবর্ত্তী পাল-রাজগণের সময় হইতে মোসলমান আমল পর্য্যন্ত, কোনও না কোনও প্রকারে বিদ্যমান ছিল। ভুঁইয়া রাজপদ কোনও বংশবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। কোচরাজ হরিদাসের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত যদিও অস্পষ্ট, কিন্তু তিনিই যে কোচ-রাজবংশ স্থাপন-কর্ত্তা, ইহা নহে। "তাবকাত-ই-নাসেরী" পুস্তক-পাঠে, (১২শ শতাব্দীর শেষ ভাগে) উত্তরবঙ্গে কোচ বা মেচ জাতির উন্নতাবস্থা জানা যায়। তাঁহাদের দলপতি বা রাজা, বক্তিয়ার খিলিজির তিব্বত-অভিযানকালে পথপ্রদর্শক ছিলেন। *

বৌদ্ধ পালরাজগণ ৮ম শতাব্দীর শেষ হইতে ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, সমগ্র গৌড়দেশে বা তাহার খণ্ডবিশেষে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে লিখিত আছে যে কোচেরা কখনও গৌড়েশ্বরের বশবদ ছিলেন; খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে পর্য্যন্ত কামরূপে ভগদত্ত-বংশীয় রাজারা প্রবল ছিলেন। † উক্ত বংশের অবনতিকালে কোচ জাতি প্রবল হইয়া উঠেন। ৯ম শতাব্দীর আরবীয় বণিক সোলেমান কামরূপের পরে 'কসবান' দেশের নাম করিয়াছেন। টড্ কসবান বলিতে 'কচ' দেশ মনে করিয়াছেন; উহা 'কোচ' দেশ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

* তাবকাত-ই-নাসেরী। Stewart's History of Bengal, Pages 51, 55. নিজাম-উস-শালাতীন; ৫১ পৃঃ।

† গৌড় ইতিহাস, ৬৭ পৃঃ, ১৪৩ পৃঃ।

"বোরদেদ-জাহা-নামা" নামক পারস্য পুস্তকে লিখিত আছে যে, ২১ শত বৎসর পূর্ব্বে কোচ প্রদেশের বঙ্গ বিপ বা সাঙ্গলদেব নামক জনৈক হিন্দু রাজা ভিগ্রাসিক-পর্ব্বতবাসী কেদারকে পরাজিত ও বঙ্গবিহার অধিকার করিয়া গৌড়-নগরের পত্তন করেন।* ফেরস্তোশী-কৃত বর্ণনায়, ৪র্থ শতাব্দীর পারস্য সম্রাট বাহারাম গোরের প্রসঙ্গে, সাঙ্গলদেবের নাম আছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ভগদত্ত বংশীয় রাজা ছিলেন. ভগদত্তের বংশে ৭ম শতাব্দীতে ভাস্করবর্ম্মা কামরূপের রাজা হন। তিনি কোচবংশোদ্ভব বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

৪র্থ হইতে ৫ম শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য হূণ জাতিরা উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন; তাঁহাদের জনৈক রাজার নাম কেদার ছিল। তিনি গৌড়বিজেতা ও লক্ষ্মণ-উপাধিত্য নামে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহারই নামানুসারে গৌড়ের অপরাবস্তী নাম হইয়াছে, ঐতিহাসিকগণ এইরূপ অনুমান করেন। ইত্যাদি কারণে সাঙ্গলদেবের আবির্ভাব-কাল, ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী মনে করা যাইতে পারে। খৃঃ-পূঃ ৩য় শতাব্দীর গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনায়, Scyrtae (কিরাত) ও Casyri (কসেরী) জাতির নাম আছে। কিরাত জাতি কামরূপের অধিবাসী। 'কসেরা' শব্দ 'কোচ' নামের রূপান্তর হওয়াই সম্ভব।† যে কিছু দিনই হউক, কোচ জাতির উন্নতাবস্থা নিতান্ত আধুনিক নহে। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিদাস মণ্ডল তাঁহাদের দলপতি বা রাজা ছিলেন। হরিদাস মণ্ডল (a Mech chief‡) কোচবিহারের অন্তর্গত খুটাঘাট পরগণার চিক্না গ্রামে বাস করিতেন। স্বজাতির বাদশটী শ্রেষ্ঠ বংশের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ছিল। তিনি হাজোর, মতান্তরে রমার কন্যা হীরা-দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহের জন্ম হয়। এই সময়ে কামতাপুরের খেন-বংশীয় রাজারা পশ্চিম কামরূপের চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন।

বিশ্বসিংহের জন্মের পরে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ কর্ত্তৃক কামতাপুরের [illegible]

* "This has been touched on before, so we begin the history of the great Koch tribe at the rise of one Shankaldip, a koch chief."—*History of Upper Assam. P. 20.*

† মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা, ১২৪, ১৮৯ পৃঃ। Cosyri (কসেরী) জাতি হিমালয়-উপত্যকাবাসী।

‡ Hunter's "Statistical account of Cooch Behar" P. 363.

ঘটে। বুকাননের মতে, কামতাপুর ধ্বংসের পরে, চন্দন ও নদন নামে দুই ভ্রাতা, কামতাপুরের ৩০ মাইল উত্তরে, মুরলীবাস নামক স্থানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজ্য অধিক দূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। যাহাই হউক, কোচ জাতি কর্ত্তৃক খেনরাজ্য আক্রান্ত হইয়া অরাজকপ্রায় হইয়াছিল। কোচরাজগণ প্রথমতঃ সমবেত-প্রযত্ন ছিলেন, পরে একত্রিত হইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন। * কামতাপুরের তাৎকালিক মুসলমান শাসনকর্ত্তা হোসেন শাহের পুত্র দানিয়েল শাহ (মতান্তরে নাসরত শাহ) কোচ জাতির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গৌড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। † উক্ত ঘটনার প্রতিশোধ উপলক্ষেই হউক, কিংবা রাজ্যবিস্তারলোভেই হউক, পরবর্ত্তী কোচরাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বকালের মধ্যে মুসলমানেরা কয়েকবার কোচ ও আসাম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশ্বসিংহের রাজ্যবিস্তারের কোনও হানি হয় নাই। বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণের সময় উল্লিখিত আক্রমণের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নরনারায়ণ নিজ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সাহায্যে কোচরাজ্য পশ্চিমে তুলী ও গঙ্গাতীর, দক্ষিণে বোড়াঘাট ও পূর্ব্ব-দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা, লুসাই পাহাড় ও মণিপুরাদি সহ সমগ্র আসাম ও ভোটরাজ্য সেই সময় কোচরাজ নরনারায়ণের অধীনতা স্বীকার করিত।

মহারাজ বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণ, তাঁহাদের সমসাময়িক মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। † মহারাজ নর নারায়ণের অভিযানে যে সমস্ত সৈন্য গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রায় কতের (জলপাইগুড়ির রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ) অধীনে এক দল শক্তিশালী স্থানীয় যোদ্ধা ছিল। ১৪শ শতাব্দীতে মালেক ফিরোজ অধীনে, দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ তোগলক চীন-বিজয়ের নিমিত্ত যে লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণের মতে, তাহা এই কামরূপবাসীর হস্তেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্য কামরূপ দেশের রত্নপীঠের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। ১২শ শতাব্দীর ভীমত্রাস মহম্মদ বক্তিয়ারের বীরলীলা, এই কামরূপ রাজ্যে আসিয়াই সংবরিত

* Martin's Eastern India, P. ...

হইয়াছিল। গৌড়ের পাল ও সেন-রাজগণের (৮ম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) সুদীর্ঘ কালের আধিপত্য থাকিলেও কামরূপে কোচরাজত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। পাল ও সেনরাজগণের সময় কামরূপের খণ্ডবিশেষে কোচ আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। ১৬শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ৩০০ বৎসর কালের মধ্যে পাঠান ও মোগলরাজগণ কর্ত্তৃক অন্যূন ১৬ বার আক্রান্ত হইয়া, এবং প্রতিবেশী ভোট ও আহম জাতির অনবরত উৎপাতের মধ্যে, সিংহাসন রক্ষা করিয়া কোচ জাতি বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

বর্ণ

কোচ নামে পরিচিত জাতি মূলে কোন্ বংশ হইতে উৎপন্ন, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান। আজ পর্য্যন্ত তাহার আলোচনা বিশেষ লাভ করে নাই। ইম্পীরিয়াল গেজেটিয়ারের ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়ার অংশে দেশীয় রাজ্যের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কোচবিহার রাজবংশ 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কোচ জাতির মূলতত্ত্ব-নির্ণয়ে বিস্তর শ্রমস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ আকৃতি, আচার ব্যবহার, ভাষা, খাদ্যাখাদ্য, ধর্ম্ম ও আদিম কালের ইতিহাস ইত্যাদির সাহায্যে, এই জাতি আর্য্য কি আদিম অধিবাসী, তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

মিঃ রিসলির (পরে স্যার হার্বার্ট রিজলি) মতে কোচ জাতি এখন রাজবংশী নামে পরিচিত, রাজবংশীরা দ্রাবিড়-বংশীয়; তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। মিঃ হডসন্ ও ডাঃ ল্যাথামের মতে, কোচ বা রাজবংশী জাতি মঙ্গোলীয় বংশীয়, তুরেণীয়, অথবা অনার্য্য বংশসম্ভূত, এবং হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। কর্ণেল ডেল্টন্ বলিয়াছেন,—রাজবংশীরা কৃষ্ণকায়, এবং কোচেরা কোঁচ-ঠোঁট-বিশিষ্ট ও নিগ্রোদের ন্যায় তাঁহাদের চোয়াল আছে। মিঃ গুহ্যহাসের মতে, রাজবংশী জাতি দেখিতে দ্রাবিড়বংশীয়। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল কোচ জাতিকে নিগ্রো জাতির অন্তর্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন। মিঃ বিভার্লি লিখিয়াছেন,—কোচ জাতি দ্রাবিড়-বংশসম্ভূত ভূঁইয়া শাখার অন্তর্গত। বুকানন বলিয়াছেন—যদিও সমস্ত রাজবংশী কোচ নহে, তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশই ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রফেসার সাওয়ারের মতে ভাষাতত্ত্বে আর্য্য ও দ্রাবিড

দ্রাবিড়গণ আর্য্য হিন্দুগণের প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্য জাতি। এঃ কর্জ্জনের মতে, দ্রাবিড় জাতি আপনাদিগকে কখনও অহিন্দু বলিয়া পরিচিত করেন নাই। অনেক বাঙ্গালী লেখক বলেন,—কোচ জাতি প্রাচীন নাগ জাতির একটী শাখা। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেন যে, কোচ জাতি প্রাচীন 'কম্বোজ' জাতি হইতে উৎপন্ন। * আলোচনা-স্থলে এই সকল পণ্ডিতের মতই সচরাচর উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

আধুনিক জাতি-তত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিত হারবার্ট রিজলি লিখিয়াছেন,—নেপাল, পূর্ব্বোত্তর বঙ্গ, আসাম ও হিমালয় প্রদেশবাসিগণের মধ্যে মঙ্গোলীয় ভাব খুব প্রবল। তাঁহার মতে, বাঙ্গালী-শরীরে বেহারী অপেক্ষা আর্য্য শোণিত অনেক অল্প, এবং মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় শোণিত অনেক অধিক; † অর্থাৎ, অধিকাংশ বাঙ্গালীই দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ আর্য্য শোণিত পঞ্জাবাদি পশ্চিম দেশ ব্যতীত পাইবার উপায় নাই। ‡ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ আনাণ্ডেল কলিকাতা মিউজিয়মে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কলিকাতার অধিবাসিগণকে নিগ্রো ও মঙ্গোলীয়-বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিঃ ক্রুক নামক আর এক জন সিভিলিয়ান, রিজলির মতের সমালোচনা উপলক্ষে তাঁহার "The Natives of Eastern India" পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সামান্যসংখ্যক লোকের নাক ও মস্তকের মাপ গ্রহণ দ্বারা কোনও বৃহৎ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। সেই সমস্ত জাতির মধ্যে যখন অন্য জাতির রক্ত সঞ্চারিত হয়, তখন তাহাদের মূল উদ্ধার কঠিন হইয়া পড়ে। পাইওনিয়ার পত্রের (১৯১১ খৃঃ ৫ই জুন) সম্পাদকীয় মন্তব্যে রিজলির উল্লিখিত সিদ্ধান্ত, হঠ-কারিতা-প্রসূত অনুমান (rash assumption) বলিয়া গবরমেণ্টকে ঐ সব মত গ্রহণ করিতে বিশেষ সাবধান করা হইয়াছে।

জাতিতত্ত্ব-বিদ্যা (Ethnology) বিগত শতাব্দীর একটী উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় আবিষ্ক্রিয়া, কিন্তু উহা এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। জাতি (race) নির্ণয় দূরে থাকুক, মানবজাতি কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, এখন পর্য্যন্ত সেই প্রশ্নই অমীমাংসিত রহিয়াছে। তৎসংক্রান্ত শিক্ষা বা উপদেশাদি (anthropology) অবলম্বনে প্রফেসর সেস একটী সুচিন্তিত

* গৌড়রাজমালা পৃঃ ৩৭।

† Risley's Tribes and Castes of Bengal IXXXi.

‡ IXXXVIXVI

সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মানব-শরীরের উচ্চতা, অস্থি, করোটি, মস্তিষ্ক, দন্ত, নাসিকা, চক্ষু, কেশ, লোম, চর্ম্ম, বর্ণ ও ব্যাধি প্রভৃতির প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়া, জাতিতত্ত্ব-বিদ্যার প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলি আপাততঃ অগ্রহণীয় বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। * ভারতের গৌরবস্থানীয় রাজপুতনার ছত্রিশটী ক্ষত্রিয় রাজকুল শক জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া কর্ণেল টড্ রাজস্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। † দক্ষিণ ভারতের মালবার প্রদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজ দৃষ্টে এক জন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন,—"এই সকল ব্রাহ্মণের যাহা মূর্ত্তি দেখিলাম তাহাতে আর্য্যরক্ত ইহাদের দেহস্থ ধমনীতে বিন্দুমাত্রও আছে কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। * * * * * ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত, অথবা ব্রহ্মার তেজে উৎপন্ন বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, দক্ষিণাবর্ত্তে আসিয়া তাঁহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এক দিনেই অপনোদিত হইতে পারে।" ‡ জাতি-তত্ত্ববিদ্ কোনও পণ্ডিত বলিয়াছেন, শারীরিক বর্ণ কোনও জাতির নিজস্ব হইতে পারে না; বিশুদ্ধ শোণিত ও অনুকূল জলবায়ুর উপরেই তাহা অধিকমাত্রায় নির্ভর করে; যথা সুমেরু-বৃত্তের নিকটবর্ত্তী দেশবাসী শ্বেতবর্ণ, বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী দেশে অবিকৃত থাকিতে পারে না। প্রমাণ-সংগ্রহ করিতে গেলে এই সমস্ত নির্দ্ধারণও মূলাহীন হইয়া পড়ে। কামস্কাটকা ও লাপলাণ্ড দেশের সব

* "But it must be remembered that the science of ethnology is still in its infancy. It is one of the many sciences of which the nineteenth century has witnessed the birth, and among these sciences it is one of the youngest. Its students have already collected a large mass of materials upon which to build its superstructure; but these materials belong rather to the physiological framework of man and the external influences that surround him than to the more subtle forces of the moral and intellectual world. These latter are difficult to seize, distinguish, and arrange, and it will be long before the facts connected with them can be ascertained with the same amount of certainty as the relative size of the skull or the number of convolutions in the brain. For the present, at least, we must be content with those racial characteristics which can be seen and handled, measured or weighed: the scientific appraisement of the mental and moral characteristics which even now we may fancy we can trace must be left, to the care of the future."—*'The races of the old testament' chapter I. p. xv.*

† রাজস্থান ১ম, ৫ম, অঃ।

‡ ভারতী পত্রিকা ১৩০৪, ১১১ পৃঃ।

জাতি শ্বেতবর্ণ নহে। গ্রীনলণ্ডের এস্কুইমো জাতি কৃষ্ণবর্ণ; আবার যাহারা মঙ্গোলিয়ার নিকট বহুকাল বাস করিয়াও টুরেগ জাতি শ্বেতবর্ণ। সমস্ত আর্য্যজাতি এক বর্ণের ছিলেন না। * ভারতীয় আর্য্যজাতি বহু বংশে ও বহু বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। কথবংশীয় আর্য্যেরা শ্যামবর্ণ ছিলেন। † আর্য্যবংশীয়দের ভারতে উপনিবিষ্ট হইতে বহু সময় আবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহাদের কোন্ দল কোন্ সময় কি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা এখন আর অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। কোচ জাতি দ্রাবিড় জাতির একটী শাখা বলিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্রাবিড় জাতি ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। বহু কাল পূর্ব্বে; মধ্য-এসিয়ার পুরাতন-ভাষাভাষী কতকগুলি লোক, সিন্ধু প্রদেশের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়া দ্রাবিড় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেক পরে আর্য্য নামে পরিচিত সম্প্রদায়ও এই মধ্য-এসিয়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। ‡ মনু, দ্রাবিড় ও কম্বোজ জাতি ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়াই মনে করিতেন। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জাতি-গুলির আদিপুরুষ কেহই বাঙ্গালার পুরাতন অধিবাসী নহেন। তাঁহারা কান্য-কুব্জ, অযোধ্যা, বারাণসী, মগধ, মহারাষ্ট্র, দ্রবিড়, মধ্যভারত ও উৎকল প্রভৃতি দেশ হইতে আগত। কোচ জাতি ব্রহ্মপুত্র প্রদেশ হইতে হিমালয়ের পাদদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। ইঁহাদের আক্রমণে ব্যস্ত হইয়া পুণ্ড্র দেশের অধিবাসীরা দক্ষিণ বঙ্গে গিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। § কোচ জাতির এতদঞ্চলে আগমনের পূর্ব্বে, ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব পার্ব্বত্য পথে, এক (মঙ্গোলীয়) জাতি আসিয়া পুণ্ড্র রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং পরিণামে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উক্ত দেশে বসবাস করিতে থাকেন। ইহারাই পৌণ্ড্র। ইহা কত কালের ঘটনা, নিশ্চয় করা কঠিন। কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল অবস্থায়, মঙ্গোলীয়দের পুণ্ড্র দেশে আগমন অবধারণ করেন। যাহাই হউক কোচেরা পৌণ্ড্র জাতিকে বিতাড়িত করিয়া অধিক দিন নিরাপদে কাটাইতে পারেন নাই। মঙ্গোলীয় জাতির পথ অবলম্বনে, ভড় নামে এক পরাক্রান্ত জাতি আসিয়া পুণ্ড্র রাজ্য জয় করেন, এবং উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকেন। বৌদ্ধের ও তাঁহাদের সম্পৃক্ত আভীর জাতি কর্ত্তৃক পুণ্ড্র রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। এই আক্রমণ ভড় জাতির

* "The races of the old testament", p. 22.

† ঋগ্বেদ ৮ম: ৯৯ সূ: ৩৭, ১০ম: ৩১ সূ: ১১।

‡ Imperial Gazetteer VI. P. 327. ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান জাতি, ৪ পৃ:।

§ গৌড়ের ইতিহাস, ১ খণ্ড, ৫৫, ৫৬ পৃ:।

আগমনের পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছেন। আভীরদিগের পূর্ব্বে উড্ডুর জাতি পুণ্ড্র রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। পরে ভোজ-গৌড়গণ পুণ্ড্রদেশের রাজা হন। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে শবর জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে কোলবীয় শ্রেণীর অন্তর্গত বলা হয়; দশকুমারচরিতে ইঁহাদের বিবরণ আছে। এই সব আক্রমণের পূর্ব্বাপর ধারাবাহিকতা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। সেই সময় পুণ্ড্র রাজ্য বলিতে পরবর্ত্তী কালের করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই কেবল বুঝাইত না। পরবর্ত্তী কালের কামতাপুর ও কোচবিহার রাজ্য সময় সময় পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। * পণ্ডিতগণের মতে, পূর্ব্বোক্ত মঙ্গোলীয় জাতির সহিত কোচ জাতির দীর্ঘকালব্যাপী সংস্রব হেতু উভয় জাতির মধ্যে রক্ত-সংস্রব ঘটিয়াছিল। † কোন জাতির গঠনমান আকৃতি, তাহার সমর্থন করে। এই প্রকারের আকৃতি-পরিবর্ত্তন এ কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কোচবিহার, রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের যে কোনও শ্রেণীর মুসলমানের সহিত স্থানীয় হিন্দুর আকৃতিগত অনৈক্য দৃষ্ট হয়। নবদীক্ষিত মুসলমানের সহিত বিভিন্ন স্থান হইতে আগত মুসলমানের রক্ত-মিশ্রণ, এই পার্থক্য-সৃষ্টির কারণ।

বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে বৈদিক হিন্দু ও জৈন ধর্ম্মের প্রচার ছিল। কামরূপে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ, অর্থাৎ চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েনসাঙ্গের আগমন কাল পর্য্যন্ত হিন্দু মত প্রবল ছিল। ক্রমান্বয়ে জৈন ও বৌদ্ধ মতের বিস্তারের ফলে, আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক ব্রাহ্মণসমাজের চক্ষে বঙ্গদেশ নিতান্তই হীন ছিল। তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাভাব পরবর্ত্তী কালে বিবিধ আকারে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২৩ জন বাঙ্গালীর সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, এবং ৪টী শাখার মধ্যে ২টীর কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের দেবকোট (দিনাজপুরের নিকট) ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। মহাবীরের প্রশিষ্য ভদ্রবাহু, উক্ত অঞ্চলে জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া খৃঃ পূঃ ৪৬৩ অব্দে দেবকোটে দেহত্যাগ করেন। অশোকের ধর্ম্মসভায় কামরূপের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। হিউয়েনসাঙ্গের কামরূপ-আগমনের ফলে, (খৃঃ ৬৩৮) তদ্দেশে বৌদ্ধ মতের রীতিমত প্রচার আরম্ভ হয়। তাৎকালিক কামরূপ রাজ ভাস্করবর্ম্মা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ

* গৌড়ের ইতিহাস, ২য়, ১১৩ পৃঃ। বিশ্বকোষ।

† গৌড়ের ইতিহাস, ৬০, ৩য় পৃঃ।

করিয়াছিলেন। হিউয়েনসাঙ্গের পরে (৭৪৭ খৃঃ), বৌদ্ধ যতি শান্তিরক্ষিত, এবং উড্ডানদেশবাসী যতি পদ্মসম্ভব, তিব্বত রাজ স্থ-স্রোঙ দেউ-চন কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। পদ্মসম্ভব পথিমধ্যস্থ পার্ব্বতীয় জাতির দেবদেবীগুলিকে বৌদ্ধ দেবদেবীর শ্রেণীতে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের উপযোগী উপাসনা-প্রণালীর সৃষ্টি করেন। পরে শান্তিরক্ষিতের শিষ্য কমলশীলও তিব্বতরাজের আহ্বানে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের সময়েই পূর্ব্বোত্তর ভারতে বৌদ্ধ মতের বহুল প্রচার আরব্ধ হয়। পালরাজগণের রাজত্বকালে তাঁহাদের চক্রবর্ত্তিত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে কামরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাঁহাদের রাজত্বকালে বা সমসময়ে, কামরূপে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের দ্বারা জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল রাজা কামরূপে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ-স্থাপন ও ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেও পূর্ব্ব ও পশ্চিম কামরূপে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকের এবং ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল।

পাল-রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম ছিল; তথাপি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রগাঢ় চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্ম বলিয়া জনসমাজে প্রকৃত বৌদ্ধ মত প্রচারিত হইতে পারে নাই। তাৎকালিক বৌদ্ধ প্রচারকগণ তাহা উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণের উপযোগী বিগ্রহ-পূজা ও বিবিধ উৎসবের সৃষ্টি করেন। কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার মত উত্তরবঙ্গে বহুলরূপে প্রচার হইতেছিল। এই সময় ভারতের বহির্ভাগ হইতে কোনও কোনও বিগ্রহ আনীত হয়। প্রান্ত-সীমাবর্ত্তী পর্ব্বতীয় জাতিগুলিকে বৌদ্ধ মতে আনয়নের যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার ফলে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার সৃষ্টি হইয়া বৌদ্ধবিহারাদিতে স্থান লাভ করে, এবং ক্রমশঃ সমস্ত গৌড়দেশে বিস্তৃত হয়। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী গৌড় জনের মধ্যে যা কিছু বৈদিকাচার (হোমার্থ অগ্নিস্থান) অবশিষ্ট ছিল, এই সময়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের অবস্থায়, ঐ সমস্ত বৌদ্ধবিগ্রহ ও উৎসবাদি রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছিল। মহাকাল, চামুণ্ডা, রথযাত্রা, দীপালী, ধর্ম্মপূজা, শীতলা, তারা, কালী, চণ্ডা, স্থানপূজা, কালভৈরব, তিস্তা, কামাখ্যা ও করতোয়া ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের মাত্র বৌদ্ধোৎসব ও দেবদেবীগুলিকে হিন্দুরা ক্রমশঃ আত্মস্থ করিয়া লইয়াছেন। পালরাজগণের রাজত্বের শেষাবস্থায়, এবং হিন্দু সেনরাজগণের অভ্যুদয়কালে,

শেষোক্ত পরিবর্ত্তনের আরম্ভ হইয়াছিল। বল্লালসেন নিজেই চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। উল্লিখিত দেবদেবীগুলির মধ্যে মহাকাল ধর্ম্মরূপী বুদ্ধের দ্বারপাল ছিলেন। তারাদেবী বিদেশ হইতে আনীতা। হাড়ি ও ডোম জাতি প্রথমে ধর্ম্মের পূজক ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা উঁহা হিন্দুমতে আনয়ন করেন, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পূজকদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া নিজেরাই পূজকের স্থান অধিকার করেন। মালদহ জেলার অন্তর্গত গাজলের কালীর এখনও হাড়ি পুরোহিত; এই কালী রূপান্তরিতা বৌদ্ধদেবী। পাল-রাজগণের সময় মহাকালের উপাসনা বৌদ্ধতান্ত্রিক সমাজে প্রবেশ লাভ করে। ভোটানের বৌদ্ধ-সমাজে এখনও মহাকালের পূজা প্রচলিত। দ্বাদশ চণ্ডীর মধ্যে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বাইহোরাণী নামক সুবিখ্যাত চণ্ডীর এখনও কোচ পূজারী বিদ্যমান। এই চণ্ডী এখন হিন্দুদেবী। অন্য জাতির পূজা ও বলি কোচেরাই তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। অপরের তাহাতে অধিকার নাই। *

বর্ত্তমান সময়ের হিন্দুর অননুমোদিত কূর্ম্ম ও বরাহ ভক্ষণাদি, তান্ত্রিকতার প্রবল অবস্থায় কামরূপের হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। † বুদ্ধের শূকর-মাংস-ভক্ষণের প্রবাদ হইতে তান্ত্রিকসমাজে বরাহভক্ষণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। নেপালের কোনও কোনও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা-গ্রহণকালে এখনও বরাহ-মাংস ব্যবহৃত হয়। ‡ হাড়ি জাতির অবস্থা যাহাই হউক, উত্তর-বঙ্গের কোচ জাতির মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার সুস্পষ্ট চিহ্ন এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। § উপরি-উক্ত ভক্ষ্যাদি, জাতীয় উৎসব ও উপাস্য দেবদেবীগুলি, তাঁহাদের অতীতকালে বৌদ্ধ-জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বঙ্গের অন্যান্য জাতির তুলনায় কোচ জাতি অধিকমাত্রায় বৌদ্ধভাবাপন্ন থাকিবার কারণ অতি সুস্পষ্ট।

হিন্দু ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক সেনরাজগণের প্রভাব, কোচ অধিবাসীর দেশে (কামরূপে) তেমন ভাবে বিস্তারলাভ করে নাই। পাল-রাজগণের ন্যায় তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য কোনও স্মৃতিচিহ্ন কামরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের আধিপত্যকালেও তুলনায় পালরাজগণের অপেক্ষা অনেক কম ছিল। যে কোনও মত বা শিক্ষার কথা মনে করা যাউক না কেন, রাজকীয়

* গৌড়ের ইতিহাস; ৫৮, ৬৩ পৃঃ।

† যোগিনীতন্ত্র; ২য় ভাগ; ৯ পটল ১৩। "হংস পারাবতং ভক্ষ্যং কূর্ম্মং বারাহমেব চ।"

‡ [illegible]

প্রভাবে তাহা যত শীঘ্র প্রসার লাভ করিতে পারে, কালস্রোতে হইতে গেলে তাহার বহু গুণ সময় আবশ্যক হয়। গৌড় বা বঙ্গদেশে যে সমস্ত হিন্দুরাজা বৈদিক-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী ছিলেন, তন্মধ্যে আদিশূর এক জন। তিনি বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অশ্রদ্ধাবান হইয়া সুদূর পশ্চিম হইতে বেদাচারী ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতে, তাহা ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভ বা মধ্যভাগের ঘটনা। শঙ্করাচার্য্যের কামরূপ-আগমনও প্রায় এই সময়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ পাল-রাজগণের রাজত্বকালে আদিশূরের কৃত কার্য্যের ফল, উত্তর-বঙ্গে ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতেছিল। আদিশূরের দৌহিত্র-বংশীয় সেন-রাজগণের গৌড়দেশে আধিপত্যকালে, হিন্দুধর্ম্মস্থাপনের যে পুনরুদ্যোগ আরব্ধ হয়, আজ পর্য্যন্ত তাহা বিরাম লাভ করে নাই। যে সমস্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিজয় সেনের রাজত্বকালে (১০৭৯—১১১৯ খৃঃ) তাঁহারা আবার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন। স্বনামখ্যাত বল্লাল সেনের আমলে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ক্রমে বৌদ্ধ-বিদ্বেষে পরিণত হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বৌদ্ধাচার পরিত্যাগ করেন নাই, বল্লালসেন তাঁহাদিগকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। তিনি বরেন্দ্রবাসী এক শত ব্রাহ্মণ-পরিবারকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া, আর সকলকে ভোট, দরদ, টংকল, মগধ ও মোবঙ্গে (পূর্ণিয়ার উত্তর) প্রেরণ বা নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন। * বল্লালসেন নিজে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন; বৌদ্ধরাও তাঁহাকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ও তাঁহার লক্ষ্যস্থানীয় ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও নীচ শ্রেণীর লোক বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন। যাঁহারা প্রথম প্রথম হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের সহায় সম্পদ ছিল, তাঁহাদের পক্ষে পূর্ব্বসমাজ-লাভে বিশেষ কোনও বাধা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা পরে হিন্দু হন, এবং সহায়হীন ছিলেন, তাঁহারা সমাজে অপেক্ষাকৃত নীচে স্থান লাভ করেন। † অনেকের মতে, এই কারণেই বৈদ্য জাতির পতন ঘটে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত কারণেও অনেক জাতি বল্লালসেন কর্ত্তৃক সমাজের উচ্চে ও নীচে স্থান লাভ করিয়াছেন।

* গৌড়ের ইতিহাস; ১৭০, ১৮১ পৃঃ।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; ১০৭ পৃঃ।

কথিত আছে, যাগযজ্ঞে অস্বীকৃত হওয়ায় বৈদ্য—সুবর্ণবণিক জাতি বল্লালসেনের আদেশে অবনমিত হইয়াছেন। যোগী জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশাও নাকি বল্লাল-বিদ্বেষের ফল। কার্য্যবিশেষে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি কৈবর্ত্ত জাতির এক শাখার জল আচরণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কারণবিশেষে ডোম জাতীয়া একটী রমণীকে তিনি উচ্চ সমাজে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রতিবন্ধকতায় সফলকাম হইতে পারেন নাই।

এই শ্রেণীর নীচ জাতিগুলির অবস্থা পূর্ব্বে এত মন্দ ছিল না; সম্ভবতঃ বৌদ্ধমত-পরিত্যাগে বিলম্ব করাতেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। উড়িষ্যা দেশে বাউরী জাতিরা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সমকক্ষতা করিতেন। পরবর্ত্তী সেন রাজগণের আমলে বৌদ্ধ-বিদ্বেষ উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের ধন-প্রাণ হরণ করিয়ে কোনও দণ্ডভোগ করিতেন না। এই অত্যাচার এত দূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, হিন্দু রাজগণের নবাগত শত্রু মুসলমানগণকে বৌদ্ধেরা 'ধর্ম্মরূপী' বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে—"ধর্ম্ম হইল যবন রূপী, মাথা অতি কালটুপী, হাতে শোভে তিরুচ কামান। চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়, গোরী-অ বলিয়া এক নাম" * সেন রাজগণের সমাজ-বন্ধন বা বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ও নবাগত মুসলমানগণের সংস্রব-ভয় হইতে দেবীবর মিশ্র বর্ত্তমান মেল-বন্ধনের সৃষ্টি। তাঁহার মতে, মুসলমান ও নীচ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সহিত সংসৃষ্ট উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ দোষযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এইরূপে অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বিচারে 'ছাদী বংশজ' নামে পরিচিত হন। অল্প দোষে দোষিগণকে লইয়া তিনি 'মেল' বন্ধন করেন। উক্ত হেতুবাদে বৈদ্য-সংস্রবহেতু, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে 'বিজয় পণ্ডিতি' মেলের সৃষ্টি হয়। † সদ্গোপ, তিলি, তামুলী, তন্তুবায়, গন্ধবণিক প্রভৃতি বৈশ্য জাতি, হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও আর বৈশ্যত্ব পান নাই। তাহাদের তুলাদণ্ডের উদ্ধ্বরূপে তুলামূর্ত্তি সদ্ধর্ম্মসিদ্ধজনের স্তব থাকা বোধ হয়, তাহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কায়স্থগণের কলিতা জাতি বৌদ্ধ কোচ জাতির পৌরোহিত্য করিতেন। এখন হিন্দু হইয়াও আর পূর্ব্ববৎ আর্য্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেছেন না; সমাজে অনেক নীচে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বর্ণিত মহাভারতোক্ত মল্ল ক্ষত্রিয়গণ অত্যধিক বুদ্ধভক্ত ছিলেন; ইঁহারা এখন ব্রাত্য শ্রেণীতে অবনমিত। ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব।

---

* ধর্ম্মমঙ্গল।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২০০-৭ পৃ।

প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান।

উদ্ভিদই উদ্ভিদেয় অস্তিত্বের কারণ-স্বরূপ। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম—সকল উদ্ভিদই পরস্পরের সাহায্য করিয়া জীবিত রাখিতেছে, বর্দ্ধিত হইবার উপায় করিয়া দিতেছে। ডারউইন সাহেবের একটী মত আছে—'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' (Survival of the fittest)। উল্লিখিত মতের দোহাই দিয়া অনেকে অনেক রকম কথা বলিয়া থাকেন, অনেকে ভিন্নভাবে সে মতের অনুসরণ করেন। বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিলে, এ কথা মনে হয় না যে, যোগ্যতম তদধীনস্থ বা তদপেক্ষা হীনশক্তিসম্পন্নকে বিনাশ করিয়া স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষার, স্বকীয় প্রভাব-বিস্তারের জন্য বাগ্র। ডারউইনের সংস্কার যদি ইহাই হইত যে, মারামারি কাটাকাটি ভিন্ন জগতে প্রতিপত্তি-লাভের উপায় নাই, তাহা হইলে দুর্ব্বল কিছুতেই পৃথিবীতে স্থান পাইত না। মারামারি কাটাকাটি করিয়া কে জীবিত থাকিতে পারে? এতদুপায়ে আপাততঃ দুর্ব্বলকে পৃথিবী হইতে না হয় দূরীভূত করিতে পারা গেল, কিন্তু সংসারে ত সকলেই দুর্ব্বল নহে, সবল ও শক্তিশালী জীবও ত পৃথিবীতে আছে। অতঃপর তাহাদিগের মধ্যেই যুদ্ধ বিবাদ বাধিবে। ফলতঃ যে উপায়ে দুর্ব্বলকে বিতাড়িত করিতে হইয়াছে, ঠিক সেই উপায়েই শক্তিশালীদিগের সংখ্যা হ্রাস হইবে। কিন্তু পৃথিবীতে তাহা না হইয়া অন্যরূপ হইতেছে; সবল দুর্ব্বলের সহায়তা করিতেছে; দুর্ব্বলও সবলের সাহায্যের জন্য নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে। সহানুভূতি ও সহকারিতা লইয়া সমগ্র সৃষ্টি চলিতেছে। এতদুভয়ের অভাব হইলে বাস্তবিকই সৃষ্টির বিলোপ সংঘটিত হইবে। তখন রাজা প্রজাকে হনন করিবে, শৃগাল শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র জন্তুকে উদরস্থ করিয়া ফেলিবে, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি মহীরুহগণ পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করিয়া আত্মবিলোপের পথ প্রশস্ত করিয়া লইবে, এবং তৎসন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতা বা তৃণগুল্মাদিগকে সৃষ্টি-রাজ্য হইতে মুছিয়া ফেলিবে। অঘটন-ঘটনপটীয়সী প্রকৃতি বা সৃষ্টির মধ্যে ঈদৃশ নিয়ম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না। হিংস্র পশুগণ বনমধ্যে বাস করে; তাহারা লোকালয়ে আসিতে অভ্যস্ত নহে, আমরাও তাহাদিগের পল্লীতে গিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিতে যাই না। গগনবিহারিগণ গাছপালায় নিরাপদে বাস করিতেছে; তাহাদিগের বাসস্থানের উচ্ছেদের জন্য আমরা গাছপালা কাটিয়া দেশকে মরুভূমি করিতে প্রস্তুত নহি।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় যে, সৃষ্টির মূলে মারামারি কাটাকাটি নাই; সহানুভূতি ও সহকারিতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

শৈশবাবস্থায় বা ক্রমাবস্থায় সকল জীবজন্তু, সকল উদ্ভিদ নিঃসহায়; অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটাণুকীটদিগকে আপাততঃ আমরা অসহায় মনে করিতে পারি, অথবা তাহারা যে কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, এমনও সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা কি সত্যই সেইরূপ ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? এ কথা আদৌ বিশ্বাস্য নহে। তাহারা যতই নিম্নশ্রেণীস্থ হউক, যতই স্বকীয়-শক্তিসাপেক্ষ হউক, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই প্রকৃতির মধ্যে তাহাদিগের জন্য এমনই সুব্যবস্থা করা আছে যে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাহারা পারিপার্শ্বিকতার সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ক্রমে নিজ নিজ জাতির বংশধারায় প্রবাহে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া যথাকালে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। পৃথিবী হইতে অনেক-জাতীয় জীব, অনেক-জাতীয় উদ্ভিদ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহা বলিয়া এমন মনে করা ভুল যে, 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন'ই তাহার মূলীভূত কারণ। প্রকৃতির নিয়মবশে তাহা হইয়া আসিতেছে, এবং পৃথিবী ক্রমে যত পুরাতন হইতে থাকিবে, ততই নূতন নূতন জাতীয় জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির আবির্ভাব হইবে; সেই সঙ্গে কত পুরাতন জাতির তিরোভাব ঘটিবে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মুখে শুনিতে পাই —প্রাচীন যুগের কত দেশ, কত মহাদেশ সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে, এবং সাগরগর্ভ হইতে কত নূতন দেশের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ প্রলয় ব্যাপারে নিমজ্জিত দেশবাসী জীবজন্তু ও তরুলতা সৃষ্টির আদি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আবার যে স্থানে নূতন দেশ ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যে সকল জীবজন্তু বা তরুলতাদি জন্মিয়াছে, তৎসমুদায় স্থানীয় আবহাওয়া অবস্থানের অনুরূপ হইয়াছে। সুতরাং অন্তর্হিত ও নবাবির্ভূতের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাদের অন্তর্গত সৃষ্ট জীবজন্তু বা বৃক্ষলতাদির মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য বিদ্যমান থাকিবেই। কলিকাতার যাদুঘরে গেলে কত প্রকার অন্তর্হিত অদ্ভুত জীবের কঙ্কাল নয়নগোচর হয়, কিন্তু এখন আর সে প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে' সৃষ্টির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না; প্রাকৃতিক বিধানই তাহার মূল কারণ।

এক্ষণে আমরা দেখিব, 'উদ্ভিদই উদ্ভিজ্জগতের কারণ' কিরূপ? পৃথিবীর অতি শৈশবাবস্থায় একটীও উদ্ভিদ ছিল না; পৃথিবীতে বীজ উপ্ত হইবার স্থান ছিল না; পৃথিবীতে তখন মৃত্তিকারও আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু সেই প্রাচীনতম যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ কালের মধ্যে পৃথিবীময় কত প্রকারের গাছপালা জন্মিয়াছে, রাশি রাশি ভূমি দুর্গম অরণ্যে পূর্ণ হইয়াছে, রাশি রাশি ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর কত কোটী কোটী মণ শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, এবং সেই অপরিমেয় শস্যাদি দ্বারা কোটী কোটী নর নারী, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রতিপালিত হইতেছে! এ সকলের মূলে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র উদ্ভিদ! পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থায় ধরিত্রী-পৃষ্ঠে কেবল বারিধি ও প্রস্তরপিণ্ড বা পর্ব্বতরাশি ব্যতীত কিছুই ছিল না, ইহা যেন স্মরণ থাকে। কালের প্রভাববশে পিচ্ছিল প্রস্তরগাত্রে লোমকূপসদৃশ ক্ষুদ্র ছিদ্র, কোথাও বা ফাটল উৎপন্ন হয়। এই সুযোগে কোনও অজ্ঞাত মহাপুরুষ দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরাল হইতে শৈবালাদি প্রাথমিক উদ্ভিদের বীজ নিক্ষেপ করেন,—ইহারাই উদ্ভিদ-জগতের ভিত্তিস্বরূপ। এই সকল উদ্ভিদ ব্যষ্টিভাবে চক্ষুর অগোচর বস্তু হইলেও, সর্ব্বাধিক বুদ্ধিশীল, অপুষ্পক হইলেও জননশীলতায় অনুপমেয়। ইহারা আত্মদেহ বিভক্ত করিয়া বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অমোঘ শক্তি ধরে। ইহারা এক দিকে যেরূপ বুদ্ধিশীল, অন্য দিকে সেইরূপ স্বার্থান্ধ; সুতরাং ইহাদিগের পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ নিবন্ধন প্রস্তরগাত্রে বা ফাটলে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ হইতে থাকে। এক্ষণে উক্ত সমাবেশ-কলঙ্ক মৃত্তিকা বা মৃত্তিকান্তর বলিতে ক্ষতি কি? এইরূপে মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বতগাত্রে উচ্চতর উদ্ভিদের আসন সৃষ্ট হয়। ক্রমে তাহাতে উচ্চতর উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। অতঃপর ইহারাও জীবিতকালে স্ব স্ব অবয়বের পরিত্যক্ত অংশ—পত্র, ফল, ফুল, কন্দ, মূল প্রভৃতি দ্বারা সেই আসন সুস্তরতর করিয়া আরও অধিক ও উচ্চতর উদ্ভিদের স্থান করিয়া দেয়। এইরূপে মহারণ্যের সৃষ্টি হয়। ক্রমে বারিপাত-ফলে পাহাড় বিধৌত হইয়া প্রস্তরকণা সহ উদ্ভিজ্জাবশেষও নিম্ন দেশে নামিয়া ভূমির সৃষ্টি করে। সেই ভূমি এক্ষণে মানব জাতির মূলধন।

মানব জাতির সভ্যতামার্গে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান—কৃষিক্ষেত্র, এবং তাহারই পরিপুষ্টিতে মানব জাতির পরিপুষ্টি, জীবজন্তুমাত্রেরই পরিপুষ্টি। কৃষিক্ষেত্রের উর্ব্বরতা দোহন করিয়াই মানব জাতির সুখ-সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-বিলাস। সেই উদ্ভিদই স্বকীয় দেহপাত করিয়া ধরিত্রীর কলেবরকে উত্তরোত্তর

উদ্ভিজ্জপদার্থে পুষ্ট করিতেছে। ফলতঃ, ভূমি উর্ব্বর হইয়া উঠিতেছে। উদ্ভিজ্জ পদার্থই ক্ষেত্রের উৎপাদিকা-শক্তির মূল, উৎপাদিকার আধার। উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যেই উৎপাদিকা-শক্তি বা উর্ব্বরতা নিহিত থাকে। ক্ষেত্রস্থ কোনও উদ্ভিদ ক্ষীণ, নিস্তেজ, হীনপ্রভ হইলেই বুঝিতে হইবে, মাটীতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ কৃত্রিমতার দিন বলিয়া ক্ষেত্রের সারহীনতা দূর করিবার নিমিত্ত, কিংবা মাটীকে সমধিক বলবতী করিবার উদ্দেশ্যে ফস্ফরাস্, পটাশ, চুণ প্রভৃতি নিয়োজিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকা পূর্ণতা লাভ করে না। এ সকলের সহিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সম্মিলিত হইলে, তবেই তাহা মাটী নামে অভিহিত হইতে পারে।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, উদ্ভিজ্জ পদার্থ জিনিসটা কি? ভূগর্ভ ও বায়ুমণ্ডল হইতে উদ্ভিদ যে সকল পদার্থ আহরণ করিয়া জীবিত থাকে, এবং পরিবর্দ্ধিত হয়, তৎসমুদায়ই উদ্ভিদের কলেবর-গঠনে নিয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল পদার্থ উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিবামাত্রই রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, বিভিন্ন-সংযুক্ত-পদার্থে পরিণত হয়। কাজেই আমরা বুঝিতে পারি না যে, ভূমি ও বায়ুমণ্ডল—এতদুভয় স্থানের পদার্থনিচয় হইতে উদ্ভিদের অবয়ব গঠিত হইয়াছে। কোনও একটী জীবিত উদ্ভিদকে গৃহে আনিয়া যথানিয়মে বিশ্লেষণ করিলে, তন্মধ্যে যে সকল পদার্থ পাওয়া যায়, ভূমি ও বায়ুমণ্ডল হইতেও তৎসমুদায়ই পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হয় যে, উদ্ভিদ-শরীরে যে যে পদার্থ পাওয়া যায়, পুনরায় তাহা ধূলায় পরিণত হইয়া মৃত্তিকার কলেবর পরিপুষ্ট করে, এবং বাষ্পাংশ গগনমার্গে গিয়া আপনাপন মৌলিক পদার্থে বিশিষ্ট যায়। মৃত উদ্ভিদ বা তাহার পরিত্যক্তাংশ মৃত্তিকায় সংযোজিত হইলে ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হয়; কারণ, সেই উদ্ভিজ্জাংশ উদ্ভিদের আহরিত পদার্থ দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল, এবং কালক্রমে সেই সমুদয়ই বিগলিত হইয়া পরবর্ত্তী উদ্ভিদগণের আহার্য্যে পরিণত হয়। ইহাই হইল উদ্ভিদ দ্বারা উদ্ভিদ-পোষণ। উদ্ভিদ দ্বারা উদ্ভিদ পোষিত হয়, তাহার অন্য এক প্রমাণ এই যে, যে ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ আবাদ হয়, এবং ফসল স্থানান্তরিত হয়, সে ক্ষেত্র ক্রমে হীনশক্তি হইয়া পড়ে। এইরূপে যত অধিকবার আবাদ হয়, পরবর্ত্তী ফসল সকল তত শক্তিহীন হয়, ফসলের পরিমাণ ও গুণবত্তা তত হ্রাস পায়। অধিক কথায় কাজ কি, এক খণ্ড আবাদভূমি ও এক খণ্ড আবাদযোগ্য পতিত জমীর গাছের বৃদ্ধি ও শ্রী দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উভয় ভূমির উদ্ভিদের মধ্যে

কত প্রভেদ! পতিত জমীতে গাছ-পালা আপনই জন্মে, আপনই মরে, এবং তাহাদিগের অবয়ব সেইখানেই লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া, সে জমীর উদ্ভিজ্জ পদার্থ কেহই লইয়া যাইতে পারে না, ফলতঃ মাটীর বস্তু মাটীতেই থাকে, উপরন্তু বায়ু-মণ্ডল হইতে উদ্ভিদ যে সকল পদার্থ আহরণ করিয়াছিল, তাহারও কতকাংশ ধৃতাবস্থায় মাটীতে থাকিয়া যায়; এই নিমিত্ত অরণ্যসমূহ এত উর্ব্বরা কিন্তু আবাদী ভূমি সম্বন্ধে অন্য কথা। আবাদী ভূমিতে পুনঃ পুনঃ আবাদ হইতেছে, পরে সে ক্ষেত্র হইতে সমগ্র ফসল স্থানান্তরিত হইতেছে, এবং অনেক ফসলের উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ—পত্র কাণ্ড শিকড় পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইতেছে। এইরূপে ক্ষেত্রকে আমরা নিঃস্ব করিয়া ফেলি, এবং স্বার্থের অনুরোধে গৃহস্থালীর কতক-গুলি আবর্জ্জনা দ্বারা ভূমির সে ক্ষতি পূরণ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকি।

উদ্ভিদ দ্বারা মাটীর আরও একটীর উপকার সাধিত হইয়া থাকে। তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংযোজিত হইলে ভূমি অল্লাধিকপরিমাণে স্থিতিস্থাপকতা গুণ লাভ করে; তন্নিবন্ধন মাটীর কাঠিন্য ও দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া যায়, মাটীর মধ্যে সূর্য্যের উত্তাপ, বৃষ্টির জল, শিশির ও বাতাস প্রবিষ্ট হইবার সুবিধা হয়। অন্য দিকে সূর্য্যের আকর্ষণে ভূমির নিম্নস্তরের রস সর্ব্বদা উপরিভাগে উঠিতে থাকে, এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলে ভূমির রসাতি-শয্য কাটিয়া যায়, এবং ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিদও শিকড়ের নিকটেই রসের যোগান পায়।

আবার, অনেক উদ্ভিদ স্বকীয় মূলদেশে র‍্যাডিসিকোলা নামক জীবাণুদিগকে আশ্রয় দান করিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান (nitrogen) আহরণের সুবিধা করিয়া দেয়। নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া উদ্ভিদগণ বৃদ্ধিশীল হয়। নাইট্রোজেন-সংস্পর্শে মৃত্তিকাস্থিত অজৈব (inorganic) পদার্থ-রাশি বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইবার যোগ্য হয়। এই জন্য উদ্ভিদ জীবনের পক্ষে নাইট্রোজেন বাষ্প বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে সকল উদ্ভিদের সে শক্তি আছে, তাহারা মাষিক-বর্গীয় (Leguminoseæ)। অড়হর, মুগ, মটর প্রভৃতি ডাল কড়াই, ধঞ্চে, নীল ও বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই বর্গীয় সকল উদ্ভিদই সুঁটীধারী। ইহারা উপরিলিখিত উপায়ে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া পরবর্ত্তী উদ্ভিদগণের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

আর্য্য ও ইব্রীয় নিবাসের জীবতত্ত্ব।

ম্যাক্সমূলর মহোদয় ভাষার উচ্চারণগত উপমা দ্বারা সংস্কৃত সহ গ্রীক লাটিন ইত্যাদি ভাষার অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য Cock ও কুক্কুট শব্দ লইয়া অনেক আলোচনা (Science of Language I—348) করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে প্রসঙ্গক্রমে বা উপমা-স্থলে নানা-জাতীয় পশু পক্ষীর নামের উল্লেখ থাকিলেও কুক্কুটের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। পরবর্ত্তী কালে রচিত ঋগ্বেদ অপেক্ষা অপ্রাচীন শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা (১।১৬ বণ্ডিকা), শতপথ ব্রাহ্মণ (১।১।৪।১৮), বাজসনেয়ি-সংহিতা (১। ১৬।১) এবং রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে (১৩।৪) কুক্কুটের নাম ও প্রসঙ্গ আছে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় কুক্কুট 'মধুরিহ্ব' নামে পরিচিত। উক্ত সংহিতার ভাষ্যকার উবট ও মহীধর নিজ নিজ ভাষ্যে কুক্কুটের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কুক্কুট।

প্রাচীন পারসীকদের ধর্ম্মশাস্ত্র আবেস্তার বেন্দিদাদ ভাগের ১৮শ ফর্গার্দের ৩৫ ও ৫২ পদে কুক্কুটের নাম দৃষ্ট হয়। কুক্কুট জেন্দভাষায় *Parodars*, ভিন্ন-জাতীয় মন্দ-ভাষাভাষী (অবশ্য পারসীকদের মতে) লোকগণের নিকট 'কাহরকাতস্' ও লৌকিক সংস্কৃতে 'কুকবাক' নামে পরিচিত। কুক্কুট উচ্চৈবাক্ দ্বারা সুপ্ত-মনুষ্যকে ঊষার পূর্ব্বে উপাসনার জন্য জাগরিত করিয়া দেয়, এ জন্য পারসীকদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার আহার নিষিদ্ধ (Vendidad 18/35—37, 52—54) হইয়াছে। আর্য্য জাতির ভক্ষণ-নিষেধের কারণ অবগত নহি। ইরাণীর চক্ষে কুক্কুট পবিত্র ও পূজ্য। হোমরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন গ্রীক পদ্য-সাহিত্যে কুক্কুটের উল্লেখ নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত গ্রীক সাহিত্যে কুক্কুটের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সিজার প্রথম শতাব্দীতে বৃটনে কুক্কুট দেখিয়াছিলেন (The Animals of the Bible)।

কেহ বলেন,—প্রাচীন পারসীক জাতি, এবং কেহ কেহ বলেন, রাজর্ষি সলোমন কর্ত্তৃক কুক্কুট পক্ষী পারস্য প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সিরিয়াতে নীত হয়। আবেস্তার রচনাকাল ও সলোমনের রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব সহস্র বৎসর। সলোমনের রাজত্বকালে ইরাণীগণ প্রাচীন বাবিলের পূর্ব্ব দিকে বাস করিত। ইরাণীদের আবেস্তা সে দেশে যে সময়ে রচিত, ঠিক সেই দেশে সেই সময়ে

আর্য্য জাতির প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদ রচিত হয় নাই, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

বাইবেল-বর্ণিত (2 Kings 17—30) 'নার্গেল' নামক দেবতা কুক্কুটাকারে পূজিত হইত। এই নার্গেল-পূজা প্রাচীন কুথীয়ান জাতি দ্বারা সিরিয়াতে প্রবর্ত্তিত হয়। এই কুথীয়ান জাতি আসিরিয়ার রাজাদের দ্বারা সমরিয়া দেশে, এবং তৎপরিবর্ত্তে সমরিয়াবাসী ইহুদী (ইব্রীয়) জাতি মিডিয়া অর্থাৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৮ম পঞ্চিকা ৩৮ অধ্যায়) 'শল্য' নামক দেশে নির্ব্বাসিত হয়। খ্রীষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক Josephus বলেন,—সম্ভবতঃ এই কুথীয়ান জাতি প্রাচীন পারসীকদের কোনও শাখা, কিংবা তাহাদের প্রতিবেশী জাতি। পরলোকগত লেয়ার্ড মহোদয়ও ইহার সমর্থন (Nineveh and its Remains, 2—538) করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতের কুষাণ-মুদ্রায় কুক্কুটের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। আর্য্যদের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদের ন্যায় হিব্রু ভাষায় রচিত 'Old Testament'এ কুক্কুটের নাম বা কোনও প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে মনে হয়, প্রাচীন কালে ঋগ্বেদ ও হিব্রু বাইবেলের জন্মভূমিতে কুক্কুট পক্ষী ছিল না। প্রাচীন আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির নিকট কুক্কুটের নাম অজ্ঞাত ছিল। কুক্কুটের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ, আভা, এবং মালাক্কা দ্বীপ। পরবর্ত্তী কালে গ্রীক ভাষায় রচিত বাইবেলের নূতন গ্রন্থের (New Testment) মধ্যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত, অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম St. Markএর পুস্তকে কুক্কুটের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কোকিল।

যে কোকিল পক্ষী লইয়া কবিগণের এত উপমা-সৃষ্টি, সেই কোকিল পক্ষীর নাম ঋগ্বেদে নাই। ঋগ্বেদ অপেক্ষা অপ্রাচীন শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় (২৪।৭৭, ৩৯ কণ্ডিকা) 'অন্যবাপ' ও 'পিক' শব্দ আছে। ভাষ্যকার উবট ও মহীধর 'অন্যবাপ' শব্দের অর্থ কোকিল করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৭।১০৪।২ ঋকে যে 'কোক' শব্দ আছে, তাহার অর্থে নিশাচর-পক্ষী বুঝায়। ইহারা 'যাতুধান' নামক অসুরীয় অনিষ্টকারী evil-spirit-রূপে রাত্রে আর্য্যগণের অপকার করিত। "উলূকযাতুং শুশুলূকযাতুং জহি শ্বযাতুমুত কোকযাতুম্।" মিঠার গ্রিফিথ এই 'কোক' শব্দের অনুবাদে *Chacco*, এবং মিঠার দত্ত 'চক্রবাক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ঋকে যাতুধান-রূপী হিংস্রক পশুপক্ষিগণ যে নিশাচর, ঋক-পাঠে ইহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু কোকিল ও চক্রবাক নিশাচর-পক্ষী নহে। অধিকন্তু ইহারা দিনে কিংবা রাত্রে

লোকালয়েও আসে না। পেচক নিশাচর-পক্ষী। যে জাতীয় পেচক উৎসন্ন স্থানে বাস করে, হিব্রুতে তাহা 'কোশ' নামে (Psalms 102—6) পরিচিত। ইহার সহিত 'কোক' শব্দের সাদৃশ্য আছে। ইংরাজি ভাষায় অনূদিত বাইবেলের Authorised Versionএর যে যে স্থানে (Levi 11—16 Deut 14—15) cuckoo শব্দ আছে, মূল হিব্রু শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া Revised Version সংস্করণে তাহার অনুবাদ Sea mew, Sea gull, বা গাংচিল করা হইয়াছে। মনে হয়, প্রাচীন আর্য্য ও ইব্রীয় নিবাস পিক বা গরুভূতের রবে মুখরিত হইত না।

কপি।

প্রথম হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত ঋগ্বেদে নানা-জাতীয় জীব জন্তুর নামের উল্লেখ থাকিলেও, কপি কি বানরের নাম দেখা যায় না। ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অংশ দশম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তে বৃষাকপি ও কপি, এবং অপ্রাচীন শুক্ল যজুর্ব্বেদে (২৪।৩০ কণ্ডিকা) 'মর্কট' শব্দ আছে। বৈদিক পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের এই সূক্তকে ও শুক্ল যজুর্ব্বেদকে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলেন। কপির নাম হিব্রুভাষায় কোফেস। বাইবেলে বর্ণিত 'কোফেস' (কপি) তৎকালে ওফির নামক দেশ হইতে (1 Kings 10—22, 2 Chron 9—21) কানান-ভূমিতে আমদানী হইত। ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলেন,—কপি ও কোফেস, উভয় শব্দই তামিল-ভাষামূলক। কেহ এই ওফির দেশকে দক্ষিণ-ভারতের সহিত অভিন্ন মনে করেন (Science of Language 190)। কিন্তু বাইবেল-বর্ণিত এই ওফির দেশ নানা প্রমাণ দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় তারিখের 'সঞ্জীবনী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সমর্থিত হয়। ঋগ্বেদের ১০।৮৬।১৩ ঋকের "বৃষাকপায়ি রেবতি..... " ইত্যাদি ঋক-বচনের 'বৃষাকপায়ী' শব্দের ব্যাখ্যায় নিরুক্ত-কার (১২।১০) 'বৃষাকপায়ী বৃষাকপেঃ পত্ন্যোষৈবাভিসৃষ্টকর্ম্মতনা' অর্থ, এবং দুর্গাচার্য্য তাহার টীকায় বৃষাকপি অর্থে 'আদিত্য, সূর্য্য' ও বৃষাকপায়ী অর্থে 'উষা, সূর্য্যা' করিয়াছেন।

কুকুর।

গ্রীক-চক্ষে কুক্কুর পবিত্র। হোমরের বর্ণনায় কুক্কুর উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। আর্য্যদের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্রে কুক্কুর অশুচি ও অপবিত্র-রূপে চিত্রিত। ঋগ্বেদের ১।১৮২।৪ ঋকে (১) আর্য্য-শত্রু পরজাতীয়দিগকে হেয়-রূপে চিত্রিত করিবার জন্য তাহাদিগকে কুক্কুরের সহিত তুলনা

(১) অন্যব্রতমভিহ্রুতঃ পুনো হতং মুখো বিদথুষ্টাতরিনা।

করিয়া অশ্বিদ্বয়ের নিকট তাহাদের বিনাশকামনা করা হইয়াছে। ৯।১০১।১ ও ১৩ ঋকে (১) দেখা যায়, আর্য্যগণ যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগকে কুকুরের ন্যায় অশুচি বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ৭।১০৪।২২ ঋকে দেখা যায়, (২) কুকুর অশরীরী যাতুধান-রূপে রাত্রিকালে আর্য্যদের অপকার করিয়া বেড়াইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৩) কুকুর অপবিত্র-জীব-রূপে পরিচিত।

ঋগ্বেদের ২।৩৯।৪ ঋকে (৪) দেখা যায়, কুকুর মনুষ্যের শরীরের ও গৃহের রক্ষক। ঋগ্বেদের ৭।৫৫।৩ ঋকের "স্তেনং রায় সারমেয় তস্করং বা পুনঃসর" দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, সারমেয় রাত্রে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ঐ সূক্তের ৪র্থ ঋকের "ত্বং শূকরস্য দর্দৃহি তব দর্দতু শূকরঃ" দ্বারা জানা যায়, কুকুর বন্য শূকরের উপদ্রব হইতে শস্যক্ষেত্র-রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইত।

ঋগ্বেদের ৭।৫৫ সূক্তে ও রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে (৭০।১০) কুকুর গৃহের ও পশুর রক্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে অর্থাৎ ১০।১৪।১০-১২ ঋকে, এবং ইরাণীদের আবেস্তার বেন্দিদাদ ভাগের ৮ম ফর্গাদের ৪৭—৬৮ পদে চারি-চক্ষু-বিশিষ্ট কুকুর যমদূত-রূপে চিত্রিত। কুকুর ইরাণীদের গৃহের ও পশুপালের রক্ষক-(Vendidad, 13 Fargard)-রূপে বর্ণিত দেখা যায়। প্রাচীন ইব্রীয় জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেও কুকুর অপবিত্র ও অশুচি (Exodus 22—31, Dent 23—18)। অধিকন্তু কুকুর বিক্রয়ের মূল্য পর্য্যন্ত অপবিত্র। Job, 30—1 ও Isaiah 56—11 পদে কুকুর পশুপাল-রক্ষক-রূপে বর্ণিত। আর্য্যগণ যেমন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কুক্কুর বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তেমনই প্রাচীন ইব্রীয় জাতিও পরজাতীয় লোকমাত্রকে কুক্কুরের সহিত তুলনা করিয়া ঘৃণা (1 Samuel 17—43, 2 Kings 8—13, Psalms 22—16, 59—6) করিতেন। প্রাচীন ইহুদী জাতিও কুক্কুরের দৃষ্টি অপকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

মুসলমানদের নিকটও কুকুর অশুচি ও অপবিত্র। হজরত মোহাম্মদ কুক্কুর দ্বারা পশুরক্ষণ-কার্য্য ব্যতীত কুক্কুর-পালন নিষেধ করিয়াছেন। কৃষ্ণবর্ণ কুকুর শয়তান-তুল্য। ইহার দৃষ্টি মনুষ্যের অত্যন্ত অপকারী

(১) অপস্থানং প্রবিষ্টেন সবাহো দীর্ঘজিহ্বেন।—১ম ঋক।
অপস্থানম অরাধসং হতা মৃধং ন ভৃগবঃ। ১৩ ঋক।

(২) উলূকযাতুং শুশুলূকযাতুং জহি শ্বযাতুমুত কোকযাতুম্।

(৩) গার্হপত্যাহবনীয়ো যৎতরেণা নো বা রথো বা যাযা প্রতিপদ্যেত বা তত্র প্রায়শ্চিত্তি-রিতি.....৭ম পঞ্চিকা, ২য় অধ্যায়।

(৪) যানেব নো অরিষণ্যা তনূনাং খগলেষ বিশ্বসঃ পাতমস্মান্।

বলিয়া হরিদ্র সরিকে বর্ণিত হইয়াছে (মেস্যাত সরিক; সাবময়-পবন)। আরবী ও হিব্রুতে কুকুর শব্দের প্রতিশব্দ কালব্।

ঋগ্বেদে গর্দ্দভ হেয় ও অপবিত্র জীব নহে। বরং ইহা দেবতাদের বাহন। ঋগ্বেদের ১।৩৪।৯, ১।১১৬।২, ১।১৬২।২১, ৮।৮৫।৭ ঋকে রাসভ অশ্বিদ্বয়ের রথের বাহন। ৩।৫৩।৫ ঋকে গর্দ্দভ ইন্দ্রের বাহন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে প্রাচীন কালে লোকে গর্দ্দভারোহণে অভ্যস্ত ছিল। ভারতবর্ষের ন্যায় বৈদিক ভূমিতে গর্দ্দভারোহণ অসম্মানকর ছিল না, বরং দেববাহনরূপে কল্পিত হওয়ায়, গর্দ্দভারোহণ সম্মানকর ছিল, এমন বুঝা যায়। ৮।৫৬।৩ ঋকে শত-গর্দ্দভ-দানের প্রসঙ্গ দ্বারা প্রাচীন আর্য্যনিবাসে গর্দ্দভ-সুলভতা প্রমাণিত হয়। প্রাচীন পারসীক জাতির নিকটও গর্দ্দভ পবিত্র জন্তু (Yacna 41—2)। পৃথিবীর মধ্যে তাতার দেশে অশ্ব, আরব দেশে উষ্ট্র ও সিরিয়া ভূমিতে গর্দ্দভ অধিবাসীদের সাধারণ বাহন (Isaiah 21—7)।

গর্দ্দভ।

মহাপুরুষ আব্রাহাম (Genesis 22—3) ও মহাত্মা যিশুখৃষ্ট সর্ব্বদা গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন। বাইবেলের Genesis 49—11, Numbers 22—22 ইত্যাদি বহু পদে গর্দ্দভ ইব্রীয় জাতির সাধারণ বাহন রূপে পরিচিত। Isaiah 21—7 পদে দেখা যায়, গর্দ্দভ ইব্রীয় জাতির রথের বাহনও ছিল। সিরিয়া ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোনও দেশের লোক সাধারণতঃ গর্দ্দভারোহী নহে। পালেষ্টাইনের গর্দ্দভ পৃথিবীর মধ্যে সুশ্রী। প্রাচীন আসিরিয়া দেশে বন্য গর্দ্দভ ছিল। গরের হিব্রু নাম খামর।

আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির গো-পুষ্পা-প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব না। পৃথিবীর মধ্যে এই ভারতবর্ষই একমাত্র গো-প্রধান দেশ, ইহা মনে করা ভুল। প্রাচীন সিরিয়া ভূমির অন্তর্গত বাশন দেশ প্রাচীন কালে গরুর জন্য বিখ্যাত (Dent 32—14, Psalms 22—12) ছিল। বাইবেলে যত অধিক-পরিমাণে গরুর প্রসঙ্গ আছে, উষ্ট্রের প্রসঙ্গ তাহার তুলনায় অত্যল্পমাত্র। বাইবেলের Kings 8—63, 2 Chron 7—5, 29—33 পদে রাজর্ষি সলোমনের বাইশ সহস্র গো-বলির বৃত্তান্ত আছে।

গো।

প্রাচীন আর্য্যনিবাসেও গো সুলভ ছিল। ঋগ্বেদের ৮।৫।৩৭ ঋকে দশ সহস্র গো-দান ও ৮।৬।২২ ঋকে দশ সহস্র গো-লাভের বিবরণ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের

কোনও কোনও দেবতাকে 'বৃষ' নামে ও বিশেষণে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রাচীন আক্কাদ ও সিনিয়র (মেসপটামিয়া) প্রদেশবাসিগণও কোনও দেবতা-বিশেষকে Bull god নামে সম্বোধন (Hibbert Lectures by Prof. Sayce, 289) করিত।

বৈদিক ভাষায় বৃষের অপর নাম 'উক্ষণ'। সেমিটিক ভাষাতেও বৃষের নাম 'উক্ষণ' (Hibbert Lectures by Prof. Sayce, 456)। যে প্রকার আর্য্যদের দ্বিতীয় মাসের নাম 'বৃষ', তদ্রূপ ইব্রীয় জাতিরও দ্বিতীয় মাসের নাম 'ইয়ার' (Kings 6—38)। উভয় নামের অর্থ, সেচনকারী। গরুর অপর নাম হিক ও আরবীতে বকর। বাঙ্গালা ভাষায় 'গরু' নামে (Levi 22—28) পরিচিত।

ঋগ্বেদের 'অহি' ও 'অহিশুব' (৮।৩২।২৮ ঋক), আবেস্তার (Vendidad 18—45) 'অজিহ', এবং হিব্রু বাইবেলের (Psalms 140—3) 'অফশুব' অভিন্ন। যে জাতীয় ফণাধারী বিষধর সর্প আমাদের নিকট [illegible] সর্প। 'ফণী' নামে পরিচিত, ইহাদের হিব্রু নাম (Deut 32—33) 'কেফেস'। যেমন বিষদন্তধারীই আমাদের নিকট 'সর্প' নামে পরিচিত, তদ্রূপ হিব্রু বাইবেলে সর্প-শ্রেণীর বিষদন্তের সাধারণ নাম 'সিফোন' ও 'সরাফ'। আবেস্তায় ইহারা 'ফ্রযায়' (Yacna 9—34) নামে পরিচিত।

ঋগ্বেদ (১।৩২।৩ ঋক) ও আবেস্তায় (Vendidad 1—8; Yacna 9—62) অহি ও বৃত্র অভিন্ন। নির্ঘণ্টুতেও (১।১০) অহি ও বৃত্র এক-পর্য্যায়-ভুক্ত। অহি ও বৃত্র প্রাচীন আর্য্য ও ইরাণী জাতির চিরশত্রু ও আহতা-কাঙ্ক্ষী। ঋগ্বেদ ও আবেস্তার 'অহি' ও 'বৃত্র' দেবতা ও অসুরের প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে কল্পিত। ইহারা সর্ব্বত্র Evil Spirit রূপে পরিচিত।

বাইবেলেরও সর্ব্বত্র 'অহি' ও 'শয়তান' অভিন্ন। প্রথম মনুষ্য আদম হইতেই সর্প দৈবত ও মনুষ্যের প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে পরিচিত। এই সর্পের প্ররোচনায় ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আদমের স্বর্গ-চ্যুতি ঘটিয়াছিল; তখন হইতে অহি মনুষ্যের শত্রু (Genesis 3—15)।

অহি ও বৃত্র পূর্ব্বে দেব-পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল। ঋগ্বেদের ২।২।৪, ১৩২।১২ ঋক ও কৌতরেয় ব্রাহ্মণের ৩য় পঞ্চিকায় তাহার আভাস ও ইঙ্গিত আছে। ইব্রীয় জাতির সর্প ও শয়তান যে পূর্ব্বে দেবতা বা *Angel*দের অন্তর্গত ছিল, তাহা সুস্পষ্ট New Testamentএর অন্তর্গত 2 Peter 2—4,

Luke 10—18 পদে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঋগ্বেদের অপ্রাচীন অংশের ১০।১১৩।৭ ঋকে ও ব্রাহ্মণভাগে এবং আবেস্তার Yacna 9—23 পদে স্বর্গে দেবাসুরের যুদ্ধের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ New Testmentএর Revelation 12 Chapterএ স্বর্গে দিয়াবল (শয়তান) সহ স্বর্গীয় দূত যীশুখ্রীষ্টের যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন কাল্ডিয় জাতিরও এই বিশ্বাস ছিল (Mononment Fact and Higher Critical Fancies 106)।

ঋগ্বেদে বৃত্র ও অহি জল-অবরোধক-রূপে (১।৩২ ও ৩৩ সূক্ত) পরিচিত। বাইবেলেও (Revelation 12—16) দিয়াবল (শয়তান) নদী-স্রোতের অবরোধকারি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাতালবাসী সর্প সংস্কৃতে 'নাগ' ও হিব্রুতে 'নাক' নামে পরিচিত। ইন্দ্র-শত্রু এই বৃত্র বা পিশাচ পিণঙ্গবর্ণ (১।৩৩।৫ ঋক) ও ইব্রীয় জাতির দেব-শত্রু দিয়াবল বা নাগবর্ণ (Revelation 12—3) রূপে বর্ণিত হইয়াছে। গর্ব্বিত বৃত্র ঋগ্বেদের ২।১২।১২ ঋকে 'রৌহিণ' এবং দাম্ভিক নাগ বাইবেলে (Isaiah 51—9) 'রহব' নামে পরিচিত। আর্য্য জাতির সর্ব্বগুণসমন্বিত দেবতা ইন্দ্র যে প্রকার গর্ব্বিত 'রৌহিণ'কে (২।১২।১২ ঋক) তদ্রূপ সর্ব্বগুণসমন্বিত যিহোবা দাম্ভিক 'রহব'কে (Isaiah 51—9) বিনাশ করিয়াছিলেন। যে প্রকার সমুদ্র-গামী মহানাগ বা শয়তান যিহোবা কর্ত্তৃক (Isaiah 27—1) খড়্গ দ্বারা হত হইয়াছিল, তদ্রূপ "তং চিদিধা কতপয়ং যায়ানমহর্যে তমসি বাবৃধানম্ তং চিন্নদানো বৃষভঃ সুতস্যোচ্চৈরিন্দ্র অপসূর্যা জঘান", যে বৃত্র অন্ধকারে শিশিরসম্ভোগপূর্ব্বক জলমধ্যে শয়ন করিয়া প্রগাঢ় অন্ধকারে উল্লসিত ছিল, অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সোমরস-পানে হৃষ্ট হইয়া বজ্র উত্তোলন করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন (৫।৩২।৬ ঋক)।

সর্প-বৈরের মন্ত্রপাঠে সর্প বিষ নষ্ট হয় (ঋগ্বেদ ৭।৫০ সূক্ত, Psalms 58—5, Ecclesiastes 10—11, Jeremiah 8—17) অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির এমন বিশ্বাস আছে। নাগ-পূজা অতি প্রাচীন (Numbers 21—8, 2 Kings 18—4)। অগস্ত্যের অভিশাপে নহুষ সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা পৌরাণিক কথা। নহুষ অর্থ সর্পবিশেষ। ইব্রীয় জাতি যে ধাতুময় সর্প প্রস্তুত করিয়া পূজা করিত, তাহার নাম 'নহুষ্টন' (2 Kings 18—4) ছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব কোনও কোনও গ্রীক মুদ্রায় পেলকেয় প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

গৃধ্রদের নিকট পেচক জ্ঞানদাতা। ইহা নির্ঋতি দেবীর বাহন। প্রাচীন আর্য্য জাতি পেচকের রব ও দৃষ্টি অপকারী ও অমঙ্গলজনক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ঋগ্বেদের ৭।১০৪।১৭, ২২ ঋকে দেখা যায়, যাতুধান নামক রাক্ষসগণ উলূক-রূপে রাত্রে আর্য্যদের অপকার করিত। 'কোক' নামক পেচক জাতীয় এক প্রকার নিশাচর পক্ষী (৭।১০৪।২২ ঋক) যাতুধানগণের বাহন, প্রাচীন আর্য্যগণ এমন বিশ্বাস করিতেন। ইহার সহিত ইব্রীয় ভূমির উৎসন্ন স্থানে বাসকারী কোশ-জাতীয় পেচকের তুলনা করিতে পারি (Psalms 102—6)। ঋগ্বেদের ১০।৬৫।৪ ঋকে পেচক যম-দূত-রূপে চিত্রিত। ইব্রীয়-চক্ষে পেচক অপবিত্র (Leviticus—16)। পেচকের দৃষ্টি ও রব ইব্রীয় জাতির নিকট অমঙ্গলজনক (Psalms 102—6, Isaiah 34—14)। জনশূন্য অর্থাৎ পেচকের বাসভূমি হইবে, এই উপমা ইব্রীয় জাতির মধ্যেও প্রচলিত (Isaiah 34—11) ছিল।

উলূক।

ঋগ্বেদে Tiger শব্দের প্রতিশব্দ, অথবা ব্যাঘ্র কি শার্দ্দূল শব্দ নাই। এমন কি, চিতাবাঘের নাম বা প্রসঙ্গও দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদে যে 'বৃক' শব্দ আছে, তাহার অর্থ হিংসক, অনিষ্টকারী জন্তুর। অশরীরী যাতুধানগণ পর্য্যন্ত বৃকের (৩।৫১।৬ ঋক) পর্য্যায়ভুক্ত। আধুনিক অভিধানে বৃক অর্থে নেকড়ে বাঘ গৃহীত হইয়া থাকিলেও, প্রাচীন নির্ঘণ্টু (৩।২৪) নিরুক্ত ইত্যাদি কোষ গ্রন্থে বৃক অর্থে বলবান, অসুর, ইত্যাদি। বাইবেলেও Tiger শব্দের কোনও হিব্রু প্রতিশব্দ নাই। খৃষ্টিয়ান বাইবেলের অপ্রাচীন অংশে অর্থাৎ Psalms ও Isaiah প্রভৃতি পুস্তকে যে 'নিমার' শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ চিতা ও কেন্দুয়া বাঘ। এই *Nemar* শব্দের অর্থ Tiger নহে। ঋগ্বেদ ও বাইবেলের বহু ঋকে ও পদে উপমাস্থলে কিংবা বর্ণনায় সিংহ, ভল্লুক, বরাহ, এমন কি বৃষের পরাক্রমের বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শার্দ্দূলের কোনও প্রসঙ্গ নাই। ঋগ্বেদের ১।১০৫।৭, ১৮ ঋকে বৃক অর্থে চক্র, এবং ৮।২২।৬ ঋকে লাঙ্গল। অপ্রাচীন শুক্ল যজুর্ব্বেদে (২৪।৩৩ কণ্ডিকা) যে 'শার্দূলো বৃকঃ' শব্দ আছে, ভাষ্যকার উবট ও মহীধর তাহার অর্থ 'শার্দূলো ব্যাঘ্রঃ বৃকঃ' করিয়াছেন।

বৃক ও ব্যাঘ্র।

ঋগ্বেদে শ্যেনের আসন অতি উচ্চ। আর্য্যদের শ্যেন পূজ্য। ঋগ্বেদের ৯।৯৬।৬ ঋকে শ্যেন গৃধ্র-জাতীয় ও ৪।৩৮।৫, ৬।৬৩।১৩ ঋকে মাংসাশী, এবং ৪।২৭ সূক্তে দ্রুতগামি-রূপে পরিচিত। শ্যেনের বাসস্থান অদ্রি বা পর্ব্বতের উপর উচ্চ

শ্যেন। বৃক্ষে। এই শ্যেন আমাদের নিকট উৎক্রোশ বা কুরর পক্ষী বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। এই কুরর পক্ষী উচ্চ বৃক্ষে বাস করে, এবং মাংসাশী। কখনও কখনও এই কুরর ছোঁ মারিয়া মধুর চাক লইয়া যায়। এই কুরর বা উৎক্রোশ মধু পান করিতে ভালবাসে।

এই শ্যেন বা কুরর পক্ষী প্রাচীন ইব্রীয় জাতির নিকট সম্মানিত ছিল। শ্যেন প্রাচীন আসিরিয়াস, ইব্রীয় ও আরব জাতির পূজ্য ছিল। হিব্রু ও আরবীতে শ্যেন 'নিশর্' নামে পরিচিত। 'আসিরীয়ার রাজা সনহেরিব 'নিশরক' নামক দেবতার মন্দিরে পুত্রের হস্তে নিহত হয়েন (2 Kings 19—37)। হজরত মোহম্মদের পূর্ব্বে আরববাসিগণ 'নশর' নামে এই নিশরের পূজা (কোরাণ সরিফ সুরা নুহ্ ২৩ আয়েত) করিত। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি বিশ্বাস করিতেন, শ্যেন বা নিশর গত যৌবন 'ফিরিয়া পায়, (Psalms 103—5)। শ্যেনের ন্যায় 'নিশর' পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে বৃক্ষের উপর বাস করে (Job 39—27, Jeremiah 49—16)। নিশর দ্রুতগামী পক্ষী (Dent 28—49)। বৈদিক শ্যেন যে প্রকার সুপর্ণ ও পক্ষে শক্তি ধারণ করে, তদ্রূপ নিশরের পক্ষও খুব শক্তিশালী (Dent 32—11)।

মোয়ার পূর্ব্বেও এই নিশর পূজ্য ছিল। প্রাচীন পারসীক জাতির নিকট এই শ্যেন 'শায়না' নামে পরিচিত (Farvardin Yasht 97, Bahram Yasht 41)। 'শায়না' প্রাচীন পারসীক জাতির সম্মানাস্পদ। প্রাচীন আসিরিয়ানগণ শ্যেনকে 'শুরদু' নামে অভিহিত করিতেন (Hibbert Lectures by Prof. Sayce, 227)।

ঋগ্বেদের ১।৫০।১২ ঋকের 'শুকেষু মে হরিমাণং রোপণা কাসু দধ্মসি। অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি'র হারিদ্রব শব্দের অর্থ দত্ত মহোদয় রেদভাষ্য সায়নাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া 'হরিতালবৃক্ষ' এবং মিষ্টার গ্রিফিথ মহোদয় তাঁহার ঋগ্বেদের অনুবাদে 'হরিতাল বৃক্ষ' করিয়াছেন। গ্রিফিথ মহোদয় তাঁহার অনুবাদের টীকায় বলেন, হরিতাল নামে কোনও প্রকার বৃক্ষ নাই। প্রফেসর রথ ও বোথলিঙ্ক মহোদয়দ্বয়ের কৃত বিখ্যাত বৈদিক অভিধানের অনুসরণ করিয়া বলেন, সম্ভবতঃ ইহা কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় পীতবর্ণ পক্ষী। ঋগ্বেদের অন্যত্র (৮।৩৫।৭ ঋক) যে 'হারিদ্রবের পতথো বনে তুপ.....' ঋক আছে, তাহাতে জানা যায়, 'হারিদ্রবের' অর্থ বৃক্ষ নহে। 'হারিদ্রবের' কথা থাকায় দুইটি হারিদ্রব পক্ষীর কথা জানা যাইতেছে।

হারিদ্রব ও হোপহোদ।

যাহাই হউক, প্রাচীন আর্য্যগণ শুক ও হারিদ্রব নামক কোনও পক্ষিবিশেষে শরীরের রোগ প্রক্ষিপ্ত করা যায়, এই প্রকার বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন পারসীক জাতিরও হোমা নামক পক্ষীর সম্বন্ধে এই প্রকার একটা ধারণা ছিল। হোমা পক্ষীর ছায়াস্পর্শে রোগনাশ ও উচ্চপদ-লাভ হয়, প্রাচীন পারসাক জাতি বিশ্বাস করিতেন (Farvardin Yasht 139)।

প্রাচীন আরব ও ইব্রীয় জাতির 'হোদহোদ' নামক পক্ষীর সম্বন্ধেও এই প্রকার ধারণা ছিল। এই 'হোদহোদ' পক্ষী তাহাদের নিকট 'চিকিৎসক-পক্ষী' বলিয়া পরিচিত। এই 'হোদহোদ' পক্ষী সাধারণতঃ চক্রবাকের ন্যায় যুগ্মরূপে উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা সাধারণতঃ বালুকাময় স্থানে ও মরুভূমিতে বাস করিতে ভালবাসে।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪২ ও ৪৩ সূক্তের দেবতা কপিঞ্জল। কিন্তু সূক্তের মধ্যে কপিঞ্জল শব্দ নাই। শকুন শব্দ আছে। শকুনের অর্থ পক্ষী। এ দেশে এখনও অনেকের বিশ্বাস, বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় নিশাচর পক্ষী রাত্রিকালে গৃহস্থ-বাড়ীর নিকট ডাকিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, এবং তস্কর আসে। ইহা উলূকজাতীয় ও সর্পভুক্। নিরুক্ত (৩।১৯) ও নির্ঘণ্টু (৩।১৩)তে কপিঞ্জল শব্দের "কপিবির্ব জীর্ণ রূপিরিব ঋবত ঈষৎ-পিঙ্গলো বা গমনীয়ং শব্দং গিরতীতি বা" ব্যাখ্যা ও অন্যত্র (নিরুক্ত ৯।৩) শকুনি অর্থ আছে। ১।১৯১।১১ ঋকে শকুন্তিকা নামক পক্ষীর নাম দেখা যায়। এই শকুন্তিকা সর্প-শত্রু ও সর্পবিষ-হরণকারী। নকুল ও নকুল (নেউল) (১।১৯১।১৪ ঋক) যেমন সর্পবিষ-হরণকারী, অথচ সর্প-ভুক, তদ্রূপ এই শকুন্তিকা পক্ষীও সর্পভুক। ঋগ্বেদের ২।৪২।৩ ঋক "অবক্রন্দ দক্ষিণতো গৃহাণাং সুমঙ্গলো ভদ্রবাদী শকুন্তে। মা নঃ স্তেন ঈশত মাঘশংসো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥" দ্বারা জানা যায়, কপিঞ্জলের রব অমঙ্গলজনক। অতএব কপিঞ্জল (শকুন) যাহাতে গৃহের দক্ষিণ দিকে সুমঙ্গলসূচক ভদ্রবাদী ক্রন্দন করে, এবং তস্কর না আইসে, তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তস্করের কথা থাকায় জানা যাইতেছে যে, ইহারা উলূকজাতীয় নিশাচর পক্ষী।

কপিঞ্জল।

ইহার সঙ্গে ইব্রীয় দেশের পেচক-জাতীয় নিশাচর সর্পভুক 'কিপোদ' [illegible] (Isaiah xxxiv) পক্ষীর অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই 'কিপোদ'

পক্ষী যে স্থানে ডাকে, এবং বাস করে, তাহা শীঘ্রই জন-শূন্য হয়, প্রাচীন ইব্রীয় জাতি এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। কপিঞ্জলের স্বর কর্কশ তুল্য, ইহা ঋগ্বেদের ২।৪৩।৩ ঋক "যদুৎপতন্নসি কর্করির্যথা ..... " দ্বারা বোধ হইতেছে। এ জন্য ঐ ঋকে কপিঞ্জলের নিকট "শকুনে ভদ্রমা বদ তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিং চিকিদ্ধিনঃ" এই ভাবে প্রার্থনা করা হইতেছে।

ইব্রীয় দেশের 'কিপোদ' পক্ষীর স্বরও কর্কশতুল্য, অথচ গুরুগম্ভীর।

ঋগ্বেদের ১।৩০।৪ ঋকের 'কপোত' কোন্ জাতীয় পক্ষী, তাহার একটু আলোচনা করিব। পৃথিবীর সমস্ত দেশে পারাবত (Pegion) পালিত হইয়া থাকে। এই পারাবত নিরীহ পক্ষী। ঋগ্বেদের ১০।১৬৫।২ ঋকে কপোত-দূত অমঙ্গল-নাশের নিমিত্ত কপোত ইষিতো নো অস্তনাগা দেবাঃ শকুনো গৃহেষু" এইরূপ প্রার্থনা আছে। কপোত ও পারাবত যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পক্ষী, ইহা দ্বারা তাহা বুঝা যায়। শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতার (২৪।২৩,২৫ কণ্ডিকা) কপোত ও পারাবত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পক্ষিরূপে বর্ণিত দেখা যায়। ঋগ্বেদের ৮।৪।১৮ ঋকে পারাবত শব্দ আছে। ঋক-পাঠে ইহা যে Dove-জাতীয় ঘুঘু কিংবা এতদ্দেশীয় কবুতর, তাহা বুঝা যায়। ঋগ্বেদের পূর্ব্বোক্ত ১০।১৬৫ সূক্তে কপোত ঐ সূক্তে কখনও কখনও শকুন (পক্ষী) এবং ঐ সূক্তের শেষ ঋকে বিশদভাবে "যদ্ধলীকো বদতি মোঘমেতদ্যৎকপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি। যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতত্তস্মৈ যমায় নমো অস্তৃত্যবে॥" উলূকও যমদূতরূপে অভিহিত ও চিত্রিত।

শ্রীআজিজউদ্দীন আহম্মদ।

ভুলে ভুলী।

গ্রামের প্রান্তভাগে, যেখানে ক্রোশত্রয়ব্যাপী বিস্তৃত মাঠটা আপনার অবাধ শূন্যতা লইয়া ঝুমড়াগাছি গ্রামখানার সহিত মিলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সেইখানে—সেই শূন্যতা ও পূর্ণতার সন্ধিস্থলে দুখীরাম খাঁইতির ক্ষুদ্র কুটীরখানি সেই গ্রামের পূর্ণতার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অসীম শূন্যের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শূন্যতা ও পূর্ণতার মধ্যস্থলে সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানি [illegible] ক্ষুদ্র [illegible]

তীয়মান হইত; অন্ধকারময়ী রজনীতে দূর প্রান্তর হইতে সেই ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষীণ আলোকরেখা পথিকদিগকে আলেয়ার লীলা প্রদর্শন করিত। গভীর রজনীতে যখন গ্রাম প্রান্তর সব গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়া যাইত, তখন সেই কুটীর হইতে ক্বচিৎ বাঁশীর করুণসুর উত্থিত হইয়া স্তব্ধ প্রান্তরের বুকে লুটিয়া বেড়াইত।

এই কুটীরের যে মালিক, তাহার সহিতও যেন গ্রামের কোনও সম্পর্ক ছিল না। দিন রাত্রির মধ্যে সে একবারও এই কুটীর ছাড়িয়া যাইত না; শুধু সপ্তাহের মধ্যে এক দিন রামনগরের হাটে গিয়া চামড়া কিনিয়া আনিত, এবং সাত দিন ধরিয়া যে জুতা গড়িত তাহা হাটে গিয়া বেচিয়া আসিত। আসিবার সময় চাল, ডাল, নুন, তেল, সব কিনিয়া আনিত, আর সেই সঙ্গে দুই ঝাঁপি তাড়ী বা এক বোতল ধেনো মদ লইয়া আসিত। গভীর শূন্যতার মধ্যে প্রাণটা যখন হাঁপাইয়া উঠিয়া হা-হা করিতে থাকিত, তখন দুখীরাম একটু তাড়ী বা একটু মদ গলায় ঢালিয়া দিয়া আবার জুতা গড়িতে বসিত। ক্বচিৎ গ্রামের কোনও কৃষক শক্ত চামড়ার মোটা জুতা খরিদ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার কুটীরে আসিত, এবং একবেলা ধরিয়া দরদস্তুর করিয়া হয় ত এক যোড়া জুতা কিনিয়া লইয়া যাইত। কখনও বা কোনও শ্রান্ত পথিক তাহার কুটীরসন্নিহিত বটগাছের তলায় বসিয়া শ্রান্তি দূর করিত, দুখীরাম তামাক সাজিয়া আনিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে বসিত। শ্রান্তি দূর করিয়া পথিক চলিয়া যাইত, দুখীরাম আসিয়া আপনার কাজে মন দিত।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তর আকাশ সব যখন মিশিয়া যাইত, আকাশের কালো বুকে দপ্ দপ্ করিয়া তারা জ্বলিতে থাকিত, বটগাছের উপর পাখীর কল-কল শব্দ থামিয়া আসিত, তখন দুখীরাম উনানে ভাতের হাঁড়ী চাপাইয়া হুঁকা কলিকা লইয়া দাবার উপর বসিত, এবং অন্ধকার দিগন্তের দিকে বসিয়া আপন মনে গুণ্-গুণ্ করিয়া গাহিতে থাকিত—

'পার কর, পার কর বোলে ডাকচি ঘারে বারে।
মাঝি! বেলা গেল, সন্ধ্যে হলো, যাব দেশান্তরে॥'

দুখীরামের পারে যাইবার সময়টা যে খুব কাছাকাছি হইয়াছিল, তাহা নহে। বয়সটা এখনও চল্লিশের ভিতর, কিন্তু এই বয়সেই সে যেন পারে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ পার অপেক্ষা ও পারে সুখের মাত্রাটা

বেশী কি না, সে সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, এ পারের যাত্রীদের এতই অনন্ত, জীবনযাত্রাটা এমনই একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল যে, ও পারে গিয়া একটা পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িবার জন্য তাহার প্রাণটা যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিত। তাই সে ও পারে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পরপারের কাণ্ডারীকে আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকিত—

'ওমেরিলাম বেদ পুরাণে তুমি কর্ণধার,
ভবে করতে পার নিতার (মরি হায়) ;
দুর্দ্দি ! তুফান ভারি বহিতে নারি,
তরী টলমল করে।'

তরী খুবই টলমল করিতেছিল, তুফানও ছিল। সে তুফানে ভবীদাস যখন তরীটাকে সামলাইতে পারিত না, তখন ব্যাকুলভাবে পারের কাণ্ডারীকে আহ্বান করিত।

২

ভবে ভবীর যে এমন অবস্থা হইতে পারে, ইহা কেহ কখনও কল্পনাই করিতে পারে নাই। যাহার ঢোলের শব্দ শুনিলে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোক ছুটিয়া আসিত, যাহার সম্মুখে বড় বড় তুলীরাও ঢোলে খা দিতে সাহস করিত না, বড় বড় প্রমাদীদেরাও এক দিন পয়সা দিয়া যাহাকে পাইত না, সেই দুর্দ্দীরামকে যে এক দিন ঢোল ছাড়িয়া জুতা সেলাই করিয়া খাইতে হইবে, ইহা যেন লোকের ধারণার অতীত। কিন্তু ধারণার অতীত ঘটনাও যখন ঢোলের উপর বাস্তবিক ঘটিয়া গেল, তখন অদৃষ্টের উপর নিতান্ত অবিশ্বাসী লোকেরাও অদৃষ্ট না মানিয়া থাকিতে পারিল না।

বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ তুলী যুধিষ্ঠির খাইতির নিকট দুর্দ্দীরাম ঢোল শিখিয়াছিল। শুধু শিখে নাই, অল্প দিনের মধ্যে ওস্তর বিদ্যাটা এমন অদ্ভুতভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল যে, তাহাতে গুরুও আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। এক দিন এক বড় আসরে গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। শ্রোতৃবর্গ শ্বাসরুদ্ধে এই প্রতিযোগিতার জয়-পরাজয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বৃদ্ধ যুধিষ্ঠির সে দিন যেন সারা জীবনের সমগ্র শিক্ষা, সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়া গুরু শিষ্যের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৃদ্ধের চেষ্টা কিন্তু সফল হইল না। দুর্দ্দীরাম খানা তেটের মধ্যে কাওয়ালীকে টানিয়া আনিয়া পথমের মুখে তেওটের ঢেহাই দিবার জন্য হাত তুলিল, গুরু তখন ওস্তাদি দেখাইয়া হাত গুটাইয়া

লইয়া ঢোলের উপর হাত দুইটা রাখিল। দুখীরামের তেহাই সম্পূর্ণ হইল না, সে একটা তেহাই দিয়া গুরুর দিকে চাহিতেই দ্বিতীয় তেহাই দিতে উদ্যত হাতটা আর নামাইতে পারিল না; ত্রস্তভাবে কাধ হইতে ঢোলটা নামাইয়া গুরুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিল। গুরু হাত দুইটা বাড়াইয়া দুখীরামের গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'বাহবা দুখীরাম, তুইই আমার নাম রাখতে পারবি।'

দুখীরাম উপুড় হইয়া পড়িয়া গুরুর পায়ের ধুলা মাথায় দিল। শ্রোতৃবৃন্দ দুখীরামের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই দিন হইতে দুখীরামের নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িল। বিবাহে, পূজায় ঢোলের বাজনার জন্য দুখীরামকে বায়না দিতে বড়লোকমাত্রই আগ্রহান্বিত হইত। কবি বা তর্জার আসরে দুখীরামের ঢোল না বাজিলে আসর যেন আদৌ জমিত না।

দুখীরামের এই আকস্মিক উন্নতিতে অনেক চুলীই ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে গ্রামের বদন চুলীই প্রধান। বদনেরও একটু নাম যশ ছিল, কিন্তু চন্দ্রোদয়ে খদ্যোতের মত দুখীরামের অভ্যুদয়ে বদনের সে নামটুকু সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া আসিল। বিশোহানির জন্য বদন দুখীরামকেই সম্পূর্ণ দায়ী করিল।

এই সুনামের হানি ছাড়া বদনের ঈর্ষার আর একটু কারণ ছিল; দুখীরামের এই প্রসিদ্ধির সহিত যেমন অর্থাগম হইতে লাগিল, তেমনই তাহার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিবার জন্য অনেকেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অনেকেই মেয়ে দিয়া তাহার প্রসিদ্ধিলব্ধ অর্থের কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের মধ্যে সৈরবীর মা প্রধান। সৈরবীর মা সৈরবীকে সাত বৎসর বয়সে একবার সাড়ে তিন গণ্ডা টাকায় দেবীপুরের হাক দাসের কাছে বিক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু বছর দুই পরে হাক দাস যখন এই ক্রীত সম্পত্তির উপর আপনার স্বত্ব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গেল, তখন সৈরবীর মা চারি বৎসর খাওয়ান পরান বাবদ তিন গণ্ডা টাকা লইয়া মেয়েকে পুনরায় অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিল। এই দ্বিতীয় পক্ষ মেয়েটীর বিনিময়ে কেহই দেড় গণ্ডার বেশী দিতে রাজী হইল না। সৈরবীর মাও কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিল না; সৈরবী পনর বছরের হইয়া গেল, তথাপি মা দেড় গণ্ডা টাকার তাহাকে কাহারও হাতে দিল না।

মুটার মেয়ে হইলেও সৈরবীর একটু রূপ ছিল। যৌবনের আবির্ভাবে সে রূপ যেন আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। দুখী রায় তিন গণ্ডা টাকা দিয়াই এই বয়স্থা রূপসী মেয়েটিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। কিছু নায়নাও দিল।

ইহাতে কিন্তু বদন দাস তাহার উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিল না। এতে দুখীরাম তাহার নায়েডাঙ্গের উপর ঘা দিয়াছিল, এখন আসিয়া তাহার মনোনীতা ভাবী পত্নী সৈরবীকেও কাড়িয়া লইল। বদন অনেক দিন হইতে সৈরবীর মূল্য দেড় গণ্ডা টাকা ডাক দিয়া বসিয়া ছিল, এবং তাহার আশা ছিল, এই দেড় গণ্ডাতেই এক দিন সৈরবীর মাকে রাজী হইতে হইবে। বুড়ী তাহাতে রাজী হয়-হয় হইয়াছিল। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ নবাব দুখীরাম তিন গণ্ডা টাকা ডাক দিয়া তাহার আশার মূলে কুঠারাঘাত করিল। উঃ, কি ভয়ানক এই লোকটা! ভগবান তোরা এত অত্যাচার সহিবেন কি? বদন দিনে দুইবার পঞ্চানন্দের গাছতলায় গিয়া মাথা কুটিয়া আসিত। পঞ্চানন্দ তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিলেও, খালের আন্তরিক প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

সে বৎসর গ্রামে দুই দলে খুব প্রবল আড়াআড়ির সহিত বারোয়ারী হইয়াছিল। আড়ম্বরে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার জন্য উভয় দলেই যথেষ্ট উদ্যোগের সহিত আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছিল। দুইটা দলই প্রবল; এক দলের কর্ত্তা পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট বলরাম ঘোষ; অপর দলের সর্দ্দার হরিবল্লভ রায়। বলরাম বাবুর পক্ষে কলিকাতার ভূবন দাস ও মন্তি দাসের যাত্রার বায়না হইল; হরি বাবুর পক্ষে হাসীবুরের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনওয়ালা বলাই বৈরাগী ও বসন্তবাড়ীর নটবর দাসকে বায়না দিয়া আনিল। সেই সঙ্গে কবির আসরে বাজাইবার জন্য দুখীরামের বায়না হইল।

এখানে বায়না লইবার পর অপর পক্ষ দুখীরামকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহাকে বিগুণ অর্থের প্রলোভন দেখাইল। দুখীরাম কিন্তু সে প্রলোভনে ভুলিল না। কেন না, সে কবির আসরে বায়না পাইলে আর কোনও বায়নাই গ্রহণ করিত না। কবির আসরে উভয় পক্ষে খুব তুমুল সঙ্গীত-সংগ্রাম চলিত, সুরের কারসাজি, রাগরাগিণীর যোগাযোগ,

নূতন নূতন তাল লয়ের মধ্য দিয়া জিগীষু পক্ষদ্বয় যখন পরস্পর পরস্পরকে ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য আপনাদের সমগ্র শিক্ষা দীক্ষাকে নিয়োজিত করিতে থাকিত, তখন সেই আড়াআড়ির গানে, সেই ওস্তাদী তানমানের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া দুখীরাম যে আমোদ পাইত, পূজা বা বিবাহের আসরে শুধু শানাইয়ের একঘেয়ে সুরের সঙ্গে বাজাইয়া তেমন আমোদ সে পাইত না। সুতরাং কবির আসরের বায়না ছাড়িয়া দুখীরাম বলরাম বাবুর পক্ষে বায়না গ্রহণ করিল না।

ইহাতে বলরাম বাবু ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং দুখীরামকে ডাকাইয়া আনিয়া বায়না লইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দুখীরাম সবিনয়ে জানাইল, সে যখন অপর পক্ষে বায়না লইয়াছে, তখন এ পক্ষে বায়না লইতে অক্ষম। বলরাম বাবু হুকুম দিলেন, 'বায়না ফিরিয়ে দে।'

দুখীরাম হাতযোড় করিয়া সবিনয়ে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, 'লাখ টাকা দিলেও তা পারব না হুজুর।'

বলরাম বাবুর মুখখানা ভ্রূকুটীভীষণ হইল। কিন্তু দুখীরাম তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। বদন দাস বায়না লইবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল। সে গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, 'একটু ভাল বাজাতে পারে বলে ও অহঙ্কারে বাঁউকে যানে না হুজুর। তা নইলে হুজুরের মত লোককে অপমান করে যায়।'

বদনের এই টিপ্পনীতে বলরাম বাবুর ক্রোধটা যেন একটু বেশী তীব্র হইয়া উঠিল। ভদ্রলোকের প্রতি ছোটলোকের এরূপ অবজ্ঞার শাস্তি কতটা ভীষণ হইতে পারে, তিনি বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

এক পাড়ায় মতি রায়ের যাত্রার আনন্দে আখড়াই বাজনা বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে অপর পাড়ায় কবির আসরে দুখীরামের ঢোলের গুরু-গম্ভীর শব্দে গ্রামখানা মাতিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে যাত্রার আসরের ভিড় যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং কবির আসরে লোকের ঠেলাঠেলিতে তিলধারণের স্থান রহিল না।

তখন গাওনা আরম্ভ হইয়াছে; সহস্র সহস্র দর্শকের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলাই বৈরাগী সবেমাত্র সখী-সংবাদের মহড়া ধরিয়াছে—

'ওহে জিলক্ষ সজলজলদঙ্গ, এ কি রঙ্গ বামে কুবুলা রঙ্গিণী!'

যখন [illegible] দুখীরাম [illegible] প্রথম তেহাই মারিয়া ঢোলকের বোলটি

ধরিয়াছে, এমন সময়ে সহসা উৎসুক জনমণ্ডলীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া লাঠিধারী পুলিসের দল আসরে ঢুকিয়া পড়িল, এবং দুর্ঘীরামের হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া বলিল। দুর্ঘীরাম ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার আকস্মিক বিস্ময় অপনীত হইবার পূর্ব্বেই এক জন কনেষ্টবল তাহার কাঁধ হইতে ঢোলটা ছিনাইয়া লইয়া এত জোরে দুরে ছাড়িয়া ফেলিল যে, সে আঘাতে ঢোলের কাঠটা ভাঙ্গিয়া দুইখান হইয়া গেল, একটা লোক খুন হইতে হইতে বাঁচিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেই সমাগত দর্শকদিগের কে কোথায় যে ছুটিয়া পলাইল, তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। পুলিস দুর্ঘীরামের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে ধারদর্পে টানিয়া লইয়া চলিল।

ভয়ে জনতাপূর্ণ মজলিস আসরে একটা ছেলে উঠিয়া কীর্ত্তন ধরিয়াছে—

'তুমি কমলাপতে নাথ শ্রীপতি শ্রীনাথ দীননাথ দীনতারণ!'

ইহাতে ভক্তির উচ্ছ্বাসে কলরাম বাবু অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

কতক্ষণ পরে দুর্ঘীরাম শুনিতে পাইল যে, গদারাম পালের ছেলে বিনা আহ্বানে মাঝিদের হুকুমে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে গদারাম পালের একটা ছেলে ঘর হইতে আসিয়া চট্টগোল করিতে করিতে হঠাৎ মারা গিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল, কালী ঘা দিয়াছে; কেহ বলিয়াছিল, বিষ মারিয়াছে।

এই কথা শুনিবামাত্র জনমণ্ডলীর মধ্যে কোলাহল উঠিল। ইহার বাপের দল জোর করিয়া দুর্ঘীরামের পক্ষে এক জন উকীল দিল। দুর্ঘীরামের বিরুদ্ধে সাক্ষী দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু উকীলের জেরায় তাহাদের সাক্ষ্য টিকিল না; দুর্ঘীরামের পক্ষের লোক যে বিষ দিতে দেখিয়াছে, এ কথা কেহই প্রমাণ করিতে পারিল না। প্রমাণের অভাবে দুর্ঘীরাম মুক্তি পাইল।

মুক্তি পাইয়া দুর্ঘীরাম ঘরে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু দুইটী জিনিস সে আর ফিরিয়া পাইল না; একটী তাহার প্রিয় ঢোলখানি, দ্বিতীয়, সৈনবা। ঢোলখানি তাহার সঙ্গেই পুলিস কর্ত্তৃক বিখণ্ডিত হইয়াছিল; এবং সৈনবা জেলের ভয়েই যখন তখন দ্বিতীয় পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। [illegible]

বাকী দেড় গণ্ডা টাকা বলরাম বাবুর নিকট কর্জ্জ করিয়াছিল। শুনিয়া দুখীরাম বুকের ভিতর একটা মস্ত আঘাত অনুভব করিল।

কষ্টে সে আঘাতটাকে সামলাইয়া দুখীরাম কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সে আবার একটা নূতন ঢোল কিনিয়া আনিল, কিন্তু সে ঢোল দিয়া তেমন মিঠা আওয়াজ বাহির হইল না। সেটাকে বেচিয়া আর একটা কিনিল; কিন্তু তাহার আওয়াজও দুখীরামের মনের মত হইল না। রঙ্গের মুখে কর্ত্তব দিতে গেলে আওয়াজটা যেন ম্যাড়-ম্যাড় করিত। দুখীরাম সে ঢোলটাও বেচিয়া ফেলিল। এমনই করিয়া সে পাঁচ সাতটা ঢোল বেচিল, কিনিল, কিন্তু তাহার পুরাতন ঢোলের অনুরূপ ঢোল একটাও পাইল না। ক্রমে তাহার মনে হইতে লাগিল, মাঝে মাঝে তালও যেন কাটিয়া যাইতেছে; বাজাইতে বাজাইতে হাতটাও যেন অবশ হইয়া আসে; শ্রোতৃবর্গ যেন বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করে। বিরক্ত হইয়া দুখীরাম ঢোল ছাড়িয়া দিল, এবং জীবিকার জন্য পৈতৃক ব্যবসায় জুতা তৈরী আরম্ভ করিল।

সমজদার লোকেরা বলিল, 'আহা, এমন ওস্তাদ লোকটা জ্যান্তে মরে' রইলো।' বিজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিল, 'হবে না, গুরুর অভিশাপ। গুরুকে আসরের মাঝখানে 'থ' বানিয়ে দিলে, সে অভিশাপ যাবে কোথায়? এমনি ক'রে লোকা ধোপারও নাকি গলায় ছেঁদা হ'য়ে গিয়েছিল।'

দুখীরাম কিন্তু এ সকল কথায় কাণ দিল না। সে গান বাজনার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া সূচ, সূতা, চামড়ার মধ্যেই আপনার মনটাকে ডুবাইয়া রাখিল। যখন চঞ্চল মনটা তাহার ভিতর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভাসিয়া উঠিত, তখন সে হাঁড়ির ঝাঁপি আর ধেনো মদের বোতল লইয়া বসিত। ঢোলের আওয়াজ কাণে আসিলে কুটীরের ভিতর ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিত, এবং তাহাতেও শব্দের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ না হইলে, কাণে আঙ্গুল চাপা দিত। তবে কচিৎ কোনও বিনিদ্র রজনীতে, ঘনঘটাচ্ছন্ন কোনও দুর্য্যোগময় নিশীথে, রজনীর স্তব্ধতা যখন বড়ই ভীষণ হইয়া উঠিত, তখন সে ছোট বাঁশের বাঁশীটা লইয়া তাহাতে ফুৎকার দিত, এবং তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনার শূন্য প্রাণের করুণ উচ্ছ্বাস বাহির করিয়া শূন্য প্রান্তরের স্তব্ধ বক্ষকে আকুল করিয়া তুলিত।

৪

সে দিন শীতের সন্ধ্যাটা খুব জমাট শীত ও ঘন কুয়াসার মধ্যে

এমনই একটা গভীর বিষাদের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, দুখীরাম কিছুতেই মনটাকে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিবার পূর্বেই সে তাড়ীর ঝাঁপিটা বাহির করিল। কিন্তু সে দিন সপ্তাহের শেষ দিন; ঝাঁপিটা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। তলায় যেটুকু পড়িয়াছিল, সেইটুকুই ঢালিয়া পান করিল। কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। সন্ধ্যা জ্বালিয়া বোতলটা লইয়া দেখিল, তখনও আধ বোতল মজুদ। তাহারই খানিকটা গলায় ঢালিয়া দিয়া, তামাক খাইয়া, দুখীরাম কাযে বসিল। মাথাটা চন্‌-চন্‌ করিতে লাগিল। দুখীরাম জোরে জোরে চামড়ায় ফোঁড় দিতে আরম্ভ করিল।

কাজ কিন্তু হইল না। কয়েকটা ফোঁড় দিতেই দুখীরাম যেন পরিচিত কণ্ঠের মৃদু কাতর আহ্বান শুনিতে পাইল। সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া সে ক্ষণকাল কাণ পাতিয়া শুনিল, তার পর লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, সৈরব?'

'হাঁ' বলিয়া সৈরবী ঘরে ঢুকিল। দুখীরাম সরিয়া গিয়া নিজের জায়গায় বসিল। সৈরবী দরজা ভেজাইয়া দিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। দুখীরাম বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, শঙ্কিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'এমন সময় কি মনে ক'রে সৈরব?'

মৃদুস্বরে সৈরবী বলিল, 'খুদের বাপের অসুখ।'

ব্যস্তভাবে দুখীরাম বলিয়া উঠিল, 'কি অসুখ?'

'জ্বর।'

'কে দেখছে?'

'কেউ না। সে দিন নিতাই কবরেজ দু'টো বড়ী দিয়েছিল, তাই খেয়ে দু'দিন ভাল ছিল। আজ আবার বিকেল থেকে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এয়েছে।'

একটু ভাবিয়া দুখীরাম কহিল, 'কোম্পানীর ডাক্তারখানায় যায় না কেন?'

'কাল যাবে বলছে।'

'আমাকে কি তার সাথে যেতে হবে?'

'না।'

দুখীরাম জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে সৈরবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সৈরবী

পাড়টা নীচু করিয়া আঙুল মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে বলিল, 'কাল হাকিম বাবুর ছেলের বিয়ে, খুদের বাপ ঢোলের বায়না নিয়েছে।'

প্রেসিডেন্ট বলরাম বাবুকে অনেকে হাকিম বাবু বলিত। হাকিম বাবুর নাম শুনিয়া দুখীরাম মাথা নীচু করিল। সৈরবী বলিল, 'কাল বিয়ে, আজতো বায়না ফেরৎ দেওয়া যায় না। তার উপর হাকিম লোকের ঘর।'

একটু ভাবিয়া মুখ তুলিয়া দুখীরাম বিষাদগম্ভীরকণ্ঠে বলিল, 'কিন্তু আমি যে ঢোল ছেড়ে দিয়েছি, সৈরব।'

দুখীরাম তোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। সৈরব তেমনই নতমুখে বলিল, 'তা জানি।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দুখীরাম বলিল, 'আর কাউকে না হয় দেখ্।'

সৈরবী নিরুত্তরে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর ঘরের খুলিয়া বাহিরে গিয়া আস্তে আস্তে দরজাটী ভেজাইয়া দিল। দুখীরাম বসিয়া শাণ-কাঠখানার উপর তুরপুনের বাঁটটা অস্থিরভাবে ঠুকিতে লাগিল।

একটু পরে সে দরজার দিকে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল, 'সৈরব!'

উত্তর আসিল না। দুখীরাম ব্যস্তভাবে উঠিয়া দরজা খুলিয়া ডাকিল, 'সৈরব, চলে গেলি?'

সৈরবী তখন চলিয়া গিয়াছিল। দুখীরাম ফিরিয়া আসিয়া বোতলের শেষ মদটা সব একনিঃশ্বাসে গলায় ঢালিয়া দিল। তার পর, চাড়ায় দুই চারিটা ফোঁড় না দিতেই তাহার চোখ দুইটা এমন অবশভাবে মুদিয়া আসিল যে, তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিল না; সে যন্ত্রপাতিগুলা একটু সরাইয়া মোটা কাঠখানা মাথায় দিয়াই শুইয়া পড়িল।

পর দিন সকালে উঠিয়াই দুখীরাম তাড়াতাড়ি বদনের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। বদন তখন চাটায়ের উপর বসিয়া ময়লা কাঁথাখানা দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া তামাক টানিতেছিল। দুখীরামকে দেখিয়াই সে বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিল। দুখীরাম জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছ?'

বদন তাহার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, 'কাল সারারাত জ্বরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে।'

দুখীরাম বলিল, 'ঔষধপত্তর খাও।'

বদন বলিল, 'আর কোম্পানীর ডাক্তারখানায় যাব মনে কচ্ছি।'

'তাই যাও' বলিয়া দুখীরাম ঘরের দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'যন্ত্রটা কোথায়?'

বদন বিস্ময়ে কোনও উত্তর করিতে পারিল না। ঘরের এক কোণে আড়ায় ছেঁড়া কাপড়ে জড়ান ঢোলটা ঝুলিতেছিল। দুখীরাম হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া হুঁকাটা বদনের হাতে ফিরাইয়া দিল, এবং ঘরে গিয়া ঢোলটা পাড়িয়া আনিল। তাহার কাপড়টা খুলিয়া দুইটা চাপড় দিয়া আপন-মনে বলিল, 'ঠিক আছে।' বলিয়া পুনরায় তাহাতে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'তা হ'লে আমি হাকিম বাবুর বাড়ী চললাম। 'ক' দিনের বায়না?'

বদন বলিল, 'দু দিনের। কিন্তু মাগী যে বললে, তুমি রাজি নও?'

দুখীরাম মৃদু হাসিল। বদন ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, 'সৈরবী!'

দুখীরাম বলিল, 'ওর দোষ নাই। কাল আমি ওকে পষ্ট কিছু বলি নাই।'

বলিয়াই দুখীরাম ঢোলটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বদন হুঁকাটা হাতে লইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দুখীরামকে পুনরায় ঢোল কাঁধে করিতে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইল। কলরাম বাবুও কম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। তিনি দুখীরামকে দিনা বায়নায় বাজাইতে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুখীরাম বলিল, 'আজি বদনের বদলী এয়েছি, হুজুর!'

কলরাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বদনা কোথায়?'

দুখীরাম বলিল, 'হুঁয় ঘর!'

একটু ভাবিয়া কলরাম বাবু বলিলেন, 'তুই রাজা, কিন্তু বদনার সঙ্গে যে চুক্তি হইয়াছিল, তা আমি দেবনা, তুই দু'দিনে বারো আনা পাবি।'

দুখীরাম সবিনয়ে উত্তর করিল, 'পাওনার কথা আমার সঙ্গে কেন হুজুর, আমি বদনের বদলী, পাওনা যা তা বদনের। আমি বাজাতে এয়েছি, বাজিয়ে যাব।'

কলরাম বাবু আর কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু লোকে বড় গোল বাধাইল; দুখীরাম পুনরায় ঢোল কাঁধে লইয়াছে শুনিয়া অনেকেই তাহার বাজনা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল। বিবাহের পর দিন সন্ধ্যার সময় যখন প্রসিদ্ধ শানাইদার রবু হাড়ী বাবুদের শানাই শুনাইতে উদ্যত হইল, তখন অনেকেরই ইচ্ছা হইল দুখীরাম উহার সঙ্গে ঢোল সঙ্গত করুক।

দুখীরাম কিন্তু বাবুর বিনা হুকুমে উঠিতে পারিল না! বাবুও সকলের আগ্রহ সত্ত্বেও দুখীরামকে উঠিতে হুকুম দিলেন না; অপর এক জন চুলীকে শানায়ের সহিত সঙ্গত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। দুখীরাম, মাথা হেঁট করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল, বলরাম বাবু আজ পূর্ব্ব রাগের প্রতিশোধ লইতেছেন। তাই দুখীরাম উপস্থিত থাকিতে আর অন্য চুলী উঠিয়া তাহার সম্মুখে সঙ্গত আরম্ভ করিল। কিন্তু সে ত এ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং ইহাতে তাহার আর মান অপমান কি। তবু যেন দুখীরামের প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল।

কিন্তু গানের সঙ্গে যখন সঙ্গত মিলিল না, শানাইদার মাঝে মাঝে চুলীর উপর তীব্র ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তখন দুখীরাম আর থাকিতে পারিল না; সে ঢোলটা কাঁধে লইয়া উন্মত্তভাবে আসরের মাঝে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সমবেত শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া মাথাটা একবার নীচু করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'দোষ যদি কিছু হয় তা হবে, কিন্তু দুখীরাম আজ একবার ঢোলে ঘা না দিয়ে থাকতে পারবে না।'

কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দুখীরাম ঢোলে [illegible] আরম্ভ করিল। শ্রোতৃমণ্ডলী ধ্বনিধ্বনি করিয়া উঠিল। উপযুক্ত সুরের উপযুক্ত সঙ্গতে আসর মেন মাতিয়া উঠিল; বাজনার তালে তালে নর্ত্তকী নাচিয়া, দুলিয়া দুলিয়া শ্রোতাদের অন্তর মুগ্ধ করিতে লাগিল; বহুকাল পরে দুখীরাম আজ প্রাণ ভরিয়া বাজাইয়া যেন বিস্মৃতপ্রায় সুখ-স্বপ্নটাকে জাগাইয়া তুলিল। তার পর মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর জয়ধ্বনির মধ্যে দুখীরাম কখন যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। সঙ্গীতশেষে যখন দুখীরামের খোঁজ পড়িল, তখন শানাইদার বলিল, 'সে চলে গেছে।'

দুখীরাম তখন আপনার কুটীরদ্বারে তাড়ীর বাঁপিটা পাশে রাখিয়া হুঁকা হাতে লইয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছে—

'মাঝি! বেলা গেলো, সন্ধ্যে হলো, যাব দেশান্তরে।'

সে দিন দুখীরামের হাট হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। সে চামড়ার বোঝা, তাড়ীর বাঁপি, মদের বোতল দাবার এক পাশে রাখিয়া তামাক সাজিয়া খাইতে বসিল। তখনও ঘরে আলো জ্বলে নাই; শীতের শুরু সন্ধ্যার মধ্যে অন্ধকার ঘরখানা তাহার প্রাণে যেন কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। উঠিয়া আলো জ্বালিতেও তাহার ইচ্ছা

হইল না, শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্য মাঠের দিকে চাহিয়া জোরে জোরে হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

'ঘরে আছিস্?'

চমকিয়া উঠিয়া দুখীরাম উত্তর দিল, 'কে? সৈরব?'

'হাঁ, সারাটা দিন কোন্ চুলোয় গিয়েছিলি?'

'হাটে গিয়েছিলাম সৈরব।'

উঠানের উপর ঠিক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সৈরবী বলিল, 'ঘরে আলোটাও জ্বালতে পারিস্ নি বুঝি? অন্ধকারে ভূতের মত বসে' আমাকে টানছিস্!'

দুখীরাম নিরুত্তরে মৃদু হাসিল। অন্ধকারে সৈরবী তাহা দেখিতে পাইল না। হুঁকায় জোরে একটা টান দিয়া হুঁকাটা রাখিতে রাখিতে দুখীরাম বলিল, 'এমন সময়ে কেন সৈরব?'

সৈরবী বলিল, 'আমি দু'বার এসে তোকে খুঁজে গিয়েছি।'

দুখীরাম বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সৈরবীর মুখের দিকে চাহিল। সৈরবী কহিল, 'আলোটাই জ্বালিস্ নাই।'

দুখীরাম উঠিয়া আলো জ্বালিল, এবং কেরোসীনের ডিবাটা দাবার উপর রাখিয়া বলিল, 'কি?'

সৈরবী একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, 'হাঁ, আমি তোর ঘরে লুটুবিতে করতে এয়েছি কি না। তোর বাজনার দামটা নে।'

বলিয়া সে খোঁচল হইতে পান খুলিতে লাগিল। দুখীরাম একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, 'বাজনার দাম? আমি কি পালার তরে বাজাতে গিয়েছি সৈরব?'

ঝঙ্কার দিয়া সৈরবী বলিল, 'তবে কি লস্ত গিয়েছিলি? আমার মাথা খেতে? তা মাথা তো খেয়ে এয়েছিস্।'

দুখীরাম ভীতভাবে সৈরবীর মুখের দিকে চাহিল। সৈরবী বলিল, 'হাকিম বাবুর কাছে না বলে এসেছিস্, সৈরবীর কথায় বাজাতে এয়েচি।'

দুখীরাম বলিল, 'সত্যি মা, তা বলেছি।'

তীব্রস্বরে সৈরবী বলিল, 'কবে থেকে এত সত্যিবাদী হ'লি?'

দুখীরাম কোনও উত্তর না দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। সৈরবী বলিল, 'আজ হাকিম বাবু ওকে ডাকিয়ে নিয়ে কি নাহনাটাই করেছে। বলেছে, ও তোকে, নয় আমাদের—দেশ থেকে তাড়াবে।'

দুখীরাম নিরুত্তর। সৈরবী তাহার সম্মুখে টাকাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এই নে, আমি চল্লুম।'

দুখীরাম বলিল, 'শোন্'

সৈরবী ফিরিয়া দাড়াইল। দুখীরাম বলিল, 'টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে যা।'

'কেন বল্ তো?'

'আমি তোকে দিচ্ছি।'

সৈরবীর চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে কঠোরস্বরে বলিল, 'তার পর?'

'তার পর গাঁ ছাড়তে হয়, আমিই ছাড়্‌বো।'

'সে ভোর খুসী। কিন্তু তোর টাকা আমি কেন নিতে যাব? আমাকে কি তুই তেমনি মেয়ে মনে করিস্? আমার মরতে জায়গা ছিল না, তাই সে দিন তোর কাছে এয়েছিনু। ছি ছি, ভুই এমন!'

বলিয়া সৈরবী গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। দুখীরাম বলিল, 'বড্ড অন্ধকার, আলোটা ধরবো?'

'রেখে দে তোর আলো। তোর আলোর মুখে ঝাঁটা, তোর মুখেও—'

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সৈরবী অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। দুখীরাম স্পন্দহীনভাবে দাবার উপর বসিয়া রহিল। শীতের কনকনে বাতাস কাপড়ের পাশ দিয়া হু-হু করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। সারা দিনের অনাহারে শরীরটা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে। দুখীরাম হাত বাড়াইয়া একটা তাড়ীর ঝাঁপি টানিয়া লইল, এবং একনিঃশ্বাসে অনেকটা তাড়ী গলায় ঢালিয়া দিল। মাথাটা চন্-চন্ করিয়া উঠিল। সোজা হইয়া বসিয়া দুখীরাম গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

'পার কর, পার কর বলে' ডাকচি বারে বারে।'

গাহিতে গাহিতে তাহার মনটা যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন সে ঝাঁপিটা টানিয়া লইয়া প্রায় নিঃশেষ করিয়া জড়িতকণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

'শুনেছিলাম বেদপুরাণে, তুমি কর্ণধার,
ভবে কর্‌তে পারাপার;
হরি, তুফান ভারী, রইতে নারি, তরী টলমল করে।'

গান-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট তাড়ীটুকু গলায় ঢালিয়া দিয়া ঝাঁপীটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, এবং উঠিতে গিয়া সেইখানেই ঢলিয়া পড়িল।

পর দিন সকালে ধার্ম্মিক বলরাম বাবু যখন পাপিষ্ঠ দুখীরামকে কোন্ আইনের কোন্ ধারায় ফেলিয়া গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করা যায়, তাহাই ভাবিতেছিলেন, তখন চৌকীদার ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, সংসারের চিরস্থায়ী আইনের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে দুখীরাম সংসার হইতে অপসৃত হইয়াছে;—তাহার লাসটা উঠানের উপর ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্য।

"উত্তরকুরু ও পঞ্চজন" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় আর্য্যগণ যেমন আপনাদিগকে 'আর্য্য' বলিতেন, সেইরূপ তাঁহারা 'আয়ু' নামেও পরিচিত ছিলেন। আর্য্য ও আয়ু এই দুই শব্দ যথাক্রমে ঋ ও ই ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই দুই ধাতুর অর্থই গমন করা। (১) মক্ষমূলর আর্য্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন, কৃষক। কিন্তু এরূপ অর্থ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কারণ, আর্য্যগণ যে কৃষিকার্য্য করিতেন, তাহা কৃষ্টি ও চর্ষণি শব্দদ্বয় দ্বারা অত্যন্তরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন, আর্য্যগণ প্রথমে বেদিয়ার মত যাযাবর অর্থাৎ ভবঘুরে (nomad) জাতি ছিলেন, সেই জন্য আর্য্য ও আয়ু নামে তাঁহারা আপনাদিগকে অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অর্থ আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, গমনার্থক ঋ ধাতু হইতে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের সকল গুলিই ধর্ম্মাত্মক। ঋ ধাতু হইতে বৈদিক ঋত, ঋতযু, ঋতু, আর্য্য প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন। (২) ঋত অর্থে যজ্ঞ, সত্য, ব্রত প্রভৃতি। ঋতযু অর্থে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক। ঋতু অর্থে যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত কাল। অতএব, আর্য্য

---

(১) মাং। আর্ষন্তি। কৃতেন। অর্যেণ। চ।—১০।৪৮।৩
দুষ্ট কর্ম্ম দ্বারা আমাতে গমন করে।

(২) অগ্নিঃ। নেতা। ভগঃ ইব। ক্ষিতীনাম্।
দৈবীনাম্। দেবঃ। ঋভুক্ষাঃ। ঋতাবা।—৩।২০।৪
নেতা, ঋতুপালক, ঋতরক্ষাকারী অগ্নি ভগদানশ দেবপূজক ক্ষিতিদিগের নেতা।

শব্দের '(যজ্ঞ দ্বারা) দেবগণের নিকট গমনকারী' অর্থই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (১)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে, ঋগ্বেদের যুগেই অগ্নিকে প্রথম আয়ু বলা হইত। আর্য্যগণ মনে করিতেন, অগ্নি দেবতাদিগের দূত। যখন তাঁহারা যজ্ঞ করেন, অগ্নিই দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আনয়ন করেন। অতএব, অগ্নিই দেবতাদিগের নিকট প্রথম-গমন-কারী। এই জন্য অগ্নিই 'আয়ু' নামের প্রথম বা প্রধান অধিকারী। ইহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে। যে সকল মানব যজ্ঞ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে আয়ু নামের অধিকারী হইবেন, ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

অতএব, অগ্নির উপাসকগণ, অব্রত দাস, দস্যু প্রভৃতি জাতি হইতে আপনাদিগের প্রভেদ করিতে আয়ু ও আর্য্য এই দুই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের অনেক স্থলে 'অর্য্য' শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অর্থ কোনও স্থলে 'অরি বা শত্রু-সম্বন্ধীয়'; আবার কোথাও 'স্বামী', বা আর্য্য। যে 'অরি' শব্দ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ স্বামী (২), এবং যাহা 'রা' হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ, শত্রু, বা অন্যজাতি (৩)। উদ্ধৃত স্থলে 'অর্য্য' শব্দ স্বামী অর্থে ইন্দ্রকেও বুঝাইতে দেখা যাইতেছে। অতএব, গমনার্থক 'ঋ' ধাতুর অর্থ সাধারণ গমন নহে। দেবতা-সম্বন্ধীয় গমনই 'ঋ' ধাতুর প্রকৃত অর্থ।

আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা রাজা বা ধনী ছিলেন, তাঁহাদিগকে 'মঘবান'

---

(১) উরু। জ্যোতিঃ। অনয়ন্। আর্য্যায়।—৭।৫।৩

আর্য্যের নিমিত্ত বৃহৎ জ্যোতি উৎপাদন করিয়া.....।

আর্য্যায় কর্ম্মবতে অনায় ইতি সায়ন। কর্ম্মবতে অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্ম-নিমিত্ত।

যদি। বিশঃ। মানুষীঃ। দেবযতীঃ

প্রযযতীঃ। ইয়তে। অগ্রং। অর্চিঃ।—৩।৫।৩

যখন দেবের নিকট গমনকারী, হবিঃপ্রদানকারী মনুষ্য প্রজা দীপ্ত অর্চ্চিকে স্তব করে।

(২) সং। অর্যঃ। গাঃ। অজতি। যস্য। বষ্টি।—১।৩৩।৩

অর্যঃ স্বামিরূপ ইন্দ্রঃ যস্য দেবস্য বষ্টি অন্নরেণাপহৃতাঃ গাঃ প্রাপ্তুং কাময়তে।

অর্থ :—যাহার ইচ্ছা করেন স্বামী (ইন্দ্র) গো সকল (গ্রহণ করিয়া) প্রদান করেন।

(৩) সং। অর্যঃ। পুষ্টীঃ। বিযঃ ইব। আ। মিনাতি।—২।১২।৩

অর্যঃ অরেঃ সম্বন্ধীনি পুষ্টীঃ পোষকাণি গবাশ্বাদীনি ধনানি স্বামিনাতি সর্ব্বতো হিনস্তি।

অর্থঃ—তিনি (ইন্দ্র) শত্রুর পোষক ধন সকল নিজসমূহ সংহার করেন।

বলা হইত (১)। মগ শব্দ পারসীক মাগি (Magi) শব্দের অনুরূপ। মঘবান-দিগকে 'সুরি' নামেও অভিহিত দেখি (২)। অগ্নি ভারত নামে আহূত হইতেন (৩)। অগ্নি যাহাদিগকে ভরণ করেন, তাঁহারাও 'ভারত' নামে অভিহিত হইতেন। সেই জন্য অগ্নিপূজক আর্য্যদিগের আর এক নাম ভারত জন (৪)। আর্য্যগণ আপনাদিগকে তুর্য নামেও অভিহিত করিতেন,

(১) এষঃ। ক্ষেতি। রথবীতিঃ। মঘবা। গোমতীঃ। অনু
পর্বতেষু। অপস্রিতঃ।—৭।৩১।১৯

এই মঘবান, রথবীতি গোমতী (নদীর) নিকট পর্ব্বত সকলে পলায়ন করিয়া বাস করিতেছেন।

মা। মঘোনঃ। পরি। খ্যতং।—৬।৫৭।৩

মঘবানদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

অস্মাকম্। অগ্নে। মঘবৎসু। ধারয়।
অনামি। ক্ষত্রং। অজরং। সুবীর্যম্।—৩।৮।৬

হে অগ্নে! আমাদিগের মঘবানদিগের মধ্যে অনমনীয় ক্ষত্র (অর্থাৎ বল), অজর সুবীর্য্য স্থাপন কর।

ত্র। তৎ। দুঃশীমে। পৃথবানে। বেনে।
ত্রা। রামে। বোচম্। অসুরে। মঘবৎসু।—১০।৯৩।১৪

অর্থ:—দুঃশীম, পৃথবা, বেন, রাম, অসুর (এই সকল) মঘবান্দিগের মধ্যে যাহা বলিতেছি।

(২) অরক্ষেভিঃ। ভব। গোপাভিঃ। ইষ্টে
অস্মাকম্। পাহি। বিসর্দৃ। সুরীন্।—৩।৮।৭

হে তৃতীয় লোক-(অর্থাৎ স্বর্গ)-বাসী! তোমার রক্ষক অপায়ন দ্বারা অপরাজিত রক্ষা সকলের সহিত আমাদিগের সুরিদিগকে রক্ষা কর।

অধ। সুরিভ্যঃ। সুদিনা। বি। উচ্ছান্।—৭।১৮।২১

অনন্তর সুরিদিগের জন্য সুদিন সকল উদিত হউক।

উভয়াসঃ। জাতবেদঃ। গ্নাস। তে
স্তোতারঃ। অগ্নে। সুরয়ঃ। চ। সন্তি।—২।২।১২

হে জাতবেদ অগ্নে! স্তবকারিগণ ও সুরিগণ উভয়ে তোমার সখ প্রাপ্ত হইবে।

(৩) ত্বং। নিঃ। অসি। ভারত। অগ্নে। বশাভিঃ। উক্ষভিঃ।
অষ্টাপদীভিঃ আহুতঃ।—২।৩।৫

হে ভারত অগ্নে! তুমি আমাদিগের হও; বশা (অর্থাৎ বন্ধ্যা গাভী), উক্ষ (অর্থাৎ বৃষ), অষ্টাপদী-(অর্থাৎ গর্ভবতী গাভী)-দিগের দ্বারা আহূত হও।

(৪) বিশ্বামিত্রস্য। রক্ষতি। ব্রহ্ম। ইদং। ভারতং। জনং।—৩।৩।১২

বিশ্বামিত্রের এই স্তোত্র ভারত জনকে রক্ষা করে।

(১) কিংবা তাঁহাদের মধ্যে তুর নামক এক সম্প্রদায় ছিল। শূর, ধৃষ্ণু, তুর ও বোধ, এই সকল নাম একটি ঋকে প্রাপ্ত হই; (২) ইহারা ইন্দ্র-পূজক আর্য্য সম্প্রদায়। ইহারাই সেকালের যোদ্ধা জাতিদিগের অন্তর্গত ছিলেন।

ঋগ্বেদের কালে যাঁহারা রাজ-বংশ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অনু, দ্রুহ্য, পূরু, তুর্বশ ও যদু প্রসিদ্ধ (৩)। ইহাদের মধ্যেও পরস্পর যুদ্ধ হইত। ঋগ্বেদে চেদি বংশেরও

---

(১) সুশেবঃ। তুরঃ। উশিজস্য। সোতা।
যে। যজ্ঞাঃ। নবাঃ। মমহুঃ। তুরাসাট্।—৩।৪১।৫

উশিজ-পুত্রের সোতা অন্য সকলের সহিত তুরযুক্ত হউন। হে মরুদ্গণ! যে সকল যজ্ঞ তোমাদিগের তুরা দিগের।

(সায়ণের মতে—শীঘ্রগমনকারী তোমাদিগের যে সকল অশ্ব।)

বিশ্ব। ইৎ। তা। তে। তুরিয়ঃ। সজোষাঃ।
অভি। তুরাসঃ। যজমানাসঃ। অর্কৈঃ।—১০।৪৯।৬

হে অশ্ববান্, কর্ম্মবান্, যশস্বীযুক্ত! এই সকলই তোমার। তুরাসঃ তোমার অভিমুখে স্তব করিতেছে।

(২) অহি। ত্বা। শূরঃ। নর্যঃ। চিৎ। ঊতয়ে। ধৃষ্ণুঃ
নি। তা। বোধি। মনুষ্যাণঃ। যুধেনয়ম্।—৬।২৩।৫

তোমার (অর্থাৎ ইন্দ্রের) সহিত শূর নহে, তুর নহে, ধৃষ্ণু নহে, তোমার সহিত যোদ্ধা বলিয়া অভিমানীও যুদ্ধ করে নাই।

(৩) যৎ। ইন্দ্রাগ্নী। যদুষু। তুর্বণেষু
যৎ। দ্রুহ্যুষু। অনুষু। পূরুষু। যৎ।
অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতম্
অথ। সোমস্য। পিবতম্। ঋভুক্ষঃ।—১।১০৮।৮

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি যদুদিগের, তুর্বশদিগের, দ্রুহ্যদিগের, অনুদিগের, পূরুদিগের মধ্যে থাক, হে বৃষদ্বয়! অতঃপর এখানে আইস, আমার সুতসোম পান কর।

[সায়ণ যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, অনু, পূরু প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে আধ্যাত্মিক অদ্ভুত ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। আমরা তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।]

নি। ধ্বয়রঃ। অনবঃ। দ্রুহ্যবঃ। চ
ষষ্টিঃ। শতাঃ। সুষুপুঃ। ষট্। সহস্রা।—৭।১৮।১৩

তোকায়া অনুগণ ও দ্রুহ্যগণ ছয় ধাত্রায়, ছয় হাজার—চিরনিদ্রা গিয়াছিল।

যূয়ং। তে। মানুষে। জনে। সোমঃ। পুরুষু। সুতঃ।
তস্য। আ। ইহি। প্র। দ্রব। পিব। মদায়।—৮।৩৩।১০

তোমার জন্য এই সোম পূরুদিগের মধ্যে মানুষ জনে অভিষব করিতেছে।

নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (১) ভোজ-বংশীয় রাজার নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) আর এক রাজ-বংশের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা অসমাতি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইঁহাদিগকে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বলিয়া মনে করি। (৩) এতৎ ব্যতীত সুমিত্র বংশ (৪) গুঙ্গু জাতি (৫) অজ, শিগ্রু, যক্ষু (৬) রুশম, রুম, শ্যাবক,

---

এখানে আইস, তাহার (অর্থাৎ সোমের) রস পান কর।

ম। মে। পুরবঃ। সখ্যে। রিষাথন।—১০।৪৮।৫

হে পুরুগণ। আমার (অর্থাৎ ইন্দ্রের) বন্ধুত্ব নষ্ট করিও না।

যৎ। দ্রুহ্যসি। অনবি। দুর্বণে। যদৌ

হবে। মাং। অধ। মা। আ। গতম্।—৮।১০।৫

যদি দ্রুহ্য, অনু, দুর্বণ (ও) যদুর মধ্যে তোমাদের দুইটীকে আহ্বান করে, অনন্তর আমায় নিকট এস।

(১) ন্যুকিঃ। এনা। পথ। গাৎ। যেন। ইমে। যন্তি। চেদয়ঃ।—৮।৫।৩৯

যে পথে চেদিরা গমন করেন, সে পথে কেহ যাইতে পারে না।

(২) দুহীয়ং। ইব। স্নোহিতস্য। পাকস্থামানম্।

ভোজং। দাতারম্। অবম্ ॥—৮।৫।২৪

ভোজ পাকস্থামাকে, লোহিত (অয়ের) দাতাকে এই চতুর্থ ঋক্ বলিয়াছি।

(৩) ইন্দ্র। কর্ত্রা। অসমাতিষু। রথপ্রোষ্ঠেষু। ধারয়।

দিবি ইব। সূর্যং। দৃশে ॥—১০।৬০।৫

হে ইন্দ্র! অসমাতিদিগের মধ্যে বলবানদিগকে রথপ্রোষ্ঠে ধারণ কর, যেমন দেখিবার জন্য সূর্য্যকে দিবালোকে (ধারণ কর)।

যস্য। ইক্ষ্বাকুঃ। উপ। ব্রতে। রেবান্। মরায়ী। এধতে।

দিবি ইব। পঞ্চ। কৃষ্টয়ঃ ॥—১০।৬০।৮

যাঁহার (অর্থাৎ অসমাতি রাজার) ব্রতে (অর্থাৎ কর্ম্মে) ধনবান ও শত্রুহন্তা ইক্ষ্বাকু, দিব্য লোকে পঞ্চ কৃষ্টির মত বর্দ্ধিত হইতেছেন।

(৪) সুমিত্রেষু। দীদয়ঃ। দেববৎসু।—১০।৬৯।৭

দেবতুল্য সুমিত্রদিগের মধ্যে দীপ্ত হও।

(৫) অহং। গুঙ্গুভ্যঃ। অতিথিগ্বং। ইষ্করং। ইষম্।

ন। বৃত্রতুরম্। বিভুং। ধারয়ম্।—১০।৪৮।৮

আমি (ইন্দ্র) গুঙ্গুদিগের হইতে অন্নসম্পন্ন সোম-যজ্ঞকারী, বৃত্রসংহারকারী, অতিথিত্বকে প্রজাদিগের মধ্যে ধারণ করিয়াছি।

(৬) অজাসঃ। চ। শিগ্রবঃ। যক্ষবঃ। চ।

বলিং। শীর্ষাণি। জভ্রিরে। অশ্ব্যানি ॥—৭।১৮।১৯

অজগণ, শিগ্রুগণ, ও যক্ষুগণ, অশ্ব মস্তক সকল (ইন্দ্র নিমিত্ত) আহরণ করিয়াছিল।

কৃপ, (১) গন্ধার (২) প্রভৃতি জাতির নাম ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের বিষয় পরে কিছু বিস্তারিতভাবে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এই সকল জাতি ভিন্ন অনেক ঋষি-বংশের নাম ঋগ্বেদে বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন অথর্বা (৩) ও তাঁহার পুত্র দধীচি, কবি ও তাঁহার পুত্র উশনা, (৪) মনু ভৃগু, অঙ্গিরা (৫), কুশিক-বংশীয় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, (৬) তৃৎসু-বংশীয় বসিষ্ঠ (৭)

---

(১) স্থূপেকাসং। মা। অব। সৃজন্তি। অন্তঃ

পথাং। সহস্রৈঃ। রুশমাসঃ। অগ্নে।—৫।৩০।১৩

হে অগ্নে! রুশমগণ আমাকে সুন্দর গৃহ ও সহস্র গো দান করিয়াছে।

যৎ। যা। রুমে। রুশমে। শ্যাবকে। কৃপে

ইন্দ্র। মাদয়সে। সচা।—৮।৪।২

হে ইন্দ্র! যখন তুমি রুমে, রুশমে, শ্যাবকে, কৃপে (ইহাদের) সহিত মত্ত হও।

(২) গন্ধারীণাম্ইব। অবিকা।—১।১২৬।৭

গন্ধারীদিগের মেষসদৃশ।

(৩) যজ্ঞৈঃ। অথর্বা। প্রথমঃ। বি। ধারয়ৎ।—১০।৯২।১৩

অথর্বা যজ্ঞ সকলের দ্বারা প্রথম ধারণ করেন।

(৪) উশনা। কাব্যঃ। ত্বা। নি। হোতারং। অসাদয়ৎ।

যমগ্নিং। ত্বা। মনবে। জাতবেদসম্ ॥—৮।৪৩।১৭

কবি-পুত্র উশনা তোমাকে হোতৃরূপে স্থাপন করিয়াছেন; জাতবেদা তোমাকে মনুর নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে (স্থাপন করেন)।

(৫) বিতা। অদধুঃ। ভৃগবঃ। বিক্ষু। আয়োঃ।—২।৪।২

ভৃগুগণ ইঁহাকে (অগ্নিকে) আয়ুর বিশদ্বিগের মধ্যে দুই ভাগে ধারণ করিয়াছিলেন।

উত। ত্বা। ভৃগুবৎ। শুচে।

মনুষ বৎ। অগ্নে। আহুত অঙ্গিরস্বৎ। হবামহে ॥—৮।৬০।১৩

হে শুচি, আহুত অগ্নে! তোমাকে (আমরা) ভৃগুর মত, মনুর বৎ, অঙ্গিরা সদৃশ আহ্বান করিব।

(৬) বিশ্বামিত্রঃ। যৎ। অবহৎ। সুদাসম্

অপ্রিয়ায়ত। কুশিকেভিঃ। ইন্দ্রঃ।—৩।৫৩।৯

যখন বিশ্বামিত্র সুদাসকে লইয়া যাইতেছিলেন, ইন্দ্র কুশিকদিগের সহিত প্রিয়বৎ আচরণ করিয়াছিলেন।

সসর্পরীঃ। অমতিং। বাধয়ানা। বৃহৎ। মিমায়। জমদগ্নি দত্তা।—৩।৫৩।১৫

অজ্ঞানকে দূর করিতে সমর্থা, জমদগ্নি-দত্তা বাণী সকল প্রভূত শব্দ করিতেছে।

(৭) বসিষ্ঠস্য। স্তবতঃ। ইন্দ্রঃ। অশ্রোৎ

উরুং। তৃৎসুভ্যঃ। অকৃণোৎ। উ। লোকম্।—৭।৩৩।৫

ভরদ্বাজ (১), গুনহোত্র বংশ, (২) গৃৎসমদ বংশ (৩) কণ্ব (৪) প্রভৃতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ঋষি-বংশীয়গণ ঋগ্বেদের রচয়িতা ছিলেন। ইঁহারা কোন্ কোন্ রাজার সময়ে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

যে সকল জাতি আর্য্যদিগের শত্রু ছিল, তাহাদের যে সকল নাম ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু উহাদের বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধে তেমন কিছু বলা হয় নাই। এক্ষণে আমরা উহাদের সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে পণি নামক এক জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৫)। উহাদিগকে সম নামেও অভিহিত হইতে দেখি (৬)। সায়নাচার্য্য

ইন্দ্র স্তবকারী বসিষ্ঠের (ওর) প্রার্থনা করিয়াছিলেন; এবং উরুলোককে তৃৎসুদিগকে দান করিয়াছিলেন।

(১) যাভিঃ। বিপ্রং। প্র। ভরদ্বাজং। আবতম্।—১।১১২।১২

যে সকল (রক্ষার) দ্বারা বিপ্র ভরদ্বাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) তীব্রঃ। বঃ। মধুমান্। অস্তু। গুনহোতেষু। মৎসরঃ।
একং। যিদ্বঃ। কামম্।—২।৩১।১৪

তোমাদিগের গুনহোত্রদিগের মধ্যে এই মধুসদৃশ তীব্র মত্তজনক (সোম); এই কামনাকে পান কর।

(৩) স্তুষা। যথা। গৃৎসমদাসঃ। অগ্নে.....।—২।৪।৬

(৪) যেন। ভাবা। তুর্বশং। যদুং।
যেন। কণ্বং। ধনস্পৃতম্।
তারে। সু। তস্য। ধীমহি।—৮।৭।১৮

যাহার দ্বারা তুর্বশকে, যদুকে রক্ষা করিয়াছ, যাহার দ্বারা ধনাকাঙ্ক্ষী কণ্বকে ধনলাভার্থ তাহাকে প্রার্থনা করে।

(৫) অতিত্রে। অন্ধঃ। পণয়ঃ। সসন্তু।
অবরাময়ানাঃ। তমসঃ। বিমধ্যে।—৪।৫১।৩

অতিত্রের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে পণিগণ অজ্ঞানী হইয়া বাস করুক।

(৬) পর্যেষিণং। বিমুদা। মনঃ।—৯।৫৩।০

পণির মন ও (ধনার্থ) কোমল কর।

তয়া। সমস্য। হৃদয়ং। আয়িথ।
কিকিরা। কৃণু।—৬।৫৩।৪

তাহার (অর্থাৎ অস্ত্রীর) দ্বারা সমের হৃদয় আটিয়া কিকিরা কর।

[অন্য এক শ্লোকের পূর্ণ উদ্ধার দেওয়া হইল।]

সম অর্থে শত্রু করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, পণি জাতি আর্য্যদিগের সমকক্ষ ও সমানবর্ণ ছিল বলিয়া সম নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে ইহারা ধনবান, বাণিজ্যকারী ও কুসীদজীবী জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১) ইহারা কিন্তু আর্য্যদিগের মত যজ্ঞ করিত না, এবং আর্য্য ঋষিদিগকে দান (২) করিত না। সেই জন্য তাহারা দেবত্ব ও মঘবা হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যেমন পৃথিবীতে পণি জাতি ছিল, সেইরূপ দেবলোকেও দেবশত্রু-রূপে দেব-পণি ছিল, আর্য্যগণ এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। এই দেবপণিদিগের সহিত সূর্য্য, উষা, অগ্নি, গো লইয়া ইন্দ্রাদি আর্য্য দেবতাদিগের বিবাদ হইয়াছিল। আর্য্যদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, দেবপণিদিগের শ্রেষ্ঠ 'বল' কোনও সময়ে সূর্য্য, অগ্নি গো, উষা হরণ করে। ৩

উত। ঘ। নেমঃ। অন্যতঃ। পুমান্ ইতি। ব্রুবে। পণিঃ।
সঃ। বৈরদেয়ে। ইত্। সমঃ ৭—৫।৩১।৮

অর্থ—এবং নেম অন্যত পুরুষ পণি ইহা বলি। সে বৈরদেয়বাসী সম।

ভূতৈ। অন্নে। সমস্যা। মহঃ। ধনস্য। মনীষাঃ —১০।২৯।৪

অর্থ—সমের ভরণীয় অন্নের নিমিত্ত মহা (আহ্বান) মনীষিগণ প্রাপ্ত হউন।

(১) ন। রেবতা। পণিনা। সখ্যং। ইন্দ্রঃ
অসুতুতা। সুতপাঃ। গং। দৃণীতে।—৪,২২।৭

সোমপানকারী ইন্দ্র, যাহারা সোমযজ্ঞ করে না, এরূপ ধনবান পণির সহিত সখ্য উচ্চারণ করেন না।

ইন্দ্রঃ। বিবান্। বেষ্ণাটান্। অহঃদৃশঃ
উত। ক্রত্বা। পণীন্। অভি।—৮।৫৫।১০

সকল কুসীদজীবী, দিবসগণনাকারী পণিদিগের (সমন করিয়া) কার্য্য দ্বারা (অভিভব করা)।

চোদয়মাণঃ। ইন্দ্র। ভূরি। বামম্।
মা। পণিঃ। ভূঃ। আপ্সুতঃ। নৃবিৎ। প্রবুদ্ধ।—১।৩৩।১০

হে প্রবুদ্ধ ইন্দ্র! তুমি শোভন (দ্রব্য) দাতা হও; আমাদিগের হইতে অধিক পণি যেন না হয়।

[সায়ন অর্থ করেন—অস্মৎ অধি অস্মাস্থ পণির্ব্যবহারী মাভূদ্যাঃ গবাং মূল্যং আবাচক্ষে-ত্যর্থঃ। অর্থাৎ, আমাদিগকে গবাদি প্রদান করিয়া পণির মত (অর্থাৎ ব্যবসায়ীর মত) মূল্য লইও না।]

(২) ন। দেবত্বং। পণয়ঃ। ন। আনশুঃ। মঘম্।—১।৫১।৯

পণিগণ দেবত্বকে, মঘকে প্রাপ্ত হয় নাই।

(৩) সঃ। ঊম্বাং। অবিন্দৎ। গাঃ। ব্রঃ। সং
অগ্নিং। সঃ। অ[illegible]। বে[illegible]। ৬মসিম

প্রাচীন নবগ্ব দশগ্ব অঙ্গিরাগণ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবের সাহায্যে পণি-দিগের নিকট হইতে উহাদিগকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনা ঋগ্বেদে কিম্বদন্তী রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা ইহা হইতে অনুমান করি যে, আর্য্য ও পণিগণ পূর্ব্বে এক দেশেই বাস করিতেন। কিন্তু এক সময়ে সেখানে পণিগণের প্রভুত্বই অধিক হইয়াছিল। ক্রমে আর্য্যগণ তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। দেখা যায়, পণ, পণ্য, বিপণি প্রভৃতি বাণিজ্যসংক্রান্ত শব্দ বাণিজ্যপ্রধান পণি জাতির নাম হইতেই উৎপন্ন। পণি জাতির প্রধান দেবতার নাম 'বল'।

সমজাতীয় পণিদিগের নাম ও কর্ম্ম হইতে উহাদিগকে সেমেটিক-জাতীয় ফিনিসীয় বলিয়া মনে হয়। রোমানগণ কার্থেজবাসীদিগের সহিত যে যুদ্ধ করেন, তাহা পুণিক্ (Punic) যুদ্ধ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এসিয়া-মাইনর-বাসী ফিনিসীয়গণ কার্থেজ নগরের প্রতিষ্ঠা করে। আর্য্য রোমানদিগের নিকট ইহারাই পুণি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সকলেই জানেন, বাণিজ্যপ্রধান ও কুসীদজীবী ফিনিসীয়গণ প্রভূতধনবান ছিল। অতএব অনুমান করি, বৈদিক আর্য্যগণ এই জাতীয় লোকের সহিত একই দেশে বাস করিতেন, এবং ইহাদিগের উপর প্রভুত্বও স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে শত-দাঁড়যুক্ত নৌকার উল্লেখ দেখা যায়। (১) বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্র-যাত্রারও উল্লেখ আছে। (২) বণিক্ ব্যবসায়ীগণকে বণিক্ বলা হইত। (৩) সম্ভবতঃ 'পনিক' শব্দ হইতেই আর্য্যগণ বণিক্ শব্দ প্রাপ্ত

বৃহস্পতিঃ। গোত্রভিদঃ। বলস্য। নিঃ
মজ্জানং। ন। পর্বণঃ। আহরৎ্। সরমা।—১০।৬৮।৯

তিনি উষাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি সূর্য্যকে, তিনি অগ্নিকে (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন); তিনি মন্ত্রের দ্বারা অন্ধকার সকল দূর করিয়াছিলেন। বলের গো সেহ হইতে, অস্থ হইতে মজ্জার মত, (ইহাদিগকে) বৃহস্পতি বাহির করিয়াছিলেন।

(১) উহথুঃ। ভুজ্যুং। অস্তং। পৈতৃষ্বস্রিয়াম্।
নাবং। আতস্থিবাংসম্।—১।১১৬।৫

(অশ্বিদ্বয়) শতদাঁড়যুক্ত নৌকায় স্থাপন করিয়া ভুজ্যুকে পৈতৃষ্বসেয়ী হইতে বহন করিয়াছিলেন।

বেদ। নাবঃ। সমুদ্রিয়ঃ।—১।২৫।৭

সমুদ্রে স্থিত (বরুণ) নৌদিগকে জানেন।

(২) যয়া। বণিক্। ব কুঃ। পণ। পুরীষম্।—৫।৪৫।৬

হইয়াছেন। যে সকল পণি অগ্নি উপাসনা করিয়াছিল, বোধ হয়, তাহারা আর্য্যদিগের মধ্যে বণিক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দাস ও দস্যুগণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ঋগ্বেদের এক স্থানে দেখা যায়, তাহারা 'অনাসঃ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১) সায়নাচার্য্য অনাসঃ অর্থে বলেন,—আস্যরহিতান্ (অর্থাৎ মুখহীন), অতএব বোবা। আমরা অনুমান করি, উহাদের নাক চেপ্টা ছিল। দেখা যায়, যুদ্ধকালে উহারা স্ত্রী পুরুষে যুদ্ধ করিত। (২) ইহাদিগকে 'মৃধ্রবাচ' বলা হইত। (৩) ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পণি, দাস ও দস্যুদিগের ভাষা আর্য্য ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। উহারা দনুর বিশ ছিল বলিয়া উহাদিগকে 'দানব' বলা হইত। (৪) দানবদিগেরও রাজা ছিল।

যে। অস্যাঃ। আচরণেষু। প্রিয়েষু। সন্তঃ। ন। প্রবস্যবঃ।—১।৪৮।৩

ধনকামিগণ যেমন সমুদ্রে (নৌকা) প্রেরণ করেন, সেইরূপ যাহারা তাঁহার (অর্থাৎ উষার) আগমনে (রথ প্রেরণ করেন)।

সমুদ্রং। ন। সংচরণে। সনিষ্যবঃ।—১।৫৬।২

ধনকামী (বণিক)গণ যেমন সমুদ্রে বিচরণ করিতে (নৌকায়)।

(১) অনাসঃ। দস্যূন্। অমৃণঃ। বধেন।—৫।২৯।১০

নাসিকাহীন দস্যুদিগকে বধ (অর্থাৎ বজ্র) দ্বারা সংহার করিয়াছ।

(২) স্ত্রিয়ঃ। হি। দাসঃ। আয়ুধানি। চক্রে।

কিম্। মা। করন্। অবলানি। অস্য। সেনাঃ।—৫।৩০।৯

দাস (নমুচি) স্ত্রীদিগকে অস্ত্র করিয়াছিল। ইহার অবলা সেনা আমার কি করিবে?

(৩) নি। দুর্যোণে। অবৃণক্। মৃধ্রবাচঃ।—৫।২৯।১০

মৃধ্রবাক্যদিগকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছেন।

মৃধ্রবাচঃ হিংসিতবাগিন্দ্রিয়ান্ অসুরান্ ইতি সায়ণঃ।

দনো বিশঃ। ইন্দ্র। মৃধ্রবাচঃ।—১।১৭৪।২

হে ইন্দ্র! মৃধ্রবাক্যযুক্ত দনুর বিশ (অর্থাৎ প্রজা)।

নি। অক্রতূন্। গ্রথিনঃ। মৃধ্রবাচঃ। পণীন্। অশ্রদ্ধান্।

অবৃধান্। অযজ্ঞান্।—৭।৬।৩

অক্রতু, গ্রন্থক, মৃধ্রবাক্যযুক্ত, (হিংসিতবাগিন্দ্রিয়যুক্ত), অশ্রদ্ধাকারী, অবর্ধনকারী, অযজ্ঞ পণিদিগকে।

(৪) নি। মায়িনঃ। দানবস্য। মায়াঃ

অপাদধঃ। পপিবান্। সুতস্য।—২।১১।১০

(অর্থাৎ কুলুক) যাহা সকল নিপাতিত করিয়াছেন।

কিন্তু উহারা আভিজাত্যিক। (১) ইহারা অহি বা বৃত্র নামেও অভিহিত হইত। (২) বোধ হয়, দানবগণ সর্প পূজা করিত; সেই জন্য ইহারা অহি নামে বিখ্যাত ছিল।

ঋগ্বেদে আমরা মৃধ্র, যাতুধান, রাক্ষস, কিকীদিন্ প্রভৃতি অনার্য্য জাতিদিগেরও নাম প্রাপ্ত হই। মৃধ্রদিগের দেবগণ গ্রীবাশূন্য বলিয়া বর্ণিত। (৩) এই মৃধ্র জাতির অস্তিত্ব আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়েও প্রাপ্ত হইতেছি। কারণ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত। যখন আরব দেশের মুসলমানগণ স্পেন অধিকার করেন, তখন স্পেনবাসী আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে মূর আখ্যা প্রদান করেন। অতএব, আর্য্য স্পেনীয়দিগের ভাষায় মূর শব্দ ছিল, এবং উহা তাঁহারা শত্রুদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে। সংস্কৃতে মূর শব্দের অর্থ মূঢ়। স্পেনীয় ভাষাতেও ইহার এইরূপ কোনও মন্দ অর্থ ছিল।

---

(১) দশ। রাজানঃ। সমিতাঃ। যযক্ষুবঃ
সুদাসং। ইন্দ্রাবরুণা। ন। যুযুধুঃ।—৮।৮৩।৭
হে ইন্দ্র বরুণ! দশ অযজ্ঞকারী রাজা একত্র হইয়া সুদাসকে যুঝিতে পারে নাই।

(২) উপ। প্র। ইত। কৃণিকাঃ। ইব। ক্রতুম্।
অধ। রাধঃ। প্র। মৃক্ষত। সুদাসে।
রায়া। বৃত্রং। জঙ্ঘনৎ। প্রাক্। অপাক্।
উদক্। অথ। যাতনে। বধৈঃ। অ। পৃথিব্যাঃ।—৭।৩৩।১১
হে কৃণিকাগণ! সুদাসের যজ্ঞে সত্বর গমন করিয়া ধনলাভে উত্তেজিত কর; রাজা (সুদাস) পূর্ব, পশ্চিম, উত্তরের বৃত্রদিগকে হনন করিয়াছেন; অনন্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানে যজ্ঞ করিতেছেন।

দাসপত্নীঃ। অহিগোপাঃ। অতিষ্ঠন্।
বিরুদ্ধাঃ। আপঃ। পণিনা। ইব। গাবঃ।—১।৩২।১১
অহি (অর্থাৎ বৃত্র) দ্বারা রক্ষিত, দাস (অর্থাৎ বৃত্র) দ্বারা পালিত জল সকল, পণি দ্বারা (অবরুদ্ধ) গোসকলের ন্যায়, অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিয়াছিল।

(৩) মা। তে। যজ্ঞঃ। মৃধঃ। যথা
মূরদেবঃ। ইন্দ্র। সত্যে। অবতঃ।—৮।২১।১৫
হে ইন্দ্র! শত্রুগণ (অর্থাৎ সোমযজ্ঞকারিগণ) যেমন তোমার আপনার, মূরগণ সেরূপ সত্য প্রাপ্ত না হউক।

বিগ্রীবাসঃ। মূরদেবাঃ। অদন্ত
মা। তে। দৃশন্। সূর্যঃ। উৎচরন্তম্।—৭।১০৪।২৩

যাতুধান নামে আর এক জাতির উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখা যায়। ইহাদের নানা সম্প্রদায় ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, একটী ঋকে উলূকযাতু, শুশুলূকযাতু, শ্বযাতু, কোকযাতু, শ্যেনযাতু ও গৃধ্রযাতু নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) বোধ হয় ইহারা রক্ষোজাতীয় ছিল, এবং উলূক, শ্ব, কোক, গৃধ্র প্রভৃতি উহাদের উপাধি ছিল। যাতুধান নাম পুরুষ রাক্ষসে এবং শাশদানা নাম স্ত্রীরাক্ষসীতে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। (২) কোনও কোনও ঋকে যাতুধান শব্দের পরিবর্ত্তে যাতুজ শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩) এই শব্দ দ্বারা কি মনুষ্য জাতিকে বুঝাইতেছে?

কিমীদিনগণ ব্রহ্মদ্বেষী, ঘোরদর্শন, আমমাংসভোজনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৪) প্রাচীন মিসরবাসীগণ মিসির দেশকে কমিৎ (অর্থাৎ কৃষ্ণ) বলিত। কিমীদিনগণ কি কমিৎবাসী ছিল? সে কালে কোনও আর্য্যকে যাতুধান বা রাক্ষস বলিলে তিনি অতিশয় রুষ্ট হইতেন। (৫) উদ্ধৃত ঋকে শুচি বা শ্বেত রাক্ষস বলায় মনে হয়, রাক্ষসগণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। একটী ঋকে উহাদিগকে তমোবৃধ বা অন্ধকারবর্দ্ধক বলা হইয়াছে। (৬) ইহাতে তাহাদের কৃষ্ণবর্ণের আভাস পাওয়া যায়।

---

(১) উলূকযাতুং। শুশুলূকযাতুং। শ্বযাতুং।
শ্বযাতুং। উত। কোকযাতুম্।
শ্যেনযাতুং। উত। গৃধ্রযাতুং।
বৃষদা ইং। গ। মৃণ। রক্ষসঃ। ইন্দ্র।—৭।১০৪।২২।

হে ইন্দ্র। উলূকযাতু, শুশুলূকযাতু, শ্বযাতু, কোকযাতুকে বিনাশ কর। শ্যেনযাতু ও গৃধ্র রাক্ষসকে বজ্র দ্বারা সংহার কর।

(২) ইন্দ্র। অহি। পুরাসং। যাতুধানম্।
উত। স্ত্রিয়ং। মায়য়া। শাশদানাম্।—৭।১০৪।২৩

হে ইন্দ্র। পুরুষ যাতুধান (ও) স্ত্রী শাশদানাকে মায়া দ্বারা নিধন কর।

(৩) যাতুজূনাং। আমিম্। অভাধিম্। প্র। মৃণীহি। শত্রূন্।—৮।৪।৫

(৪) ব্রহ্মদ্বিষে। ক্রব্যাদে। ঘোরচক্ষসে
দ্বেষঃ। ধত্তম্। অঘায়ুষে। কিমীদিনে।—৭।১০৪।২

ব্রহ্মের দ্বেষ্টা, আমমাংসভক্ষণকারী, ঘোরদর্শন, কিমীদিনের জন্য অনবরত দ্বেষ ধারণ কর।

(৫) যঃ। মা। অঘায়ুং। যাতুধান্। ইতি। আহ
যঃ। বা। রক্ষাঃ। শুচিঃ। অগ্নিঃ। ইতি। আহ।—৭।১০৪।১৩

অর্থাৎ আমাকে যে যাতুধান বলিয়াছে, কিংবা (আমি) শ্বেতরাক্ষস হই' যে বলিয়াছে।

(৬) ইন্দ্র সোমা। তপতং। রক্ষঃ। উরুতং
নি। অর্পয়তম্। বৃষণা। তমঃ বৃধঃ।—৭।১০৪।১

আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া দাস ও দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পুর সকল অধিকার করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের বিষয় ঋগ্বেদের ঋষিগণ তাঁহাদের রচিত ঋক্ সকলে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

বাঁশের কথা।

আমাদের দেশে গৃহনির্ম্মাণের যে সমস্ত উপাদান আছে, তন্মধ্যে বাঁশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহনির্ম্মাণ ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রকারেও ইহা যে কত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্প্রতি কাগজ প্রস্তুত জন্যও ইহার আদর হইতেছে। যন্ত্র-সাহায্যে বাঁশগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়; তৎপর সেই খণ্ডিত বাঁশগুলিকে যন্ত্র-সাহায্যে চূর্ণীকৃত করিয়া মণ্ড (Pulp) প্রস্তুত হয়। সেই মণ্ড হইতেই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এ দেশে বাঁশও যেরূপ প্রচুর জন্মিয়া থাকে, ইহার ব্যবহারও সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঁশ কিরূপে জন্মে, এবং বৃদ্ধি পায়, এই প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অপরাপর বৃক্ষলতাদির যেমন প্রতি বৎসর কিংবা এক বৎসর অন্তর (১) ফল ফুল হইয়া থাকে, বাঁশ গাছের সেরূপ হয় না। সাধারণতঃ ৩০।৪০ বৎসর (২)

হে ইন্দ্র ও সোম! হে বৃষ্ণিবয়! রাক্ষসকে নিস্তাপ নাও, অন্ধকারকে হনন কর, নীচে স্থাপন কর।

(১) চাম্বুগার (Tarsiogenes Kurzii) যে বৎসর ফুল হয়, তার পরের বৎসর সেই গাছের ফল পাকিয়া থাকে।

(২) কোথও কোথও আবার বাঁশের বৎসর বৎসর ফুল হইয়া থাকে। ইহাদের নাম Dandrocalamus Strictu. এবং Dandrocalamus Hamiltonii.

"A few clumps in a forest or a few culms here and there flower every year but at the interval of a certain number of years it flowers gregariously,"—Kanjilal's Flora.

Dandrocalamus Strictus মিটোল বাঁশ। কখনও কখনও নানারূপ রকমের বাঁশও হইয়া থাকে। ইহার গাঁটগুলি উঁচু উঁচু। লাঠী, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি ইহা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমেরা অনেক সময় এই বাঁশের লাঠী ব্যবহার করিয়া থাকে।

অন্তঃ ইহার এক একবার ফুল হইয়া থাকে। সেই ফুল হইতে যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা পাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বাঁশের ঝাড় ক্রমশঃ মরিয়া যায়। সেই বীজ হইতে ক্রমে চারা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উহা ঝাড়ে (Clump) পরিণত হইয়া থাকে।

বাঁশের চারাটী যখন প্রথম বীজ হইতে জন্মে, তখন উহাকে ঠিক একটী ঘাসের মতন দেখা যায়। উহার ঠিক সেইরূপ পাতলা পাতলা আঁশের ন্যায় শিকড় (Fibrous root) হয়, এবং ডাঁটার (Stalk) গোড়াও সেইরূপ সোটা হইয়া থাকে। যে বৎসর চারাটী জন্মে, সে বৎসর উহার কয়েকটী নূতন পাতা বাহির হওয়া ব্যতীত আর কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। দ্বিতীয় বৎসর ঐ চারায় একটী পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সেই পাতলা পাতলা আঁশের ন্যায় শিকড় হইতে উহার একটী নূতন রকমের মোটা মূল (Rhizome) বাহির হইয়া থাকে। সেই মূলের অগ্রভাগ ক্রমে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়া আর একটী চারায় পরিণত হয়। সেই চারা ক্রমে বড় হইয়া তাহা হইতে পুনরায় সেইরূপ আর একটী মোটা মূল (Rhizome) বাহির হয়।

এইরূপে প্রতি বৎসর মাতৃচারা হইতে একটী করিয়া মোটা মূল বাহির হইয়া থাকে, এবং সেই মূল হইতে আর একটী নূতন চারা জন্মিতে থাকে। দ্বিতীয় বৎসরের চারাটী প্রথম বৎসরের চারা অপেক্ষা অগ্রে প্রথম কিছু দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপ হওয়ার একটী কারণ আছে। প্রথম বৎসরের চারা হইতে যে মোটা মূল বাহির হয়, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে চারা-বর্দ্ধনোপযোগী খাদ্যসমূহ (Carbo-hydrates) সঞ্চিত থাকে। পরবর্ত্তী বৎসরের চারা সেই সঞ্চিত খাদ্য গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় বলিয়াই উহা প্রথম প্রথম দ্রুত বাড়িয়া থাকে। কিছু কিছু দিন পরে উহার বৃদ্ধির গতি কমিয়া গিয়া পূর্ব্ব বৎসরের চারার ন্যায় সমভাবাপন্ন হয়।

চারা প্রথম বৎসরে সাধারণতঃ ১ ফুট কিংবা ১½ ফুটের অধিক দীর্ঘ হয় না। দ্বিতীয় বৎসরের চারা ফুট তিনেক দীর্ঘ হইয়া থাকে। ১৯১৩ সনে বাঁশের (১) বীজ হইতে যে চারা জন্মিতে হইয়াছিল, আমরা ১৯১৭ সনে

Dandrocalamus Hamiltonii গাছের কাছ থেকে ইহার চারা ভাল, তাহাই প্রভৃতিই বেশী প্রচলিত হইয়া থাকে। ইহাকে কোনও কোনও স্থানে বড় বাঁশ বলে।

(১) মুলি বাঁশ (বঙ্গদেশ) তরুই (আসামী), কটি (কাছাড়) Melocanna Bambusoides.

দেখিয়াছি যে, উহা হইতে প্রায় ১৫ ফিট দীর্ঘ নূতন চারা জন্মিয়াছে। আমরা অনুমান করিলাম, সেই বাঁশের ঝাড় পূর্ণায়তনের হইতে আরও প্রায় ২৩ বৎসর লাগিবে। আর এক জায়গায় দেখিয়াছি, ১৯১৪ সনে যে ঝাড় (১) বীজ হওয়ায় মরিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে এখন যেরূপ বাঁশ জন্মিতেছে, আশা করা যায়, তাহা ৩৭ বৎসরের মধ্যেই ব্যবহারোপযোগী হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বীজ হইতে যে বাঁশের গাছ জন্মিয়া থাকে, তাহা ৩৭ বৎসরের মধ্যেই সাধারণতঃ পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়।

বাঁশ পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইলেই তাহা ব্যবহারোপযোগী হয় না। পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইলেও প্রথম বৎসরে যে বাঁশটী (Culm) জন্মে, তাহা অত্যন্ত নরম থাকে। তখন উহার গায়ে প্রতি গাঁটের সঙ্গে একটী করিয়া খোলা (Sheath) জড়ান থাকে। এই সময় প্রথম প্রথম উহাতে কোনও পত্রাদিও থাকে না। গায়ের ত্বকটী চকচকে সাদাটে মতন (Waxy) হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের গাছ হইতে যে মোটা মূল বহির্গত হয়, তাহার সঞ্চিত খাদ্য শোষণ করিয়াই উহা তখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই মোটা মূলগুলিতে এরূপ খাদ্য সঞ্চিত থাকে যে, নূতন চারাটী অঙ্কুরিত হইলে পর ৩৪ মাসের মধ্যেই উহা পূর্ণাকার ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ পূর্ণাকার ধারণ করিলেই উক্ত মূলের সঞ্চিত খাদ্য প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই জন্য নবোদ্গত বাঁশগাছে প্রথম প্রথম পত্রাদি কিছুই জন্মিতে পায়ে না। কিছু দিন পরে উহাতে সামান্য কিছু পত্রাদির উদ্গম হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বর্ষে উক্ত গাছটী আর সেই মোটা মূলের সঞ্চিত খাদ্যের উপর নির্ভর করে না। এই সময়ে সেই মূলের সমস্ত সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষ হইয়া যায়। সে তখন মাটী হইতে রস টানিয়া লইয়া নিজেই নিজের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়।

মানুষের পাকস্থলী দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, বৃক্ষলতাদির পত্র দ্বারা সেইরূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়। উহারা মূল দ্বারা রস টানিয়া পত্রের উপর লইয়া যায়। পত্র বায়ু হইতে বাষ্প (Carbon) টানিয়া লইয়া তাহার সহিত মিলাইয়া দেয়। সেই মিশ্রিত দ্রব্যসমূহ আলোক ও পত্রমধ্যস্থিত

(১) আমাদের বাঁশ (বঙ্গদেশ), কালিয়া (আসাম) Oxytenanthera Auriculata.

সবুজ বর্ণের পদার্থ (Chlorophyle) (১) সাহায্যে খাদ্যে পরিণত হইয়া আবার নীচে নামিয়া আসে। তাহার দ্বারাই উদ্ভিদের দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রথম বর্ষে বাঁশ যে কিছু পাতা জন্মিয়াছিল, সেই পত্রের সাহায্যে দ্বিতীয় বর্ষের মূলোত্থিত রস প্রচুরপরিমাণে খাদ্য প্রস্তুত করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। তাহার ফলে এই সময়ে গাছটীতে ক্রমে ক্রমে আরও নূতন পত্র ও শাখা প্রশাখার উদ্গম হইতে থাকে। প্রতি গাটের গায়ে যে খোলা (Sheath) জড়ান ছিল, তাহাও ক্রমশঃ আলগা হইয়া মাটীতে পড়িতে থাকে। রঙও একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া কালাটে-গোছ হয়। তবে তাহার চাক্‌চিক্য ভাবটী চলিয়া যায় না। এই সময়ে গাছটীকে এরূপ দেখায় যে, তখন অনেকেই ইহাকে ঘরবহারোপযোগী বলিয়া স্থির করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বর্ষের বাঁশ কখনও উপযুক্ত-পরিমাণে শক্ত (lignified) হয় না। ইহা দ্বারা যে কাজ করা যাইবে, অল্পকাল-মধ্যে তাহা ঘুণ ধরিয়া খারাপ করিয়া ফেলিবে।

তৃতীয় বর্ষে গাছটীতে আরও শাখা প্রশাখার উদ্গম হইয়া পত্রাদিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। উহার সমস্ত খোলাগুলি তখন পড়িয়া যায়। পত্রের আর চাক্‌চিক্য থাকে না।—রং কালাটেগোছের (dull green) হয়। এই সময়ে উহা উপযুক্তপরিমাণে শক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। এই সময় হইতে অন্যান্য বৃক্ষ-লতাদি যে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বাঁশও সেই নিয়মে বর্দ্ধিত হয়। তখন উহার বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

বাঁশ (২) কিরূপ হারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে দেরাদুন ফরেষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ অস্‌মস্টন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নিজে পরীক্ষা পূর্ব্বক তাহার ফলাফল (৩) প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

The culms there appeared early in August their growth

---

(১) যে পদার্থ বিদ্যমান থাকায় পত্রের বর্ণ সবুজ হয়, তাহাকেই Chlorophyle বলে।

(২) Dandrocalamus Giganteus, বড় বাঁশ।

(৩) S. Indian Forester, February, 1918.

in height was completed by the end of November. The growth was at first very slow, gradually quickening for 4 to 6 weeks until the bamboo was some 12′ or so in height when a maximun rate of growth was attained which was maintained fairly uniformly for several weeks after which the rate gradually decreased till the end of November when growth ceased.

অর্থাৎ, যে বাঁশটী অগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে জন্মিয়াছিল, তাহা নভেম্বর মাসের শেষভাগেই পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়। প্রথমে ইহা অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। তৎপরে ৪ হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহার গতি ক্রমশঃ বাড়িয়া আনুমানিক ১২′ দীর্ঘ হইয়াছিল। ইহার পর ইহার গতি আরও বর্দ্ধিত হইয়া কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঠিক একই ভাবে বাড়িতেছিল। তৎপরে ইহার গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া নভেম্বর মাসের শেষাশেষি পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়।

তিনি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে যে বাঁশটী নূতন বহির্গত হইয়াছিল, তাহা ৩½ মাসে অর্থাৎ নভেম্বরের শেষভাগে দৈর্ঘ্যে ৭১′ হইয়াছিল। তিনি বলেন, বর্ষাকালের মধ্যভাগেই বাঁশ বাড়িতে থাকে, এবং বর্ষা শেষ হইলেও ২।১ মাস পর্য্যন্ত উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়। বায়ুমণ্ডলে শৈত্য ভাব যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হয়, অর্থাৎ রাত্রিকালে যখন বৃষ্টি পড়িতে থাকে, অথবা বৃষ্টিপাতের অব্যবহিত পরেই ইহার বৃদ্ধির হার সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত হইয়া থাকে।

"The maximum rate of growth is attained when the relative humidity is greatest or in other words when the atmosphere is saturated and this is the condition at night both during and shortly after rains.

মিঃ অস্মস্টন একাদিক্রমে এক পক্ষকাল উহার বৃদ্ধির গতি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ-কালে তিনি দেখিয়াছেন যে, দিবা অপেক্ষা রাত্রিতে বৃদ্ধির হার প্রায়ই দ্বিগুণ হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের আংশিক বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম :—

তারিখ	সময়	দৈর্ঘ্য (ফুটে)	বৃদ্ধি দিবা	বৃদ্ধি রাত্রি	২৪ ঘণ্টার বৃদ্ধি (ইঞ্চিতে)
১৯শে অগষ্ট	বেলা—৬টা	৪·১৫	·১১	—	
	সন্ধ্যা—৬টা	৪·২৬			
২০শে ঐ	বেলা—৬টা	৪·৪৬	·২০	·২০	৪·৮
	সন্ধ্যা—৬টা	৪·৬৬			
২১শে ঐ	বেলা—৬টা	৪·৮৬	·১৪	·২০	৪·১
	সন্ধ্যা—৬টা	৫·০০			
২২শে ঐ	বেলা—৬টা	৫·২৭	·২৫	·২৭	৬·২
	সন্ধ্যা—৬টা	৫·৫২			

এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৯শে অগষ্ট সন্ধ্যা ৬টায় যে বাঁশটী ৪.২৬′ দীর্ঘ ছিল, ২০শে অগষ্ট ভোর ৬টার সময় তাহা ৪.৪৬′ হইল। অতএব সমস্ত রাত্রিতে উহা ·২০′ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ঐ বাঁশই ১৯শে অগষ্ট ভোর ৬টায় ৪.১৫′ ছিল, এবং সন্ধ্যার সময় উহা ৪.২৬′ ফুট হয়। অতএব দিনমানে উহা কেবলমাত্র ·১১′ বাড়িয়াছিল।

দিনমানে যাহা ·১১′ অর্থাৎ ১.৩″ বাড়িয়াছিল, রাত্রিতে তাহা ·২০′ অর্থাৎ ২.৪″ বৃদ্ধি পাইল। দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালের বৃদ্ধির হার যে দ্বিগুণ হয়, ইহা দ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে।

এই বাঁশের বৃদ্ধির হার এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে ৩১শে অগষ্টের সন্ধ্যা ৬টা হইতে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত ১৩.০″ হইয়াছিল। অর্থাৎ ১০ দিন পূর্ব্বে যাহার বৃদ্ধির হার ২৪ ঘণ্টায় ৪.৮″ ছিল, দশ দিন পরে তাহার বৃদ্ধির হার ২৪ ঘণ্টায় ১৩.০″ হইল। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে উহা দৈর্ঘ্যে ২৩′ ফুট হয়। সেই সময় হইতে উহা নয় দিনে ৯.১৮′ ফুট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ স্থলেও দেখা যাইতেছে যে, ১০ দিন পূর্ব্বে যাহা ১৩.০″ অর্থাৎ দৈনিক ১′—১″ হারে বাড়িতেছিল, দশ দিন পরে তাহারই বৃদ্ধির হার দৈনিক ১′—২″ হইল। এইরূপ আশ্চর্য্য বৃদ্ধির হার খুব কম উদ্ভিদেরই হইয়া থাকে।

বৃদ্ধির হারের এইরূপ তারতম্য অনেকটা বায়ুমণ্ডলের শৈত্যের উপর নির্ভর করে। মিঃ অস্‌বর্‌ন্‌টন নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

প্রাণময় প্রেম।

[Love in a Life—*R. Browning.*]

১

কক্ষ হ'তে কক্ষান্তর
হর্ম্ম্য মাঝে খুঁজি সারা বেলা,
দুজনে একত্র করি বাস।
হৃদয়! হৃদয় মোর!—ত্যজ শঙ্কা, নিশ্চিত এবার
মিলিবে দর্শন তার—সাক্ষাৎ সে প্রেম-প্রতিমার!
নহে—মিলিবেক শুধু শয্যায় সুবাস—
নহে সে সঙ্ক্ষোভ, যবে চকিতে চঞ্চলা
ত্যজি কক্ষ, রেখে যায় যবনিকা'পর!
দেখিছ না—পর্য্যঙ্কের আস্তরণ-কোণে
অঙ্কিত কুসুমদাম, সংস্পর্শে তাহার
মুকুলিত নব-অনুরাগে?
এখনো যেন সে আভা জাগে
হের, ওই বিমল দর্পণে,
উজল পালঙ্ক যবে শিয়োপায় তুলিল বাজার!

২

তবু ত এ দিন যায়—
শেষ নাহি হয়—কক্ষ দ্বার;
ভাগ্যের পরীক্ষা করি ফিরে—
বিশাল এ হর্ম্ম্য খুঁজি পার্শ্ব হ'তে অন্তঃস্থলে পশি;
একই ফল মিলে ভাগ্যে—আসি পশি' পলায় রূপসী।
কাটায় সারাটা দিন অন্বেষণে ফিরে?
কিসের ভাবনা তায়?—হের চারিধার
নামিতেছে ধীরে এবে গোধূলির ছায়;
তার সাথে সন্ধানের অন্ধি-সন্ধি কত
উপনীত, প্রাণে করি আশার সঞ্চার।
বুঝিছ না—আছে খুঁজিবার,
এ আঁধারে এ-ধার ও-ধার,
গোপন-প্রকোষ্ঠ আছে যত
কন্দরা-দরি, তন্ন তন্ন করি সব আছে দেখিবার।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গোরা !

১

আমার মাঝে নাইকো আমি আর,
নূপুর-বেণু তমিয়ে করে কার !
আমার পড়া, আমার শুনা পণ,
জ্ঞানের বোঝা, মানের গরবণা,
সকলি সখা, ঘুমিয়ে গেছে আজ !
ঘুচিয়ে গেছে ধরার সাথে কাজ !

২

আমার এবে কেবলি অবসর !
যেন সাধে লুটাই ধূলি 'পর !
ফেলে করে বুকের মাঝে মোর,
উথলে কেন আকুল আঁখি-লোর,
কেমন করে বলব সখা, আর !
বোঝার সে যে, নয় গো বোঝাবার !

৩

স্বপনে হেরি কাহার কাল রূপ !
চমকে উঠি, রইতে নারি চুপ !
কি যেন সে যে কেমন ইসারায়,
কি কথা মোরে ঘালিয়ে যেন যায়,
বুঝি না কিছু, বুঝিতে নাহি চাই !
আপনা শুধু হারিয়ে ফেলি তাই !

৪

কোথায় বাজে নূপুর রুনু ঝুনু !
মধুর স্বরে বাজায় কেবা বেণু !
জানি না তারে, চিনি না তারে কভু,
পরাণ-মন পাগল করে তবু,
পারি না আর রইতে নদীয়ায় !
যে যেন আজি আমারে শুধু চায় !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত !

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। পৌষ।—চিত্রকর শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'পথহারা'র কল্পনা সুন্দর। ইহার পারিপার্শ্বিক আকাশ, পাহাড়, বনভূমি, তরুলতা প্রকৃত নহে। গুহা-শিল্পের প্রকৃতিচিত্রের অনন্যসাধারণ অনুকরণ। অনুকরণে ও অনুসরণেও বটে, নন্দলাল যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে 'ক্লাসিকে'র প্রচুর আভাস আছে। চিত্রকর তাঁহার তুলিকায় ভারতীয় চিত্রের পৌরাণিক যুগের ভাব আনিয়াছেন, তাহাও সত্য। কিন্তু পৌরাণিকের 'নকলই' কি চিত্র-প্রতিভার চরম? তাহাই কি 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র একমাত্র লক্ষ্য? চিত্রের লতা-গুল্মগুলি কল্পনার রাজ্য হইতে, বা প্রাচীনতম চিত্রকরদিগের চিত্রপট হইতে সংগ্রহ না করিয়া নন্দলাল যদি প্রকৃতি হইতে আহরণ করিতেন, এবং এই ভারতীয় ভাবটিকে ভারতের দৃশ্য-জগতে ফুটাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কোনও চিত্রকলা-পদ্ধতির গৌরব ক্ষুণ্ণ হইত না। এই চিত্রের রেখা-বিন্যাসে, বর্ণের সমাহারে ও সামঞ্জস্যে যে নিপুনতার পরিচয় আছে, স্বভাবের অনুসরণ করিলে নিশ্চয়ই তাহা ব্যর্থ হইত না। 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র অনুসারী চিত্রকরগণের মধ্যে, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যসম্প্রদায়ে, নন্দলালই বোধ করি, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রতিভাশালী চিত্রকর। এমন প্রতিভা, এমন শক্তি শুধু গতানুগতিকতার অনুবর্ত্তন করিবে? প্রকৃতিকে বর্জ্জন করিয়া চিরকাল গুহা-চিত্রে দাগা বুলাইয়াই তৃপ্ত লাভ করিবে?—চিত্রখানি 'অস্বাভাবিক' হইলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মন মুগ্ধ করে, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। যাহা উদ্ভটের আবেষ্টনেও এত সুন্দর হইয়াছে, তাহা সত্যে ও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আরও সুন্দর হইতে পারিত, 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র নিতান্ত গোঁড়া ভিন্ন বোধ করি আর কেহ তাহা অস্বীকার করিবেন না। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুর হইতে সংকলিত 'আইরিশ যুদ্ধ-গান' পড়িয়া বুড়া বয়সেও রক্ত একটু গরম, মনটা একটু 'চাঙ্গা' হইয়াছিল।

'মনোনিয়া' তোরে গড়িল যে ধাতা বিবিধ বর্ণরাগে—
ইচ্ছা কি তাঁর, অত্যাচারীর চরণ সেথায় আগে?
চাই মোরা শুধু চির-স্বাধীনতা,
স্বপনেও যেন ভুলি না সে কথা,
স্বাধীনতা মোর স্বদেশ-দেবতা;
বলগে ওলন্দাজে—
দেশ-শত্রুরে তাড়াতে মোদের অনেক রক্ত আছে,
তার বিনিময়ে (হোক না অধিক) বাধ না করার মাঝে।

মনে কর দেখি হতাহত সেই বিপুল ক্ষিপ্ত জাতি
ছিল যারা সেই তোর দুর্দ্দিনে আজি যারা
সুত সাথী।
শ্যাম তৃণ-বীথি রক্তেতে লাল,
মরণের তরে নর পালে পাল
স্থির-প্রতিজ্ঞ,—কত না কপাল
রয়েছে 'ওপরী' কেতে।
কিসের শঙ্কা? আয় তোরা সবে আজি
দুর্যোগ রেতে,
হোক্ বৃথা মরা, সেও ভাল এই অপমানে
বাঁচা হ'তে

কাজী আবদুল ওদুদ 'মুসলমান সাহিত্যিক' প্রবন্ধে যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা নবীন মুসলমান সাহিত্যের জন্যই উদ্দিষ্ট বটে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের পক্ষেও তাহা সাহেবের অনেক পরামর্শ সুপথ্য। ইনিও মামুলী প্রথামত বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমানের মান-হানির অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের দায়-দফায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মুসলমান সাহিত্যিকগণ এখন বঙ্কিমের ও তাঁহার পরবর্ত্তী হিন্দু লেখকগণের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করিতেছেন; 'টিলটির বদলে পাটকেল' বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোনও হিন্দু পত্র বা হিন্দু লেখক তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। কাজি সাহেব নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের ও জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে এই প্রতি-ক্রিয়ার ফলাফলের বিচার করিয়াছেন,—'আমাদের অল্প কয়েক জন সাহিত্যিক প্রতিশোধ লইবার জন্য সৃষ্টিতে মন দিয়াছেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ হিন্দু-সাহিত্যিক মুসল-মানের নানা বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের প্রতিশোধের জন্য তাঁহারা হিন্দু-সাহিত্যিকদের উল্টা সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ হিন্দু লেখকেরা যেরূপ যেরূপ অবস্থায় হিন্দুর চেয়ে মুসলমান-চরিত্র হীন দেখাইয়াছেন, মুসলমান লেখকেরা ঠিক সেইরূপ সেইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া হিন্দুকে মুসলমান অপেক্ষা হীন অঙ্কিত করিতেছেন। এক পক্ষের এরূপ অন্যায় করা এবং অপর পক্ষের এরূপ প্রতিশোধ লওয়া নিশ্চয়ই আনন্দের সংবাদ নয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বাংলার সন্তান, উভয়ের সমবেত চেষ্টাতেই দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে; এ ক্ষেত্রে এই দুই জাতির মধ্যে একটা বিদ্বেষের ভাব থাকিয়া যাওয়া দেশের পক্ষে বড় অকল্যাণের কথা। কিন্তু আঘাত করিলেই প্রতিঘাত পাওয়া স্বাভাবিক। প্রায় সকল সাহিত্যেই কবির লেখনীর আঘাত অক্ষয় হইয়া আছে। মুসলমান মহাকবি ফেরদৌসি মাহ্‌মুদ গজনবীর কুৎসা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রতিশোধ-লিপিতে যথেষ্ট মুদ্রিতাদা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া এবং সাহনামার সুন্দর অমর কাব্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকার জন্যই উহা আজও লোকমুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। অথবা ধরুন বঙ্কিমচন্দ্রেরই কথা। আয়েষার চরিত্রাঙ্কনের জন্য মুসলমান সাহিত্যিক তাঁহাকে এই বলিয়া গালি দিবেন যে, তাঁহার এ সৃষ্টি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। পাঠানদের অন্দর-মহলে অবরোধপ্রথা খুবই দৃঢ় ছিল; সে ক্ষেত্রে আয়েষা ও জগৎসিংহের ভালবাসা হওয়া দূরে থাকুক, দেখা হওয়াই অসম্ভব। এ অভিযোগ যে সত্য, তাহা কোন সমালোচকই অস্বীকার করিতে পারেন না, কেন না বঙ্কিমচন্দ্র "কৎলুখাঁ" ও "ওসমান"কে এমন উদার করিয়া সৃষ্টি করেন নাই যে, তাঁহারা সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্তের জন্য শত্রুকে অন্তঃপুরে স্থান দিবেন। কিন্তু সত্যদৃষ্টি সমালোচক এই কথা বলিয়াই ত বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি উড়াইয়া দিতে পারেন না। আবার যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই রসের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ত বঙ্কিমচন্দ্রের দোষ ধরা যায় না। এই যে বিপন্ন বীরের প্রতি নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, এই যে মিলনের চিত্র—যে মিলন জাতি, সমাজ, পারিবারিক বন্ধন—সমস্ত গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নিজের মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সে সৃষ্টি ত কোন সাহিত্যরসিকই অবজ্ঞা করিতে পারেন না।' কাজি সাহেব এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন,—'কবি বা ঔপন্যাসিক যদি তাঁহার সৃষ্টিতে এমন কিছু রস না দিতে পারেন যাহা

[illegible] [illegible] [illegible] [

ইংরেজীনবীশ জোনাকীর দীপ্তি! তাহার ফলে যাহার দৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অনাও আবশ্যক। তাহাই ভবিষ্যতের ক্ষেত্র। ইতিমধ্যেই তাহাতে সোনার ধানের আশা করিতে পারি। স্বাতন্ত্র্য ও শিক্ষা ও সাহিত্য 'অন্যোন্যাশ্রয়ী'। এক নহিলে অন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব। জাতীয় সাহিত্যে পূর্ব্ব আদর্শের প্রবোধন আছে। পূর্ব্ব-বৈভব নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু অতীতের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। নব-যুগের নূতন ভাবের গানও চাই, তাহা শুনিবার কানও চাই। সাহিত্য যদি গান দিতে পারিত, তুমি তান দিতে পারিতে কি? আত্মশক্তির উদ্বোধন—রাষ্ট্রে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আমাদের 'নান্যঃ পন্থা নান্যের নান্যের গতিরন্যথা।' দেশের চার কোটি নর-নারী যদি তোমার পাঠক হইত, তাহা হইলে তুমি হারাণের হেনাকে নারাণের কোলে তুলিয়া দিয়া তাহাদের সাহিত্যের সাধ মিটাইতে পারিতে কি? সে সাহস করিতে কি? সে প্রবৃত্তি হইত কি?

ভারতী। পৌষ। শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদের অঙ্কিত 'চন্দ্রমুখী' তরল বর্ণের লীলা;—নীল নেষ্টনীর মধ্যে শ্বেত, মৃদু গোলাপী ও লঘুতম নীলের বর্ণাভাসে ছবিখানি যেন শিল্পী কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ, সুনীল আকাশে শুভ্র-মেঘখণ্ডের ফেনে চন্দ্রবিম্বের মত ভাসিতেছে। দেব-প্রতিমায় যেমন বর্ণচ্ছটা থাকে, তেমনই চিত্রকর শ্রীমেশ্বরপ্রসাদ চন্দ্রমুখীর পারিপার্শ্বিক-রূপে চন্দ্রবিম্বের আভাস দিয়াছেন; একটা পূর্ণচন্দ্রের 'আদলেই আঁকিয়া দিয়াছেন। অতএব, ইনি 'চন্দ্র-মুখী'। অতএব, ইহা 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'। অতএব, চন্দ্র-চারিণীর অঙ্গুলি গুলিও সেই ছাঁচে ও ছাঁদে আঁকা। সেক্সপীয়রের নাটকে আছে—চাষারা দৃশ্যপট আঁকিতে না পারিয়া পর্দ্দায় দৃশ্যের নাম লিখিয়া দিয়াছিল। রামেশ্বরপ্রসাদ তাহাদিগকেও হার মানাইয়া দিয়াছেন। এখন 'মরালগামিনী' আঁকিবার সময় ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির শিষ্যগণ চিত্রিতার দুই চরণে দুটি হাঁস আঁকিয়া দিবেন। 'গজেন্দ্র-গামিনী'র পায়ের নিশ্চয়ই হাতীর ডাক পড়িবে। 'আমর চামর কেশ' যদি ছবির নাম হয়, তাহা হইলে সুন্দরীর মাথায় চিমসের চমরী বসাইয়া ছাড়িয়া দাও। যদি 'শুকনাসের সৌন্দর্য্য ফুটাইবার ইচ্ছা থাকে, তোমার মানসীর নাকের নীচে একটি রক্ত-চঞ্চু, কণ্ঠী-ধারী, হরিত টিয়া বসাইয়া দাও। যদি দুইটি চোখকে বাটীতে পরিণত করিয়া, একটাতে ছোলা ও আর একটাতে একটু জল আঁকিয়া দাও, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা, নৈবেদ্যের চূড়ায় সোণা, দুধের উপর চিনির মত মনোহর হইতে পারে। শুনিয়াছিলাম, জলের আলিপনা নিমেষে মিলায়। 'জলের আল্পনা'র ভাগ্যেও তাহা ঘটিতে পারে। কিন্তু মাসে মাসে ধারাবাহিক 'জলের আল্পনা' চলিয়াছে। লেখকের ধৈর্য্যসাধ এবং সম্পাদক-মিথুনের ও পাঠকবর্গের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণ-কুমারী এই 'ভারতী'কে উপন্যাসের নৈবেদ্য সাজাইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন। এখন সেই ভারতী 'জলের আল্পনা'য় তাঁহার তৃপ্তি। দেবতাদের ভাগ্যেও 'দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ!' শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'হিন্দুদিগের মস্তকাবরণের পুরাতত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতিলাল মজুমদারের 'চোখের দেখা' ঐহিক চোখের দেখা বটে, কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিক চোখে খুব 'চেয়াইয়া চাহিয়া' না দেখিলে দেখা দুষ্কর। যথা—

'এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো,
যেখান-সেখান ঘুরে বেড়ায়—কাঁচপোকাটি যেন্‌ো ;
মেয়ে রেখো কোটোয় তুলে,
গোলাপ যখন পর্‌বে চুলে
টিপ্ করে' সই কপালটিতে পোরো ;
এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো।'

মনটি কাঁচপোকা! আরশোলা কাঁচপোকা হয়, শুনিয়াছি। কিন্তু এই কবির কামনার রচা মন —ওরে পোকা? সেও কি উন্মাদিনী কল্পনার মোহে কাঁচপোকা হইতে পারিবে? তার পর চিন্তাকে চাবুক লাগাও,—সেই 'পোকাটি ধর,' তাহাকে মেরে কোটোয় তুলে রাখো, যখন চুলে গোলাপ পরবে, ঠিক সেই সময়ে—যখন পারি আলতা কি স্নুট পরিবে, অবলার! সে সময়ে নয়,—টিপ্ করে', কপালটিতে পোরো,'—ইহার কাজে নৈষধ কোথায় লাগে? এমন সৃষ্টিছাড়া অনুরোধ—এমন কাঁচ পাকার কবিত্ব! আর কোন্ দেশের গীতিকাব্যে আছে? দিজু কাকের 'আষাঢ়ে' ইহার কাছে খই পায় না,'—কবি আবার উপমা কালিদাস। তাঁহার 'মনের স্বপন বক্ষের পাখার হৃত চোখের আগে ভিড় করে সব কত!' আহা! অবশ্য মঙ্গীন, তাহা অবশ্য চোখের দেখা'তেই বুঝা গিয়াছে। এখন কাঁচপোকাটা মন হইতে বাহির হইয়া "ভারতীর শুভ পক্ষবনে ভর করিল। দেখ, যদি চোখের উপর হইতে বক্ষের পাখাগুলা সরিয়া যায়। নতুবা উদ্বেগের মহাঔষধ—অথবা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা। অবস্থানিশেষে কবির তুমেক রকম হয় বটে। এ কবির নমুনা এখন, ইহার 'প্রাণের ভিতর সোনার সাঁঝ বাজে।' কিন্তু তাহার ফলভোগ করিতে হয় 'ভারতী'কে।—'যে জন সেবিবে ও পদ-কমল, তাকেই পড়িছে হবে।' শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'প্রতিভার লক্ষণে' অনেক কৌতুকজনক তথ্য আছে।—পণ্ডিত বলিতেছেন,—'পাগলা-গারদের অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, খুব ছেলেবেলাতে যাদের প্রতিভা স্ফুরিত হয়, একটু বয়স হলেই তাদের মাথা-খারাপের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে, আর পাগলদের ছেলে-পিলেদের ভিতরও এ-রকম অকালপক্কতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।'—অধিকাংশ মাসিকের, বিশেষতঃ 'ভারতী'র অবিকৃতেও ইহার প্রমাণ পুঞ্জীভূত হইতেছে।—'পূর্বকালে মিল্টন লিখিতে পারিতেন না; বলয় 'কিংবা শর্মণ্ ভাড়া' অন্য সময় বাগ্‌দেবী যে তাঁর কাছ থেকে কোথায় সরে পড়তেন, তার খোঁজ পাওয়া মুস্কিল হয়ে উঠত।' কিন্তু এ দেশের মিল্টনেরা গীতের সময়েও পাঠককে নিশ্চিন্ত হইতে দেন না। আচ্ছা, নূতন মহাকাব্য 'পৃথ্বীরাজ' কোন্ ধরণে লেখা? শ্রী...দেবীর 'কে' নিতান্ত হাল্কা-ভুলান' গল্প। এতটা কোনও পেটুক গল্প-পাঠকও হজম করিতে পারিবে, এমন আশা করি না; তবে ইহার প্রধান গুণ এই যে, নিরাশ হইবার জন্য পাঠককে দশ বিশ পৃষ্ঠা পড়িয়া মরিতে হয় না। দুই পৃষ্ঠাতেই সে কাজ শেষ হইয়া যায়। 'Brevity is the soul of wit', অতএব, ইহাও witএর দাবী করিতে পারে। কিন্তু তাহাতেই অত্যাশ্বাস। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বাঙ্গালী পল্টনের মুক্তমালা নক্ষত্র' সাময়িক উচ্ছ্বাস—বাঙ্গালী পল্টনের

[illegible] বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। [illegible] বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার [illegible] ইহাই

—

হিব্রু জাতির ধর্ম্মের মূল।

১

হিব্রু জাতির ধর্ম্মপুস্তকের নাম পুরাতন টেষ্টামেণ্ট। খ্রিষ্টধর্ম্মের যে অংশ লিখিত হইয়াছে, তাহাকে নূতন টেষ্টামেণ্ট বলে। ইহাই খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মপুস্তক। এই দুই গ্রন্থ বাইবেল নামে প্রসিদ্ধ। বাইবেল শব্দের অর্থ পুস্তক। পুরাতন টেষ্টামেণ্টের প্রথমেই বিশ্ব-সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই বিশ্ব-সৃষ্টি ছয় দিনে সাধিত হয়। যে দেব বিশ্বের সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে ঈশ্বর বা ঈশো বলে। তাঁহার তিনটী নাম; একটী মনুষ্য-ভেদ, অন্য দুইটী দেব-ভেদ। এক-দেহকে Holy Ghost বলা হয়।

মনুষ্যদেহধারী ঈশোই যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা ঈডেন নামে অভিহিত। সিরি য়োসি খৃষ্ট—তিনিই যোয়াহা বিশ্বের সৃষ্টি করেন। ঈডেনের নামে দেব সম্প্রদায় ঈশোই প্রথমে ঈডেনে বাস করিতেন। ঈডেনের পূর্ব্ব দিকে সে দেব-উদ্যান ছিল তাহাতে কর্ম্ম করিবার জন্য আদম ও তৎপত্নী ঈভ নিযুক্ত হইয়াছিল। ঈশোর দেবদূতেরা ঈডেন রক্ষক ছিলেন। বাইবেলের মতে ঈশোই আদমের মৃত্তিকা হইতে মঠিন করিয়া প্রাণদান করেন, এবং তাহার নাম আদম রাখেন। এই কথাটী বর্ণের প্রয়োজনীয় বেশোচনের আলোচনা করিব। পাছে তাহারা অমৃতফল ভক্ষণ করিয়া দেবতাদের মত অমর হয়, এই ভয়ে ঈশোই ঈডেনের হইতে তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন ঈডেনের বাহিরে আদমের বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে দেবতাদের তাহাদিগকে বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন। ঈশোই সন্তানের এই পাপকার্য্যে ক্ষুব্ধ হইয়া আদম-বংশ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন। কথিত আছে, এই সময় জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। কেবল আদমবংশীয় নোহ নামক এক ব্যক্তিকে ও পুত্রাদি সহ রক্ষা করিবার জন্য ঈশোই তুষা-প্রদেশে করিয়া নৌকা-নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করেন। এই নৌকা করিয়া নোহ পরিবার ও জন্তুদের সহ জলপ্লাবনে রক্ষা পায়। কথা করিয়া তুমি বাহির হইলেই নোহ অগ্নিবেদী গঠনা করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান

করিলেন। ইহাতে ঐলোই তুষ্ট হইয়া তাহা ও তাহার বংশের সহিত এই মত স্থাপন করেন যে, স্বর্গীয় নরেশ্বর যারা তিনি তাহাদিগকে আপন প্রীতি জানাইবেন, এবং অন্যান্য যারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন না।

আমরা অনুমান করি, এই সকল বিবরণ অতি প্রাচীন কালে দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের সূচনা করিতেছে। ইহাদের একটী ঐলোই-পূজক, অপরটি সর্পপূজক। ঐলোই-পূজকগণ ঐলেহিং নামে প্রসিদ্ধ ছিল; উহারা আপনাদের রাজাকে বোধ হয় ঐলোইএর অবতারস্বরূপ মনে করিত। সম্ভবতঃ এই জাতি পর্বতবাসী ছিল। আদম সর্পপূজক হুবক-দিগের ছিল। উহারা সমতল ভূমিতে বাস করিত।

মনে হয়, আদম ঐলোই-পূজা গ্রহণ করিবে প্রার্থনা করা পাপ হইয়া মেষোদ্যানে হুবকরূপে নিযুক্ত করা। সে ও তাহার পত্নী ঐক্য ঘুচাইয়া সর্পপূজা করায় ঐডেন হইতে বহিষ্কৃত হয়। আদম নিম্নে নামিয়া সর্পপূজকদিগের মধ্যে বসবাস করে। তখন ঈভানও সেখানে ঐলেহিংকে বিবাহ করে। তাহারা তাহাদিগের পাণিগ্রহণ করিতে দেখিয়া, ঐলোই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অনন্তরাম্বে বেশ ভাবিয়া দেখে ঐলোইদিগের মনে হয় যে, মনুষ্য-গণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ঐলোই প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্প-পূজকদিগের প্রতি ঐলোই-পূজকগণের একটী বিদ্বেষ ছিল। এই জলপ্লাবনে নোহ রক্ষা পান। কারণ, তিনি ঐলোই-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। একণে দেখা যাউক, ঐলোই-ধর্ম্মের নিয়ম কি ছিল? দেখা যায়, নোহ জলপ্লাবন হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া, আরারেট পর্ব্বতে গমন করিয়া তাহাতে পশুর রক্ত ও মাংস আহুতি প্রদান করেন। ইহাতে ঐলোই তুষ্ট হন। অতএব, ঐলোই-ধর্ম্ম পশুবলি-প্রধান ধর্ম্ম। ইহাকে আমরা 'আপিপূজা' নাম প্রদান করিব। এই প্রকার ধর্ম্ম বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। একণে দেখা যাউক, ঐলোই, ঐলেহিং, ঐডেন, আদম, নোহ, এই সকল শব্দ কোন্ ভাষা হইতে উৎপন্ন।

ঐডেন দেখা যায়, অগ্নির ভবন 'ঐড়' বলা হইত। ঐড় শব্দ 'ঐন'-রূপেও উচ্চারিত হইত। (১) ঐলোই অর্থে ঐড়ীয়, এবং ঐলেহিং

---

(১) অগ্নি। ঐন। অগ্নিহোত্র।—সায়ণ।

অগ্নিহোত্র অগ্নির ভবন।

অগ্নি। ঐন। পুরোহিতম্।—সায়ণ।

অর্থে যাহারা স্তব করে; ইউলে বা ইউলেন অর্থে যে স্থানে স্তব করা হয়। আদম্ শব্দ আদি শব্দ হইতে, এবং নোহ শব্দ নৌ হইতে উৎপন্ন, মনে করি। আর্য্যগণ অগ্নির বেদিকে ইড়া বা ইলা বলিতেন। (১)

পুরাতন টেষ্টামেণ্টে ঈশ্বরের আর এক নাম পাওয়া যায়; ইহা Yahweh-(যহ্ব)-রূপে লিখিত হয়। এই নাম য়িহুদী জাতির ইষ্টমন্ত্র বলিয়া সহজে তাহারা উচ্চারণ করিত না। তাহারা মনে করিত, যহ্ব নাম উচ্চারণ করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কোন্ ভাষা হইতে যহ্ব শব্দ আসিয়াছে, এ বিষয়ে Bible Dictionaryতে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ বলেন, হিব্রুদিগের দেব শব্দ হইতে যহ্ব শব্দ উৎপন্ন। কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বেদে যে যহ্ব শব্দই বর্ত্তমান, তাহা কাহারও অবলম্বনের যোগ্য নাই। অগ্নিকে বহু স্থলে যহ্ব অর্থাৎ মহৎ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। পারসীকগণের শ্রেষ্ঠ দেবতাকে 'অহুর মজ্দ' বলা হইত। ইহা ভারতীয় আর্য্য-কণ্ঠে 'অসুর মহৎ' রূপে উচ্চারিত হয়। মহৎ ও অসুর, এই দুই শব্দই ঋগ্বেদের ঋষিগণ দেবতাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন। যহ্ব শব্দ অগ্নির বিশেষণ রূপেই প্রায় ব্যবহৃত হইত। (২)

অতএব, বাইবলে বর্ণিত অগ্নিপূজকগণের ভাষায় আর্য্য শব্দ বর্ত্তমান। তাঁহাদের দেবতা জ্ঞানী ও অমর। ভারতীয় আর্য্যগণ সোমকে অমৃত বলিতেন, এবং উহা দেবগণের ও দেবোপাধিক ঋষিগণের ভোগ্য বলিতেন। য়িহুদিগেরও অমৃত ফল ছিল। তাহা দেবজাতি ব্যতীত অপর কেহ

---

(১) অগ্নেঃ। অক্তঃ। পদে ইড্যায়াঃ।
পুরোহিতঃ। অস্মন্। কৃধি। ইমং। দেবান্।—১০।১।৬
হে অগ্নে! (তুমি) ইড়ার পদে অপিত হইয়াছ, সম্মুখে স্থাপিত (রহিয়াছ); দেবতাদিগকে এখানে যজন কর।

(২) অগ্নে। মহসা। ভব। আয়ুষেণ্যম্।—৩।২৯।৩
হে অগ্নে! মহৎ তেজের সহিত প্রকাশিত।
বৈশ্বানরঃ। নৃতমঃ। মহসঃ। অগ্নি।—৩।৩।২
নেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহৎ (অর্থাৎ মহান্) বৈশ্বানর অগ্নি।
অভি। ত্রিয়াণি। পপ্রথে। চনোহিত। নামানি
মহ্বঃ। অদ্রি। নেষু। বর্ধতে।—৩।৭।১
মহ্ব (অর্থাৎ মহান্), পর্ব্বত হিতকর, যাঁহাদের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছেন, (তিনি) স্থির ও চল সকল প্রেরণ করিতেছেন।

ভক্ষণ করিবার অধিকারী ছিল না। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা বাইবেলে বর্ণিত অগ্নিপূজক জাতিকে আর্য্যজাতি বলিতে হয়। ভারতীয় আর্য্যদিগের ইন্দ্রের ন্যায়, ঈলোই বৃষ্টির আনয়নকারী, বজ্রধারী, ধানুকী, এবং যুদ্ধের দেবতা বলিয়া বর্ণিত।

মিশরে বোধ হয় সকলের প্রথমে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হয়, এবং উহারা সর্পপূজক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। মিশরজাতীয় লোকের সহিত আর্য্যদিগের বিবাদ বাইবেলে সূচিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করি।

২

প্রাচীন কালে ব্যাবিলন নগরের দক্ষিণে উর নামে এক নগর ছিল। অতিপূর্ব্বকালে এই নগরে হিব্রুদী-জাতীয় অব্রম্ নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁহার পিতা ঐ নগর হইতে কনান দেশে গিয়া বাস করেন। বাইবেল গ্রন্থে দেখিতে পাই, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া অব্রমের সহিত কয়েকটী সর্ত্ত করিয়া, তাঁহার বংশকে রাজবংশ করিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি তাঁহার অব্রম নামের পরিবর্ত্তন করিয়া অব্রহাম বা অব্রহ্ম নাম প্রদান করেন। তিনি তাঁহার পত্নীর নামও সরি হইতে সারা নামে পরিবর্ত্তিত করিলেন। তাঁহাকে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করিবারও আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার বংশে পুত্র সন্তান হইলে, কিংবা অন্য বংশ হইতে পুরুষ ক্রয় করিলে, তাহার লিঙ্গাগ্র ছেদন করিতে হইবে। পুত্র সন্তান জন্মিবার অষ্টম দিবসে ত্বকচ্ছেদ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। (১)

অব্রহ্মের একটীমাত্র পুত্র সন্তান ছিল। তাহার নাম ছিল, ঈশাক। একদিন ঈশ্বর তাঁহার ঐ একমাত্র সন্তানকে অগ্নিতে আহুতি দিবার আদেশ করেন। অব্রহ্ম তখনই দুইটী যুবক, নিজ পুত্র ও কাষ্ঠ লইয়া ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে সেই পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইয়া যুবকদ্বয়কে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, পুত্র ও কাষ্ঠ লইয়া তিনি পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। (২) আনীত কাষ্ঠ দ্বারা একটী বেদি রচনা করি অব্রহ্ম তাহাতে নিজ পুত্রকে স্থাপন করিয়া ছোরা দ্বারা কাটিতে গেলে তখন ঈশ্বর আকাশ হইতে বলিলেন, হে অব্রহ্ম! তোমার পুত্রকে কাটি হইবে না। আমি সন্তুষ্ট হইলাম যে, আমার প্রতি তোমার এত ভ

(১) Genesis, Chap. 17, Verses 1,5,10,11,12 and 25.

অনন্তর অব্রহ্ম তথায় একটী মেষকে বদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেন। (১) ঈশ্বরের প্রীতিসম্পাদনার্থ জন্তু বধ করিয়া তাহার রক্ত-মাংস অগ্নি-বেদিতে আহুতি প্রদান করিবার প্রথা য়িহুদী জাতি-দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহারা মনে করিত, দগ্ধ মাংস ও রক্তোত্থিত গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঈশ্বর তুষ্ট হন। (২) মেষ-বলি বোধ হয় নোহের সময় হইতে প্রচলিত ছিল; নচেৎ দেবাদেশক্রমে তথায় মেষ বদ্ধ হইবার কারণ নাই।

উল্লিখিত বর্ণনায় অব্রম্ শব্দ অব্রহ্মে ও সরৈ শব্দ সারাতে পরিবর্ত্তন করিবার মধ্যে, এবং অব্রহ্মের পুত্রের ঈষাক নামকরণে আর্য্যভাষীর হস্ত অনুভব করি। লিঙ্গাংশ ছেদন কর্ম্ম অব্রহ্মের বংশে একটী বিশেষ সংস্কার বলিয়া উহা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে এক স্থলে ত্বক্‌চ্ছেদ যজ্ঞের বর্ণনা দেখিতে পাই। সে স্থলের অর্থ সায়নাচার্য্য বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা প্রথম ঐ ঋকগুলির সরল অর্থ করিয়া, পরে তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

'বীর সকল স্থূল মেষ পাক করিয়াছিলেন; অক্ষ সকল নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রীড়াস্থলে ছিল; জল সকলের মধ্যে বৃহতী ধনু (লইয়া) দুই জন পবিত্র (অর্থাৎ ছাঁকনি) হস্তে শুদ্ধ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন। (৩)

নানা দিক হইতে চীৎকারকারিণী আসিয়াছিল; মেষ পাক করে; অর্দ্ধ পাক করে নাই। এই (কথা) দেব সবিতা আমাকে বলিলেন—একটী কাষ্ঠ (রূপ) অক্ষ; একটী ঘৃত (রূপ) অন্ন হইয়াছে। (৪)

চক্রশূন্যা, স্ব-ধারণকারিণী দ্বারা বর্ত্তমান (৩) রক্ষিত গ্রামকে দূর হইতে দেখিয়াছি। স্বামী লোকদিগের যজ্ঞ সেবা করিতেছেন। নবীয়ান্ সদ্য শিশ্ন সকল ছেদন করিতেছেন।' (৫)

---

(১) Genesis, Chap. 22, Verses 9,10,11,12,13.

(২) Leviticus, Chap. 1, Verse 8.

(৩) পীবানং। মেষং। অপচন্ত। বীরাঃ। অক্তাঃ। অক্ষাঃ। অনু। দীবে। আসন্।
ঘা। ধনুং। বৃহতীং। অপস্যু। অন্তঃ। পবিত্রবন্তা। চরতঃ। পুনন্তা ॥—১০।২৭।১৭

(৪) বি। জোষমাসাং। বিষ্ণঃ। দধ্রন্। পচাতি। নেমঃ। নহি। পক্বং। অর্ব্বঃ।
অগ্নং। ন্যে। দেবঃ। সবিতা। উৎ। আহে। ত্র অন্নঃ। ইৎ। বনবৎ। গর্পিঃ। অয়ঃ ॥—১৮

(৫) অপশ্যং। গ্রামং। বহমানং। আরাৎ। অচক্রয়া। যযা। বর্ত্তমানম্।
নিমস্তি। অর্বঃ। শ্র। মুষ্কা। অনাবয়ং। সদ্যঃ। শিশ্না। প্রমিনানঃ। নবীষান্ ॥—১৯

এই ঋকগুলি হইতে আমরা জানিতেছি যে, কোনও গ্রামে শিশ্নচ্ছেদ যজ্ঞ হইতেছে; ঐ গ্রাম চক্রহীনা স্ব-ধারণকারিণী দ্বারা রক্ষিত। নৌকাই চক্রহীনা রথ-স্বরূপ। অতএব, স্ব বা ঈশ্বর নৌকায় অবস্থিত থাকিয়া গ্রাম রক্ষা করিতেছেন, এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। এই যজ্ঞে কাষ্ঠ ও ঘৃত দ্বারা অগ্নি পূজিত হইতেছেন। নেম নামক ব্যক্তি পাক যজ্ঞ করে; কিন্তু অর্ধ নামক ব্যক্তি পাক করে না। ইহারা চীৎকার করিতে করিতে যজ্ঞে আসিয়া থাকে। স্থূল মেষ পাক করা এবং ধনু ধারণ করিয়া জলে ভ্রমণ করা এই যজ্ঞের বিশেষত্ব। অক্ষ-ক্রীড়ার অর্থ, মনে হয়, আকাশে দেবগণ নক্ষত্র দ্বারা অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। তাহা হইলে, রাত্রিকালে এই যজ্ঞ সম্পাদিত হইতেছে।

নোহ জলপ্লাবন হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর তাঁহার সহিত কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রামধনু আকাশে স্থাপন করা উহাদের মধ্যে অন্যতম। (১) অতএব, এই যজ্ঞে ধনুর্ধারণ ঐ সর্ত্তের নির্দ্দেশক বলিয়া মনে হয়। স্থূল মেষের বধ নোহের প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞ। অব্রহ্মও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেখান গিয়াছে। শিশ্নচ্ছেদ যজ্ঞ অব্রহ্মের প্রতিষ্ঠিত। চক্রহীনা স্ব-ধারণকারিণী নৌকা মুসা-প্রতিষ্ঠিত 'আর্ক' নৌকার বর্ণনা বলিয়া মনে করি। (২) ঋগ্বেদের ঋষিগণ যজ্ঞকে স্বর্গে যাইবার নৌকা বলিয়া মনে করিতেন। যে ঋত্বিক যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহার উপাধি অর্বান্। য়িহুদীদিগের প্রফেটকে নবী বলা হইত। প্রাচীন ব্যাবিলনের প্রফেটগণও নবী নামে খ্যাত ছিলেন। নেম নামক যে ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতেছি, উহার নাম ঋগ্বেদের অপর এক স্থলে বৈরদেয়-দানী পুরুষ পণি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৩) আমরা 'ঋগ্বেদে

সায়ন-মতে, শিশ্না, শিশ্নানি-লিঙ্গ, শুষি—তৃণিয়াহ্বয়াদিবৃষ্ণানি প্রকর্ষেণ হিংসন্। কিন্তু সায়ন ৭।২১।৫ ঋকে শিশ্ন শব্দ পুরুষের লিঙ্গ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) Genesis, Chap. 9, Verse 13.

(২) Exodus, Chap. 25.

(৩) উভ। ঘ। নেমঃ। অত্তঃ
পুণান্। ইভি। ভবে। পণিঃ
সঃ। বৈরদেয়ে। ইৎ। নমঃ।—১।৩৩।৮

এবং নেম অত্তত পুরুষ পণি, এই কথা যদি। সে বৈরদেয়-যাসা নয়।

[সায়ন ইহার অন্য অর্থ করেন। পণিঃ অর্থে ভোজার্থে বণিগ্রাজেন। নম অর্থে, নমস্কারো দাতব্যঃ।]

আর্য্য ও অনার্য্য' প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পণিগণ সম বা সেমেটিক-জাতীয় ফিনিসীয় জাতি। প্রাচীন ফিনিসীয়া দেশে Berytus (বীরাইতস্) নামে এক নগর ছিল। ইহাই বর্ত্তমান কালে Beyrout (বৈরোৎ) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমরা অনুমান করি, ঋগ্বেদে উল্লিখিত বৈরদেয় নগরই বর্ত্তমান বৈরোৎ।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তের ৩য় ঋকেও নেম নাম দেখিতে পাই। এ স্থলে দেখি, নেম ইন্দ্রে বিশ্বাসী নহে। আমরা অনুমান করি, ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই সূক্ত রচিত হইয়া যজ্ঞে ব্যবহৃত হইয়াছিল। (১) এই সূক্তে নেম শব্দ পাইয়া প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ মনে করিয়াছিলেন যে, ইনিই সূক্তের ঋষি। এই সূক্ত পাঠ করিলে কাহারও কাহারও এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু যখন আমরা নেমকে ঋগ্বেদের অপর স্থলে পণি-বংশীয় পুরুষ-রূপে দেখিতে পাই, তখন আর আমাদের সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, নেম কোনও ঋষি নহে। সায়ন ৫।৬১।৮ ঋকের ব্যাখ্যাকালে পণি শব্দের স্তবকারী অর্থ করিয়াছেন; বেদের কোথাও কিন্তু পণি শব্দের তিনি এরূপ অর্থ করেন নাই।

ঋগ্বেদে শিগ্রুদেব নামক এক জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই। (২) আমার

(১) প্র। বঃ। মোমম্। অদ্য। ভরতঃ বাজয়ন্তঃ
ইন্দ্রায়। সত্যম্। যদি। সত্যম্। অস্তি।
ন। ইন্দ্রঃ। অস্তি। ইতি। নেমঃ। উ। ত্বঃ। আহ
কঃ। ইম্। দদর্শ। কম্। অস্তি। ভূতাম।—৮।৮৯।৩

হে রণাকাঙ্ক্ষিগণ! ইন্দ্র নিমিত্ত সত্য সুন্দর স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর, যদি সত্য স্তোম (তোমাদের) থাকে। নেম বলে, ইন্দ্র বলিয়া কেহ নাই, কে ইঁহাকে দেখিয়াছে, কাহার অভিমুখে স্তব করিব?

অয়ম্। অস্মি। জরিতঃ। পশ্য। মা
ইহ। বিদ্মা। জাতানি। অভি। অস্মি। মহা।
শতম্। মা। প্রদিশঃ। বর্ধয়ন্তি
আরদ্ধিরঃ। ভুবনা। দদরীমি।—ঐ।৪

হে স্তবকারী! এই আমি রহিয়াছি—আমাকে দেখ। এই সমস্ত উৎপন্নদিগের মধ্যে (আমি) মহৎ হইয়া রহিয়াছি। যজ্ঞের জ্ঞাতৃগণ আমাকে বর্দ্ধিত করেন; বিদারণশীল (আমি) ভুবন সকল বিদারণ করি।

(২) নঃ। শতবঃ। ইন্দ্র। জুজুবুঃ। নঃ
নঃ। হবনা। শবিষ্ঠ। বেন্যাভিঃ।

মনে হয়, ইহারাই ত্বক্‌চ্ছেদকারী জাতি। ইহাদের বিষয়ই পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋক্‌গুলিতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করি। মনে হয়, উদ্ধৃত বাক্যের 'বেদ্যা' শব্দ যেহুইজন জাতিকে বুঝাইতেছে।

বোধ হয়, অব্রহ্মের দল অব্রহ্মা দস্যু নামও প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১) বাইবেলেও আর্য্য দেবপূজকদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উঁহারা এসিয়া-মাইনরের বিভিন্ন স্থানে রাজ্য করিতেন। অমরাইট, হিবাইট, অর্কাইট, হিট্টাইট প্রভৃতি নামধেয় জাতি অব্রহ্মের সময়ে ও পূর্ব্বে কনান দেশ অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছিল। (২) আমি মনে করি, অমরাইট শব্দে অমৃতপূজক, হিবাইট শব্দে হবি-দাতা, অর্কাইট শব্দে অর্কপূজক ও হিট্টাইট শব্দে হেতি-পূজকদিগকে বুঝাইত। (৩) নিম্নোদ্ধৃত একটী বাক্যেই অমৃত, অর্ক ও হব, তিনটী শব্দই বর্ত্তমান। আর্য্যগণ রুদ্র দেবকেই অত্যন্ত ভয় করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, রুদ্রের নাম গ্রহণ করিলে মৃত্যু বা তৎসদৃশ কোনরূপ অনিষ্ট হয়। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন রুদ্রের ধনু ও বাণ আছে। (৪)

সঃ। শর্ধৎ। আৎ। বিষুণস্যা। জন্তোঃ।
মা। শিশ্নদেবাঃ। অপি। ওঃ। তৎ। নঃ॥—৭।২১।৫

হে ইন্দ্র! যাতুগণ আমাদিগকে হিংসা না করুক। হে শবিষ্ঠ! মেধ্যাদিগের দ্বারা বন্ধ্যা (হিংসা) না করুক। সেই স্বামী (ইন্দ্র) বিষম প্রাণীদিগের শাসনকর্ত্তা। শিশ্নদেবগণ আমাদিগের গুতকে যেন নষ্ট করে না।

[শিশ্নদেবা অব্রহ্মর্ষয়ঃ ইতি সায়ন। শিশ্নেন দীব্যন্তি, ক্রীড়ন্তি ইতি শিশ্নদেবাঃ।]

(১) নি। মায়াবান্। অব্রহ্মা। দস্যুঃ। অভূৎ।—৪।১৬।৯

মায়াবান্ অব্রহ্মা দস্যু নষ্ট হইয়াছিল।

(২) Genesis, Chap. 10, Verses 16, 17 and Chap. 15, Verses 16, 20.

(৩) ইমে। উ। ত্বা। পুরুশাক। প্রযজ্যো।
অরিষ্টাসঃ। অভি। অর্চন্তি। অর্কৈঃ।
অধি। হবম্। আ। হবতঃ। হবানঃ
ন। ত্বাবান্। অন্যঃ। অমৃত। ত্বৎ। অস্তি॥—৩।২১।১০

হে বহুশক্তি, প্রকৃষ্ট যজনীয়! এই অরিষ্টগণ তোমাকে অর্ক সকলের দ্বারা অর্চনা করিতেছে। হে অমৃত! হবান (অর্থাৎ আহুত ভূমি) হবতের (অর্থাৎ আহ্বানকারী আমার) হব (অর্থাৎ স্তোত্র) শ্রবণ কর। তোমার মত (বা) তোমা হইতে (শ্রেষ্ঠ) অন্য কেহ নাই।

পরি। নঃ। হেতি। রুদ্রস্য। বৃজ্যাঃ।—৪।৩৩।১০

রুদ্রের হেতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক।

(৪) অহম্। বিভর্মি। সায়কানি। ধনু।—৩।৩১।১০

হে রুদ্র! অহং হইয়া ধনু ও সায়ক সকল ধারণ করি। অথর্ব—৪।৩।৭।

রুদ্র অগ্নির এক নাম। বোধ হয়, অহম্ রুদ্রাভিরের পূজক ছিলেন। অবেস্তাও মুসার দেবতা Jealous ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাকেও Jealous দেবরূপে ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছেন। (১)

৩

বাইবেলে দেখিতে পাই, মুসা নামে এক ব্যক্তি ইস্রেলদিগকে মিশর দেশ হইতে উদ্ধার করেন। মুসাই প্রকৃতপক্ষে ইস্রেলদিগকে একটী জাতি গঠন করেন। মুসার উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতেছি যে, তিনি লেভী-বংশ-সম্ভূত; (২) মিডিয়ান জাতির এক পুরোহিতের কন্যা-বিবাহ করেন; (৩) ইস্রেলজাতি-গঠনকালে তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। (৪) মুসা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইস্রেলীদিগকে মিশর হইতে আনয়ন করেন। (৫) মুসা ও তাঁহার ভ্রাতা আরণ ভিন্ন অপর কাহাকে ঈশ্বর আদেশ প্রদান করিতেন না। ঈশ্বরের মন্দিরে যজ্ঞ করিতে (অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি দিতে) কেবল লেভীবংশীয়গণ ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। (৬) অপর কোনও ইস্রেল সম্প্রদায়ের ইহাতে অধিকার ছিল না। মুসার ঈশ্বর যে ঈশ্বর ছিলেন। (৭) তিনি বজ্র, অগ্নি, শিলাবৃষ্টি ও বিদ্যুৎ ঈশ্বর; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে নানা প্রকার রোগ প্রেরণ করেন। (৮) কোনও স্থানের উপর অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি তাহাদের সন্তান-উৎপাদন রহিত করিয়া বংশলোপ করিতেন। এই প্রকার ঈশ্বর অন্যত্রও দেখিতে পাই।

মুসার নিকট যহ্বা যেরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়। (৯) তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বক্ষণে

---

(১) ত্বাং বা। রুদ্র। চর্ষণীধৃতং। নরোগিরঃ
নি। হুয়ন্তবী। বৃষভ। বা। সুতুতী।—৮।৩৩।৪

হে রুদ্র! তোমাকে নমস্কার সম্বলের দ্বারা আহ্বান করি না; হে বৃষভ! মদস্তুতি দ্বারা (ও) অন্য দেবতা সহিত (তোমাকে) আহ্বান করিয়া ক্রুদ্ধ করিব না।

(২) Exodus, Chap. 2, Verses 1,2,10.
(৩) Exodus, Chap. 3, Verse 1.
(৪) Exodus, Chap. 18 Verse 17.
(৫) Exodus, Chap. 3, Verses 10, 14.
(৬) Number, Chap. 3, Verses 6, 11, 12. Number, Chap. 8.
(৭) Exodus, Chap. 15, Verse 3.
(৮) Exodus, Chap. 9. Verses 23, 18, 12.
(৯) Exodus, Chap. 19, Verses 16 to 21

সিনাই পর্ব্বতের উপরে যখন [illegible] উঠিয়া যাইতে বলিলেন, তখন মুসা ঈশ্বরকে বলিলেন যে, সিনাই পর্ব্বত ধূমে আচ্ছাদিত হইয়া এবং মহৎ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ধূম হইতে যেমন ধূম উঠে, সেইরূপ ধূম উহা হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। সমস্ত পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল। মহৎ মুসাকে বলিলেন যে, তুমিই কেবল পর্ব্বতের উপরে যাও; তোমার সঙ্গে যেন এখানে না আসে—কারণ, তাহাকে দেখিলেই সে মরিয়া যাইবে। কেবল তুমি ও তোমার ভ্রাতা আরণ পর্ব্বতের উপরে আসিতে পারিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, মুসার উপাখ্যান হইতে কি ঐতিহাসিক জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি। মুসা যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে লেবী বংশ বলা হইত। এই বংশই যহুদ-পূজার পুরোহিত বংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঋগ্বেদে স্তবকারী ঋষি বা ঋষিকুলকে কোনও কোনও স্থলে ভেভ নাম দেওয়া হইয়াছে। ভেভ শব্দের অর্থ কি, বুঝা যায় না; এক স্থলে ঋষির নামও ভেভ ছিল, দেখা যায়। (১) মুসা লেবী বা ভেভ বংশীয় ছিলেন, ইহা হইতে তিনি কোন্ আর্য্যঋষিবংশ-সম্ভূত ছিলেন, বলা কঠিন। যহুদ সেই জন্য ঐ বংশকে তাঁহার ভেভ (অর্থাৎ ঋষিক) বংশ-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মুসা যদুর ঋষি, এবং মুসার শ্বশুর আরণ পুরোহিত হইয়াছিলেন। যদুর মুখ, অগ্নি হইতে তাহাকে অগ্নিময় করিয়াছিল। পারসীক মিডিয়ানগণ আর্য্য-বংশীয় ছিল। দেখা যাইতেছে, মিডিয়ানদিগের পুরোহিত-বংশে মুসা বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুসা যে আর্য্যবংশজ, তাহাও এই অনুমান সমর্থিত হইতেছে।

বাইবেলে যেহবারী ঈশ্বর ও হোরিব পৌষ্ট নামক ঈশ্বরের উল্লেখ আছে,

---

(১) ভাং। সপ্ত। ভেভাঃ। ঋষিভ্যঃ। যদ্বা লুপ্তে।—১০।৭১।৩

তাঁহার (অর্থাৎ বাক্যের) অভিমুখে যা[illegible] (অর্থাৎ ঋষির) স্তব উচ্চারণ করিলেন।

[সায়ণ এখানে ভেভাঃ অর্থে স্তোত্রমালাঃ পঙ্‌ক্তিঃ সপ্ত ইত্যাদি করিয়াছেন।]

মধু। জনঃ। জনতি। ভেভঃ। ইষ্টৌ।—৩।১।৩

ভেভ (অর্থাৎ স্তবকারী) যজ্ঞে মধুময় স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বিশ্পতং। ভেভঃ। ঈমহি। প্রবৃক্তং

উৎ। নিষ্ঠাঃ। সোমং। ইব। ঋত্বিয়ং।—১।১৩।৩।২৪

অধ্বর্য্যুর মত ভেভ (ঋষিক) তোমরা (অর্থাৎ ঋষিরা) প্রকৃত ধারণ সোমের মত চাহিয়াছিলে।

তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমরা বৈদিক যুগে পুরুষ ও হিরণ্যগর্ভ-রূপ ধী-র সন্ধান প্রাপ্ত হই। ঋষিগণ মনে করিতেন, এই ধী প্রাপ্ত না হইলে কেহ প্রেয়ের পথ হইতে শ্রেয়ের পথে যাইতে পারে না। এ বিষয়টী কঠোপনিষদে বেশ সুন্দররূপে বুঝান হইয়াছে। অতএব, ভারতীয় আর্য্যগণ যাঁহাকে ধী ও হিরণ্যগর্ভ বলিতেন, বাইবেলের ঋষি তাঁহাকেই Holy Ghost আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই বিশ্বাস যিশুখৃষ্টের চরিতেও আমরা দেখিতে পাই। (১)

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

কুইনাইন পিল্।

১

দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও নানাবিধ আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা সত্ত্বেও কি করিয়া গ্রামবাসিগণ কেবলমাত্র কুইনাইন পিলের সাহায্যে আত্মশাসনে দড় হইয়া উত্তরোত্তর দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারে, তাহার তথ্য নির্ণীত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত বনমালী ভড়ের দ্বারা।

ভড় মহাশয় পূর্ব্বে বিহারাঞ্চলে কোনও গ্রামে পাটওয়ারী ছিলেন। পাটওয়ারীর পদ দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়াতে, তিনি দিনকতক কোনও বিখ্যাত ডাক্তারের ঔষধালয়ে কম্পাউণ্ডারী করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। পরে কম্পাউণ্ডারগণের পরীক্ষার আইন প্রচারিত হইলে তিনি সে কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে তাঁহার ধারণা হইল যে, ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য কুইনাইন ব্যতীত সুচারুরূপে চলিতে পারে না; সুতরাং তিনি সম্প্রতি যথাসাধ্য কুইনাইনের বড়ি সংগ্রহ করিতেছিলেন।

ইত্যবসরে তাঁহার বিহারীলাল মিত্র ইনকম-ট্যাক্স-আসেসরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বিহারীলাল তরুণ যুবা, অতিশয় সুশ্রী চেহারা, ভদ্রবংশজাত। পিতার সম্পত্তি ছিল। সরকারী চাকরীর মধ্যে দেশের উপকারের অনেকগুলি উপায় আছে, এই প্রকার ধারণা উপস্থিত হওয়াতে বিহারী চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। বিশেষতঃ, বিহারীলালের বিবাহ নামক জটিল সামাজিক ধর্ম্ম-পালন ঘটিয়া না উঠাতে, সে মনপ্রাণ সম্পূর্ণভাবে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। দুই বৎসরের মধ্যেই বিহারী সুখ্যাতি লাভ

করিয়াছিল। জেলার কালেক্টর উড্ সাহেব তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট। এমন কি, দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিহারীলাল ডিপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইবে, সকলের ইহাই ধারণা।

বিহারীলালের প্রধান উদ্দেশ্য, গ্রামের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা। ইহার সাধনার পক্ষে বিশেষ এক জন অতিথ লোকের দরকার। পূর্ব্বে বিহারীলালের যে কেরাণী ছিল, সে উৎকোচ-গ্রহণের অপরাধে, কর্ম্ম হইতে বিতাড়িত হইলে, যথাসময়ে পদখালির বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। বনমালী ভড় মহাশয়ের আবেদনপত্র বিহারীলালের চিত্ত আকর্ষণ করাতে তিনি আহূত হইলেন।

মফঃস্বলে উভয়ের দেখা হইল।

বিহারীলাল। আপনার নাম বনমালী ভড়?

বনমালী। এর নাম এ পরগণায় আর কারও নাই। বিশ্বাস না হয়, কালেক্টর সিডিউল দেখিয়া লউন।

বিহারীলাল। আমি সন্দেহ করি নাই। আমার বক্তব্য এ আপনার আবেদনপত্র আমি রাখিয়া লইয়াছি। যদি ত্রিশ টাকায় চাকরী স্বীকার করিয়া গ্রামে গ্রামে আমার সহিত ভদ্রভাবে কার্য্য মানে অন্ততঃ দুই দিন বাহির হইতে পারেন, তবে আপনাকেই রাখিব।

বনমালী। আজ্ঞা করুন। আমি একটী কথা রাখিতে চাহি। আমাকে প্রতি দিন অন্ততঃ দুই ঘণ্টা আমার ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য অবসর করিতে ও আমার পক্ষের গ্রামে গ্রামে বিলাইতে অনুমতি প্রদান করিতে হইবে। কারণ, দেশ-হিতৈষিতাই আমার প্রধান লক্ষ্য।

বিহারীলাল। আমারও তাহাই। তবে কুইনাইন দ্বারা কেবল ম্যালেরিয়া জ্বরই নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে নিবারিত হয়, ইহাই আমার ধারণা। দেশের অনেক রকম উপকারের পথ আছে।

বনমালী। সকল প্রকার পথেই কুইনাইন সেবন একমাত্র উপায় দেখিতে পাইবেন। এই ঔষধ আমেরিকাজাত। সেখানেই যাদুতশাসন ও রাষ্ট্র-শাসনের ভার। বাঙ্গালাতে প্রথমে প্রবেশিত হওয়াতে আমরা অন্য সকল অপেক্ষা হইতে আত্মশাসনের পথে প্রথমেই অগ্রসর হইয়াছি। ইহাতে শিক্ষা হয়, ইন্সিওরেন্স হয়; সুবাদারও বশে হয়। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়া যায় কি, সাক্ষ্য গোরক্ষিণীর বটে। এ প্রকার দেখা হয়, তাহাতে ভগবান

ছাড়া আর কাহারও সহিত সম্পর্ক রাখিতে প্রবৃত্তি হয় না। তিক্ততার গুণে বিষয়-বাসনার প্রতি বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া শুষ্ক রসনা কেবল হরিনাম উচ্চারণ করিতে থাকে, এবং ধর্ম্মক্ষেত্রের সহিত বক্তৃতা ছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। ইহারই বলে গত শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশে যত ধর্ম্মপ্রচার হইয়াছে, তাহা অন্য কোনও দেশে হয় নাই। আমেরিকায় খানিকটা হইয়াছিল, তাহাও কেবল ইহারই গুণে। আপনি প্রত্যেক দেশের আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করুন। কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে, সমাজ সম্বন্ধেও আমার সেই বক্তব্য। কুইনাইনের ব্যবহারের পূর্ব্বে 'ভালবাসা' নামক কথা এ দেশে প্রচারই হয় নাই। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাবনা পূর্ব্বে কখনও হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস বলে না। প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, পিত্তদমন হইলে ও কুইনাইন দ্বারা দেহ সংশোধিত হইলে জাতীয় দোষ থাকে না; এক জাতির সহিত অন্য জাতির, ব্রাহ্মণের সহিত চণ্ডালের, স্বচ্ছন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ চলিতে পারে। পিণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং এহেন বিবাহে যদি পুত্রসন্তানের অভাবও হয়, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই।

বিহারীলাল। আপনার ধারণা অসাধারণ। কিন্তু কত দূর সারবত্ত, সে বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে। হইতে পারে যে, কুইনাইন দেবন দ্বারা প্রশমিত হইলে সৎ প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের পথ পরিষ্কৃত হয়, কিন্তু কুইনাইন তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কুইনাইনের ব্যবহার, এবং ন্যায়শাস্ত্রশাসন কিংবা অন্য জাতির সহিত বিবাহের প্রস্তাবনা সমসাময়িক হইলেও, হয় ত উভয়ই কোনও অন্যতম কারণের উপসর্গ ও লক্ষণ হইতে পারে। ইহার মধ্যে সত্যটুকু আবিষ্কার করিতে হইবে। যাহা হউক, এখন দুই একখানি গ্রাম পরিদর্শন করা যাউক। এ গ্রামখানি এক কালে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বনমালী। হাঁ। ইহার নাম কালীপুর।

২

কালীপুরের রাজা যদনচন্দ্র সিংহ ও প্রজা স্বরূপচন্দ্র গ্রামানিক, উভয়েই বনাশ্রিত। উভয়ের বাসস্থানের ব্যবধান প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। মধ্যে ঘনতর সাহার বসতি।

যদনচন্দ্রের পিতা রক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া সে কালে একটী অট্টালিকা

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁর তাঁহার প্রজার সংখ্যা বহু। খাতা গোলা পূর্ণ থাকিত। ক্রমে প্রেগোদ্ভব আইন জারি হওয়াতে প্রজারা স্বরূপ গোমস্তাকে নেড়ামুখো যবন কহিয়া ঘরক উত্তোলন করিয়াছিল। সেই মুণ্ডেশ্বরীর মন্দা দেবিয়া বদনচন্দ্রের পিতা মরণকালে পুত্রকে কহিয়া গিয়াছিলেন 'সাবধান।' বদনচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বাহির হইতে লাঠিয়াল ও উকীলের দল সংগ্রহ করিলেন। দশবৎসরব্যাপী মোকদ্দমার সংগ্রামে ফলে ওস্তাদকে ঠাকাইয়া ও উৎখাত করিয়া বদনচন্দ্র জয়নিনাদপূর্ব্বক প্রাসাদের ত্রিতলে বসিয়া নৃত্য, গীত ও সেতার কিছু দিন বাজাইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক প্রজা পলাইয়া গেল; অনেকে ধর্ম্ম দিয়া চাকরাণে ও জমলার বাদে চাকরী করিতে গেল। বিস্তীর্ণ জমী রাজার হস্তচ্যুত হইয়া পড়াতে রোডসেসের গুরুভার আরও গুরুতর হইল। খাজনার টাকা কমিয়া গেল। যত দুর্ব্বৃত্ত ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, অলস ও অকর্ম্মা লোক রাজার স্কন্ধে চাপিয়া তাঁহার ভবন খাইতে বসিল। বদনচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কলিকাতার গিয়া জমাদারী বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া খটাঙ্গধারী হইয়া পড়িলেন। রাণী ও রাজেন্দ্রবিজয়া সকলে মেঘ সংবাদ পাইয়া দৈবের দোকে বসিয়া পড়িল। ব্রহ্মদায়ী শিষ্য ও কিতবের দুষ্টশ্রেণী একাদিক্রমে অধিকার করিয়া গল্লিকা-সেবনে ভরপুর হইল। নিয়তলে কাঁসী আতা ও ছাগল ও গিন্নিবরওয়ানমণ্ডলী, ঘোড়ার সহিসের সহিত একত্র হইয়া পাকা সখ্য স্থাপন করিলেন, রাত্রিকালে জনপ্রাণী সে দিকে যাইত না।

কালীপুর ছোটনাগপুরের অন্তর্গত। পূর্ব্বে সেখানে ম্যালেরিয়া ছিল না। সম্প্রতি ম্যালেরিয়া সাঁওতাল ও মোনিপুর জেলা হইতে আসিয়াছে। রাজার অর্থ ও বয়সের ও স্বাস্থ্যের অপব্যয়ের ফলে জ্বর; প্রজার অর্থ ও স্বাস্থ্য অর্থের অভাবে জ্বর। রাজার ঘোড়ার সহিস দিয়াও কম্প ও ইনফ্লুয়েঞ্জা; প্রজার উপর দেওয়াও কম্প ও ইনফ্লুয়েঞ্জা। এক জনের বল কেবিয়া দিলে প্রাণ কমে; অন্যের বল পাইলে কমে। অতএব উভয়েরই মনুষ্যের শরীর।

স্বরূপ প্রাণান্তিক রাজায় সহিত জড়িয়া বসিয়াছে। সম্প্রতি 'সেটেলমেণ্ট' আফিসের আসিয়া তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ স্থায়ী জোত সব অনেক উলার করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু স্বরূপের পুণ্যফলে তাহার ঘটে হুঁসময়। পাপীর বোঝা ভগবান বহেন। পুণ্যবানের বোঝা তাহাকেই বহিতে হয়। সুতরাং সে বোঝা ও লোকে সমাগত। এত জমী নয়, রাখিবার লোক নাই।

এত তুলায় চাষ ছিল যে, তাহাতেই গ্রামখানির বস্ত্র কুলান হইত। এত মধুপের চাষ ছিল যে, এখনও তৈলের অভাব হয় নাই। এত গাভী ছিল যে, সারের অভাব দূরে থাকুক, অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধে গোগৃহের ধরা সিক্ত হইত। পুষ্করিণী ও বাঁধে জল থাকিত, এবং মৎস্য চরিত। সেগুলি এখন ডহর, কিংবা পাঁথল। গ্রামে জলাভাব। জল পাওয়া দুষ্কর। যে সকল স্থানে জলাশয় ছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত গন্ধ-কচ্ছপের সংগ্রামে রাজার আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। প্রথা যাহাতে জল না পাইয়া দাসত্ব স্বীকার করে, তাহাই উদ্দেশ্য। প্রজার দাসত্ব-স্বীকারের সঙ্গে জলেরও অন্তর্ধান। কাহারও পূর্ব্বেকার জলহীন বাঁধে হস্তক্ষেপ করিবার যো নাই। এখন সে সব পুনর্গ্রহণ করিতেও তাহারা অক্ষম। আর শ্রম করিবার শক্তি নাই। লোকবল নাই। অর্থ নাই।

কেবল বাঙ্গলায় প্রজার নহে, ক্রমে প্রজায় প্রজায় দ্বন্দ্ব বাধিল। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে নিজের নিজের স্বত্ব বুঝিয়া লইল; কিন্তু আত্মবিবাদে ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িল। রাজা ও প্রজার ধ্বংসের ফলে জেলার আদালত ও উকীল বাড়িয়া গেল। সহরের নূতন বসতি হইয়া অধিবাসিগণ বহু দেশের পুঁথি-পাঠপূর্ব্বক রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন-তন্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল। এই সে পতিত গ্রামবাসী ইহাদিগের উদ্ধারের সদুপায় কি? অনেকে বলিত, 'স্বায়ত্তশাসন'; অর্থাৎ, ইহাদের উপর আরও ট্যাক্স বসাইয়া দাও। আর ও কুইনাইন সেবন করাইয়া দাও। কেহ কেহ বলিত, ইহাদিগকে 'ভোট্' নামক তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত কর। কেহ কেহ বলিত যে, গুরুমহাশয়ের দল বাড়াইয়া, এবং শিক্ষা-কর বসাইয়া গঙ্গানারায়ণ-ব্রহ্মের রাষ্ট্রীয় অর্থ ইহাদিগকে মরণকালে খাওয়াইয়া দাও। কেহ কেহ বলিত যে, গ্রামে খোঁয়াড়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া গাভীকুলের চর্ম্ম সংগ্রহ কর, এবং তাহারই আয় দিয়া ও নূতন ট্যাক্স বসাইয়া গ্রামের ময়লা ভাগাড়ে ফেলিতে থাক, কিংবা গভীর কূপ খনন করিয়া তাহা ময়লা দিয়া ভর্ত্তি কর। কিন্তু সাবধান! যেন জল বাহির না হয়।

সনাতন সাহা এই সকল কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া গ্রামবাসিগণকে শুনাইতেন। যখন দিনাবসানে শৃগাল ও কুক্কুর বহু শব লইয়া গ্রাম্য শ্মশানে বিকট ধ্বনি করিত, যখন মুমূর্ষু পিপাসাতুর বাকরুদ্ধ কৃষক দারাসুতের নগ্ন ও শীর্ণ দেহপঞ্জরের উপর কম্পাপন করিয়া মানব-জীবনের শেষ অনুভূতি জ্ঞাপন করিত, তখন সকলে ভাবিত যে, স্বায়ত্তশাসনের এই উপযুক্ত সময়।

বল্লভীর দারুণ অবস্থা উপস্থিত হইল। তাহার কল্পনায় নীলকণ্ঠ দেহ দেখিয়া সনাতন নাহা বলিলেন, 'তোর ভয় কি লো?'

বল্লভী। তিনি আমাকে দেখিয়াছেন।

সনাতন। তাতে ভয় কি? আসল খাতাপত্র পাছে দেখেন, সেই ভয়। তুই ওগুলো সিন্দুকে লুকিয়ে ফেল্।

কোনও আসন্ন বিপদ না দেখিয়া বল্লভী আশ্বস্তা হইল। বল্লভী মনে মনে ভাবিল, 'খাতাপত্র লুকাইবার দরকার কি? খাতাপত্রে এমন কি আছে?'

বিহারীলাল সনাতন সাহার বাটীতে উপস্থিত হইলে, সনাতন সাহার ভয় অনেকটা ভাঙ্গিয়া গেল। এ যে আসেসর বাবু নয়। এক জন কচি ছেলের মত। মুখে করুণা মাখানো। সনাতন সাহা একখানি চেয়ার দিয়া বলিলেন, 'আজ আমার বড় সৌভাগ্য।'

৪

শ্রান্ত বিহারীলাল চেয়ারে উপবেশন না করিয়া একটা জলচৌকির উপর বসিয়া পড়িল।

'আমি মহা বিপদে পড়িয়াছি। এ তল্লাটে একটুও থাকিবার স্থান নাই। রাজার বাড়ীতে আমি যাইতে চাহি না। আমার সঙ্গে এক জন কেরাণী আছেন, তিনিও বোধ হয় অতিথি হবেন না।'

কথা শেষ না হইতেই বৃদ্ধ বনমালী ভড় আসিয়া উপস্থিত। বিহারীলাল বাগ হইতে লাহার ধুতি বাহির করিয়া কোট ও নেকটাই প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলেন। সনাতন সাহা বল্লভীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বল্লভী, এ গুলো আমার তোষার ঘরে রেখে দে।' বল্লভী অবনতমুখে সেগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী। উনি বোধ হয় আপনার কন্যা। আমি বাস্তু টিকিতে না পারিয়া বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। বোধ হয় অপরাধ ক্ষমা পাইয়াছি।

সনাতন। ওটি আমাদের স্বরূপ প্রামাণিকের কন্যা। স্বরূপের অবস্থা এখন খারাপ। তাই ওদের আমি সাহায্য করি। মেয়েটি আমাকে ধর্ম্মবাপ বলিয়া থাকে। অতি কষ্টে ওদের দিন চলে।

বনমালী। ঐ স্বরূপ প্রামাণিকের কথা আপনাকে কি বলিতেছিলাম? এক সময় রাজা পর্য্যন্ত স্বরূপকে ভয় করিত। এহেন ধর্ম্মপরায়ণ, পরিশ্রমী ও অসমসাহসী লোক এ দেশে জন্মেছে কি না সন্দেহ। তার দুরবস্থার কথা শুনে দুঃখ হয়।

বিহারী। তার অমীলাবাৎ কোথায় গেল?

সনাতন। স্বরূপ লঙ্গ, শয্যাশায়ী। তাহার পুত্র বলরাম অনেক কষ্টে চাষ করে। স্বরূপকে জ্বরেই পাড়িয়া ফেলিয়াছে।

বনমালী। বেশ। আমি আজই দেখিতে যাইব। ইহা বলিয়া বনমালী ভড় তাঁহার কুইনাইনের বড়িগুলি শিশির মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া লইলেন।

'আপনার নিবাস?'

সনাতন। মাধবপুর।

বনমালী। কি আশ্চর্য্য! তবে বনমালী ভড় ডাক্তারের নাম শুনেন নাই?

সনাতন। শুনিয়াছি বৈকি। তাঁহার ঔষধেই আমার স্ত্রীর প্রতাহ পীলে সারিয়া গিয়াছিল।

বনমালী। আমি সেই বনমালী ভড় বটি। আপনার স্ত্রীর নাম?

সনাতন। মাধবী।

বনমালী। রঘুনাথ সাহার মেয়ে? হায়, হায়! আগে বলতে হয়। তিনি কোথায় এখন?

সনাতন। এই বাটীতেই। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

ইহা বলিয়া সনাতন সাহা ভড়-মহাশয়কে বন্ধনশালার দিকে লইয়া গেলেন। সনাতন সাহার স্ত্রী মাধবীকে দেখিয়া ভড় মহাশয়ের, এবং বনমালীকে দেখিয়া মাধবীর হৃদয় ভক্তিপূর্ণ হইয়া পড়িল। আজ স্বয়ং ধন্বন্তরী সাহাগৃহে অবতীর্ণ!

'ওরে খুকী, নমস্কার কর! ওরে খুকী নমস্কার কর! ইনি আমার প্রাণদাতা। এত বড় পিলে অন্য কেহ ভাল করিতে পারিত না।'

ভড় মহাশয় পিঁড়ির উপর উপবিষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বলভী কৃত সন্দেশগুলি গলাধঃকরণ করিতে বসিয়া গেলেন। সনাতন সাহা বাহিরে কিরিঙ্গি বিহারীলালের পরিচর্য্যায় রত হইলেন।

বলভী বিহারীলালের কোট ও শার্ট লইয়া দড়ির উপর সযত্নে ঝুলাইতে বসিল। সেই সময় পকেট হইতে টুক্ করিয়া একখানা ফটো পড়িয়া গেল।

বলভী তুলিয়া সেখানি কুড়াইয়া পুনরায় পকেটে রাখিতে গিয়া দেখিল যে, একটী অপূর্ব্ব মানবী মূর্ত্তির চিত্র। নিম্নে লেখা ছিল, 'আমার মা। যিনি স্বর্গে। যার মা নাই, তাহার দুনিয়ায় কেহই নাই।—বিহারী।'

সেই চিত্র দেখিয়া, ঐ কথাগুলি পাঠ করিয়া, বলভীর স্মৃতিপটে তাহার মাতৃমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা পরক্ষণে বিলীন হইলে বলভী

দেখিল। মাথার উপর আকাশ অনন্ত, আলোকময়। সেই আলোকে তার মনটী আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কি? সে ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া একটা ভাবার অন্বেষণ করিতে লাগিল। আর না পাইয়া বালিশ টোবানি বুকে করিয়া বালিশে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে বসিল।

বিহারীলাল বাহিরের পিঠের জলযোগ সাঙ্গ করিলাছিল।

বিহারীলালের সহিত সনাতন সাহার অনেক কথা হইয়াছিল। গ্রামের অবস্থা, গ্রামের অবস্থা, লোকের ভাব, মহাজনী কারবারের লাভ ও লোকসান, জমিদার বাড়ীর চলিত, বর্ষাভাব, এই প্রকার সকল কথা বলিয়া সনাতন শেষে বলিলেন, 'আপনি অন্দর ঘরে গিয়া একটু বিশ্রাম করুন।'

বিহারী। আপনি খুব সজ্জন লোক। আপনি নিঃসহায় প্রজাকে দয়া করেন বলিয়া গ্রামে চিরকাল হইলেন। আহা, ও মেয়েটির বোধ হয় এখনও বিয়ে হয় নাই?

সনাতন। না, তুমের বিবর, মেয়েটির যা নাই। মা না থাকিলে বিয়ে দেয় কে? তবে আমার ইচ্ছা, শীঘ্রই একটি ভাল পাত্র খুঁজিয়া বিবাহ দিব, তবে নগদ টাকার জন্য পাত্র পাওয়া দুষ্কর। যদি গ্রহণে পাত্র পাই, তবে চেষ্টা করিবেন। মেয়েটি বর্ণাংশে সুলক্ষণা ও সুন্দরী। লেখা পড়া জানে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

বিহারীলাল ভাবিতে লাগিল। ঘুঘু আই! কি দুঃখ! নাপিতের বাড়ী যান কেন? ও! আমার বুঝি সুদাম প্রামাণিক ও কিছু বলিয়াছে। বিবাহ হয় নাই। কিন্তু সুদামের সঙ্গে ওকে মানাইবে না। সুদাম একটা কালো ভূত। কালো হইলেই বা! আমার তাহাতে কি?'

এই প্রকার নানাবিধ স্বগত মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে বিহারীলাল শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বল্লভী বুক ও মুখ ফুলাইয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে। হঠাৎ বিহারীলালকে দেখিয়া বল্লভীর মুখ ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল।

বিহারীলাল তাহার মাতার ফটোখানি বালিশের উপর দেখিয়া ও বল্লভীর বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া চক্ষের নিমেষে সব বুঝিতে পারিল। করুণার উচ্ছ্বাসে ও স্নেহের উচ্ছ্বাসে বিহারীলাল বলিল, 'তোমার মা ও আমার মা একই।'

বল্লভী গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

কথার কোনও অর্থ ও উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বিশ্বের কোনও নিহিত ও অজ্ঞাত সত্য বিহারীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল।

৫

বনমালী ভড় কুইনাইনের বটিকা, ক্ষেতপাপড়ার রস ও অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গ্রামের মধ্যে তুমুলকাণ্ড বাধাইয়া বসিল। যেন ঔষধ-প্রয়োগ, অমনই তাহার তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন। স্বরূপ প্রামাণিক শয্যা হইতে উঠিয়া ভাত খাইবার জন্য লালায়িত হইল। ভড় মহাশয় বলিলেন, না, যতদিন প্রজার ভাত খাইবার ইচ্ছা থাকিবে, ততদিন স্বাস্থ্য-লাভ অসম্ভব। তোমরা মণ্ড পাও, যবের মণ্ড, খইয়ের মণ্ড, এবং অন্য কোন সস্তা জিনিসের মণ্ড খাইতে থাকো। এক মণ্ডের জোরেই একটী গৃহস্থের দিন চলিতে পারে। যে লোক কাঁধে করিবে, সেই ভাত খাইবে। বলরাম! তুমি ভাত খাইতে তোমাকে বার্কে মণ্ড ও লবণ দিতাম। জিখণ্ডয়ণ্ডলাকারাং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। এই হচ্ছে গুরুর কথা। ক্রমাগত ভাত যারিলে গুরুলাভ হয় না। প্রথমে কুইনাইন, তার পর গুরুলাভ। তার পর আত্ম-দর্শন। তার পর মুক্তি। মনে থাকিবে ত?

বলরাম। হাঁ।

বনমালী। এ গ্রামে বাঁশের খুঁটী অনেক, কিন্তু বাঁশ নাই। গ্রামের বংশপ্রতিষ্ঠা বাঁশের মাচার উপর। বাঁশ গেলেই বংশ লোপ। দেখ বাবা, বাঁশের চাষ কর। ভুলীর চাষ কর। বাটীর চতুর্দ্দিকে পেঁপে গাছ লাগাও। বাজা আলু পোঁত। নারিকেল গাছ অপর্য্যাপ্ত লাগাও। গ্রামে পুষ্করিণী ভরিয়া দাও। ভাগাড়ের কাছে মুচীকে আসিতে দিও না। ঠেঙাইয়া তাড়াও। ভেরেণ্ডার গাছ লাগাও। রবিশস্যের বন্দোবস্ত কর। তোমাদের দেশ বাঙ্গালার মত ধনশালী নয়। অতএব এখানে তোমরা স্বাস্থ্যশাসনের মর্ম্ম বুঝ নাই। তাদের তামাক আছে, পাট আছে, পঞ্চায়েত আছে। তাহাদের নাম অপর্য্যাপ্ত। হিমালয় হইতে বর্ষার জল আসিয়া পলী পড়ে। এ দেশে কেবল তোমাদের পেটের রোগ্য অন্নমাত্র হয়। অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইলেই লোকে মারা যাও। ঘরের ধান কখনও বেচিও না। এক বৎসরের খোরাক নিশ্চয় করিয়া রাখিও। কাপড় না জুটে ত নেংটী পরিধান করিয়া থাকিবে; তবু বেচিতে যাও। সিগারেট ফুঁকিও না। পাঙ্গনা ও বীজের জন্য ধান

আকাশে মাথিয়া দিবে। ধান কাটিয়া লাভ ও লাইন দিবিও না। কেবলে নিজেদের জন্য রাখিবে। বিবাহে পয়সা দাবী করিলে বিবাহ করিও না। নিজের কাপড় গায়েই বুনিবার বন্দোবস্ত করিবে। নিজেই সুতা কাটিবে। সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তা দেশিয়া শুনিও না। টাকা ফাঁকি জিনিস। ধার কর্জ্জকে ভয় করিও। টাকা থাকিলেও অনেক সময় অন্ন বস্ত্র মিলে না। সন্তানকে গাঁজা টেপিয়া বিক্রয় করিতে নাই। ধান চালই লক্ষ্মী। অনাবৃষ্টি হইলে বাঙ্গা আলু ও ডাবের জল খাইবে। বাঁশের মেঞ্চে করিয়া শুইয়া থাকিবে। জ্বর হইলে আনার কুইনাইন পিল খাইবে। গরুর সেবা করিবে। দুগ্ধ বেচিও না। যত পার, বাছুরকে খাইতে দিবে। যত পড়তি জমী আছে, তাহা প্রাণপণে গরুর উপযোগী ঘাস ও খড়, কলাই ও কুর্ত্তির জন্য রাখিবে। এই নাও আমার দশটা বড়ি, শিশিতে ঝাপিয়া দাও।

স্বরূপ। বলাই, শোন্। এ সব খাঁটী কথা। বল্লভীও শুনিয়া রাখ্।

এমন সময় রাজবাটী হইতে এক জন দরওয়ানি আসিয়া সংবাদ দিল, 'রাজার অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। ডাক্তার বাবুকে ডাকছেন।'

বনমালী ভড়ের যশ যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

স্বরূপ। ডাক্তার বাবু, যান্। আহা! রাজার হউক, তিনি দেশের রাজা, আমাদের ভগবান। মারিলে ও আমাদেরই। রাখিলেও আমাদের।

চিকিৎসকের প্রতি এই অপূর্ব্ব করুণা দেখিয়া বনমালী ভড় ভাবিলেন, 'এই চাষাদের মধ্যে যতটুকু মনুষ্যত্ব আছে, তাহা বড়লোকের মধ্যে নাই। অথচ ইহারা অশিক্ষিত! শিক্ষা কোথা হইতে আসে?'

রাজা বদনচন্দ্র সিংহ ত্রিতলে শয়ান। পূর্ব্বে উঠিতে বসিতে পারিতেন, এখন তাহার যো নাই। শরীরের এক অংশ উঠিতে চাহে, কিন্তু পারে না। এক অংশ উঠিতে চাহে না, এবং সামর্থ্যও নাই। এক অংশ উঠিবার সামর্থ্য থাকিলেও উঠিতে চাহে না। এই তিন অংশ লইয়া রাজা শয্যায় উলট্‌পালট্ করিতেছিলেন। বনমালী ভড় নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, 'আপনার শরীরের অবস্থা এখন ঠিক দেশের মতন, অতএব শীঘ্রই দেশের মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইবে।'

রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন। রাণী অন্তরালে কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রাইভেট্ সেক্রেটরী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনও উপায় নাই?'

অবসন্ন দেহে কল্পনা খুব জাগিয়া উঠে। সেদিন স্বরূপ প্রাকৃতিক শয্যায় শয়ন করিয়া 'আবোল-তাবোল্' অনেক কথা বকিতে লাগিল। একবার বলিল, 'বাবারাম! আমি রেলের গাড়ীর শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' নিকটে বলরাম ছিল না। বল্লভীর মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, 'বাবা, মাঠ হইতে দাদাকে ডাকিয়া আনি।'

স্বরূপ। না। বরঞ্চ বিহারীবাবুকে ডাকিয়া আন। আমি তাঁর পায়ের শব্দ শুনছি।

বল্লভী বাহিরে গিয়া দেখিল, খানিক্ দূর গিয়া বিহারীলাল যাইতেছে। বল্লভী দৌড়িয়া তাহার নিকট গিয়া বলিল, 'আপনি একবার আসুন। বাবার কথা শুনে ভয় হ'চ্ছে।'

সকলে স্বরূপের বাটীতে যাইত, কিন্তু দুর্নিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও বিহারীলাল যাইতে সাহস পাইত না। এত ভয় কিসের?

বিহারীলাল। চল।

বল্লভী ভয়ে জড়সড় হইয়া অগ্রে চলিল। পদতলে প্রকাণ্ড এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। বল্লভীর মুখ লজ্জায় ও দুঃখে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

বিহারীলাল বলিল, 'আমার হাত ধর।'

বল্লভী বলিল, 'না। বাটীতে গিয়া কাঁটা বাহির করিব।'

বিহারী। ব্যথার কি হবে?

বল্লভী। যাওক।

বিহারী। আমি লাগিতে দিব না।

ইহা বলিয়া বিহারীলাল বল্লভীর দক্ষিণ বাহু স্বীয় বাম বাহুতে বদ্ধ করিয়া বলিল, 'তুমি ভর দিয়া চল।'

বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া বল্লভী বলিল, 'আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি কাঁটা তুলিয়া আসি।'

বিহারী। না। তোমার পিতার সম্মুখে তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তুমি যে আমার আদরের ও যত্নের, তাহা তোমার পিতা জানুন।

বল্লভী ভাবিল, 'কিসের আদর? কিসের যত্ন? উনি বড়লোক, আমি দরিদ্র চাষা। আমার সহিত উঁহার সম্বন্ধ কি?' কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে বল্লভীর বাম বিহারীলালের বাহুকে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিল। তাহারই বলে বিহারীলাল বল্লভীর করতলের এক অংশ হঠাৎ উত্তোলন করিয়া ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিল।

বনমালী। রোগেরও যেমন ব্যবস্থা, শরীরের পক্ষেও তাহাই। অর্থাৎ, কুইনাইন পিল, স্বায়ত্তশাসন ও সমবায়-সমিতি। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত করিয়া সবগুলির হিতার্থে পরিশ্রম করাটি একমাত্র উপায়। ইহারই নাম সমবায়-সমিতি ও স্বায়ত্তশাসন। একটা অঙ্গকে স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আর একটা অঙ্গকে গলীর বাহিরে রাখা মানেই মৃত্যুর সৃজন। প্রজারা স্বায়ত্তশাসন করিবে, এবং জমীদার ও মহাজন সহরে বসিয়া মজা লুটিবে, এটা শরীরতত্ত্বের বহির্ভূত প্রথা। আমার একখানা নলিয়া প্রাণসংযম করুক, আর অন্যান্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করুক, এ হেন যোগ কোনও শাস্ত্রই প্রচার করে নাই। ইহার একই ঔষধ—কুইনাইন। যথেচ্ছোপ হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু এ রোগে প্রথমে সর্ব্বাঙ্গ তিক্তরসে সিক্ত করিতে হইবে। ইহাই আপাততঃ শ্রেয়।

বনমালী ভড় একটি বটিকা লইয়া রাজার মুখে দিয়া বলিলেন, 'জলের সহিত গিলিয়া ফেলুন।'

রাজা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিলেন।

বনমালী। আপাততঃ তিক্ত ও কটু, কিন্তু ফলে খুব ভাল। আমি সম্প্রতি আপনার জমীদারীর অবস্থা দেখিতেছিলাম। এত কর্ম্মক্ষেত্র আপনার সম্মুখে পড়িয়া থাকিতে আপনার শরীর উঠিয়া দাঁড়াইবে। কেন না, শক্তি এক পথে গিয়া থাকে। আপনি প্রজাদের সঙ্গে মিশিয়া-জুলিয়া করুন, তাহারাই আপনার বৃহৎ পরিবার। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় হইবে না, অন্ন বস্ত্র প্রচুরপরিমাণে থাকিবে। সকলে মিলিয়া রাজ্যশাসন করুন। মাথা-জুটাইয়া সাপ্তাহিক আলোচনা করুন; ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করুন। একবার সহজ করুন, উপায় আপনিই জুটিবে। আদালত, আইন কানুন ও অন্যান্য রোগের সবই কমিয়া যাইবে। স্বাস্থ্যও ফিরিয়া আসিবে।

৬

বনমালীর কুইনাইন পিল রাজা বদন সিংহকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছিল। এমন কি, সপ্ত দিবসের মধ্যে রাজার গতিগতি ফিরিয়া গিয়াছে।

ইত্যবসরে বিহারীলাল গ্রামের প্রজাদিগের ছেলেপুলের সহিত খুব মিশিয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে লইয়া বিহারীলাল মাঠে ঘাটে ও ভাগাড়ে বেড়াইত। সেই অবসরে কোথায় কি চাষ করিতে হইবে, কোথায় জল বাঁধিতে হইবে, কোন্ পথ দিয়া ময়লা বাহির হইবে, কি করিয়া অল্প খরচে স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করা যায়, এই সব কথা ভাবিত, এবং নিজের মস্তক সকলকে বহিত।

স্বরূপ বিহারীলালকে দেখিয়া বলিল, 'আসুন। দরিদ্রের ঘরে আপনারা আসিলে আমাদের স্পর্দ্ধা হয়।' ইহা বলিয়া উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না।

বিহারী। আপনি উঠিতে চেষ্টা করিবেন না।

স্বরূপ। আপনি আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিবেন না। আমি চাষা। জন্মাবধি জমীদারের গালি ও জুতা খাইয়াছি। পদাঘাতে বিতাড়িত হইয়াছি। কেবল খাজনার দায়ে। আমাদের বাসবৃত্তি। আপনাদের মুখে ও কথা শোভা পায় না। বল্লভী! বিহারীবাবুর হাত ছাড়িয়া দাও।

কিন্তু বিহারী সদর্পে হাত ধরিয়া রাখিল, এবং মুখ তুলিয়া বলিল, 'আপনার ধারণা কিন্তু স্বতন্ত্র। আমি প্রজাগণকে ঈশ্বরের দৈব ভ্রম ও সহিষ্ণুতার আধার বলিয়া মনে করি। দরিদ্র হইলেও আপনার ইতিহাস ভবিষ্যতের চিরস্মরণীয়। ইতিহাস আত্মোৎসর্গই দেখিয়া থাকে, এবং তাহারই মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করে। ভগবানের সম্পূর্ণ অবতার, এই জন্য ব্রাহ্মণ-বালকদিগকেই সখারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অগ্রজ বলরামের হাতে লাঙ্গল দিয়াছিলেন।

স্বরূপের চোখে জল আসিল।

বিহারী পুনরায় বলিল, আমি বল্লভীর কর স্পর্শ করিয়া আজি গৌরবান্বিত।

স্বরূপ। না; তুমি জল আনিয়া বিহারীবাবুর পা ধুইয়া দাও।

বল্লভী পিতার কথাবার্ত্তায় আর কোনও বিকারের ভাব না দেখিয়া আশ্বস্তা হইয়াছিল। সে বলিল, 'বাবা! তুমি রেলগাড়ীর কথা বলিতেছিলে, তার অর্থ কি?'

স্বরূপ। তার অর্থ বোধ হয় ডুইনাইনের মাত্রা বেশী হইয়া গিয়াছিল। যখন বেশী হয়, তখন অনেক রকম অপূর্ব্ব দৃশ্য শুনি। অনেক পুরাণো কথা মনে জাগিয়া উঠে। আমি একবার রেলগাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। সে প্রায় দশ বৎসর আগে। তখন তোর মাকে নিয়ে কাশীতে তীর্থ করিতে যাই; সেই তাহার শেষ।

বল্লভী করতলে মুখ ঢাকিয়া চলিয়া গেল।

বিহারীলাল। আপনি ও সব কথা বলিয়া কন্যার মনে ব্যথা দিবেন না।

স্বরূপ। বল্লভীর জন্য আপনার ব্যথা হয়?

বিহারী। হয়।

স্বরূপ। না হওয়াই ভাল। আপনি দু'দিনের অতিথি। এ গ্রামে আমার দেহ শীঘ্রই ভস্ম হইয়া যাইবে। তখন বল্লভী কোথায় যাইবে, বলিতে পারেন? তাহার জীবনে এখনও কত ব্যথার আকর পড়িয়া আছে, তাহা কে জানে? তখন তাহার খবর কে লইবে?

বিহারী। আমি লইব।

স্বরূপ বিহারীলালের কথার মর্ম্ম বুঝিল না। মানব-হৃদয় জাতি কুল মান এড়াইয়া প্রেমের পথে কত দূর 'আত্মহারা' হইতে পারে, সেটুকু সেকালের স্বরূপ প্রামাণিক ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। সে কেবল বলিল, 'ভগবান করুন, যেন আপনি মধ্যে মধ্যে অনাথার মঙ্গল অমঙ্গলের সংবাদ লইতে পারেন। এই কি আমার পক্ষে কম আশার কথা!

বিহারীলাল দুঃখিত হইল। কি বলিতে চাহিল, বলিতে পারিল না। স্বরূপ প্রামাণিক নিদ্রিত হইয়া পড়িল। বল্লভী কপাটের আড়াল হইতে ডাকিল, 'জল এনেছি।'

বিহারীলাল অগ্রসর হইয়া বলিল, 'কেন?'

বল্লভী। পা ধুইয়ে দেব?

বিহারী। তোমার অধিকার কি?

বল্লভী। দাসী।

বিহারী। আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও রমণীর আমায় পদতল স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। তুমি যাও।

বল্লভী অবাক হইয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

৭

বিহারী দেখিল যে, বল্লভীর মুখ মলিন হইয়া গেল। তাই বিহারী বলিল, 'বল্লভী, রাগ করনি ত?'

বল্লভী। না।

বিহারী। তবে বুঝাইয়া বলি। যাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহারই ছোট হইতে পারি। দাসত্বের ভাব জগতে আর থাকিবে না। তুমি 'দাসী' বলাতে আমার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে—

বিহারী কথাটি শেষ না করিয়া বলিল, 'আমি তোমার পা ধুইয়া দিতে চাহি। তোমার পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিতে চাহি। তুমি তাহাতে বাধা দিও না।'

বল্লভী কাতরভাবে বলিল, 'আপনি দেবতা, অমন কথা বলিবেন না।'

বিহারী। দেবতা মানুষের পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিতে পারে না?

বল্লভী। না।

বিহারী। মানুষকে বিবাহ করিতে পারে না?

বল্লভী। না।

বিহারী। মানুষকে ভালবাসিতে পারে না?

বল্লভী। না।

বিহারী। দেবতা কোন্ জাতি?

বল্লভী। তাঁরা উচ্চ জাতি।

বিহারী। তুমি এ কথা কোথায় পাইলে?

বল্লভী। রামায়ণে।

বিহারী হাসিল। 'আমি সে জাতীয় দেবতা নহি। তাহা হইলে জোর করিয়া তোমার পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিতাম; এমন কি, আমার মনের ও প্রাণের কথা জোর করিয়া তোমায় বলিতাম। কিন্তু আমি মানুষকে দেবতার চেয়ে বড় মনে করি। তাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর লুকাইয়া থাকেন। সোজা কথায় বলি, তুমি কাহারও পায়ে হাত দিও না। আমার হিংসা হয়। আমার পায়ে হাত দিলেও হইবে, কেন না, তুমি আমার নও।

বল্লভীর মনোমধ্যে এই কথাগুলি বহা আন্দোলন বাধাইয়া দিল: 'কিসের হিংসা?'

বিহারীলাল। নিরাশার হিংসা। আমার মনে আজ একটু আশা হয়েছিল।

বল্লভী। কিসের আশা?

বিহারী। তুমি আমার অঙ্কলক্ষ্মী হবে। আমার জাতিবিচার নাই। আমি তোমাকেই চাহি, চিরজীবন চাহিব। তোমাকে না পাইলে আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।

বল্লভীর বক্ষঃস্থল পূর্ব্বেই কম্পিত হইয়াছিল, সে হঠাৎ দ্রুতবেগে পিতার নিকট গিয়া শয্যার পার্শ্বে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল।

এমন সময় লাঙ্গল-কাঁধে বলরাম বনমালী ভড়ের সহিত গৃহে প্রবেশ করিল বল্লভীকে দেখিতে পাইল।

'বল্লভী, তুই কাঁদছিস্ কেন? বাবা ভাল আছেন ত?'

৭৮২ ... ...

সনাতন। অনেকটা। অর্থাৎ, অন্নের ভার বল্লভীকে দিয়াছি, ব্যঞ্জনের ভাগে কিঞ্চিৎ আমরা।

বিহারীলালের মুখ গম্ভীর হইল।

বনমালী। তিলি ও নাপিত, ইহাদের মধ্যে তিলিই শ্রেষ্ঠ, যদিও শাস্ত্রে কিছু লেখে না। আমরা অর্থাৎ 'ভড়' বংশ শাকদ্বীপ হইতে ঝড়ে উড়িয়া আসিয়াছিলাম, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন। ফলে কেবল ব্রাহ্মণেরই ঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের মধ্যে 'ভ্রাতা' ছিল। বৈদ্যের কোনও পাত্তা এখন নাই। শূদ্র যে ঠিক কাহারা, তাহা লইয়া মহা ঝগড়া। কিন্তু কুইনাইন সেবন করাইয়া দিলে ঠিক পাওয়া যায়, সে সকলেরই নেরুদণ্ড এক রকম, অর্থাৎ, ঠিক গোসাপের মত। জ্বর আসিলে একই রকম কম্প সকলের, একই সময় ঘর্ম্ম দিয়া ছাড়ে, এবং একই সময় পুনরায় আসে। ইহাই খাঁটী ম্যালেরিয়া, অর্থাৎ, স্বদেশী জ্বর। আমাদের নিজস্ব। যে ব্যাটাই এ দেশে আসুক না কেন, ম্যালেরিয়া সহিতে পারিবে না—আমরাই ক্রমশঃ পারিব। আপনারা এক একটা বড়ি খাইয়া অতিথিসৎকার করুন।

সনাতন (হাসিয়া)। সকলেই দিয়াছ?

বনমালী। বেশ! বোধ হয় বল্লভীও পাইয়াছে।

বিহারীলাল হাসিল; হাসিয়া লজ্জিত হইল।

সকলে আহারে বসিয়া গেলে বল্লভী স্বয়ং পরিবেষণ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের পক্ষে এহেন স্থলে পরিবেষণ করা একটু শক্ত কথা, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে দিন কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই।

এই সুযোগে বনমালী ভড় জাতিভেদ সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা কহিলেন।

'জাতি জীবের একটা অবলম্বন। জাতির প্রভেদ আছে বলিয়াই জাতিগত প্রত্যেক অংশ জীবনসংগ্রামে বাঁচিয়া থাকে। জাতি সমাজরূপী জননীর জঠর। জাতির গণ্ডীর মধ্যে থাকে বলিয়াই, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ ও মানব এতদিন তিষ্ঠিয়া আছে, নচেৎ প্রলয় হইয়া পড়িত। যত দিন আত্মবোধ প্রসারিত না হয়, তত দিন জাতিভাব খুব প্রবল থাকে। 'হিন্দু' বলিয়া কোনও জাতি নাই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও আত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহার আত্মবোধ

ব্রাহ্মণ কর্ম্মে লিপ্ত ছিল না। অন্যান্য বর্ণের আত্মবোধ তাহাদের কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে। কর্ম্মক্ষেত্রের তারতম্যে বর্ণের তারতম্য। কর্ম্মক্ষেত্রের শিথিলতায় জাতিভেদের শিথিলতা। কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তৃতিই আত্মবোধের বিস্তৃতি। উপযুক্ত শূদ্রের আত্মবোধ অনুপযুক্ত ক্ষত্রিয় কিংবা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দাঁড়াইলে তাহার কর্ম্মও অধঃপতিত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। এক জন দুরাচার মদ্যপায়ী পরদারবত ব্রাহ্মণ, কিংবা কোনও বিজাতীয়-ব্যবসায়-কারী ব্রাহ্মণ স্বীয় জাতি হইতে ভ্রষ্ট। অথচ কর্ম্মে সকলেরই অধিকার আছে। শূদ্র যুদ্ধ-ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে। কর্ম্মের সহিত জাতিগত পূর্ব্ব-সংস্কারের বিরোধ আরম্ভ হইলেই জাতিভেদ শিথিল হইবে। জগৎ হইতে জাতিভেদ লুপ্ত হইবে না, কিন্তু পুরাতন জাতি ও বর্ণের সহিত অধুনাতন জাতি ও বর্ণের শুক্র ও শোণিত সম্বন্ধের লুপ্ত হইয়া যাইবে। বাস্তবিক যে কোন্ কুলের, ও কোন্ বংশের, তাহার চিহ্ন থাকিবে না।

সনাতন। তবে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে বিবাহে দোষ কি?

বনমালী। দোষ ও গুণ, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, আমাদের বিচারাধীন নহে। আমি কেবল বুঝাইয়া দিতে পারি। জাতিভেদ শিথিল হইবার কতকগুলি সাময়িক কারণ উপস্থিত হয়। প্রথমে বলিয়াছি, কর্ম্ম-বৈচিত্র্য। একই জাতির মধ্যে যদি কর্ম্মের ঐক্য না থাকে, তবে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটে। একই বর্ণের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই দেখুন, ধোপাদের মধ্যে অনেকে পয়সা উপার্জ্জন করিয়া উচ্চ-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা আর কাপড় কাচে না। খুব বর্দ্ধিষ্ণু ধোপার ঝি, যাহার স্বামী হয় ত হাইকোর্টের উকীল, সে এখন নিজে কাপড়ে সাবান মাখায় না, নিজের গায়েই মাখে, এবং স্বামীকেই সেই পূর্ব্ব কালের গর্দ্দভ বলিয়া মনে করে। ক্রমে লেখাপড়া শিখিলে ও দেখিতে খুব সুন্দরী হইলে, ব্রাহ্মণের কুৎসিত বোকা মেয়ে তাহার ভাত রাঁধিয়া দিতে কুণ্ঠিতা হইবে না। এমন উচ্চদরের ধোপাকে অন্য ধোপা চক্ষে দেখিতে পারে না। ক্রমে তাহারা যাহাতে দেশ হইতে কাপড় কাচা উঠিয়া যায়, ভগবানকে তাহাই প্রার্থনা করে। এ সব ক্রমবিকাশের কথা। এই জন্য কখনও কখনও বহুবিবাহের দরকার হয়। আজ ধোপা কাল নাপিত, অন্য বৎসর এক জন মুসলমান দরজি, এবং সুসময়ে একটা সুন্দরী শ্রেষ্ঠীর মেয়ে, এই রকম ক্রমাগত বিবাহ করিলে যে সকল পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের পুত্রে-

একটা বড় জাতি জন্মিতে পারে, এবং তাহাদের কোনও ভাগিনেয় কিংবা ভগিনীপতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ পুরুষ দাঁড়াইতে পাবে; অর্থাৎ, একই আধারে সে ধোপা, নাপিত, ছুতার, কামার, বৈদ্য, এবং দরজির কর্ম্মে পটু হইবে। কাহারও তোয়াক্কা রাখিবে না। অনেকগুলি এই রকম জন্মিলে জিনিসের দর কমিয়া যাইবে, মজুরী কমিয়া যাইবে, বাটীতে দাস দাসীর দরকার হইবে না। হার্ব্বার্ট স্পেন্সর ইহাকে 'ইভল্যুসন' বলিয়া থাকেন।

সনাতন। ইহাতে নানাবিধ বংশগত রোগের সঞ্চার হইতে পারে।

বনমালী। কেবল কুইনাইনের ওষ্ধাতা, দাদা, কেবল কুইনাইন।

বিহারী। আমরা যাহাকে নীচ জাতি বলিয়া থাকি, তাহারাই অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। শ্রমজীবী কৃষকের সহিত যদি কোনও অলস উচ্চ বর্ণের ভদ্রাগত বিবাহ হইতে থাকে, তবে কৃষককুলই অধঃপতিত হইবে। দেশের হানি হইবে। তবে আর একটা কথা আছে। যদি কোনও উচ্চ বর্ণের লোক নীচ বর্ণের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সেই জাতির উন্নতিসাধন করিতে চাহে, তাহাতে বাধা কি?

বনমালী। আজ কাল কোনও আন্দোলনের মূলে কেবল রূপের মোহ ও পয়সা। উন্নতির কথাটা মুখে। যখন স্বজাতিকেই কেহ উদ্ধার করিতে দাঁড়ায় না, তখন অন্য জাতির কন্যা বিবাহ করিয়া সেই জাতিকে তুলিতে চাহিবে, এমন বিরাট আত্মবোধ এখনও এ দেশে জন্মে নাই। পূর্ব্বে বিপ্লবের মূলে ধর্ম্ম থাকিত। পাঁচটা জাতি ও বর্ণ ভাঙ্গিয়া একটা নূতন জাতি হইত। যেমন বৈষ্ণব ও শিখ সম্প্রদায়। তখন সকলে ধর্ম্মকেই জাতিবল বলিয়া ভাবিত। এখন পয়সা লইয়া ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব। আমাদের গ্রামে একটা বৈষ্ণবীর অনেক সম্পত্তি ছিল, এবং রূপও ছিল। সে ঐক জন সুবর্ণবণিকের প্রেমে পড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল, এবং উভয়ে নূতন চুক্তির আইনে বদ্ধ হইয়া ঘোড়ব-কারে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক প্রত্যহ সহর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। একদিন সেই বৈষ্ণবীর ভূতপূর্ব্ব ভ্রাতা দ্বারে আসিয়া বণিক মহাশয়কে কহিল, 'মহাশয়, আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐ সম্পত্তিটুকুই ভরসা ছিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া অর্দ্ধেক সেই সম্প্রদায় ও ভগবানের নামে ছাড়িয়া দিন।' বণিক চটিয়া কহিলেন, 'হে ভূতপূর্ব্ব শ্যালক! পয়সা নিজস্ব। কোনও সম্প্রদায়ের নহে। আমি পতিত বৈষ্ণব জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য তোমার ভগিনীকে বিবাহ করি নাই। আমার উদ্দেশ্য তার চেয়েও মহৎ। সেটা যে কি, তাহা

শীঘ্রই একটা সমিতিতে ঠিক করিয়া যাইবে। আপাততঃ তাহার খাতিরে তোমাকে পাঁচটি টাকা দিতেছি।' এই প্রকারে সুন্দরী মেয়েগুলো ও জমাদের পশুপাখগুলো দেখাইয়াপড়ি লয়া সমাজ বাড়িয়া লইতে পারিলে ভবিষ্যতে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও খণ্ড হইবে, পাকে প্রকারে তাহারা ভিক্ষা করিবে, এবং সমস্যার উচিত গোটা জাতিদের অন্ন ও বস্ত্র ভ্রাতৃবর্গের জন্য হয় একটা রিলিফ-ওয়ার্কস্ কিংবা স্বায়ত্তশাসনের নূতন বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।'

এই রকম নানাবিধ আলোচনায় সকলের ক্ষুধা বাড়িয়া গেল; এবং সকলে প্রচুর ভোজন করিল।

৯

বিহারীলালের সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। সে প্রত্যূষে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া গ্রামের মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। গ্রীষ্মকাল। কতকগুলি লোকমুক্ত কৃষক পূর্বাহ্ণের শীতলতা উপভোগ করিয়া পাঠ গান করিতেছিল। কতকগুলি মুকুল পাখী নিকটস্থ উচ্চ তালবৃক্ষ প্রেমলালিকের বাটীর কদম্ব বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছিল। বিহারীলাল উহা জানিত। সেই পাখাগুলিকে দেখিবার জন্য কদম্ব বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল।

কিন্তু পাখীর চেয়ে বিহারীর আরও অনেক প্রিয় জিনিস সেই বৃক্ষতলে বসিয়া একমনে বীণা বাজাইতেছিল।

যখন একটী [illegible] যে মানুষকে ধ্যান করে, সে তাহাকে টানিয়া আনে।

বিহারী নিকটে গিয়া মৃদু ধীরে বলিল, 'বল্লভী! তোমার বাবা কেমন আছেন?'

বল্লভী চমকিয়া উঠিল, 'তুমি এখানে? বাবা ঘুমাইতেছেন।'

বিহারী। বসিতে কৈ?

বল্লভী। গরু লইয়া মাঠে গিয়াছে।

বিহারী। তুমি একলা ব'সে কি ভাবছিলে?

বল্লভী লুকাইতে গেল; কিন্তু জন্মাবধি সে মিথ্যা কথা কহে নাই, তাই সে বলিল, 'তোমাকে ভাবছিলুম।' সেই কথাটির সঙ্গে সঙ্গে দুই এক বিন্দু অশ্রু সত্যের সাক্ষ্য দিতে বল্লভীর নয়নপল্লবের এক কোণে দেখা দিল। সেই মধুর 'তোমাকে' শুনিয়া বিহারী বুঝিল যে, তাহার কাল্পনিক জগৎ সত্য। সেখানে মেঘ আছে, প্রেমের ফুল আছে, তাহার জন্য একটা আসন পাতা

[illegible] [illegible] [illegible] [

কিন্তু তুমি যে ব্রত লইয়াছ, তাহা আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ঈশ্বর করুন, তুমি কৃতকার্য্য হও।'

বনমালী ভড় বড় সোজা লোক নয়। তাহার কুইনাইন-পিল একটা দ্রাতব্য ঔষধালয়ে স্তূপীকৃত হইল। বনমালী যত দিন বাঁচিয়া ছিল, তত দিন কুইনাইনের বড়ী প্রস্তুত করিত। বনমালী অত্যন্ত বৃদ্ধ হইলে, সনাতন সাহা ও তাঁহার স্ত্রী মাধবীর হস্তে দিয়া বলিলেন, 'যত দিন স্বায়ত্ত-শাসন সম্পূর্ণ না হয়, এগুলি তৈয়ারী করিয়া সকলকে বাঁটিয়া খাওয়াইবে। ইহা ছাড়া দেশের পক্ষে অন্য কোনও ভাল ঔষধ নাই।'

শ্রীনিধিরাম।

সাহিত্যে ভাব-বিপর্য্যয়।

[সাহিত্য-সভার সভাপতি শ্রীযুত মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অভিভাষণ;—গত ১৯শে মাঘ ঊনবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।]

* * * বাজার ও রাজ্যের মঙ্গলার্থ রাজভক্ত ভারত তাহার দেহের শেষ শোণিতবিন্দু পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে স্বর্গে ভগবানের আসন নড়িয়া উঠে বলিয়া যে দেশের বিশ্বাস; দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারে সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত অভিসম্পাতে যে দেশে কাব্যের সৃষ্টি; সে দেশের লোক অত্যাচারপ্রপীড়িত ভূমণ্ডলের উদ্ধারসাধনের জন্য যে প্রাণপণ যত্ন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় ভারত যে তাহার ধর্ম্মপ্রাণতার চিরপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দ ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিকই গত চারি বৎসরের কথা স্মরণপথে উদিত হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সুরম্য-সৌধমালা-পরিশোভিত আনন্দমুখর জনপদের তলদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে আগ্নেয়গিরির যে ভীষণ আলোড়ন আস্ফালন চলিতেছিল, তাহা কে জানিত? শত শত বৎসর ধরিয়া যে সম্পদ্, যে সৌন্দর্য্য, যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত হইতেছিল, কে জানিত, তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাসাইয়া দিবার জন্য উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গের সহিত অনলাম্বুধি অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইবে? য়ুরোপের এত সভ্যতা, এত বিদ্যা, এত শিক্ষা—

যাহার আদর্শে আজিকার আমাদের জীবন গঠন করিবার জন্য ব্যগ্র—তাহার ভিতরে এত বিষ, এত দাহ, এত উদ্ভ্রান্ততা। ইহা সমস্তে যাহা গঠিত হয়, অব্যবস্থিতচিত্ত বালকের ন্যায় এক দিনের খেয়ালে তাহাই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এ সভ্যতা—এ শিক্ষার সার্থকতা কি? এই প্রশ্নই এখন আমাদের মনে স্বতঃ-উদিত হইয়া থাকে।

এই প্রশ্নের সহিত আমাদের সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সাহিত্যের আদর্শ লইয়া এখন আমাদের মধ্যে মস্ত আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভারতীয় অর্থাৎ আর্য্য-সাহিত্যের—আদর্শ—ত্যাগ, সংযম—ভোগ বিলাস নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Pessimistic বা দুঃখবাদের সাহিত্য বলিয়া আমাদের সাহিত্যের অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের দেশেরও এক সম্প্রদায় লেখক এখন এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু য়ুরোপ যাহাকে Pessimism বলে, আমাদের সাহিত্যের আদর্শ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের সাহিত্য সুখের বা ভোগের বিরোধী নহে; তবে শাস্ত্রকারেরাও সংযত হইবার উপদেশ দিয়াছেন, নতুবা ভোগের পরিণাম বিষময় হইয়া উঠে।

আমাদের কবি ও শাস্ত্রকারগণ স্থায়ী সুখলাভের জন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভোগ নয়—কিন্তু সংযত ও নিষ্কাম হইয়া। তাহার ফলে অনন্ত সুখ ও শান্তির অধিকারী হইবে। আমাদের প্রাচীন কবীশ্বর, প্রয়োজন হইলে, অম্লানবদনে বনে বনে ঘোড়াচরণ করিতে পারিতেন; সুবর্ণপাত্রে পবিত্যাগ করিয়া মৃৎপাত্রে আহার করিতে পারিতেন; মর্ম্মর-প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া ঋষির উটজে কুশাস্তরণে শয়ন করিতে পারিতেন। আর্য্য-শাস্ত্রকার নবীটিকার সৃষ্টি করিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে ধ্বংসের পথে লইয়া যান না। তিনি তাহাকে প্রকৃত পথের অনন্ত ক্ষীরোদ-সমুদ্রের সন্ধান বলিয়া দেন। সেই ক্ষীরোদ সমুদ্রে উপস্থিত হইতে হইলে বহু প্রলোভন, বাধা বিঘ্ন এড়াইতে হইবে। কিন্তু বোলতার ঐহিকতাপ্রিয় (materialistic) ইহকালসর্ব্বস্ব য়ুরোপের আদর্শ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা জীবন-সুরার সমস্ত পাত্র করিবেন, তোমের কণাটুকুও বাদ দিবেন না। তাঁহাদের কথা—"আমি যা চাই, তা আমি খুব চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে ক'রে দলব। সমস্ত খাব তা নাখও, সমস্ত পেট ভরে তা খাব।"

এই উৎকট ভোগলালসার ফল যেরূপ ঘটে হয় পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য এই কালের অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে! য়ুরোপে যে কোনও মতের উদ্ভব হয় না আমাদের দেশে তাহারই সমর্থন করিয়া এক দল লোক আসিয়া জুটিয়া থাকেন, এবং সেজন্য পূর্ব্বকৃত বিচারই প্রায়শঃ ব্যর্থ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে এই আন্দোলনের ফলাফলের প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই। দেশের প্রকৃত উন্নতি তাঁহারা তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই দেখিয়া যাইতে উৎসুক। কিন্তু পৃথিবীর উন্নতি ত এত সংক্ষেপে সাধিত হয় নাই—পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কত চিন্তা কত ভাবের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলি কোরক অবস্থায় শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে; কতকগুলি ফুটিতে ফুটিতে প্রতিকূল অবস্থায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কতকগুলি আমার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। যেগুলিকে এক সময়ে পৃথিবীর লোক চিন্তা বা ভাবের চরমোৎকর্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিল, বাস্তবিকই তাহাদের উচ্ছেদের জন্য কত শত চেষ্টা হইয়াছে। অতএব, পুরাতন হইলেই যেমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, এমন নহে, সেইরূপ নূতন হইলেই যে তাহা সর্ব্বথা গ্রহণীয়, এমনও হইতে পারে না। বরং পুরাতনের দোষ গুণ অনেক দিনের পরীক্ষিত বলিয়া, ইহার স্বপক্ষে বিপক্ষে দুই একটি কথা বলিতে পারা যায়; কিন্তু একেবারে অপরীক্ষিত নূতনকে—সম্পূর্ণ অপরিচিত অভিনবের ভাব-কেতকীর সন্দেহের চক্ষে দেখা আমাদের স্বভাব। তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি না, কি জানি যদি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে ছুরিকা লুক্কায়িত থাকে। এই সন্দেহ, সঙ্কোচের জন্য যাঁহারা আমাদিগকে উপহাস করেন, করুন, কিন্তু ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

য়ুরোপের এক একটা নূতন মতবাদ গ্রহণ করিতে আমাদের সন্দেহ সঙ্কোচের যথেষ্ট কারণ আছে কি না, তাহা সেই সকল মতের একটু আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবে। আজকাল য়ুরোপীয় সাহিত্যে নীজ্‌কে ও ইব্‌সেনের মতের খুব আলোচনা হইতেছে। যে অতিমানুষবাদ (Superman) এখন ওতপ্রোতভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, নীজ্‌কে সেই মতের এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইহা ই সঙ্গে সঙ্গে "Feminist movement"ও খুব প্রবল হইয়াছে। ইব্‌সেন সেই আন্দোলনের এক জন প্রধান সহায়। নীজ্‌কে ও তৎসম্প্রদায়ের মত আধুনিক জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য

বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং গত সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধের জন্য ইহারা বহুলপরিমাণে দায়ী। আমরা আমাদের উক্তির সমর্থনার্থ এই মতের একটু আলোচনা করিব।

নীজ্‌শের মতের সারাংশ এই—আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতি যে জীবন যাপন করিতেছে, তাহা একেবারে উদ্দেশ্যহীন। অতএব, মনুষ্যজাতির সম্মুখে একটি উদ্দেশ্য স্থাপন করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে—Superman বা 'অতি-মানুষ' জাতির সৃষ্টি; অর্থাৎ, এই মনুষ্যজাতি ক্রমোন্নতিপরম্পরায় যাহাতে এক শ্রেষ্ঠতম জীবে পরিণত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। যে ধর্ম্ম, যে রাজনীতি বা সমাজনীতি, ইহাদের মতে, এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিকূল, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। জগতে কেবল শক্তিশালী লোকেরই প্রয়োজন; কারণ, এই সকল শক্তিশালী লোক হইতেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতশক্তি জাতির সৃষ্টি হইয়া সুদূর ভবিষ্যতে "অতিমানব" জাতির সৃষ্টি সম্ভবপর হইবে।

নীজ্‌শের নীতিশাস্ত্রে দয়া ধর্ম্মের স্থান নাই। কারণ, ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা হইতেই দয়ার সৃষ্টি। দয়া মানুষকে শক্তিহীন করে। নীজ্‌শের নিজের কথা এই—

"Pity is opposed to the tonic passions which enhance the energy of the feeling of life, its action is depressing. A man loses power when he pities. On the whole, pity thwarts the law of development which is the law of selection. It preserves that which is ripe for death, fights in favour of the disinherited and the condemned of life. By multiplying misery quite as much as by preserving all that is miserable, it is the principal agent in promoting decadence."

অর্থাৎ, দুর্ব্বলের উপরেই লোকে দয়া করিয়া থাকে। যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা জগতের আবর্জ্জনা; তাহারা জগতে 'disinherited', অর্থাৎ, সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত, এবং 'condemned', অর্থাৎ, বধ্য। তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে কেবল দুঃখদৈন্যের ভার বর্দ্ধিত করা হয়। তাহাতে মানব জাতির অবনতিই ঘটিবে, জগৎ supermanএর দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব, দুর্ব্বলের প্রতি দয়া-প্রকাশ অতি অন্যায় কার্য্য।

আবার—

"The weak and the botched shall perish; first principle of our humanity. And they ought even to be helped to perish."

অর্থাৎ দুর্বল লোকদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যজাতির নীতিশাস্ত্রের প্রথম সূত্র। ইহারা যাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহার সুবিধা পর্য্যন্ত করিয়া দিতে হইবে। এই সকল কথা ডারউইনের যোগ্যতমের উর্ত্তন-বাদের (Survival of the fittest) প্রতিধ্বনিমাত্র। তিনিও বর্ত্তমান সভ্য সমাজে অযোগ্য, পীড়িত, রুগ্ন মানবের রক্ষার্থ বিজ্ঞানের চেষ্টা মানব জাতির উন্নতির পরিপন্থী—এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

নির্ভীকতা, রণপ্রিয়তা—ইহাই নীত্‌শের মতে উন্নত মনুষ্যজাতির বিশেষ গুণ।

"War and courage have done more great things than charity. What is the good? Ye ask. To be brave is good. Live your life of obedience and of war."

যাঁহারা জর্ম্মান্ সেনানী Bernhardi প্রণীত "Germany and the next war" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে নীত্‌শের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। Bernhardi লিখিয়াছিলেন—

"War is a biological necessity, an indispensable regulator in the life of mankind, failing which would result a course of evolution deleterious to the species, and, too, utterly antagonistic to all culture. War, said Heraclitus, is the father of all things. Without war, inferior or demoralised races would only too easily swamp the healthy and vital ones, and a general decadence would be the consequence. War is one of the essential factors of morality. If circumstances require, it is not only the right but the moral and political duty of a statesman to bring about a war!"

সেই একই কথা। অর্থাৎ, যুদ্ধে মনুষ্য জাতির মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, অসক্ত, আবর্জ্জনাস্বরূপ, যুদ্ধ ঘটিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া জাতির সারাংশটুকুই অবশিষ্ট থাকে। অতএব, যুদ্ধ সংঘটিত করা রাজনীতিকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

এই সিদ্ধান্ত ফলেই জার্ম্মানী দুর্ব্বল বেলজিয়মকে পদদলিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

ধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য—এ সমস্তই নীত্‌শের মতে পুরোহিতদের একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠা চাতুরী—

"All lies through and through, without a shred of psychological reality—a vampyrism of pale subterranean leeches! Sin was invented

in order to make science, culture, and every elevation and noble trait in man quite impossible; by means of the invention of Sin the priest is able to rule."

ঈশ্বর সম্বন্ধে নীজ্‌শের মত পূর্ব্ববর্ত্তী মত সকলেরই অনুরূপ। তিনি বলেন—

"An omniscient and omnipotent God who does not even take care that his intentions shall be understood by his creatures—could he be a god of goodness? A God, who for thousands of years has permitted innumerable doubts and scruples to continue unchecked as if they were of no importance in the salvation of mankind, and who, nevertheless, announces the most dreadful consequences for any one who mistakes his truth,—would he not be a cruel God, if being himself in possession of the truth, he could calmly contemplate mankind, in a state of miserable torment, worrying its mind as to what was truth?"

বিবাহ সম্বন্ধে নীজ্‌শের মত—ভবিষ্যতে বিবাহের উদ্দেশ্য হইবে—এক নূতন জাতির সৃষ্টি করা। এ জন্য "concubinage" প্রথার প্রচলনের প্রয়োজন হইতে পারে। "Wife" ও "concubine"এর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কারণ—

"If, on the ground of his health, the wife is also to serve for the sole satisfaction of the man's sexual needs, a wrong perspective opposed to the aims indicated, will have most influence in the choice of a wife."

নীজ্‌শে, এমন কি, "Trial marriage" বা "Leasehold marriage"-এরও পক্ষপাতী ছিলেন। কিছুকাল একত্র বাস করিয়া যদি অসুবিধা মনে হয়, উভয় পক্ষ সে বিবাহ বাতিল করিতে পারেন।

আবার সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধেও, সমাজকে কঠোর বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এমন কি, স্থলবিশেষে বন্ধ্যাত্ব-সম্পাদনও সমাজের কর্ত্তব্য হইবে।—

"Society, as the trustee of life, is responsible for every botched life before it comes into existence, and as society has to suffer for such lives it ought, consequently, to be made impossible for them even to see the light of day. Society should in many cases actually prevent the act of procreation and may, without any regard for rank, descent, or intellect, hold in readiness the most rigorous forms of compulsion and restriction, and, under certain circumstances, have recourse to sterilisation."

মহাভারতের ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের পরে ভারতে ক্ষাত্রশক্তির অতি-

বুদ্ধির দিনে এই সকল ভ্রমাত্মক অনার্যদুষ্ট মতবাদের মূলোচ্ছেদ আমাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকিবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সেই সকল মতবাদেরই পরিণতি। এই অনর্থকর মতবাদের সহিত আমাদের ব্রহ্মচর্য্য-ব্যবস্থার তুলনা করুন। সে উপদেশ কি পবিত্র ও মহান্! এই তুলনা হইতে, আর্য্য সভ্যতার মহত্ত্ব সহজেই উপলব্ধ হইবে; আর উপলব্ধ হইবে যে, আমরা অমৃতের ভ্রমে কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাচের সমাদর করিতেছি।

এই সমস্ত ভাব সমাজের কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা আধুনিক "Bolshevi-sm"এর দ্বারা স্পষ্টীভূত হইতেছে। Bolshevikরা বিবাহ-প্রথা উঠাইয়া দিয়া "nationalisation of women", অর্থাৎ, স্ত্রীমাত্রকেই সাধারণের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

ইব্‌সেনের নাটকগুলির সার মর্ম্ম এই যে, সমাজ স্ত্রীলোকদিগকে এমনই চাপিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা পুরুষের হস্তে ক্রীড়নকের ন্যায় হইয়া আছে, ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে একেবারেই সমর্থ নহে।

আমাদের আধুনিক এক শ্রেণীর সাহিত্যে পূর্ব্বাপর এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়;—

"সমস্ত সমাজ চারি দিক্ থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে যেন ছোট করে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য ওদের জীবনটাকে নিয়ে ছুঁয়া খেলছে—পর পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে!"

ইব্‌সেনের Doll's House-এর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে Millএর Subjection of Women প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই "নারীজাতির উদ্ধার বিষয়ে আন্দোলন" দিন দিন শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকে। ইহার ফলস্বরূপ বিলাতে suffragetteদের বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার কথা সকলেই অবগত আছেন।

আমাদের সমাজ, আমাদের শাস্ত্র, নারীজাতির শত্রু। আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি সকলই নারীজাতিকে পাষাণপিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘরে, বাহিরে, কবিতায় এই কথারই প্রচার করা ও সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজের, হিন্দু শাস্ত্রের ও সেই শাস্ত্র-প্রণেতা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা, উপহাস প্রভৃতি করা এক সম্প্রদায় লেখকের 'কর্ত্তব্য' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহাদের কথা মানিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, যে স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য লড়া, মিটিংএ যাওয়া প্রভৃতি

বিসর্জ্জন দিয়া প্রকাশ্য রাজপথে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, লোকের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব অত্যাচার করে, তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ হইয়াছে, বা তাহারা সেই পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে; আর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, রাণী ভবানী, অহল্যা বাঈ প্রভৃতি নারীগণের হৃদয় সঙ্কীর্ণ ও শাস্ত্রবিহিত আচার-পালনে সংপিষ্ট হইয়া বাঁকিয়া চুরিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এ কথা স্বীকার করেন, করুন; কিন্তু আমরা সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি নারীগণকে চিরকাল দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি, এবং এখনও পূজা করিব। কারণ, আমরা ত্যাগীর পূজা করি, ভোগবিলাসীর নহে।

স্বাধীনতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কি নারীর ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রধান সহায়? আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের সমাজে নারী—জননী, পত্নী, এমন কি, সর্ব্বস্বহীনা বিধবারূপেও ত্যাগের যে মহান্ আদর্শ প্রত্যহ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রহিয়াছেন, তাহার নিকট অন্য সমস্ত আদর্শই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

য়ুরোপীয়েরা নিজেদের আচার ব্যবহার প্রভৃতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা আমাদিগকে বুঝিতে পারেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের বদ্ধমূল সংস্কার লইয়া একদেশদর্শী য়ুরোপ যদি আমাদিগকে নারীপীড়ক বলেন, তাহা হইলে আমরা তাহাই বেদবাক্য মনে করিয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইব কি? আমাদের শাস্ত্র কখনও নারীপীড়ক নহে। যে শাস্ত্র বলেন—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা।"

সে শাস্ত্র কখনও নারীপীড়ক নহে।

একেবারে দোষস্পর্শ-শূন্য সমাজ কখনও ছিল না, কোথাও নাই, এবং, কোনও স্বপ্নরাজ্যে সম্ভব হইলেও, নশ্বর জগতে পরিলক্ষিত হইবে না। এবং অনর্থের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে, অন্য অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, সন্তানজনন প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কার করিতে যাইয়া তথাকথিত য়ুরোপীয় সমাজ-সংস্কারকেরা কত বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অতএব সংস্কারকের দায়িত্ব কত গুরুতর, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

তাই কি সংস্কারের কোনও প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই আছে। সংস্কার হইয়াছে, হইতেছে, হইবে। কিন্তু সেই সংস্কার আমাদের জাতীয়তা, আমাদের মেরুদণ্ডগত আদর্শের অনুরূপ হওয়া চাই। নচেৎ, তাহা কখনও সুফলপ্রসূ হইবে না।

এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাব হইতে সমাজে একটা প্রবল অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; ইহার ফল অনেক সময় অতি ভীষণ হইয়া থাকে। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে Sir John Woodroffe, Sir George Birdwood-এর মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা এই—

"It has destroyed in Indians the love of their own literature, the quickening soul of a people, and their delight in their own arts, and worst of all their repose in their own traditional and national religion, have disgusted them with their own homes, their parents, and their sisters, their very wives, and brought discontent into every family so far as its baneful influences have reached."

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খল য়ুরোপীয় ভাবের প্রবর্ত্তন দ্বারা এই অনিষ্টের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। কয়েক জন বর্ণনাকুশল লেখক তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কুলটা নারীগণের চরিত্র এমনই চিত্তাকর্ষক ভাবে চিত্রিত করিতেছেন যে, অনেক অপরিণতবয়স্ক পাঠক পাঠিকা তাহা পাঠ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এ সাহিত্য চিরস্থায়ী হইবে, সে আশা অনেকের নাই। কিন্তু উহার অস্থায়ী জীবিতকালের মধ্যে উহা দ্বারা যে কত দূর অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ সাহিত্য সাহিত্য-কাননের আবর্জ্জনামাত্র। ইহার উচ্ছেদসাধনে সমাজ ও সাহিত্যের মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে য়ুরোপীয় ভাবে দুষ্ট হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার প্রকৃতির আলোচনা করিলাম। আমি বলিয়াছি, আমরা দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী নহি। আমরাও সংস্কারের পক্ষপাতী। তবে আমাদের মঙ্গলেচ্ছার বা সংস্কারের মূলে অতীতের প্রতি অবজ্ঞা, শাস্ত্রের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা বা বিদ্বেষ নাই। আমরা যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার গর্ব্ব করি, তাহার মূল ধর্ম্মশাস্ত্র। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই আমাদের জাতীয়তার অপূর্ব্ব মর্ম্মরসৌধ যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া, অরাতির আক্রমণপরম্পরা ব্যর্থ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; যাহা দেখিয়া য়ুরোপীয়গণও বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন যে, "They have survived in a way, and to a degree,

which is not seen in the case of any other country in the world." অর্থাৎ, হিন্দুরা এই সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আপনাদের অস্তিত্ব যেমন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এমন আর পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। সেই সৌধের সহায়ক আমরা ইহকালসর্ব্বস্ব, অস্থিরচিত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মুখাপেক্ষী হইব কেন? যে দেশে এ বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে, সে দেশে ইহার সংস্কারের উপাদান নাই, ইহা কি সম্ভব? একান্ত প্রয়োজন হইলে বিদেশ হইতে লোষ্ট্র লইব, কিন্তু তাহাদের আদর্শ লইব না। তাহা করিলে, আমাদের সমাজ, আমাদের জাতীয়তা বিলুপ্ত হইবে।

সুখের বিষয়, গত যুদ্ধে য়ুরোপের চক্ষু কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে। ইহাতে আশা করা যায়, আমাদের দেশেও অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইবে। আমাদের উচ্চ উদার আদর্শের অনুসরণ করিয়া, অধ্যবসায় ও সাধনার বলে, আমরা আবার উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া জগতে পরিচয় দিতে পারিব—"অমৃতস্য পুত্রা বয়ম্"। আমাদের ব্রাহ্মণ্য সেই আদর্শের প্রতীক-স্বরূপ হইয়া, আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত হৈন দীনতা, ক্ষুদ্রতা বিধৌত করিয়া দিবে। ভগবৎসমীপে ইহাই আমার প্রার্থনা।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

শ্রীশ্রী রায়পরিবার।

বৎসর-পঞ্চাশ পূর্ব্বে বাঙ্গালার তিনটি জেলার অনেকগুলি পরিবারে বিবাদী দেবীর নাম সুপরিচিত ছিল। [illegible] সম্পর্কে। যে স্থানে মধ্য-বাঙ্গালার তিনটি জেলা মিশিয়াছে, তাহারই কাছে চৌরীপুর গ্রাম। গ্রামের জমীদার চৌধুরী মহাশয়েরা ধনিমানী ঘর। সে অঞ্চলে তাঁহাদের মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি অসাধারণ। নিকটেই মাত্রাপুর গ্রামে আর এক ঘর ব্রাহ্মণ জমীদারের বাস। রায়পরিবার চৌধুরীপরিবার অপেক্ষা আধুনিক হইলেও তাঁহার প্রভাবে হীন নহে। দুই পরিবারের এলাকার মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ খাল। তাহার জলকর সমা বৎসরে চারি টাকা পৌনে ছয় আনা চৌধুরীদিগের সেরেস্তার কাগজপত্রে লিখিত থাকিলেও সে টাকা কখনও আদায় হয় না। আর সেই খাল-সীমানা লইয়া দুই পরিবারে বহু দিন ধরিয়া [illegible]

মোকর্দ্দমায় যে টাকা বাজে খরচ হইয়াছে, তাহা খালের জলে ঢালিয়া দিলে, বোধ হয়, খালটা বুজিয়া যাইত। পুরুষানুক্রমে পরিচালিত এই সব মামলা মোকর্দ্দমায় উভয় পক্ষের বহু কর্ম্মচারী ধনবান হইয়াছিল। তাহার পর নাটকোচিত অতর্কিতভাবে সকল সব মামলা মিটিয়া গেল। বৃদ্ধ রামগোপাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শৈলজাপ্রসন্ন চৌধুরীদিগের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইয়া, কেমনে জমীদারী শাসন করিবেন, তাহাতে কোন বলিত, তাঁহার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।' কিন্তু প্রজার তিনি 'মা বাপ' ছিলেন। শিকারে তিনি সিদ্ধহস্ত, তুষ্টিতে তাঁহার পরম আনন্দ, দানে তিনি মুক্তহস্ত, সঙ্গীতানুরাগে তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন প্রৌঢ়ত্বে, যৌবনাকাশে বিপত্নীক হইলেন, তখন তাঁহার পরম পূর্ব্বন্ধু দারপরিগ্রহ করিতে সকলে সাধ্যসাধনা করিলেন। তিনি কিন্তু তাহা মানিলেন না। তিনি 'সুন্দরী জননীর সুন্দরীতরা দুহিতা বিধাতার চিতা মাতা উজ্জ্বল' করিতে লাগিলেন; তখন কন্যার বয়স চারি বৎসর মাত্র। দীর্ঘ সাত বৎসর তিনি শান্ত দান্ত হইয়া কন্যাকে পালন করিলেন, আর এই অবসরে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

তখন সমাজের শাসন বড় কঠোর ছিল, ব্যক্তিগত বা বংশগত বিবাদ বিসংবাদেও সামাজিক সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হইত না। সেই জন্য ক্রিয়াকর্ম্মে চৌধুরী মহাশয়কে যাত্রাপুরে রিপুঞ্জয় রায় মহাশয়ের বাটীতে, এবং রায় মহাশয়কে গৌরীপুরে চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতে হইত। সেবার রায় মহাশয়ের মাতার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে শৈলজাপ্রসন্ন যাত্রাপুরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার পর তিন চারি দিন তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া অনেকে মনে করিল, বোধ হয় কোনরূপ কারণে তিনি অপমান বোধ করিয়াছেন, তবে আবার নূতন করিয়া ঝগড়া বাধিবে। পঞ্চম দিন কালিকালে সঙ্গীতালোচনার পর আহার করিতে যাইবার সময় শৈলজাপ্রসন্ন দাসমুন্সীকে বলিলেন, 'কাল আমি যাত্রাপুরে যাইব, দ্বিপ্রহরের পরই পাল্কী চাহি।' কর্ম্মচারীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল; কেহ কারণ বুঝিতে পারিল না।

পর দিন মধ্যাহ্নের পরই যাত্রা করিয়া শৈলজাপ্রসন্ন যাত্রাপুরে জমীদার-বাড়ীতে উপনীত হইলেন। রায় মহাশয় তখন মৈথুনিক নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, ভৃত্য যাইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া সংবাদ দিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বৈঠকখানায় আসিলেন, চৌধুরী মহাশয়ের আগমনে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না;

আগত-সম্ভাষণ ও কুশল-প্রশ্ন শেষ হইলে শৈলজাপ্রসন্ন বলিলেন, 'আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথার জন্য আসিয়াছি।' রায় মহাশয় বলিলেন, 'যে আজ্ঞা হয়, করুন।' শৈলজাপ্রসন্ন বলিলেন, 'সীমানার খালের ব্যাপারটা মিটাইয়া দেওয়া যাউক।' রায় মহাশয় বলিলেন, 'সে ত বড়ই সুখের কথা। কিন্তু খালটা প্রকৃতপক্ষে আমার—' শৈলজাপ্রসন্ন সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'সে তর্ক করিতে আমি আসি নাই। আমি আমার সব সম্পত্তি ৩ কড়ায় আপনার সুদ্ধুক দাম করিতে চাহি।' এ প্রস্তাব এমনই অপ্রত্যাশিত যে, রায় মহাশয় প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ইহার দুই মাস পরে বিধাত্রী দেবীর সঙ্গে রায় মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল, এবং সেই বিবাহের এক মাস পরেই সমস্ত সম্পত্তি কন্যাকে দানপত্র করিয়া দিয়া শৈলজাপ্রসন্ন সংসারত্যাগী হইলেন; কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না।

হিন্দু কুলবধূর বিষয়-বুদ্ধি যতই তেজ প্রখর হউক না, সাধারণতঃ সে তেজ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে না; তাহা পতির বা পুত্রের কাজের ভিতরে থাকিয়া কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে, বাহিরের লোক-দৃষ্টির কেন্দ্রের সন্ধানও পায় না। কাজেই যত দিন শ্বশুর শাশুড়ী বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন অহিরের লোক কেহ বুঝিতেও পারে নাই, রায় মহাশয়ের অন্তঃপুরে বিষয়কার্য্যে বধূর কেহ হাত আছে। কিন্তু বৃদ্ধ রায় মহাশয় বিধাত্রীর পৈত্রিক সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে সময় সময় যে সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাতেই বুঝিতেন, বধূর বিষয়বুদ্ধি অসাধারণ প্রখর। এই সময় সময় তিনি আপনার সম্পত্তি-সংক্রান্ত কথাও বধূর সঙ্গে আলোচনা করিতেন। তিনি পুত্রবধূকে 'মা লক্ষ্মী' বলিয়াই ডাকিতেন, এবং বলিতেন, 'মা লক্ষ্মী সত্যই আমার ঘরের লক্ষ্মী!' শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর স্বামী বধূ সংসারের কর্ত্রী হইলেন, তখন বিষয়কার্য্যে বিধাত্রীর প্রভাব একটু একটু প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ, রায় মহাশয় মৃত্যুকালে তাঁর দেওয়ানজীকে বলিয়া গিয়াছিলেন, জটিল কাজে তিনি যেন 'মা লক্ষ্মী'র পরামর্শ গ্রহণ করেন; কেন না, তিনি দেখিয়াছেন, অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের সরল বুদ্ধির কাছে পুরুষের কুটিল বুদ্ধিকে পরাভব মানিতে হয়! বৃদ্ধ দেওয়ানও সময় সময় পৌরীপুরের জমীদারীর কথায় অহিরের নানা বিষয়ে বিধাত্রী দেবীর পরামর্শ লইতেন।

এই সময় নীলকরের অত্যাচারপীড়িত প্রজারা এক দিন দলবদ্ধ হইয়া কাছারীতে আসিয়া বলিল, অত্যাচারে তাহাদের পক্ষে চাষের কাজ করা অসম্ভব

হইয়াছে, জমীদার প্রতীকার না করিলে তাহাদের যান ইজ্জত সব যায়, তাহারা না খাইয়া মরে। নীলকরের প্রবল প্রতাপের বিষয় জমীদারের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, 'সবই জানি। কিন্তু উপায় কি? নীলকরের সঙ্গে ঝগড়া করিলে যে বাড়ীর একখানা ইটও রাখা দায় হইবে।'

প্রজারা নিরাশ হইল; কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিল। সেই সময় বৃদ্ধ দেওয়ান-গোকুল সর্দারকে ইঙ্গিত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গোকুল তাঁহার অনুসরণ করিল।

গোকুল ফিরিয়া আসিয়া অন্য প্রজাদিগকে বলিল, 'তবে আর কি; চল বাড়ী যাই।' সকলে বাহিরে আসিলে সে বলিল, 'বাবু ত বিদায় দিলেন। কিন্তু ভিটা ছাড়িয়া যাইব, একবার মাকে প্রণাম করিয়া যাইব।' এই বলিয়া সে অন্দরের পথে অগ্রসর হইল, সকলেই তাহার সঙ্গ লইল। অন্দরের উঠানে দাঁড়াইয়া গোকুল ডাকিল, 'মা! মাঠাকরুণ!' কালীর মা জমীদার-গৃহে আশ্রিতা বৃদ্ধা। সে খিড়কি দরজার দালানের একটা জানালার সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'কি গোকুল?'

গোকুল বলিল, 'নীলকরের অত্যাচারে আমরা সব প্রজারা ভিটা ছাড়িয়া যাইতেছি; তাই একবার মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।'

কালীর মা বলিল, 'তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কর্ত্তাকে সে কথা জানাইয়াছ?'

'হাঁ। তিনি বলেন, নীলকরের সঙ্গে ঝগড়া করিলে বাড়ীর একখানা ইটও বজায় রাখিতে পারিবেন না।'

বিধাত্রী দেবী স্বয়ং জানালার সম্মুখে আসিলেন। যেন পীঠের উপর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি বলিলেন, 'তবে কর্ত্তাকে এই অন্দরে আসিতে বল, আমি কাছারীতে যাই।' তাহার পর তিনি বলিলেন, 'আমি যদি আমি তোমাদের মা, তোমরা আমার এতগুলি সন্তান। তোমরা যদি মা বাপের মান ইজ্জত রাখিতে না পার, তবে মার মান ইজ্জত রাখিবে কেমন করিয়া? তবে ত তোমাদের আগে আমাকেই দেশত্যাগী হইতে হয়। তোমরা কি অত্যাচার হইতে মাকেও রক্ষা করিতে পার না?'

'হুকুম পাইলেই পারি। মা, যে খালের ঝগড়া তুমি মিটাইলে, সেই খাল লইয়া দুই বছর দাঙ্গা হাঙ্গামায় এই গোকুল সর্দারই বরাবর কর্ত্তাদের 'সর্দার'

ছিল। বুড়া হইলেও এখনও কর্জাতে যে জোর আছে, তাহাতে লাঠীর জোরে কুঠীর পঞ্চাশজন লিপাড় করিতে পারি। চাই কেবল হুকুম।'

বিবাত্রী দেবী বলিলেন, 'ইহার আবার হুকুম কি, গোকুল? ঘরে আগুন লাগলে আগুন নিবাইতে হয়; সে জন্য কি কখনও কাছারীর হুকুমের বা মার আদেশের অপেক্ষা রাখিতে হয়? তবে আমি তোমাদের মা—আমি এই কথা বলিতেছি যে, তোমরা যদি কোনও বিপদে পড়, তবে যতক্ষণ এ বাড়ীর একখানা ইট থাকিবে, ততক্ষণ তোমাদের উদ্ধারের চেষ্টার কোনও ত্রুটী হইবে না।'

'তবে আর কাহাকেও ভয় করি না' বলিয়া গোকুল মাষ্টারে প্রণাম করিল।

পাশেই গোকুলের ছেলে ছিল। সে বলিল, 'কিন্তু যদি—'

সহসা গোকুল তীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ছেলেকে বলিল, 'চুপ কর, ছোটলোকের বাচ্ছা। মার কথায় অবিশ্বাস! তিন দিন পাঠশালায় যাওয়ার এই ফল।'

ছেলের মুখ লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে উদ্ধতস্বভাব বাঙ্গালীর ছেলে বাপের কথার উপর কথা কহিতে শিখে নাই।

প্রজারা তখন ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন কর্ত্তা কাছারীর বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিলেন—নবীন নাপিত তাঁহার দাড়ী-কামাইবার আয়োজন করিতেছিল। গোকুল কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আজ যে—জমীর কাছে আসিব, তাহার মাথা ভাঙ্গিব।'

কর্ত্তা চিন্তিতভাবে বলিলেন, 'তাই ত!'

গোকুল বলিল, 'তাহাতে আর কি, কর্ত্তা মহাশয়; এ মরা খাটের জন্য গায়ের জোরে প্রাণ দিতে গিয়াছি, আজ মার ইজ্জতের জন্য মার আইনের জোরটা দিতে পারিব না?'

কর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর প্রজারা কি করিয়াছিল, সে ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয়, অর্থাৎ, যুদ্ধ ও সন্ধি, রাজা ও শাসনকর্ত্তা এই সকলের কথা বাদ দিয়া, যে ইতিহাসে জাতীয় জীবনের স্তরপরম্পরা বর্ণিত হয়, জাতির উন্নতি-অবনতির কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণীত হয়, সেই ইতিহাস রচিত হয়, তবে তাহাতে দেখা যাইবে, বাঙ্গালার নীলবিদ্রোহ জাতীয় জীবনের যুগ-সন্ধি। তখন এক দিকে বাঙ্গালার ইংরাজ নীলকরের অনাচার, আর এক

দিকে ইংরাজ শাসন কেবল আকের পত্তন দিতেছিল ; অন্য দিকে অন্য শক্তিতে দেশের কে কোন্ পথে, আর এক দিকে মুটিমেয় ইংরাজের ঔদ্ধত্য দেখা। সেই সময় বাংলা সাহিত্যে ও দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্য্য নূতন আবেগ পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। সেই সময় দলবদ্ধ 'নীল বাঁদর' রচিত হয়। সেই সময় বাঙ্গালার পল্লী প্রান্তর মুখরিত করিয়া জন-সাধারণ গাহিত—'নীল বানরে সোণার বাঙ্গালা কল্লে এবার ছারখার'। সেই সময় হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দুপেট্রিয়টে' নীলকরের অত্যাচারের প্রতিবাদ ; তাঁর সেই সময় দেশের জনমতগঠনের সম্বন্ধে কার্য্যে বাঙ্গালা হইতে নীলের চাষের নিমূল। সেপয় আলোড়নের সময় যেমন, তখনও তেমনই ভাবের বন্যা—আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য আপনি বাঙ্গালী গৃহস্থের বহির্দ্বারের প্রাচীরে অস্ত্র হইয়াই প্রস্তুত থাকিতে হয় নাই ; পবিত্র অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছিল। বাঙ্গালার অধীশ্বরী-রূপী বিধাত্রী দেবী সেই ভাবের অতিব্যক্তিতে প্রজাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

এক বাত্যায় যেমন বনে বহু দিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা উড়াইয়া লইয়া যায়, এক বন্যায় যেমন নদীতে বহু দিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়, নীলের হাঙ্গামায় তেমনই বাঙ্গালা হইতে নীলকরের অত্যাচার দূর করিয়া দিল। তখনও বাঙ্গালায় লোকের অসন্তুষ্ট ছিল না। তাহার 'ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ' ছিল ; তখনকার মধ্যবিত্ত অনুষ্ঠানের গৃহস্থের সুখ 'নীলদর্পণে' প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—'আমার নিজ গোঁসাই ধান, ঘোল বিঘার বাগান, আমার কুড়িখানা লাঙ্গল, পঞ্চাশ—ষাট মাইলার ; পুজোর সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা।' নীলবিপ্লবের অত্যাচার যখন দুঃস্বপ্নের মত দূর হইয়া গেল, তখন বাঙ্গালী আবার বে যাহার কাজে মন দিল, সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল।

বিধাত্রী দেবীর এক দিনের একটি কথায় তাঁহার নাম বাঙ্গালার তিনটি জেলার অনেকগুলি গ্রামে পরিচিত হইয়া গেল ; লোক বলিত, 'সবই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি কাহাকে দিয়া কি কাজ করান, কে বলিতে পারে ? নহিলে কর্ত্তা যে হুকুম দিতে পারিলেন না—গৃহিণী কি সে হুকুম দিতে পারিতেন ? এ সব তাঁহারই মায়া।' কেহ বলিল, 'হইবে না—কেমন বাপের মেয়ে ?'

তাহার পর আরও বিশ বৎসর কাটিয়া গেল। বিধাত্রী দেবী পতি পুত্রের সংসার লইয়া—দেবসেবা ও লোকসেবা লইয়া—অতিথি অভ্যাগতের আদর যত্নের বন্দোবস্ত করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। সে দিনের সে কথা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। কর্ত্তা গৃহিণীর রাজরাজেশ্বরী রূপে যখন তখন কেবল তাহার বিকাশ হইত। কর্ত্তা কোনও দিন কোনও কাজে অসময়ে অন্তঃপুরে আসিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিতেন, 'এখন যে?' কর্ত্তা আসল কথাটা বলিবার পূর্ব্বে বলিতেন, 'কেন, আমার কি এ সময় বাড়ীর মধ্যে আসিতে নাই? আমি অন্দরে আসিলাম, তুমি বাহিরে যাও।' প্রথম প্রথম বিধাত্রী দেবী স্বামীর এই কথায় কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতেন—'আহা মানুষ! সেই যে এক কথা গেয়ে দিয়ে গিয়েছে!' কর্ত্তা বলিতেন, 'সে কথা তুলিলে যে, সোনা ফেলিয়া আঁচলে গেরো দেওয়া হইবে।' সেবারেও গৃহিণী বলিতেন, 'যাইবই ত—আর দিন কতক দেরী কর—রমা বাবুকে লইয়া আমি কাছারী করিতে যাইব। কি বল রমাবাবু?' এই কথা বলিয়া তিনি একমাত্র সন্তানের পুত্র রমারঞ্জনের মুখ চুম্বন করিতেন। কর্ত্তা কিন্তু হাসিয়া বলিতেন, 'ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।' তুমি তোমার নূতন কর্ত্তাকে লইয়া কাছারী করিতে যাইবে; আর আমি আমার নূতন গৃহিণীকে লইয়া রোজই কাছারী করিব—এই নূতন গৃহিণী গোরী—রমারঞ্জনের দিদি। কর্ত্তার কোলে সে দৌহিত্রী বন্দোবস্তে স্থানচ্যুত হইয়াছিল।

সেই সুখের সংসারে বিধাত্রী দেবীর দিন কাটিতেছিল। কিন্তু তিনি যে কেবল সংসারের বন্দোবস্ত লইয়াই—দেবসেবা ও পূজাদি লইয়াই—নাতি নাতিনীকে লইয়াই—পতি, পুত্র, পুত্রবধূ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, তাহাও নহে। বৈষয়িক অনেক বিষয়ে কর্ত্তা তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহা কর্ত্তা জানিতেন, আর তিনি জানিতেন। সম্পত্তির সব সংবাদ যে তিনি নখদর্পণে দেখিতেন, তাহা আর কেহ জানিত না। যেমন নাবিক পথহারা বহুদর্শী লোক উপস্থিত হইলেও কেহ জিগিরপানে লুব্ধদৃষ্টি উত্তোলন করিয়া রাখে না, তেমনই তাঁহার পরামর্শে আরব্ধ কার্য্যে প্রজাদের অনেক উপকার হইলেও সে আর্য্যের কারণ তাহারা জানিতে পারিত না। কেবল তাহারা কর্ত্তার অনেক কাজেই প্রসন্নার প্রতি স্নেহ দর্শন পরিচয় পাইত, কিন্তু সে স্নেহ যে মাতৃজ্ঞানে কেমনতর-নবাগিনী রহিত প্রদর্শিত হইয়া পুলকাশ্রু

[illegible] দিই ও সাধন করিয়াছে, আর বুঝিতে পারিত না। [illegible] সংসারের অন্তঃপুর হইতে প্রবাহিত সেই স্নেহধারায় প্রত্যহ স্নিগ্ধ হইত।

পরিবারে কোথাও দুঃখের ও শান্তির বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। লোকে বলিত, 'সোনার সংসার। গৃহিণীর গুণে কোথাও কোনও অভাব নাই।'

সহসা এই সংসারে বিপদের বজ্রপাত হইল। ম্যালেরিয়া মহামারীর আকারে গ্রামে দেখা দিল, এবং বজ্র যেমন সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষকেই দগ্ধ করে, তেমনই প্রথমে রায়-পরিবারের চূড়া চূর্ণ করিয়া দিল। রায় মহাশয়ের ভাদ্রোৎসব পর—পিতার শ্রাদ্ধের শেষ মিটাইবার পূর্ব্বেই—পুত্র পীড়িত হইলেন! গৃহিণী মন্দাকে লইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় গেলেন। কিন্তু চিকিৎসা কোনও ফল ফলিল না।..দুই মাসের মধ্যে পতি পুত্র হারাইয়া বিধাত্রী দেবীর পক্ষে কুসুমাস্তৃত সংসার কণ্টকাকীর্ণ হইয়া গেল—সাজান সংসার শ্মশান হইল!

২

বিশ বৎসর পূর্ব্বে বিধাত্রী দেবীর বক্ষ অন্ধকার হইতে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল—বিশ বৎসর পরে অতর্কিত ঘটনার অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষণে—আলোর কাছাই হইল। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জুটিয়াছিলেন জয়ে—বিশ বৎসর পরে জুটিলেন পরাজয়ে; সেবার জুটিয়াছিলেন ভাবে—এবার জুটিলেন অভাবে। এ পরাজয় অদৃষ্টের কাছে, এ অভাব জীবন-সর্ব্বস্বের। পতিপুত্র-পরিত্যক্ত সংসার লইয়া তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইল। রমার ও গৌরীর দিকে চাহিয়া তিনি শোকবিক্ষত হৃদয়ে বল বাঁধিলেন—সংসার দেখিতে হইবে, সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে, রমাকে ও গৌরীকে 'মানুষ' করিতে হইবে, বিধবা পুত্রবধূকে ধর্ম্মকর্ম্ম শিখাইয়া দিতে হইবে। তিনি না দেখিলে সব নষ্ট হইবে, রমার ও গৌরীর অমঙ্গল হইবে। তাই প্রবল চেষ্টায় শোকের আক্রমণ সংযত করিয়া, হৃদয়ে রাবণের চিতার দাহ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ব্যথা বুঝিল কালীর মা; আর বুঝিলেন, বৃদ্ধ দেওয়ানজী। দেওয়ানজী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'ভগবানের লীলা কে বুঝিবে? এ যে শোকেরও অবসর দিলেন না।'

দেওয়ানজী জানিতেন—বিধাত্রী দেবী সম্পত্তির সংবাদ জানিতেন; কিন্তু সব সংবাদ যে তিনি নখদর্পণে দেখিতেন, তাহা তিনিও জানিতেন না, এখন তিনি দেখিলেন, বিধাত্রী দেবী সবই জানেন। বিধাত্রী দেবী দীর্ঘনিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, 'যাহা বলিয়াছিলাম, হায়, তাহাই হইল। রমাকে লইয়া আমাকেই কাছারী করিতে হইল।' 'কাছারী করিবার' আরও একটা কারণ উপস্থিত হইল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে এক জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া বিষয়ের ভার কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে লইবার প্রস্তাব জানাইলেন। বিধাত্রী দেবী তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন কোর্ট অব-ওয়ার্ডসের অধীন নাবালক জমীদারদিগকে এক স্থানে রাখা হইত। তাহাতে তাহার আপত্তি ছিল। রমাকে ছাড়িয়া তিনি হয় ত থাকিতে পারিতেন—যখন এত সহিয়াছে, তখন তাহাও হয় ত সহিত; কিন্তু পুত্রবধূ কি লইয়া থাকিবে? তাহাকে যে ছেলে মেয়ে দিয়াই ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, তাহার ধীরে ধীরে সংসারের কাজ শিখাইতে হইবে। বিধাত্রী দেবী বলিলেন, গৌরীপুরের জমিদারী তাহার, আর তাঁহার শ্বশুরের নির্দ্দেশানুসারে শালাপুর জমিদারীর যে অংশ দেবোত্তর, তাহারও তিনিই আজীবন সেবাইত। সে সব বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে—কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস তাহা সামান্য বলিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। বিধাত্রী দেবী নিশ্চিন্ত হইলেন; প্রজাদিগকে কি তিনি পরের হাতে সঁপিয়া দিতে পারেন?

পুত্রবধূকে এবং রমাকে ও গৌরীকে তিনি সদাসর্ব্বদা কাছে রাখিতেন; একত্র উপবেশন, একত্র শয়ন; সর্ব্বদা সকলে এক সঙ্গে থাকিতেন। যাহারা তাঁহার কাজের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিল না, তাহারা বলিল, 'বুড়ী মেয়ে মানুষ; কিন্তু ঐ রমা গৌরীই ভরত মুনির মৃগশিশু হইবে।' তাহারা বিধাত্রী দেবীকে চিনে নাই। এই সব কাজের মধ্যে তিনি সর্ব্বদাই ইষ্টদেবতাকে ভাকিতেন—'পরের তরী ঘাটে আসিতে যে ক্ষয় দিনু ইবলম্ব হয়, সে কয় দিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া তোমাকেই ডাকিবার অবসর দাও।' শোকে শান্তিলাভের জন্য তাঁহার পিতাও ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি শান্তি লাভ করিয়াছিলেন কি? কিন্তু তিনিও কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া আত্মোন্নতির জন্য সংসার ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। এখন পিতার দৃষ্টান্ত কন্যা সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন। পিতার আদর্শে কন্যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করিতেন। যে পিতা কন্যাকে কোনও দিন মাতার অভাব অনুভব করিতে দেন নাই, যাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তাঁহার দেবত্বেরই পরিচায়ক ছিল, যিনি কর্ত্তব্যে অটল, এবং ধর্ম্মে অবিচলিত ছিলেন, সেই পিতাকে বিধাত্রী দেবী দেবতাজ্ঞানেই পূজা করিতেন। প্রতিদিন দেবপূজা শেষ করিয়া তিনি

বিধাতা দেবী লক্ষ্মী করিতেন, প্রকৃতি পুত্রকে পিতার ও কন্যাকে মাতার অনুরূপ করিয়া গঠিত করিয়াছেন। বয়স যখন, ব্যবহারেও তেমনই তিনি তাঁহার মৃত পুত্রের ছবি দেখিতে পাইতেন। সে তেমনই স্থির—ধীর—উদার—সহৃদয়, তেমনই বুদ্ধিমান, বিবেচক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আজ্ঞানুবর্ত্তী। আর গৌরী তাহার মাতার মত একটু চঞ্চল, জনতাপ্রিয়, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের আবর্ত্তী। কিন্তু পৌত্র পৌত্রীতে তাহার স্নেহের তারতম্য ছিল না। তাহারা দুই জন তাঁহার দুই নয়ন, দুই জনই সমান। ভ্রমাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের কারণ, তাহার উপর বংশের বল ও সম্পদ নির্ভর করিতেছে; সে পুণ্যশ্লোক বংশের শিবরাত্রির সলিতা; বিবাহে সে অল্প বয়সে অর্থ ও প্রভুত্ব লাভ করিবে, সুশিক্ষিত না হইলে সে সম্পদ তাহার পক্ষে বিপদে পরিণত হইতে পারে। গৌরীকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের কারণ—অন্য বিষয়ে অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে তাহাকে পরের ঘর [illegible] হইবে, যত সংকল্প করিয়াই মেয়ের বিবাহ দেওয়া যাউক না, তাহার মধ্যে অনিশ্চয়তা অনেকটা থাকে; কারণ, অদৃষ্টের অন্ধকার নেপথ্যে দুই কলিয়া পরের সংসারের সবটা দেখা যায় না। বিশেষ স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রেম, শাশুড়ীর স্নেহ, দেবরাদির ভালবাসা, এ সব নিরঙ্কুশ লাভ করিতে হয়। তাহাই স্ত্রীলোকের নিয়তি। সেই জন্য তিনি যেন রমার অপেক্ষাও গৌরীর জন্য অধিক চিন্তিত হইতেন; সর্ব্বদা তাহাকে সহপদেশ দিতেন। তাঁহার সেই আগ্রহের আধিক্য যে সময় সময় গৌরীর ও গৌরীর [illegible] কাছে 'বাড়াবাড়ি' বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাও তিনি [illegible], কিন্তু তাহাতেও তাঁহার কর্ত্তব্যে একনিষ্ঠ থাকিতেন।

গৌরীর বয়স যখন দশ বৎসর হইল, তখনই বিমাতা দেবী দেওয়ানজীকে বলিলেন, এখন হইতে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা যাক। দেওয়ানজী বলিলেন, 'ভাল—ঠাকুর দেখি; কিন্তু আর এক বৎসর যাইলে ভাল হয়, সম্বন্ধের যখন ঐ দুই ওঁড়া।' বিমাতা দেখিলেন দীর্ঘসূত্রীর ভাগে অনিচ্ছুক; 'কিন্তু মেয়ে, সাবিত্রীর ত নহে। দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিবে।'

যাহাহউক, গৌরীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে তিনি নিযুক্ত হইলেন। তাহার পর যখন তাঁহার আত্মীয়দিগকে রূপে গৌরীর উপযুক্ত এবং ধনবান পাত্রের সন্ধান করিতে বলিলেন, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বিমাতা দেবী [illegible]

তাহাদের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য বিধাতার নির্দ্দিষ্ট মনে করিয়া করিতেন। সংসার হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, সংসারে বা বিধাত্রী দেবীর হৃদয়ে তাঁহাদের স্থান পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু যাহারা ছিল, তাহাদের লইয়া সংসার আবার নূতন করিয়া গড়িতে হইল।

পুত্রবধূর প্রতি বিধাত্রী দেবীর স্নেহের সীমা ছিল না। সংসারের সুখের আস্বাদ পাইতে না পাইতে তাঁহার পক্ষে জীবন দুঃখময় হইয়াছে বলিয়া বিধাত্রী দেবী সর্ব্বদা তাঁহাকে স্নেহে শীতল করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাহার পিত্রালয়ের কেহ আসিলে, তিনি পরম যত্নে থাকিতেন। আত্মস্তরিরা সকলেই যে আপনাদের আত্মীয়কে সুপরামর্শ দিতেন, এমন নহে; কিন্তু তাহা জানিয়াও বিধাত্রী দেবী তাঁহাদিগকে আদরে আপ্যায়িত করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের পরামর্শে পুত্রবধূ যে শাশুড়ীর প্রাধান্যে সময় সময় একটু বিরক্তি-চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিতেন না, তিনি তাহাও লক্ষ্য করিতেন। তিনি মনে মনে হাসিতেন; সবই পুত্রবধূর, সংসার তাঁহার, পুত্র কন্যা তাঁহার; তিনি যে তাঁহাদের জন্যই আজও সংসারের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আছেন; তিনি ত এ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হয়েন। তিনি তাহাতে দুঃখিত হইতেন না। কিন্তু তিনি যখন লক্ষ্য করিতেন, তাঁহার ব্যবহারে তাহার মাতা বিরক্তি প্রকাশ করিলে, রমার নয়নে বেদনাকাতর দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত, তখন তাহার বুকের মধ্যে একটা দারুণ হাহাকার গুমরিয়া উঠিত—শূন্য স্থানটা স্নেহে পূর্ণ করিবার চেষ্টা, রমাকে বুকে চাপিয়া ধরিবার একটা প্রবল কামনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে প্রয়াস পাইত। কিন্তু পাছে রমা তাহা বুঝিতে পারে, সেই ভয়ে তিনি সে ভাব ফুটিতে দিতেন না। রমা তাহা বুঝিতে পারিত কি না, জানি না; কিন্তু সময় সময় তাঁহার মনে হইত, সূর্য্যকিরণ যেমন স্বচ্ছ হ্রদের নিম্নতল পর্য্যন্ত ভেদ করে, রমার দৃষ্টি তেমনই তাঁহার হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। বাস্তবিক, শৈশবে শোকের সংসারে বর্দ্ধিত হইয়া রমাবালা বালসুলভ চাঞ্চল্য পরিহার করিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তা সপ্রকাশ থাকিত। বিশেষ সে সর্ব্বদা ছায়ার মত পিতামহীর অনুসরণ করিত, তাঁহার স্নেহে সে এমনই পরিতৃপ্তি লাভ করিত যে, তাহার পক্ষে সংসারে আর কাহারও প্রয়োজন অনুভূত হইত না। পৌত্রী গৌরী যে তাহার মাতার অধিক অনুরক্ত হইয়াছিল, তাহাও বিধাত্রী দেবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে

বিধাতা দেবী লক্ষ্য করিতেন, প্রকৃতি পুত্রকে পিতার ও কন্যাকে মাতার অনুরূপ করিয়া গঠিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যেমন, ব্যবহারেও তেমনই তিনি তাঁহার মৃত পুত্রের ছবি দেখিতে পাইতেন। সে যেমনই স্থির—ধীর—উদার—সহৃদয়, তেমনই বুদ্ধিমান, বিবেচক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আজ্ঞানুবর্ত্তী। আর গৌরী তাহার মাতার মত একটু চঞ্চল, অনবধানী, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বশবর্ত্তী। কিন্তু পৌত্র পৌত্রীতে তাঁহার স্নেহের তারতম্য ছিল না। তাহারা দুই জন তাঁহার দুই নয়ন, দুই জনই সমান। রমাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের কারণ, তাহার উপর বংশের ধন ও সম্মান নির্ভর করিতেছে; সে সুশিক্ষিত না হইলে সে সম্পদ তাহার পক্ষে বিপদে পরিণত হইতে পারে। গৌরীকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের কারণ—অল্প বিদ্যে থাকাই তাহাকে পরের ঘর করিতে সাহায্য করিবে; যত সহজে হউক মেয়ের বিবাহ দেওয়া যাউক না, তাহার মধ্যে অনিশ্চয়তা অনেকটা কমিয়া যাইবে; কারণ, অভিভাবক সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া পরের সংসারের সবটা দেখা যায় না। বিশেষ স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রেম, গার্হস্থ্যের স্নেহ, দেবরাদির ভালবাসা, এ সব নিরঙ্কুশ লাভ করিতে হয়। তাহাই স্ত্রীলোকের নিয়তি। সেই জন্য তিনি যেন রমার অপেক্ষাও গৌরীর জন্য অধিক চিন্তিত হইতেন; সর্ব্বদা তাহাকে সদুপদেশ দিতেন। তাঁহার সেই আগ্রহের আতিশয্যে যে সময় সময় গৌরীর ও গৌরীর শ্বশুরের কাছে 'বাড়াবাড়ি' বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাও তিনি বুঝিতেন, কিন্তু নাতিনীর ও তাহার শ্বশুরের কাছে একটি ব্যক্তি থাকিতেন।

গৌরীর বয়স যখন দশ বৎসর হইল, তখনই যে তাহার পিতা সেওয়ানজীকে বলিলেন, এখন হইতে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা ভাল। সেওয়ানজী বলিলেন, 'আজ—ঘটক দেবি; কিন্তু আর এক বৎসর যাইলে ভাল হয়, সদরের মধ্যে ত ঐ দুই ঘর। বিক্রমী দেখে দীর্ঘকাল ভোগ করিবে; তিন মেয়ে, একবারে ত নহে। দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া।

বাস্তবিক, গৌরীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে তিনি চিন্তিত হইলেন। তাহার মাতা যখন তাহার আত্মীয়দিগকে রূপে গৌরীর উপযুক্ত এবং ধনবান পাত্রের সন্ধান করিতে বলিলেন, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বিদেশী সেরেস্তাদার [illegible]

'গৌরীর বিবাহের আবার ভাবনা!' অনেকেই আপনার ঘরে গৌরীকে ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকা আসিবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু 'উপযুক্ত পাত্র' সম্বন্ধে পুত্রবধূর মতে ও শাশুড়ীর মতে ঐক্য হইল না। পুত্রবধূ মনে করিলেন, রূপবান ও ধনবান জামাতাই উপযুক্ত; শাশুড়ী মনে করিতেন, পুরুষের বিদ্যা চরিত্রই রূপ, কেবল কুরূপ না হইলেই হইল; মনের দিক তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, ধনার্জ্জন পুরুষের আয়ত্তাধীন। কিন্তু তিনি মনে করিতেন, বংশ ও পরিবার ভাল দেখিয়া গৌরীর বিবাহ দিবেন, কি জানি, যদি তাহার কষ্ট হয়। তাহার মাতা ভাবিতেন, অর্থের বলে তাহার কন্যা শ্বশুরবাড়ীতে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ করিবেই। ইহাতে কিন্তু বিধাত্রী দেবী বলিতেন, 'তাহা নহে, রাজকন্যা হইলেও মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে সকলের অধীন; তাহাকে জিতেন্দ্রিয়ে-জয়ী হইতে হয়।' কিন্তু এই কথায় কাহার মা একদিন যখন বলিয়াছিল, 'বৌমা গরীবের মেয়ে, তাই টাকার মর্য্যাদা অধিক বুঝেন', তখন বিধাত্রী দেবী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আহা! এখনও ভুক্তভোগী, সোনারে দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিতে হয়; তাহা হয় নাই বলিয়াই বৌমা ভুল করিতেছেন।' অনেক বিষয়ে বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূর মতের জন্য আপনার মত ক্ষুণ্ণ করিতেন, কিন্তু গৌরীর ভবিষ্য পুত্রনির্ব্বাচনের মত অত্যাবশ্যক বলিয়া তিনি তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, এ ক্ষেত্রে তাহা করিলে তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন।

তাঁহার যখন পুত্রবধূর সঙ্গে মতভেদ প্রবল হইয়া উঠিল, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনে সন্দেহের ছায়া পড়িল। শেষে তিনি ইষ্টদেবতার উদ্দেশে, মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, 'মানুষের আশু ভ্রম অতিক্রম করা অসম্ভব, আত্মশক্তিতে অতিমাত্রায় মানুষকে ভ্রান্ত করে। তোমরা আমার দৌর্ব্বল্য অবগত আছ, আমাকে কর্ত্তব্য-পথ দেখাইয়া দাও যেন গৌরীর পাত্রনির্ব্বাচনে ভুল না করি।' তিনি একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। নিশালোকবিকাশের পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন অন্ধকার হইয়া থাকে, আপনার অনিশ্চিত ভাবে তাঁহার হৃদয় তেমনই অন্ধকার হইয়া রহিল। আজ কেহ ভাল স্বপ্ন দেখিল কি না, জানি না—কিন্তু রমা তাহা নিশ্চয় করিবে। অপরাহ্ণে সে আসিয়া পিতামহীর কাছে দাঁড়াইল। বিধাত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন 'রমাবাই, আজ বেড়াইতে যাও নাই?' সে বলিল, 'না।' তিনি কিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?' কোনও উত্তর না দিয়া সে তাঁহার কাছে বসিল, তাহার পর তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। তিনি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

নিকটে আর কেহ ছিল না। রমা বলিল, 'ঠাকুরমা, তুমি কার জন্য বর ভাবিতেছ?' বালক যে তাহার চিন্তার ভাবও লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে বিধাত্রী দেবী বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বলিলেন, 'তোকে কি, রমা?' রমা পিতামহীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার বড় বড় চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল—পিতামহী তাহাকে আপনার চিন্তার কারণ জানিতে দিলেন না। বিধাত্রী দেবী আর থাকিতে পারিলেন না—স্বামীর ভালবাসা, পুত্রের ভক্তি, সে সবই কি এই বালকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে? তাঁহার পক্ষেও অশ্রু-সংবরণ করা অসম্ভব হইল। তিনি রমার মুখ চুম্বন করিলেন; তাহার পর রমার অশ্রু মুছাইয়া ও আপনার অশ্রু মুছিয়া তিনি বলিলেন, 'দিদির জন্য বর খুঁজিতেছি, বর কেমন হইলে ভাল হয়, তাই ভাবিতেছি।' রমা বলিল, 'তাহার জন্য এত ভাবনা কেন, ঠাকুরমা?' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'আমি যেমন বর ভাল মনে করি, এই কেহ তেমন বর ভাল মনে করে না, তাই ভাবিতেছি, কোন মতে কাজ করি?' 'কেহ কেহ' যে, রমা তাহা বুঝিল কি না, জানি না; কিন্তু সে বলিল, 'কেন ঠাকুরমা, তুমি ত বরাবরই বল মন নারায়ণ; তোমার মন যাহা ভাল বলিবে, তুমি তাহাই করিবে। 'বরের মতের জন্য ভাবনা কেন?'

বালকের উত্তরে বিধাত্রী দেবীর ভাবনা কাটিয়া গেল। যেন দক্ষিণা বাতাসে নিদাঘদিবসান্তে পশ্চিম আকাশে সঞ্চিত মেঘমালা সরিয়া গেল; অপগতমেঘ গগনে চন্দ্রালোক-রেখা দিলে তাঁহার মনে হইল, দেবতা তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন—রমার মুখে তিনি দেববাণী শুনিতে পাইয়াছেন। এই উত্তরের সঙ্গেই তাঁহার বিদ্বেষ ও গুরুতর শিক্ষার সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। তিনি আবার রমার মুখ চুম্বন করিলেন; বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ রমাবাবু। তোমার কথাই ঠিক। মনই নারায়ণ; কিন্তু আমরা মায়াবদ্ধ জীব, মধ্যে মধ্যে আপনাদের আশঙ্কায় এমনই বিব্রত হই যে, দেবতার কথা শুনিতে পাই না। তখন তিনিই আবার দয়া করিয়া আপনার কথা শুনাইয়া দেন।'

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

হিন্দু ধর্ম্মের বীজমন্ত্র।

[আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুত বিচারপতি সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ।—গত ১১ই মাঘ, ঊননবতিতম সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে পঠিত।]

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্হিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্ছারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু॥
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমা দদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু॥
যদ্ বো মনঃ পরাগতং যদ্ বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ব এবা বর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ॥—অথর্ব্ববেদসংহিতা ৭। ১৩। ১—৪

ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মোৎসবের দিনে, যাহা আমাদিগের দূর হইতেও সুদূর, তাহা সন্নিকট হয়; যাহা প্রচ্ছন্ন, তাহা বিকশিত হয়; যাহা সুষুপ্ত, তাহা জাগ্রত হয়। আজিকার দিনে সমাসীন সভাসদ্‌বর্গের হৃদয়ের আনন্দ সকলের হৃদয়ে অধিকার করে। ভ্রান্ত হৃদয়ে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় গৌরবের ভাব বিষময় অহঙ্কার যাহা অব্যক্ত থাকে, আজ তাহা পরিস্ফুট হয়। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবের ভাব আমার হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই সাহসপূর্ব্বক আজ আপনাদিগের সম্মুখীন হইয়াছি। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে কুণ্ঠা কিম্বা সঙ্কোচ হয় না। সমবেত হৃদয়ের প্রকৃত আনন্দ আমার নিজের হৃদয়কে আনন্দময় করিয়াছে বলিয়াই সানন্দে অদ্যকার অধিবেশনে আদিসমাজের সভাপতিরূপে আমার যাহা উদ্দেশ্য ও নিবেদন, তাহা ব্যক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের ভক্তি ইহা চাহি, এই প্রার্থনা। এইরূপ আনন্দ ভক্তিতে পরিণত হয়, পরস্পর প্রেমবন্ধনের সাধনায় সাহায্য করে।

যে সাম্প্রদায়িক ভাবের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, তাহাই আমাদিগের জাতীয়তার ভিত্তি। সেই সাম্প্রদায়িক ভাব হৃদয়ে রাখিয়া আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি। বহু জন পূর্ব্বে এই সভাস্থলে এক জন পূজ্য স্বনামধন্য আচার্য্য মহোদয় হিন্দুদের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি এই একটী কথা বলেন :—

---

১ আদি ব্রাহ্মসমাজের ৯৯তম সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে।

—"আমি দেখিতেছি, আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া নিজ শক্তি পুনরায় লাভন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতার উৎস হইয়া পৃথিবী সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত করিতেছে।"

আমারও সেই আশা ও বিশ্বাস। তাঁহার উপসংহার আমার উদ্বোধন-মন্ত্র গ্রহণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমরা মরি নাই। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি মরিবার নহে। যাহা সত্য, সভ্য-প্রতিষ্ঠ, তাহার মরণ নাই। আশা হয়, আমাদের ধর্ম্মকেন্দ্রক জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিবে। সেই ভাব সমগ্র পৃথিবীতে অধিকার করিবে, পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"আমরা ভারতবাসী যে এই দুঃখ দারিদ্র্য, ঘরে বাহিরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটী জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।" আমারও তাহাই মনে হয়। আমরা যে শক্তি আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছি, তাহা ধর্ম্মশক্তি। সে শক্তির বিস্তার নিশ্চয় হইবে। মরা গাঙ্গে আবার জোয়ার বহিবে, আমার বিশ্বাস। আশা হয়, পোড়া ক্ষেত আবার অঙ্কুরিত হইবে। সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া শেষ দুচারি কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি।

ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, যাহা এখনও ধোঁয়াইতেছে, যত দিন ধর্ম্মাধিকার ও রাষ্ট্রধর্ম্ম স্বতন্ত্র থাকিবে, তত দিন সে আগুন নিভিবে না। ইউরোপীয় জগতে স্বাধিকার ও স্বকর্তৃত্বের ভাব প্রবল। তাহা হইতেই সেখানে তুমুল বিরোধের উৎপত্তি হয়। এই যুদ্ধই তাহার পরিণাম। সেখানে যে আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহাতে সন্ধিপত্র কাগজের টুকরামাত্র। League of Nationsই বল, Parliament of menই বল, আর Federation of the worldই বল—যে নামেই তাহার উল্লেখ কর না কেন, সেই League, Federation, Parliament ধর্ম্মভিত্তি না হইলে নামমাত্রই থাকিবে। সে নামে এ স্থলে মুক্তি নাই। মোক্ষ ধর্ম্মভাবের উপর নির্ভর করে; ঐহিক প্রতিপত্তির উপর নহে। ঐহিক প্রতিপত্তির উৎপত্তি ও শেষ এইখানে। কর্ম্ম হও, কিন্তু কর্ম্মের শেষে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া কর্ম্মের ফল পরব্রহ্মকে অর্পণ না করিলে মুক্তি নাই, শান্তি নাই।

কর্ম্মী কর্ম্মধন চায়। তুমি যতই সেই শক্তি উপার্জ্জন কর, তাহা অসংযত হইয়া পড়ে, তাহার উপসংহার কল্যাণময় হয় না; সে শক্তি-সাধনা আসুরিক।

নাইট্‌স্‌কের (Nietzsche) অ্যান্টিক্রাইষ্ট গ্রন্থে (Anti-Christ) পড়িতে পাই—

"শুভ কিসে? ক্ষমতা-প্রসারে। ক্ষমতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে প্রবল হয়, তাহাই মানুষের শক্তি সঞ্চারে। আনন্দ কিসে? ক্ষমতা-প্রসারের অনুভূতিতে। বাধা বিঘ্নের অতিক্রমে। ক্ষমতা-অর্জ্জনে অক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তিতে। সর্ব্বত্র-বিনিময়ে শান্তিলাভে নয়, সংগ্রামে। কর্ম্মবলে, ধর্ম্মবলে নহে।" *

জার্ম্মাণিতে তিনি এই শিক্ষা দেন। সে জাতি এই আসুরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন তাহার অবস্থা কি?

ম্যাটসিনি তাঁহার "মানবধর্ম্মে" (Duties of man) স্পষ্টভাবে ঐতিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলেন, 'যদি ইহাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লও, তবে বিরোধ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের ফলে প্রেম, প্রীতি, আনন্দ লাভ হয় না।' ঐতিক প্রতিপত্তি যাহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথের আবিষ্কারে ব্যস্ত। সে পথ ধরিয়া চলিতে কাহার বুক পা পড়িতেছে, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কি দলাইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। মুখে "ভাই, ভাই", কিন্তু কার্য্যে বৈরী—ইহাই স্বাধিকারবাদীদিগের শিক্ষার ফল। ম্যাটসিনি বলেন যে, বিরোধ, স্বতন্ত্রভাব, ধর্ম্মবন্ধন না থাকিলে ঘটিবেই ঘটিবে। নির্ব্বিরোধ হইতে চাহিলে লক্ষ্য এক হওয়া,—একীভূত হওয়া চাই। সেই লক্ষ্য ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত অধিকার আছে সত্য, কিন্তু সেই অধিকার-রক্ষার চেষ্টাতে স্বভাবতই অন্য জন বা অন্য জাতি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়—যত দিন তাহাকে ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পার। সমাজ কিংবা জাতির সংস্করণে ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন; আমরা এক পিতার সন্তান—এই বোধ জীবনের মধ্যবিন্দু হওয়া চাই; এই ভাব জীবনের প্রত্যেক অংশে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি ফরাসী দেশের Lamennaisএর উপদেশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"অধিকারলিপ্সা ও কর্ত্তব্যপালন দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস।'

* "What is good? All that increases the feeling of power, will to power, power itself in man. What is happiness? The feeling that power increases, that resistance is overcome. Not contentedness but more power; not peace at any price but warfare, not virtue but (manliness)."

প্রাপ্তির চেষ্টাতে ত্যাগের ভাব না থাকিলে জাতিগত কিম্বা ব্যক্তিগত মহত্ত্ব হয় না। স্বাধিকার চেষ্টায় বাধা দিয়া অতিক্রম করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিতে পারে না। যে জাতি স্বাধিকার-প্রসারে স্বার্থ-নিবিষ্ট, সে জাতির জীবন দোষদুষ্ট সিক্ত। এই চেষ্টার নিবৃত্তি কিসে, শেষ কোথায়? যত দিন সেই জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল জাতি জগতে থাকিবে, তত দিন সেই অধিকারের প্রভাব চলিতে থাকিবে। নিঃস্ব জাতি দলিত হইবে। বলবানের কথা,—"আমার শক্তি আছে, আমি সেই শক্তির উপর নির্ভর করি। আমার পথে যে পড়িবে, তাহাকে দমন করিব, যাহার সহিত বিরোধ তাহার উচ্ছেদ করিব; সংগ্রামই আমার জীবন। বাধা দিয়া সহ্য করিব না। আমার শক্তির বিস্তার চাই।"

এই আসুরিক ভাব প্রবল হইলে পৃথিবী দানবরাজ্য হয়। যদি পৃথিবীর কোনও স্থানে ধর্ম্মরাজ্য থাকে, তবে তাহার সহিত সেই ধর্ম্মরাজ্যের সংগ্রাম বাধে, তাহাতেই দেব-দানবের যুদ্ধ হয়। যে মহাসমর হইয়া গেল, তাহার শেষ অঙ্কে এই ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়া আসুরিক বলের দমন হইয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান সেই ধর্ম্মভাবের উত্তেজনা। আমেরিকার নিজের সুবিধা কিম্বা প্রতিপত্তিলাভের কিছুই ছিল না। Crusadeএর সময় যেমন 'God with it! God with it!' বলিয়া বিবিধ জাতি একত্রিত হইয়াছিল, ঈশ্বরের আদেশপালনরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর—বিশ্বাসের উপর তাহারা একত্রিত হইয়াছিল, আমেরিকাও সেই ধর্ম্মভাব লইয়া এই মহাযুদ্ধে যোগদান করে। ইহাই দেব-দানবের যুদ্ধ। ব্রহ্মশক্তির অভাবে বিপুদমন হয় না। যে শক্তিসাধনায় মুক্তিলাভ হয়, তাহা ঐশী-শক্তি—তাহা ঐহিক প্রতিপত্তি নহে। ঐশী শক্তিই প্রাণশক্তি। সেই শক্তির সাধনাতেই মানবের মোক্ষ-লাভ হয়। যাহা কিছু কর্ম্ম, তাহাই ব্রহ্মে অর্পণ করিলে শান্তি। অশান্ত বিক্ষিপ্ত হৃদয়, রিপু-উত্তেজিত জীবন, ধ্বংসের কারণ, প্রলয়ের কারণ। ধর্ম্মই কর্ত্তব্য। প্রাপ্তিতে ত্যাগের ভাব চাই। আমার যাহা, তাহা আমারই নহে, আমাদের সবাকার। আমি কয় দিনের? যাহা আমার, তাহার শেষ আমাতেই। যাহা সবাকার, তাহার শেষ নাই; সবটা শেষ হইবার নহে। সেই "আমিত্ব"-পরিত্যাগ আদর্শক। সব জগতের যাহা, তাহা অনন্তের; হৃদয়ের সেই সর্ব্বব্যাপক ভাব ধর্ম্মেই অন্তর্লীন।

কর্ম্মবলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যতন্ত্র আসুরিক শক্তির উপর নির্ভর করে। তাহা মরণশীল।

Mazzini বলেন—

"যদি মানব-মনের অধীশ্বররূপে একটি মহা-মন না থাকেন, তবে বলবত্তর ব্যক্তিরা আমাদের উপর অত্যাচার করিলে কে সেই অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? মানুষের রচিত নহে, এমন কোনও পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম যদি না থাকে, তবে ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার মাপদণ্ড কোথায় থাকে? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে, কাহার বলে, কিসের বলে প্রতিবাদ করিব? আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়া জনসাধারণকে কি প্রকারে স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্তি দিতে, আপনাকে বলি দিতে আহ্বান করিব? যত দিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের বুদ্ধিপ্রসূত মতামতের উপর দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতে থাকিব, তত দিন কথায় মিল পাইতে পারি, কিন্তু কাজে মিল পাইতে পারিব না।" *

জর্ম্মাণ জাতি শক্তিকেই মানবজাতির প্রধান সাধনা বলিয়া তাহাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী সেই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। সংগ্রামেচ্ছা মানবপ্রকৃতিগত, অতএব, সংগ্রামচেষ্টা, সংগ্রাম করিতে শিক্ষা মানবজীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা (Baron von Freytag Loringhoren) জর্ম্মাণীর এক জন সর্ব্বপ্রধান সৈনিক লেখকের মত।

ট্রাইস্‌কে (Treitschke) বলেন—

"সুসভ্য বল, বর্ব্বর বল, উভয়েরই পশুপ্রবৃত্তি আছে। বাইবেলের এ কথা সত্য—মানবচরিত্রের পাপভাব মানুষ যে সময় সৃষ্টি হয়, সেই সময় হইতেই। সভ্যতা সে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে অপারক—যতই যেন সভ্য হও না, তাহা যাইবার নহে। পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে মানুষ কখনই পারিবে না।" †

---

* "If there be not a Supreme mind reigning over all human minds who can save us from the tyranny of our followmen, whenever they find themselves stronger than we. If there be not a holy and inviolable law, not created by man, what rule have we to judge whether an act is just or unjust? In the name of whom, in the name of what shall we protest against oppression and irregularity? How shall we demand of men self-sacrifice, martyrdom in the name of our individual opinions? As long as we speak as individuals in the name of whatever theory our individual intellect suggests to us, we shall have what we have to-day adherence in word, not in deeds.

† The polished man of the world and the savage have both the brute in them. Nothing is truer than the biblical doctrine of original sin, which is not to be uprooted by civilisation to whatever point you may bring it.

কিন্তু তাঁহারও মতে মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন না হইলে মুক্তি-যুদ্ধাতে মানবের হিতসাধন হইবে না। আত্মার সংস্কার যদি আবশ্যক হয়, তাহা ধর্ম্মভাব ভিন্ন কিসে হইবে? জর্ম্মণসম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম যিশুখৃষ্টের পদ পাইয়াছেন, ভাবিতেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রজাবর্গকে বলেন—

"আমি সম্রাট—আমি তোমাদের রণদেবতা। আমি যদি তোমাদিগকে আজ্ঞা করি,—পিতা মাতাকে সংহার কর, তোমাদিগকে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিতে হইবে। যে কার্য্য ভাল কি মন্দ, তোমাদের বিচারাধীন নহে। তোমাদের শক্তিতে আমার রাজশক্তি, কিন্তু আমার উপরে আর কেহ নাই। আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের প্রধান ধর্ম্ম।"

জর্ম্মণীর নেতৃগণ জর্ম্মাণ সৈনিককে এই ভাবে শিক্ষা দেন যে, তাহারা সততই মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।—শিক্ষা দেন,—"বল, তোমরা কোথায় গিয়া প্রাণ দিবে? আমরা বলিবামাত্র প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে।" তাহাদের মত এই যে, রাজা রাজ্যের জন্য। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মযাজনতন্ত্র (State and Church) বহু দিন হইতেই ইউরোপে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে—রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতি হইতে স্বতন্ত্র রাখাই কর্ত্তব্য। রাজনীতি ধর্ম্মের শাসনের অধীন নহে।

হিন্দুর সাধনাতে পরব্রহ্ম জন্য। ব্রহ্মই আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা। পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে, তখনই মানবহৃদয়ে আনন্দ দেখা গিয়াছে। Mazzini এই কথা ইতালীতে প্রচার করেন। তিনি বলেন—

"সমস্ত বড় বিপ্লবের ভিতর যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, তাহাই ক্রুসেডের ধ্বনি—'ঈশ্বর সহায় আছেন, ঈশ্বর সহায় আছেন।' এই ধ্বনিই নিষ্ক্রিয়কে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে। স্মরণ রেখো যে, সম্রাটের শিল্পিগণ মেডিচিদিগের অধীনে নিজেদের জনতন্ত্রীয় স্বাধীনতা বলি দিতে অস্বীকার করিলেও গম্ভীরভাবে যিশুখৃষ্টকেই জনতন্ত্র রাজ্যের নেতা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।" *

ইতালীতেই স্যাভনরোলা (Savanorola), ম্যাটসিনি (Mazzini) এবং গ্যারিবল্ডি (Garibaldi) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা—জ্ঞানময় পিতা পরব্রহ্মের উপর বিশ্বাস রাখিয়া জ্ঞান অর্জ্জন কর, আত্মোন্নতি ধর্ম্মনিয়ম, সত্যের নিয়ম জান। আর আমাদের পুরাতন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।"

* The cry which rang out in all the great revolutions, the cry of the crusade "God with it"! "God with it!" alone can rouse the inert into action. Remember the Florentine artisans who refused to submit their democratic liberty to the domination of the Medicis by solemn vote, elected Christ as head of the republic.

তাঁহাকে ভক্তি করা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন ;—

"সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা।"

তাঁহাকে "প্রেমস্বরূপম্" বলিয়াছেন—তাঁহাকে লাভ করিলে—

'সিদ্ধো ভবতি
অমৃতো ভবতি
তৃপ্তো ভবতি'

বলিয়াছেন। ভন মল্টকে (Von Moltke) একটী শান্তি-সঙ্গতে (Peace Deputation) এই কথা বলেন :—

"যুদ্ধ পুণ্য কার্য্য, বিধাতার বিধান। এই পুণ্য বিধানে জগতের শাসন চলিতেছে। যুদ্ধ মানব প্রকৃতির মহত্ত্ব ও উন্নতির উপায়। তাহাতেই মনুষ্যত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়; এক কথায়, যুদ্ধ অত্যন্ত নীচ, হেয়, বৈষয়িক ভাব হইতে মানুষকে উদ্ধার করে।" *

এই কপট আধ্যাত্মিক ভাবের কথা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। জার্ম্মাণীতে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিলেই ইহা সত্য কি মিথ্যা, বুঝা যায়। যে যাহাই বলুক, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। ধর্ম্মসভায় উপস্থিত সকলেই নিশ্চয় বলিবেন, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাপকে পুণ্য করিয়া তুলিতে কেহ কখনও পারিবে না। কর্ম্মকে ধর্ম্ম করিয়া তুলিলে অধঃপতন নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রিয়ার এক জন অধ্যাপক বলেন,—মানব-দ্রব্যের বিবেক নাই—"Human commodity have no conscience। তিনি বলেন—"উদ্দেশ্য-সাধনে সব পন্থাই সাধু।" সেখানকার এক জন নীতিবৈজ্ঞানিক বলেন,—রাজ-নীতিক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অনিবার্য্য।—জেনারল বার্ণহার্ডি বলেন,—যুদ্ধ স্বভাবদত্ত জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity'); যুদ্ধ হইতে জীবনলাভ হয়। আজকালকার অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণীর এই ভাব। কিন্তু সেই জর্ম্মণীতেই ক্যাণ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা এই যে,—

"মানুষ স্বাধীন; স্বাবলম্বন তাহার প্রকৃতি। যখন সে কোনও স্বার্থের দ্বারা বাধ্য না হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়, তখনই সে ন্যায়ের পথে চলে।"

---

* "War is sacred and instituted by God ; it is one of the holy bonds which rule the world ; war maintains in man all the great and noble feelings, sense of honour, unselfishness, magnanimity, courage, in short, it prevents man from sinking into the most repulsive materialism.

তিনি বলেন যে,—

"ঐশীপ্রকৃতির পূর্ণ সাগর হইতে অভিব্যক্ত অন্তর্নিহিত এক পবিত্র উৎস হইতে মানুষ নিজের শক্তি লাভ করে। তাই মানুষ কর্ত্তা, নিজের ভিতরে নিজের ইচ্ছা-শক্তিচালনের নিয়ম ধারণ করে।" *

মল্‌কি (Moltke) হউন, কিংবা কাইজার (Kaiser) হউন, কাহারও কথা আমাদের মনে স্থান পাইবে না। আমরা দাস জাতি; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে,—আমাদের অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্ম্মশক্তি আছে; আমাদের মনে এ কথা কখনও স্থান পাইবে না;

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ"

তাঁহাকেই সাধনা কর, তাঁহাকেই সাধনা কর। তিনি আমাদের পিতা, 'পিতা নোঽসি' তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন—

"পিতা নো বোধি।"

"অন্যমাৎ সৌভগাৎ ত্বয়ি।"

তাঁহাদিগেরই তিনি দুর্লভ।

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।

তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদির ভেদ নাই।

তস্মাৎ

তাঁহাতেই সকলে সম্পূর্ণ;

তত্ত্ব তস্যৈব

সবই তাঁহার;

এই মহান শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের। যিনি এই শিক্ষার অনুসরণ করেন,

স শ্রেষ্ঠং লভতে, স শ্রেষ্ঠং লভতে।

তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হয়েন।

আদি সমাজের এই সাধনা ও শিক্ষা—হিন্দুধর্ম্মের এই বীজ-মন্ত্রজ্ঞানই আদিসমাজের বীজমন্ত্র। আদিসমাজ হিন্দুর সমাজ; আদিসমাজের ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম। হিন্দুর সাধনাতে জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদির ভেদ নাই। সকল হিন্দুকেই, সমগ্র মানব জাতিকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে কুণ্ঠা হয় না —বলিতে সাহস হয়, বলিতে গৌরবান্বিত মনে হয়। সাধকসমবায় ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমাদের জাতীয় সমীকরণ ইহাতেই সম্ভব। উপস্থিত ভূতভবিষ্যতের এই শেষ শিক্ষা—ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী—

* He derives his power from an inward spring, a sacred source from the ultimate deeps of the Divine nature. Man is then a sovereign

স্বত্বাধিকার অর্জ্জন কর, কিন্তু ধর্ম্মার্জ্জনের অনুশীলন না করিলে, ব্রহ্মে তাহা সমর্পণ না করিলে, বিরোধের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। দেশ কাল পাত্রের উপর এ শিক্ষা নির্ভর করে না। সব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্বাবলম্বন। এই শিক্ষা নিজের উপর নির্ভর করে; ইহার জন্য মধ্যবর্ত্তী কোনও কিছুর প্রয়োজন নাই। ইহার মন্ত্রবিন্দু 'স্বং অস্মাকং তবাস্মি'। এই ধর্ম্ম সনাতন—ইহা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের শিক্ষা নহে, এবং অনূতন্ত নহে।

ম্যাটসিনি বলেন—

ভগবান ক্রমান্বয়ে মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পান—God manifests Himself successively in humanity

হিন্দুধর্ম্মেও—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য ইত্যাদি

ভগবানের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত।

ম্যাটসিনি ইতালি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আমাদের জাতির ভিতর ধর্ম্মভাব নিদ্রিত আছে—জাগ্রত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যিনি যিনি মানবীয় তত্ত্ব প্রচার অপেক্ষা যিনি সেই ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিতে পারিবেন, তিনিই জাতির অধিকতর উপকার সাধন করিবেন।*

আমারও আজ সেই কথা। এই যে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুর মতের এক একটি লোকও জন্মে নাই, ইহা বিশ্বাস করি না। আজ এই ধর্ম্মসভা হইতে দেশের সবের দিনে সেই ভাব জাগ্রত হয়, এই আমার প্রার্থনা। ওঁ তৎসৎ ওঁ

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সচিত্র স্বাস্থ্যপাঠ।—এলাহাবাদের মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীকুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এস্-সি, এম্, টী, কর্ত্তৃক লিখিত মূল ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উপাধিভূষণ মহোপাধ্যায় বি, এ, এল্, এস্, বি, কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত।—এলাহাবাদের সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ন প্রেস ও কলিকাতা, বহু নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। ডবল-ক্রাউন ষোল-পেজী এক শত তৃতি পৃষ্ঠা। আদর্শ টাইপ ও ছাপা সুন্দর। ইণ্ডিয়ন প্রেসের ছাপায় গৌরব এই পুস্তকে অক্ষুণ্ণ আছে। এই গ্রন্থে সাতাশখানি চিত্র দিয়াছে। চিত্রগুলি প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিবার

* The religious sentiment sleeps in our people waiting to be awakened. He who knows how to raise it, will do more for the nation than can be done by twenty political theories

পুস্তকখানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। দুই বর্ণে মুদ্রিত দশম ও একাদশ চিত্র এই শ্রেণীর ইউরোপীয় চিত্রের সহিত তুলনা করিতে পারে।

ভূমিকায় দেখিতেছি,—দুই বৎসর পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা-বিভাগ হইতে নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণের পাঠোপযোগী শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক ইংরাজী, এবং হিন্দী অথবা উর্দ্দু ভাষায় লিখিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন।' তদনুসারে গ্রন্থকার ইংরেজী ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উর্দ্দু ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গ্রন্থ ও তাহার অনুবাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। গবর্মেণ্ট গ্রন্থকারকে তিন শত টাকা পারিতোষিক দেন।—'সচিত্র স্বাস্থ্যপাঠ' সেই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ।

'স্বাস্থ্যপাঠ' দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। (১) নর-কঙ্কাল, (২) মাংসপেশী, (৩) রক্ত ও রক্তের সঞ্চালন, (৪) শ্বাস-যন্ত্র, (৫) খাদ্য ও তাহার পরিপাক, (৬) মস্তিষ্ক ও স্নায়ু, (৭) চক্ষু ও কর্ণের গঠন, (৮) খাদ্যবিচার, (৯) ব্যায়াম, (১০) গৃহের পরিষ্কার রাখিবার প্রয়োজনীয়তা, (১১) রোগ ও তাহার প্রতীকার ও সাংঘাতিক দুর্ঘটনা, এই গ্রন্থে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জটিল শারীর-তত্ত্বগুলি সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে।

গ্রন্থকার ও অনুবাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'বাঙ্গালা ভাষায় শারীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব না থাকিলেও, তাহার অসম্পূর্ণতা লক্ষ্যে মনে করিয়া' তাঁহারা মধ্য-ইংরাজী ও মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষার্থীদিগের জন্য এই গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। পুস্তকখানি ছাত্রগণের উপযোগী হইয়াছে। আমরা বলি, শুধু 'অধিকন্তু ন দোষায়' নয়; বাঙ্গালা দেশে ইহার প্রয়োজন ছিল।

শরীর-বিজ্ঞান এ দেশে উপেক্ষিত; 'শরীর-পালন' এখন বিস্মৃত। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' কথার কথায় পরিণত। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। উপবাসে কোনও জাতিই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। দারিদ্র্য আমাদের জীবনীশক্তি শোষণ করিয়া 'ভ্যাম্পায়ার' বাদুড়ের মত স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। ভারতবাসী ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ম্যালেরিয়ার মহাপীঠ বাঙ্গালা দেশের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। মানব এ দেশে মানবকে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষ দ্রুতবেগে শারীরিক অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে।—বাঙ্গালী পল্টনের রংরুটগণের শতকরা ত্রিশ জন ডাক্তারী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ, সুতরাং পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেনা হাজী ও বিশে ডাকাতের জন্মভূমি কঙ্কালসার, খর্ব্বকায়, চশমা-চক্ষু, পাণ্ডুবর্ণ অকালবৃদ্ধে পূর্ণ হইতেছে।—একে আর্থিক অবস্থা—জাতির দেহপুষ্টি দূরে থাকুক—জীবন-রক্ষারই প্রতিকূল। তাহার উপর শারীরধর্ম্মপালনে সাধারণের শোচনীয় বিমুখতা। কথায় বলে, 'চাচা, আপনা বাঁচা।' কিন্তু আমরা বাঁচিবারও চেষ্টা করি না। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের মত মনি কেহ বাঁচিবার উপায় ক'ন, সমাজের নায়কগণ বিদ্রূপ বুদ্ধ অমাত্য ও অকালপক্কগণ তাঁহাকে উপহাস করেন। যে দেশে মানব-পরমায়ু 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' নীতির অনুসারী, সে দেশে কাহার জন্য বিধবাবিবাহের হাহাকার ও ছোকরাদের হা হুতাশ, তাহা সত্যই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

প্রথমে রোগের অভিজ্ঞান আবশ্যক, তাহার পর তাহার অনুসরণ সম্ভব। এই জন্য আমরা শারীরবিজ্ঞান ও শারীরধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সাহিত্যের পক্ষপাতী। 'স্বাস্থ্যপাঠ' এই পর্য্যায়ের সুরচিত গ্রন্থ। তাই বঙ্গভাষা আবার ইহার প্রকাশ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

২৮শে কার্ত্তিকের 'এডুকেশন গেজেটে'র সুবিজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,—'বাঙ্গালার সেণ্ট্রাল টেক্সট্-বুক-কমিটী এই বিষয়ে পাঠ্যনির্ব্বাচনের সময় আর একখানি সুলিখিত পুস্তক দেখিতে পাইবেন।' আশা করি, এই ইঙ্গিত ব্যর্থ হইবে না।

শারীরবিজ্ঞানের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় এত অল্প যে, বয়স্কেরাও এই পুস্তক পড়িলে উপকৃত হইবেন। অভিভাবকগণ পরিবারের বালক-বালিকাদিগকে 'স্বাস্থ্যপাঠ' পড়িতে দিন,—পরিবারে, বংশে, এবং সমগ্র দেশে তাহার ফল ফলিবে। আমরা একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম;—

'যেখানেই ধূলা, বালি, পচা ও দুর্গন্ধপূর্ণ জিনিষ ও আবর্জ্জনা থাকে, সেখানে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কীটাণুর উৎপত্তি হয়। এই কীটাণুগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না। ইহারা এত সূক্ষ্ম যে, ১০।১২ অঙ্কার কীটাণু লইয়া এক একটী করিয়া এক লাইনে সাজাইলে সাত এক ইঞ্চ লম্বা একটী লাইন হইবে। এই কীটাণুগুলি হইতেই সাংঘাতিক রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাতাস, ধূলা-বালির সহিত এই কীটাণুকে তোমাদের বাড়ীতে লইয়া আইসে। কতক তোমাদের খাদ্যে বা পানীয়ে বা বস্ত্রের উপরে আসিয়া পতিত হয়, কতক নিশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে তোমাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই কীটাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে রোগ হয়। সকল কীটাণুই যে একপ্রকার, তাহা মনে করিও না। কোন কীটাণু পচা ফল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, কোন কীটাণু মাটীতে থাকে এবং কোন কোন কীটাণু পচা মাংস ভালবাসে। সকল কীটাণুই যে এক প্রকার রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে; কোন কীটাণু কলেরা, কোন কীটাণু বসন্ত রোগ উৎপাদন করে। কলেরার কীটাণু বসন্তরোগ উৎপাদন করিতে পারে না এবং বসন্তরোগের কীটাণু কলেরা উৎপাদন করিতে পারে না। কীটাণুরা অন্ধকার, আঁতসেতে, বায়ুসঞ্চালন-শূন্য ও অপরিষ্কার স্থানে থাকিতে ভালবাসে এবং এই সকল স্থানে যাইয়া অনেক কীটাণু প্রসব করে। এক কীটাণু হইতে কতকগুলি হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কীটাণু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে উহা আমাদের শরীরের ভিতরে অনেক প্রকারে প্রবেশ করিতে পারে। অনেক কীটাণু খাদ্য ও পানীয় জল বা দুধের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে, যেমন কলেরার কীটাণু, আমাশয় ও মেরুদ্রের (typhoid ও enteric fever) কীটাণু। অনেক কীটাণু নিশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করে, যথা—হাম, বসন্ত, ফুসফুস প্রভৃতি রোগের কীটাণু। আবার একপ্রকারে কীটাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। শরীরের আবরণ চামড়া যদি কোন স্থানে একটু কাটিয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্থান দিয়া মনুষ্যের শত্রু কীটাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরে প্রবেশ করে। এই তিন প্রকারের মধ্যে কোনও এক প্রকারে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কীটাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটী দুই তিন দিন

সংখ্যা। ইহাদের সংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি হয় যে, একটা কীটাণু হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপে অনেক সময় ১,৩৮,০০,০০০ কীটাণুর জন্ম হইতে পারে। তখনই কীটাণু সকলে সহিত মিশ্রিত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, তখনই রোগের উৎপত্তি হয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। মাঘ।—শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদের অঙ্কিত 'কলুকে' খানি চমৎকার হইয়াছে। 'জাতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির মুখোদ্দেশ' নাই বলিলেও চলে। কেবল আঙ্গুলে রঙ মাখিলে আসে। 'ক্রমে মুখে মধু আসে।' চিত্রের 'রঙ' ভারতীয় বটে; ভাবও ভারতীয়। ইহাতে ভারতের সৌন্দর্য্য ফুটাইবার চেষ্টাও সফল হইয়াছে। রামেশ্বরপ্রসাদ যে সৌন্দর্য্যে সৃষ্টি না হইয়া চিত্রের রুক্ষের সৌন্দর্য্যের-সাদৃশ্যে মজিয়া আঁটিয়া, জাপানের ভাবে ভাবুক পেশোয়ার মত ফুটাইয়া দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সকলের কিনুকিনু, বস্তুতঃ কলনা নাই মজিল যাহা,—ভক্তি-ভাবে মুকুর সাধুর শ্রীরামের সেই সৌন্দর্য্য কোহিনূর ওজনে বাদ না। ইহা কাচবিশেষও বটে, স্ফটিকবিশেষও বটে। 'বাহুল্য-সূত্রম্' একখানি প্রাচীন স্মৃতি-গ্রন্থ। ওপার্ট তাঁহার পুঁথির তালিকায় একখানি বাহুল্য-সূত্রের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সে পুঁথিখানি এখন নিরুদ্দেশ। ইণ্ডিয়ার 'গভর্ণমেণ্ট-ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরি'র সংগ্রহে একখানি ও মফস্বলের গবর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরিতে আর একখানি বাহুল্য-সূত্রম্ আছে।—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সহ তালিকা দিয়াছেন। গঙ্গানাথ ঝা মহাশয় বলেন,—'কেবল সূত্র রীতির গ্রন্থ হইতে রাজনীতি শাস্ত্রের গ্রন্থের এই প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল। ভারতের রাজনীতি যে বিশেষভাবে মৌলিক ও মূলতত্ত্ব বিজ্ঞান, তাহা এই সূত্র-গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতেছে।'—এই বাহুল্য-সূত্র-গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তর। ভারতবর্ষের রাজনীতিক সম্প্রদায়সমূহের জন্য, বাঙ্গালার নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের জন্য, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরপ্রসাদ ঘোষের অবগতির জন্য আমরা বৃহস্পতির একটি সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

'জ্ঞাতিঃ যত্র বৈরং তৎমূলদণ্ডমামূলং নয়েত।'—১ম অধ্যায়, ১০৭ সূত্র।

'দেশকালযোগ্যং কর্ম নয়ানয়ৌ চ বেদয়েৎ।'—৬ষ্ঠ অধ্যায়; ১ সূত্র।

'হিতানি নিরূপয়েৎ।'—৬ষ্ঠ অধ্যায়; ৩ সূত্র।

ইহারই একটু বৃহস্পতি; আশা করি, কেহ বৃহস্পতির উপদেশ উপেক্ষা করিবেন না। এ দেশের উত্তরপুরুষদিগকে—ভাষ্য-সম্প্রদায়কে আর একটি সূত্রে অবহিত হইতে বলি,—

'ঐকমত্যস্য পৌনঃপুন্যম্।'—৮ম অধ্যায়; ১ সূত্র।

'সূত্রং হি' ভাষ্যকারের বরাবরের বন্ধু। তাঁহারা বৃহস্পতির নিম্নলিখিত উপদেশ বিস্মরণে থাকিতে পারেন,—

গঙ্গোপাধ্যায় বাইশপত্য-সূত্র বাঙ্গালীর গোচর করিয়া দেশের উপকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায় 'নাদিরশাহের জাগরণে' সত্যেন্দ্রনাথের আধুনিক হ্রস্ব রচনা-রীতির অনুসরণ বা অনুকরণ করিয়াছেন। ইহাতে অনেক allusion আছে; 'দিল্লী হিরাট মেশেদ গজনী সিনাথুর পেশোয়ার' আছে। দুই এক স্থলে বিদ্যাপতির মত রচনার বৈচিত্র্যও আছে। দুই এক স্থলে মৌলিকতাও আছে।

'মানুষ মেষের দল
তারি দুর্ব্বার তরবারে যাবে একেবারে রসাতল!'

'দুর্ব্বার তরবারে'ও মানুষ প্রথমে ভূ-তলেই গড়ায়, তার পর হয় স্বর্গে, নয় নরকে যায়, ইহাই জানা ছিল। হঠাৎ ভূ-তলের তলে 'রসাতলে' যাইবে কেন? সুতরাং ইহা মৌলিক। অনেক স্থলে ধ্বনিভঙ্গ হইয়াছে।—বাঙ্গালা কবিতায় finishএর দিকে কবিদের দৃষ্টি থাকে না। দুই তিন পৃষ্ঠা রচনাতেও কাঁটা, খোঁচা, গুরুদের ছড়াছড়ি। কবিতায় 'প্রেরণায়' নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। 'নিসর্গসুষমাঃ কবয়ঃ' বটে, কিন্তু এ সকল বিষয়ে সাবহিত না হইলে, বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কোথাও বোধ হয় 'কবি' হওয়া যায় না। 'নাদিরশাহের জাগরণে' ক্ষমতার পরিচয় আছে, কবি সাধনায় উদাসীন না হইলে সিদ্ধ হইতে পারেন। কবিতায় তথায় যাহা গোঁজায়, তাহাই প্রতিভার দান নয়, এ ক্ষণভঙ্গবিলুরেও স্মরণীয়। শ্রীযুক্ত সুরেন ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' চতুর্থ প্রস্তাবে 'তাদুলী' ব্রতের ছবি আছে। লেখক কলমকে তুলীতে পরিণত করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালার ছবি আঁকিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় 'সোনাইন-বরণী' নাম দিয়া 'রোমক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ইহা রহস্য-প্রকাশ নাটিকা। গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। গত বারেও আমরা নবীন সাহিত্যিক অজিতকুমারের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' লিখিয়াছি। তখন জানিতাম না, তিনি বাঙ্গালার নব-যুগের নূতন সাহিত্যিক দরিদ্র কপিয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। এ কালে যাঁহারা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া বিনামূল্যে দেশবাসীকে বিবিধ ধার-করা বিলাতী উপদেশ প্রদান করিতেছেন, অজিত প্রথমে সেই শ্রেণীর অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই আপনার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন; আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; এবং গতানুগতিকতা পরিহার করিয়া আপনার শক্তিবলে সাহিত্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহাকে সাহিত্যের instinct বলে, তিনি সেই সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন। আমরা তাঁহার অনেক মতের প্রতিবাদ করিয়াছি, কিন্তু সেই সকল মতের প্রতিষ্ঠায় তিনি যে চিন্তাশক্তির, বিশ্লেষণের ক্ষমতার ও অগাধ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পরিচয় দিতেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি; আনন্দিত হইয়াছি; মতান্তরের ক্ষেত্রেও তাঁহার সাহিত্যশক্তিকে আমরা বাধ্য হইয়া ভক্তি করিয়াছি; এত অল্প বয়সে এমন শক্তিশালী সাহিত্যিকের তিরোধান দেশের ও সাহিত্যের পক্ষে শোচনীয়। অজিতের সম্বন্ধে 'ভারতী' লিখিয়াছেন,—'একালের বাংলা-সাহিত্যে যে কয়েক জন লেখক সাহিত্য-চর্চ্চায় বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অজিতকুমার তন্মধ্যে ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে প্রধান এক জন। সমালোচন-ক্ষেত্রে তাঁহার [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উঁচে কিনে' উলুইচ-লিখিত উপন্যাসের অনুবাদ।—ইহা পাঠে অনেকেরই [illegible]। ইহার ভাষা মেঘদূতের 'পথিজনের টিক উল্টা'। 'সে আমার নিবিড় চিত্তে চিত্রে করিয়াছে [illegible]' শ্রীযুক্ত দুর্গেশ সেন 'একালের ও সেকালের' লিখিয়াছেন,—'এতদিন [illegible] পৌরীশঙ্কর হিমালয়েরই অন্তর্গত একটি শৃঙ্গের পর্ব্বতশিখরের নাম।' সত্যবাবু বলেন,—'গৌড়ী সাহিত্যিকদের ভাষায় উহার (এভারেষ্টের) গৌরীশঙ্কর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ঠিক নয়।'—তথাস্তু। কিন্তু গৌড়ী ও পাতী, টীকা ও ভাষ্যক, সব দেখিয়াই এ [illegible] ভাষা। সত্যবাবু আজ যাহার পরিচয় দিলেন, তাহার বিপরীত যাহাদের [illegible] ছিল, গৌড়ী-পাতি-নির্ব্বিশেষে এত দিন তাহাই চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং 'গৌড়ী ও পৌত্রাকী' সমাসে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ত্রৈস্তি-কবিতা'র অনুবাদ করিয়াছেন। কবি ওয়েল্‌ডন জনসন ফোন ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন, এবং সত্যেন্দ্রনাথ ফোন ভাষা হইতে তাহার অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। তবে, তাঁহার ভাষায় আফ্রিকার নকল ভাষার অনুবাদ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। বাঙ্গালা ভিন্ন আর সকল দেশের পাঠকই তাহা সমান উপভোগী, তাহা অনুবাদের কষিবারও উপায় নাই। বাস্তবিক, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা না থাকুক, ভাষায় আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিশ্বের [illegible] সাহিত্যের হিসেবে সত্য, সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ নাই!—ইহুদাসী কবিতা আর তাহার [illegible] 'কুলো-কাথ'। 'যম-যাতনায় জনম আতা মরণ জুড়ে পুরতে রবে।' ও; 'চলতি ভাষা নয়, ভাষার আঁতায় কবিতাও 'এজেনারে' চোরে 'হয়ে গেছে।' বোধ হয় আজকাল [illegible] বঙ্গীয় নব-প্রগ্রহ বাঙ্গালী চুষের সাধ মোলে মিটিতেছে! 'আলোচনার' নামে বিস্তর সমাবেশ আছে। 'ভেলের কথার প্রারম্ভে হয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—'[illegible] কাঁ [illegible] খুসি, তাহাতেই তুমের কাহিনী, নিজ্জীবায় বেদনা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়।' সত্যবাবু বলেন,—'দুরের ভাষায় উক্তিগুলির প্রবল [illegible]—এই ভাষাবিকৃত [illegible] ভক্ত আতঙ্ক উদ্ধোষিত করা * * * তথাস্তুনের ইচ্ছা, আমরা বুঝিতে পারিতেছি।' শ্রীপ্রফুল্লনাথ মুখোপাধ্যায় 'ভাবনা পরবে' ভেটাগপুরের একটি পরবের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীনলিনচন্দ্র রজুমদার ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র দুইটি প্রবন্ধে, 'চীনা-কাদম্বরীর চাবে বাঙ্গালার দৃষ্ট আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'বাহিরের তাল ঠুকিয়া' তাঁহার ভাষায় বলা যায়,—'ভেঙে [illegible] যায় ছেড়ে যে এখন ছেড়ে রে!' কেবল শেষে যোগ করিয়া দাও,—'কেঁদে [illegible]'। কোনটুকু ধরিব পারা যায়, কিন্তু সতীশবাবুর পদ্যের আবশ্যকতা কম, অতএব মার্জ্জনীয়। চা-লিখিত 'বাঙ্গের জীবনচরিত' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত তলাল শীলের 'উর্দ্দু' নামক প্রবন্ধে লেখক উর্দ্দুর উৎপত্তির ও বিকাশের ইতিহাস বিবৃত করিয়া উপসংহারে লিখিতেছেন,—এখন রেল ও ছাপাখানার সাহায্যে উর্দ্দুর কেন্দ্র ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। [illegible] ছড়াইয়া উর্দ্দুর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। ভাষার উন্নতির সহিত [illegible] বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ভারতব্যাপী উর্দ্দুশিক্ষিত সম্প্রদায় এখন ভাষার উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালার সহিত উর্দ্দুর তুলনা করিলে বোধ হয় বাঙ্গালা এখনও অগ্রসর, কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই বাঙ্গালাকে পিছাইয়া পড়িতে হইবে। বাঙ্গালার মত উপন্যাস [illegible]

তথা, ইংরিজিতে সংক্ষে পুস্তক না থাকিলেও, অন্য ভাষার চিন্তা করিবার মত বিষয়ের ভাল ভাল পুস্তকের যত অনুবাদ উর্দ্দুতে হইয়াছে, বাঙ্গালায় তত হইয়াছে না। আবার ওস্মানিয়া ইউনিভার্সিটির প্রচলনা প্রথমে হইলে বাঙ্গালা অনেক পিছাইয়া পড়িবে। বঙ্গদেশের সাহিত্য-পরিষদের চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে আপনি তান অধিকার করিবার চেষ্টা না করিলে আর প্রাধান্য ত থাকিবেই না, সমকক্ষতাও থাকিবে কি না সন্দেহ। উর্দ্দু ভাষার উৎকর্ষের সম্ভাব (অনুমন্-তরক্কি উর্দ্দু) কেন্দ্র আজকাল দক্ষিণের হায়দ্রাবাদে ও সভার পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং হায়দ্রাবাধিপতি নিজাম—নবাব উস্মান আলিখাঁ বাহাদুর। এই বিদ্যোৎসাহী নরপতি উর্দ্দু ভাষার একজন কবি, কিন্তু এখনও তিনি আপন কবিতামালা প্রকাশ করেন নাই বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে কবি বলিয়া জানে না। তিনি সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে ওস্মানিয়া ইউনিভার্সিটি স্থাপন করিয়াছেন। এই ইউনিভার্সিটিতে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি সকল শাস্ত্রই উর্দ্দু ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। আরবি, পার্সি, সংস্কৃত, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা কেবল সাহিত্যরূপে পড়ান হইবে। তবে উর্দ্দু-ভাষায় এখনও উপযুক্ত পুস্তকাদি নাই, সেই জন্য প্রথমে ভাল ভাল ইংরেজি ও অরবি পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। অনুবাদ করিবার জন্য ভারতের বাছা বাছা বিদ্বান ও সাহিত্যসেবী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাও প্রচার করা হইয়াছে যে, ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্যপুস্তক করিবার উপযুক্ত পুস্তক কেহ রচনা বা অনুবাদ করিতে পারিলে নিজাম গবর্মেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন।' শ্রীযুত বিচারপতি সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় নিজাম নাই। বিন্দু-নক্রমে সিন্ধুর সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। যে শক্তি ও যে সাধনার বলে, নালন্দা, নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরের বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইয়াছিল, আমরা কি আবার সেই শক্তির উদ্বোধন ও সেই সাধনার প্রবর্তন করিতে পারিব না?

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

চিত্রবিদ্যা।

১

আর্য্য সাহিত্যে চিত্রবিদ্যার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। উহা কলাবিদ্যার অন্তর্গত। দৃশ্যকাব্যের সহিত উহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ, নাটকাদিতে পর্ব্বত, বন, জলাশয়, পথ, গৃহ প্রভৃতির আকৃতি চিত্রেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শ্রব্যকাব্যেও উহার উল্লেখ আছে। অনেক কাব্যেই চিত্রের প্রসঙ্গ আছে। দর্শনশাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও উপাসনা-গ্রন্থেও উহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বেদান্তের পঞ্চদশী গ্রন্থের একটী পরিচ্ছেদ 'চিত্রদীপ' নামে অভিহিত। উক্ত গ্রন্থের স্থানান্তরেও চিত্রের উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, আশ্রয় ব্যতীত যেমন চিত্রের অবস্থান সম্ভবপর নহে, তেমনই সাকার উপাসনায় চিত্র একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিচিত। কারণ, উহা পূজার অন্যতম আধার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

কিরূপ রীতি অবলম্বন করিয়া চিত্রকরগণ চিত্রণ সম্পন্ন করিতেন, অর্থাৎ, যাহা দেখিতেন, স্বকীয় রুচি অনুসারে প্রতিভাবলে তাহাই অঙ্কিত করিতেন, অথবা কোনও সূত্রানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চিত্র করিতেন, তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা তাহার পরিচয় দিব।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের একটী আখ্যায়িকা-পাঠে জানা যায় যে, নারায়ণ মুনি এই শাস্ত্রের উদ্ভাবক। উক্ত মুনি কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহার তপে বিঘ্ন উপস্থিত করিবার জন্য দিব্যাঙ্গনাগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার হাব ভাব প্রদর্শন করিতেছিল। কিন্তু মুনি তাহাতে প্রলুব্ধ হইলেন না; তিনি পৃথিবীতে আম্র-রসের দ্বারা অসামান্য রূপবতী রমণীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন; যোগবলে তাহাতেই জীবনসঞ্চার করিলেন। তখন দিব্যাঙ্গনারা লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। উক্ত মূর্ত্তি 'উর্ব্বী'তে অর্থাৎ পৃথিবীতে অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া, 'উর্ব্বশী' নামে অভিহিত হইল।

মহামুনি নারায়ণ এই প্রকারে লক্ষণযুক্ত চিত্র নির্ম্মিত করিয়া ঐ 'চিত্র-সূত্র' বিশ্বকর্ম্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বেদপ্রসিদ্ধ রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীর

প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সুপ্রসিদ্ধ কুন্দকুলের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে, অতি সুপ্রাচীন কালেই চিত্র-সূত্র হিন্দুশাস্ত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্রের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি হইতে জানা যায় যে, চিত্র-বিদ্যার আদিম গ্রন্থ 'চিত্র-সূত্র' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন,—'অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি চিত্রসূত্রং তবানঘ।' চিত্র-সূত্রের উপসংহারে মার্কণ্ডেয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলার মধ্যে চিত্রই প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ফলের প্রদায়ক; উহা যে গৃহে স্থাপিত হয়, সেখানে মঙ্গলবিধান করে। (১)

চিত্রসূত্রাধ্যায়ের পূর্ব্বাধ্যায়ে নৃত্যসূত্র কথিত হইয়াছে। চিত্রের সহিত নৃত্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে, নৃত্যের ন্যায় চিত্রেও ত্রৈলোক্যের অনুকৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং মহানৃত্যে যেরূপ দৃষ্টি, ভাব, অঙ্গোপাঙ্গ ও হস্তের নির্দ্দেশ হইয়াছে, চিত্রেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। নৃত্য 'পরম চিত্র' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সুতরাং নৃত্যে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে,-তাহাই এখন বলিব, তুমি শ্রবণ কর।

ইহার পরেই কথিত হইয়াছে যে, হংস, ভদ্র, মালব্য, রুচক ও শশক, পুরুষ এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা সকলেই দীর্ঘে ও আয়ামে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণযুক্ত; অর্থাৎ, যে পরিমাণ কথিত হইবে, ইহাদের দেহে তাহার বিপর্য্যয় হইবে না।

হংসের দৈর্ঘ্য স্বকীয় অঙ্গুল প্রমাণে এক শত আট অঙ্গুল। ভদ্রের পরিমাণ এক শত ছয় অঙ্গুল। মালব্যের পরিমাণ এক শত চারি অঙ্গুল। রুচকের পরিমাণ এক শত অঙ্গুল, এবং শশকের পরিমাণ নব্বই অঙ্গুল। (২)

---

(১) কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।
মঙ্গল্যং প্রথমং বৈতদ্‌গৃহে যত্র প্রতিষ্ঠিতম্॥—৩য় খণ্ড। ৪৫ অ। ৩৮

(২) যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা।
দৃষ্টয়শ্চ তথা ভাবা অঙ্গোপাঙ্গানি সর্ব্বশঃ॥
করাশ্চ যে মহানৃত্যে পূর্ব্বোক্তা নৃপসত্তম।
ত এব চিত্রে বিজ্ঞেয়া নৃত্য চিত্রং পরং স্মৃতম্॥
নৃত্যপ্রমাণং যেনোক্তং তৎ প্রবক্ষ্যামতঃ শৃণু।
[illegible]

বলা আবশ্যক যে, এই স্থলে যে পরিমাণ কথিত হইয়াছে, বৃহৎসংহিতায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত তাহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎসংহিতার 'পঞ্চমনুষ্যবিভাগ' নামক প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, হংস-সংজ্ঞক পুরুষের 'ব্যামায়' অর্থাৎ, প্রসারিত ভুজদ্বয়ের পরিমাণ ও উচ্চতা 'যড়ুনবত্যঙ্গুল' (ছিয়ানব্বই) হইয়া থাকে। শশক, রুচক, ভদ্র ও মালব্য, ইহাদের পরিমাণ হংসের পরিমাণ অপেক্ষা ক্রমে তিন অঙ্গুল অধিক। সুতরাং শশকের পরিমাণ নিরনব্বই, রুচকের এক শত দুই, ভদ্রের এক শত পাঁচ ও মালব্যের পরিমাণ এক শত আট অঙ্গুল। এই স্থলে টীকাকার ভট্টোৎপল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কথিত পরিমাণ পরবর্ত্তী গ্রন্থের বিরুদ্ধ। (১)

আরও একটী বিষয়ে বরাহমিহিরের সহিত অনৈক্য আছে। মার্কণ্ডের পরিমেয় মানবের স্বকীয় প্রমাণানুসারে অঙ্গুল-মান-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরাহমিহির পারিভাষিক মান-গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। প্রতিমা-নির্ম্মাণ-পরিচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন যে, গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য্যরশ্মিতে ধূলির মত যে সূক্ষ্মতর পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম পরমাণু। পরিমাণ বিষয়ে ইহাই প্রথম। পরমাণু রজ, বালাগ্র, লিক্ষা, যূক, যব ও অঙ্গুল, যথোত্তর অষ্ট গুণানুসারে এই পরিমাণ বুঝিতে হইবে। (২) অর্থাৎ, অষ্ট পরমাণুতে এক রজ, অষ্ট রজে এক বালাগ্র, অষ্ট বালাগ্রে এক লিক্ষা, অষ্ট লিক্ষাতে এক যূক, অষ্ট যূকে এক যব, ও অষ্ট যবে এক অঙ্গুল হয়। (৩)

বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষাঃ পঞ্চ ত্র্যাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
উচ্ছ্রায়ব্যামভুজ্যাস্তে সর্ব্বে জ্ঞেয়াঃ প্রমাণতঃ॥
ষেনৈবাঙ্গুলমানেন শতমষ্টাধিকং ভবেৎ।
প্রমাণং নৃপ হংসস্য ভদ্রস্য তু যড়ুত্তরম্॥
চতুর্ভিরধিকং জ্ঞেয়ং মালব্যস্য তথা নৃপ।
শতঞ্চ রুচকস্যোক্তং হংসানং শশকস্য চ।

(১) যন্নবতি মঙ্গুলানাং ব্যামো দীর্ঘতা চ হংসস্য।
শশ-রুচক-ভদ্র-মালব্য-সংজ্ঞিতাস্ত্র্যঙ্গুলবিবৃদ্ধ্যা॥—৫৮ অ। বৃ সং।
এতদুক্তমত্র বক্ষ্যমাণগ্রন্থেন বিরুধ্যতে।

(২) আলাস্তরগে ভানৌ রবেরুত্তরং দর্শনং রজো যাতি।
তদ্বিদ্যাৎ পরমাণুং প্রথমং ভক্তিপ্রমাণানাম্॥—৫৭ অ। বৃ সং।
পরমাণুরজো বালাগ্রলিক্ষযূকং যবোঽঙ্গুলং চেতি।
অষ্টগুণানি যথোত্তর মঙ্গুলমেকং ভবতি সংখ্যা॥—১—২।

(৩) তত্র যবাষ্টাঙ্গুলপরিণাহো মুষ্টী।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর। তৃতীয় খণ্ড। ৩৫ অ

যদিও বরাহমিহির প্রতিমা নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে এই বাহু-সূত্র বলিয়াছেন, তথাপি চিত্র ভাস্কর্য্যের উভয় ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার্য্য। কারণ, দেখিতে পাই, প্রতিমা ও চিত্র, এতদুভয়ের একরূপতারই পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় কথিত চিত্র-সূত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ যেরূপ, বরাহমিহিরের প্রতিমা পরিমাণ-নির্দ্দেশেও তাহা প্রায় সেইরূপ। কেবল কোথাও কোথাও কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়।

চিত্রের সহিত প্রতিমার কোথায় প্রভেদ হইবে, বরাহমিহির প্রতিমা সম্বন্ধে তাহাও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। প্রতিমা-মস্তকের পরিণাহ বত্রিশ অঙ্গুল, বিস্তৃতি হইতে আয়াম চতুর্থাংশ অঙ্গুল হইবে। কিন্তু চিত্রকর্ম্মে দ্বাদশমাত্র দৃশ্য হইবে; অবশিষ্ট বিংশতি অঙ্গুল অদৃশ্য থাকিবে। মার্কণ্ডেয় চিত্রসূত্রে বলিয়াছেন যে, মস্তকের পরিণাহ দ্বাদশাঙ্গুল হইবে।

এই সকল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, চিত্রাঙ্কনে শিল্পীর যথেচ্ছাচারের অবসর ছিল না। আদর্শের যত্র যথিকা তাহাকে কাজ করিতে হইত। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের সময় বিষয়েই অনুষ্টুভের প্রভাব। সুতরাং পরিমাণাদির অতিক্রমে চিত্র-স্থাপয়িতার দুরদৃষ্ট অবশ্যম্ভাবী। চিত্রের গুণ-দোষ-কথন-প্রসঙ্গে এই বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। আমরা পরে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

চিত্র সাধারণতঃ প্রতিভিত্তিতে অঙ্কিত হইত। উভয় চিত্রের আধার-গত পার্থক্য থাকিলেও, উপাদান-প্রণালী একরূপ। রেখাই চিত্রের প্রধান অঙ্গ। কারণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পরিমাণ ও সংস্থানের অভিব্যক্তি প্রথমতঃ কেবল রেখাপাতের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ণান্তরের অভাবেও কেবল অঙ্কন-ক্রিয়ার দ্বারাই মনুষ্যাদির আকৃতি বিন্যস্ত হইতে পারে। পরন্তু দর্শনীয় চিত্রদীপি প্রকরণে চিত্রের চারিটী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমাবস্থা, ধৌত; দ্বিতীয়, ঘট্টিত; তৃতীয়, লাঞ্ছিত; এবং চতুর্থ, রঞ্জিত। পট-চিত্রের আধার বস্ত্রের স্বাভাবিক শুভ্রাবস্থা, ধৌত। উহাতে অঙ্গবিলেপন, অর্থাৎ অন্নমণ্ডের দ্বারা প্রলেপ-দান, ঘট্টিত। তাহাতে মসী, অর্থাৎ, কালীর দ্বারা আকার-সম্পাদন, অর্থাৎ, পরিমাণসূত্রানুসারে কালীর লেখাপাতের দ্বারা লেখনীয় বিষয়ের আকৃতিবিন্যাস, লাঞ্ছিত; এবং স্থানানুসারে উপযুক্ত বর্ণ-বিন্যাসের নাম, রঞ্জিত। (১) স্মৃতিশাস্ত্রেও দৃষ্টান্তস্থলে চিত্র-রচনার যে পদ্ধতি

(১) যথা চিত্রপটে দৃষ্টঃ মধ্যমানঃ চতুষ্টয়ম্।
পরমাণুনি বিলেখ্য তথাবস্থাশ্চতুষ্টয়ম্ ॥

কথিত হইয়াছে, তাহাতেও পঞ্চদশী-কথিত ক্রমেরই আভাস পাওয়া যায়। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে, চিত্রকর্ম্ম যেমন অনেক অঙ্গের দ্বারা ক্রমে উন্মীলিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয়, ব্রাহ্মণ্যও তেমনই বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা ক্রমে পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। নৈষধচরিতে দময়ন্তীর উক্তি হইতে জানা যায় যে, হংস নখের আঁচড়ের দ্বারাই নলের আকৃতি দময়ন্তীকে দেখাইয়াছিল। সাহিত্যে এই শ্রেণীর অনেক উদাহরণ আছে। (১)

মার্কণ্ডেয়-কথিত চিত্রসূত্রেও চিত্র-নির্ম্মাণের উপযোগী কুড্য-সম্পাদনের পর, তাহাতে শ্বেত প্রভৃতি বর্ত্তিকার দ্বারা (তুলিকার দ্বারা) প্রমাণে চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্থাপনের পর, তাহাতে উপযুক্ত স্থানে সেই সেই বর্ণের বিন্যাস করিবার উপদেশ আছে। (২) বোধ হয়, অত্রত্য 'প্রমাণ' শব্দে চিত্রের পরিমাপক রেখাবিন্যাস অভিপ্রেত হইয়াছে।

চিত্রের স্থায়িত্ব-সম্পাদনের জন্য কুড্যে যে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অনেকগুলি মশলার সংমিশ্রণের উপদেশ দেখা যায়। যথা,—তিন প্রকার ইষ্টকচূর্ণ, সাধারণ মৃত্তিকা তিন ভাগ, গুগ্‌গুল, মোম, মধুক (বঙ্গ অথবা যষ্টিমধু) মুরুক (মুরক) মুরা, নালক প্রসিদ্ধ গৃহদ্রব্যবিশেষ, গুড়, কুসুম্ভ ও তৈল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া তিন ভাগ অগ্নিদগ্ধ সুধার (চূণ) সহিত চূর্ণাকারে মিশ্রিত করিবে।

অনন্তর ইহাতে দুই ভাগ অপক্ক বিল্বচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া (মধকং কথং বুঝা গেল না) উপযুক্তপরিমাণ বালুকা দিবে। তাহার পর পিচ্ছিল বল্কল-জলের দ্বারা সমস্ত ভিজাইবে। এই উপাদান এক যামে প্রলেপের উপযুক্ত হয়। অনন্তর এই পদার্থের দ্বারা প্রাচীর প্রভৃতিতে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। এই প্রকারে ও আরও কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্রস্থানকে উপযুক্ত করিয়া, তাহাতে চিত্র অঙ্কিত করিলে, শত বৎসরেও চিত্রের অন্যথা হয় না। (৩)

যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ সাধিতো রঞ্জিতঃ পটঃ। ২
স্বতঃশুভ্রোঽপ্যতঃ ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽশ্মবিলেপনাৎ
মস্যাদ্যৈরঞ্জিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ।—৩।৩।

(১) চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈ রঙ্গৈ রম্যীলাতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈ র্বিধিপূর্ব্বকৈঃ।

(২) শ্বেত-কাদ্রব-কৃষ্ণাভির্বর্ত্তিকাভি র্যথাক্রমম্।
আলিখ্য স্থাপয়ে দ্বিদ্বান্ প্রমাণে স্থানকে তথা।
ততশ্চ রঞ্জয়েদ্রঙ্গৈ র্যথাস্থানানুরূপতঃ॥

(৩) অপি বর্ষশতস্যান্তে ন প্রলশ্যেত কর্হিচিৎ।—৩।৩।

সাহিত্যে চিত্রের যে চমৎকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়, সূত্রকর্ত্তার সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিলে, মনে হয়, কবি এ বিষয়ে অভিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

কালিদাস চিত্রস্থ নায়িকায় আলাপকারিত্বের উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন; সূত্রকার এতদপেক্ষাও কঠিনতর ভাববিন্যাস চিত্রের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যিনি নিদ্রিত ব্যক্তির চেতনাযুক্ত ভাব, মৃতদেহের সংজ্ঞাশূন্যতা ও নিম্নোন্নত ভাব ফলাইতে পারেন, তিনিই চিত্রশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইবার উপযুক্ত। যিনি জলের তরঙ্গ, অগ্নির শিখা, ধূম, পতাকাযুক্ত আকাশ প্রভৃতি বায়ুর গতির সহিত অঙ্কিত করিতে পারেন, তিনিই চিত্রবিৎ। সুতরাং চিত্রজ্ঞকে এমন ভাবে তুলিকা-পরিচালনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার চিত্র দেখিয়া লোকে যেন সত্য সত্যই বুঝিতে পারে যে, বায়ুবেগে অগ্নিশিখা ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে; বায়ু ধূমরাশিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে; বায়ুর মৃদুমন্দ বেগে জলে তরঙ্গ উঠিয়াছে; এবং আকাশে পতাকা দুলিতেছে। (১)

কাব্যে যেমন নবরসের বিন্যাস হইয়া থাকে, চিত্রেও তেমনই শৃঙ্গারাদি-রসপ্রকটনের উপদেশ আছে। (২)

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

রায় পরিবার।

৩

গৌরীর জন্য বহু পাত্রের সন্ধান মিলিতে লাগিল। একে সে অসামান্যা সুন্দরী, তাহার পর বিধাত্রী দেবী কিছু না বলিলেও সকলে জানিত, তিনি প্রচুর যৌতুক দিবেন। গৌরীর মার কথায় এ কথা আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; অনেক সম্বন্ধের কথায় তিনি বলিতেন, ও সব হেঁজি পেঁজি লক্ষ্মীছাড়া আন কেন?

(১) ভস্মদাগ্নি শিখা ধূমং বৈজয়ন্ত্যাম্বরাদিকম্।
বায়ুস্থত্যা লিখেদ্যস্তু বিদ্বেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥
সুপ্তমূর্চ্ছেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতম্।
নিম্নোন্নত-বিভাগজ্ঞঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥

(২) শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞাশ্চ নব চিত্ররসাঃ স্মৃতাঃ।

আমি চাহি, সেরা সম্বন্ধ।' ঘটক-ঘটকীর মুখে সে কথা শাখাপল্লবিত হইয়া পাত্রের অভিভাবককে কন্যাভরু-প্রাপ্তির সম্ভাবনা জানাইয়া দিত। কিন্তু বিধাত্রী দেবীর বাছাইও তেমনই। জহুরী যেমন করিয়া জহর পরীক্ষা করে, যে নদীর বালুর সঙ্গে স্বর্ণকণা পাওয়া যায়, সন্ধানকারীরা যেমন করিয়া সে নদীর বালুকণা পরীক্ষা করে, তিনি তেমনই করিয়া সম্বন্ধ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার উপর তাঁহার অভিজ্ঞা ছিল, যাহারা টাকার কথা, প্রাওনার কথা উত্থাপিত করিবে, তাহাদের ঘরে মেয়ে দিবেন না। তিনি বলিতেন, 'আমরা কন্যা দান করিব—ছেলে কিনিব না। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বেণের ঘরে বাস করিতে পারিব না।' তাঁহার বাছাইয়ের কঠোরতায় ঘটক-ঘটকীরা বিরক্ত হইতে লাগিল। এক এক জন প্রগল্‌ভা ঘটকী মুখের উপর বলিতে লাগিল, 'তাই বল, মা, তোমার এখন নাতিনীর বিয়ে দিবার ইচ্ছা নাই।' বিধাত্রী দেবী হাসিয়া বলিতেন, 'ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, এ সামগ্রী ঘরে রাখিবার নহে। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমার সোনার কমল কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দিতে পারিব না।' অনেক ধনীর ঘরের সম্বন্ধ তাঁহার পছন্দ হইল না। পুত্রবধূ পিত্রালয়ের সকলে বিরক্ত হইয়া গৌরীর মাকে বলিলেন, 'না—বাছা, আমরা আর ইহার মধ্যে নাই। তোমার শাশুড়ীর বুঝ যে কি, তাহা আমরা বুঝি না। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি যেমন বুঝেন, তেমন আর কেহ বুঝে না।' পুত্রবধূ বিরক্তি গোপন করা দুঃসাধ্য, ক্রমে অনাবশ্যক মনে করিতে লাগিলেন। বিধাত্রী দেবী সে সব গ্রাহ্যই করিলেন না।

বহু সম্বন্ধের প্রস্তাব ত্যাগ করিবার পর একটী প্রস্তাবে বিধাত্রী দেবীর একটু আগ্রহ লক্ষিত হইল। পাত্ররা দুই ভাই, এক ভগিনী; ভগিনী জ্যেষ্ঠা, পাত্র সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। ভগিনীপতি হাইকোর্টের উকীল, ওকালতীতে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এটর্ণী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—আর এক বৎসর অবশিষ্ট আছে। পাত্র ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছে, এখনও ফল বাহির হয় নাই। ছেলে দুইটী 'হীরার টুকরা'; বিশেষ, পাত্র; সে সব পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংসারে কেবল মা। স্বামী ডাক্তার ছিলেন, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যশের মন্দিরের সোপানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই বিধবা পুত্রদ্বয়কে 'মানুষ করিয়াছেন'। গৌরীর মা ঘটকীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলে দেখিতে কেমন?' ঘটকী বলিল, 'বাছা—ছেলে কার্ত্তিক; তবে যদি তোমার মেয়ের বর্ণের মত অত শুন্দর

নহে।' গৌরীর মা বলিলেন, 'কেন—আমি ত বলিয়াই দিয়াছি, আমি সেরা সম্বন্ধ চাই।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'পুরুষের রূপ বিচার, তবে কুরূপ না হয়।' ঘটকী বলিল, 'সে ত মা, তোমরা দেখিয়াই লইবে। ঘটকীর কথায় ত আর কাজ করিবে না।' গৌরীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পয়সার কেমন?' ঘটকী কবুল জবাব দিল, 'সে ছেলের মা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে—আমার থাকিবার মধ্যে দুই ছেলে, আর মাথা গুঁজিবার বাড়ীটুকু। ছেলেরা বিবাহ করিতেই চাহে না; বলে—'গরীবের ঘরে কে মেয়ে দিবে?' আমি বলি, 'আমি গরীবের মেয়েই আনিব। কিন্তু আমি আর পারি না; বধূদের হাতে সংসার সঁপিয়া দুই দণ্ড ভগবানের নাম করিবার অবসর করিয়া লও।' তাই অনেক বলায় ছেলেরা স্বীকার হইয়াছে। দুই ছেলের বিবাহ এক সঙ্গে হইবে—বড়র ঠিক হইয়াছে। সে মেয়ের বাপও বড়মানুষ; ঐ ছেলে দেখিয়া গুঁজিয়াছেন। এখন সব কথাই ভাঙ্গিয়া বলিলাম। তোমরা যেমন ভাল বুঝিবে, তেমনই কাজ করিবে।'

গৌরীর মা বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, 'এই সম্বন্ধ!' ঘটকী বলিল, 'হাঁ, মা, এই সম্বন্ধ। আমরা ঘটক-ঘটকীরা একটু বাড়াইয়াই বলি। কিন্তু ছেলের মা আমাকে বলিয়া দিয়াছে—"ঘটক ঠাকরুণ, আমার যাহা নাই, তাহা আছে বলিয়া আমি লোককে ঠকাইতে পারিব না। আমি যেমন বলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনই বলিবে।" বিশেষ, তোমাদের এ সম্বন্ধ, তাহারাও পছন্দ করিবে কি না, জানি না।' যাহার সম্বলের মধ্যে দুই ছেলে, আর একখানা বাড়ী, সে সম্বন্ধ পছন্দ করিবে কি না সন্দেহ! আহত অভিমানে গৌরীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন—আমাদের অপরাধ?' ঘটকী বলিল, 'অপরাধের কথা নহে, মা; তাহারা বলে, 'বড়মানুষে'র ঘরে কাজ করিব? সমানে সমানে নহিলে কুটুম্ব কুটুম্বিতায় সুখ হয় না। তা' বড়রও 'বড়মানুষে'র ঘরেই সম্বন্ধ পাকা হইল।'

বধূর ব্যবহারে বিধাত্রী দেবী একটু বিস্মিত হইলেন। মানুষ টাকায় এত গর্ব্ব করে কেন? বিশেষ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৌমা টাকাকেই এত বড় করেন কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন, 'টাকার কথা তুলিতে নাই। কথায় বলে, 'স্ত্রীভাগ্যে ধন।' আমার দিদিমণির কপালে টাকার অভাব হইবে না। পুরুষ মানুষের টাকা উপার্জ্জন করিতে কতক্ষণ? মানুষ টাকা করে—টাকা কখনও মানুষ করিতে পারে না। সম্বন্ধের কাগজ

আনিয়াছ কি?' 'এই যে, বাছা'—বলিয়া ঘটকী অঞ্চলে বদ্ধ 'কমলাকান্তের দপ্তর' লইতে তিনখানা কাগজ লইয়া বলিল, 'দেখ না, কোনখানা।' গৌরীর মা প্রথমখানার নাম পড়িতেই ঘটকী বলিল, 'ওখানা নহে—ও বৈদ্যদের।' তিনি দ্বিতীয়খানা লইয়া পড়িলেন—'পাত্রের নাম—শ্রীমান সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; পাত্র এম্ এ. পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান—' ঘটকী বলিল, 'হাঁ—ঐখানা।' বিধাত্রী দেবী এক জন দাসীকে সেখানা দিয়া বলিলেন, 'এইখানা সরকার মহাশয়কে দিয়া নকল করাইয়া আন।' পুত্রবধূ এ সম্বন্ধে শাশুড়ীর মত দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না—এখনও সময় আছে।

ঘটকী চলিয়া যাইবার পর বিধাত্রী দেবী এক জন চাকরকে বলিলেন, 'দেখিয়া আয়, দেওয়ানজী মহাশয় এক্‌বার আসিতে পারেন কি না।' ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দেওয়ানজী আসিয়াছেন। দেওয়ানজী বৃদ্ধ হইয়াছেন—আর কাজ করিতে পারেন না; কিন্তু বিধাত্রী দেবী তাঁহাকে কাজ ছাড়িতে দেন নাই। তিনি অনেক সময় আপনার বাড়ীতেই থাকেন—পূর্ণ বেতন পাইবেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে আনান হয়। কেবল যে কয় মাস বিধাত্রী দেবী কলিকাতায় থাকেন, সে কয় মাস দেওয়ানজীও কলিকাতায় থাকেন—শরীর ভাল থাকে, নিত্য গঙ্গাস্নানও হয়।

বিধাত্রী দেবীর আদেশে ভৃত্য সম্বন্ধের কাগজখানা দেওয়ানজীকে দিল। বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'দিদিমণির জন্য এই একটা সম্বন্ধ আসিয়াছে, ইহার সন্ধান আপনাকেই লইতে হইবে।' ঘটকীর বর্ণিত সব বিবরণ তিনি দেওয়ানজীকে জানাইলেন। দেওয়ানজী পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষেট হইতে চশমা বাহির করিয়া চক্ষুষ্মান হইলেন, এবং কাগজের লেখা পাঠ করিয়া বলিলেন, 'আমার বোধ হয় একটা ঠিকানা করিতে পারিব। পাত্রের ভগিনীপতিকে আমি জানি। সুন্দরগঞ্জের চরের মোকর্দ্দমায় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সঙ্গে ইনি আমাদের 'জুনিয়র' উকীল ছিলেন। আমি তাঁহাকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়াছিলাম—তিনি দাস বাবুকে আর ব্যারিষ্টার 'সাহেব'কে বুঝান। খুব ধারাল উকীল। বলেন ত তাঁহার কাছেই যাই।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'আমি ত্রীলোক—আমি কি ও সব জানি। যাহা করিতে হয়, আপনি করিবেন।' 'আজ্ঞা মা, তাহাই হইবে। ক্ষেত্রনাথকেও সঙ্গে লইয়া যাইব।' বলিয়া দেওয়ানজী বিদায় লইলেন। ক্ষেত্রনাথই এখন দেওয়ানের কাজ করেন;

তিনি দেওয়ানজীর অধীনে কাজ করিয়া কাজ শিখিয়াছেন, তাহারই সাহেব গড়া।'

সেই দিনই সন্ধ্যার পর বিধাত্রী দেবী সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া উঠিলে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দেওয়ানজী মহাশয় একবার দেখা করিবেন। তিনি সন্ধ্যা আসিয়া আসিবেন।

দেওয়ানজী আসিয়া বলিলেন, 'মার অনুষ্ঠে ঘর আনা কাজ হাসিল করিয়া আসিয়াছি।' বিধাত্রী দেবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, উকীল বাবুর বাড়ীতে তিনি পাত্রটিকেও দেখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আলাপও করিয়াছেন। বিধাত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলে দেখিতে কেমন?' দেওয়ানজী বলিলেন, 'ছোট মাঠাকুরাণীর উপযুক্ত, রূপে গুণে এক—তবে হাজারে এক।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'কিন্তু আমি যে শুনিয়াছি, বর্ণ আমার দিদিমণির বর্ণের সমান নহে।' দেওয়ানজী বলিলেন, 'আমার বুড়া মানুষের চোখ, সব সময় প্রভেদ আর বুঝিতে পারি না, ততটা ঠাহর হয় না। তবে বোধ হয়, মার আমার বর্ণ দুধের কেনায় গোলাপের আভা, পাত্রের বর্ণ সোনার আভা। তবে পুরুষ মানুষের বর্ণ যতই কেন পরিষ্কার হউক না—মায় মত সকলের মেয়ের বর্ণের মত ফর্সা না।' বিধাত্রী দেবী দেওয়ানজীর প্রথম কথায় মনে মনে একটু হাসিলেন—বুড়ার দৃষ্টিতে অতিরিক্ত প্রত্যয় না থাকিলে তিনি তাহার উপর নির্ভর করিতেন না, বুড়ার ঠাহরের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। দেওয়ানজী কর্তার আদেশে বর্ষাধিককাল মেয়ে বাছাই করিয়া পুত্রবধূর নির্বাচন করিয়াছিলেন—যার সব সন্ধান লইয়া তিনি তখনই বলিতেছিলেন—'কিন্তু গোলাপেও কাঁটা থাকে, তবে মানুষের প্রকৃতি শিক্ষার বশ।'

বিধাত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলের কথা কি বলেন?' দেওয়ানজী উত্তর দিলেন, 'মনে হইল 'মানুষ' হইবে।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'তবে সম্বন্ধ করুন।'

দেওয়ানজী সম্বন্ধ লইয়া সম্বন্ধ পছন্দ করিলেন। কথাবার্তা অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষে বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'গৌরীর বিবাহ তিনি নিজে ঘর-সংসার না দেখিয়া দিতে পারিবেন না।' দেওয়ানজী তাহাও ব্যবস্থা করিলেন। বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া গৌরীর ভাবী ঘর দেখিতে গেলেন। সম্বন্ধটা যে তাঁহার মনের মত হয় নাই, সেটা আর একবার

জানাইয়া দিবার জন্য গৌরীর মা বলিলেন, 'তা মা, আপনি দেখিয়াই যাহা হয় করুন।' কিন্তু শাশুড়ীর কথা ও আপনার কৌতূহল তিনি এড়াইতে পারিলেন না।

বিধাত্রী দেবী পাকা গৃহিণীর মত বাড়ীর সাজসজ্জা হইতে পাত্রের মাতার কথাবার্ত্তা সব লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ় হইল—তিনি গৌরীর উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছেন। পাত্রের মাতা বলিলেন, 'মা, আপনি সব দেখিলেন। ধনীর মেয়ে ঘরে আনিতে আমার যেমন সঙ্কোচ হয়—গরীবের ঘরে মেয়ে দিতে আপনারও অবশ্য তেমনই সঙ্কোচ হইবে। আমি অনেক ভাবিয়া, মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তবে সাহস পাইয়াছি। আমি কোনও কথা গোপন করিতে চাহি না। আপনি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া যে ইচ্ছা উত্তর দিবেন।'

পাত্রের মাতার এই স্পষ্টোক্তি বিধাত্রী দেবীর বড় মিষ্ট বোধ হইল। গৌরীর মা কিন্তু মনে করিলেন, অতটা বিনয় কেবল তাঁহার শাশুড়ীর মন ভুলাইবার জন্য। বড়মানুষের ঘরে কাজ করিতে সঙ্কোচ! বলে, 'মেধো খাসি?—না, হাড় মুখে বসে আছিস'।

ইহার পর বিবাহের আয়োজনের পর্ব্ব পড়িল। কলিকাতায় বিবাহ হইবে কিন্তু উৎসবের আনন্দ হইতে বিধাত্রী দেবী গ্রামের লোককে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। সুতরাং বিবাহের পর তিনি নাতিনী নাতজামাই লইয়া গ্রামে যাইবেন; উৎসব তথায় হইবে; দেওয়ানজী দপ্তর হইতে পুরাতন ফর্দ্দ বাহির করিয়া তাহার কালোচিত পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; গহনার ফর্দ্দের বিচার হইতে লাগিল; কাপড়ের নমুনা দেখা চলিতে লাগিল, ইত্যাদি।

যখন আশীর্ব্বাদের দিন দেখিবার জন্য পুরোহিত ঠাকুরকে বলা হইল, তখন এক দিন বর্ষীয়সী তাঁহার খাস চাকরকে বলিলেন, 'আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই: ছেলের মা, গৃহিণীকে 'ওগো' করিয়াছে, পাকা কথা ছেলে এখন গড়াগড়ি যায়—পয়সা নহিলে কিছুই হয় না। ঐ রমার মাইয়ের ও কেন্দ্র কেন্দ্র হবে।' সেই দিন দাসী দেওয়ানজী মহাশয়কে জানাইল, 'বড়মাকরাণী বলিলেন, আপনি রমাগৌরীর মঙ্গলই দেখেন। গৌরীর এ সম্বন্ধ কি আনন্দ মত হইল?' দেওয়ানজী কথাটা শুনিয়া বিচলিত ও লজ্জিত হইলেন। পুরুষের সঙ্গে তাঁহার মতভেদের কথা বিধাত্রী দেবী এমনই বলিয়াছিলেন (তিনি আরও বলিতেন, সময় হেলিলে সকলেই হাসে

তোরা আর ছাড়াও আনিবার নহে) যে, দেওয়ানজী মুখোপাধ্যায় তাহার আভাস পাইলেন। আজ এই কথায় তিনি একটি পরিচয় পাইলেন— মুখে যে সংসারের অনাসক্তির বিষ প্রকাশ করিয়াছে? তিনি সেই দিনই বিধাত্রী দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়ে ত স্থির হইল। কিন্তু একটা কথা—বড়ঠাকুরাণী এ সম্বন্ধ সম্বন্ধে কি বলেন?' দেওয়ানজীর প্রশ্ন শুনিয়াই বিধাত্রী দেবী বুঝিলেন, কথাটা আর গোপন নাই। তিনি বলিলেন, 'বধূমাতা 'ছেলে মানুষ', তিনি আবার কেন বলুন না, আপনি কি বলেন—টাকা দেখিব, না মানুষ দেখিব? দাঁড়ি পাল্লার কোন্ দিক ভারি?' দেওয়ানজী উত্তর করিলেন, 'আমরা গরীব লোক, আমাদের টাকার দিকটাই ভারী দেখিবার কথা, কিন্তু আমরাও মানুষকে টাকার উপর স্থান দিয়া থাকি; বিষয়বুদ্ধির পরিচয় আরাতেই।' সে কথা ঠিক হইল। কিন্তু দেওয়ানজীর মনে বেদনার অবশেষটুকু রহিয়া গেল। যে সংসারের সেবায় তিনি জীবন কাটাইয়াছেন—যাহার কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করিতে পারেন, সে সংসারে কি শেষে অশান্তি প্রবেশ করিল? গৌরীর মার সম্বন্ধে তিনি বহু দিন পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি মনে মনে দেবতাকে ডাকিলেন—মা, সর্ব্বমঙ্গলা—মঙ্গল কর।

আশীর্ব্বাদের দিন সুশীলার প্রকৃতির পরিচয় জানা গেল, সে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছে। বিধাত্রী দেবীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি বলিলেন, 'দিদিমণির আমার প্রথম কেমন?'

আশীর্ব্বাদের সময় গৌরীর মাতুলেরা আসিলেন, গৌরীর মার পিতৃকুলের সম্পর্কে আরও অনেকে—তাহার মাসীরা, দিদিমা প্রভৃতি আসিলেন। সম্বন্ধ যে গৌরীর মাতার মনের মত হয় নাই, তাহা বুঝিয়া তাঁহার এক জ্যেঠাইমা (তিনি সর্ব্বদাই গৌরীর মার মন রাখিতে চেষ্টা করিতেন; কারণ, 'দশ পুত্র সম কন্যা—যদি পাত্রবিশেষে পড়ে') তাঁহাকে বলিলেন, 'তা মা, তুমি কথা কহিলে না কেন?' এত আর যে সে কথা নহে—মেয়ের বিবাহ।' গৌরীর মা উত্তর দিলেন, 'শাশুড়ী সব করেন, এখন আমি এক কথা বলিলে বলিবেন, তাঁহার অমান্য করা হইল।' জ্যেঠাইমা গৌরীর মার মাতাকে বলিলেন, 'মন্দ মেয়ে বটে গর্ভে ধরিয়াছিলে। সহ্য গুণে যেন মা বসুন্ধরা! কিন্তু তুমি যদি 'না' বলিতে, তবে তোমার অমতে কি কেহ তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে পারিত?' গৌরীর দিদিমা বলিলেন, 'কিন্তু বেহাইনও অনেক ভাবিয়

কাজ করিতেছেন।' মার কথা গৌরীর মার ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, 'ভগবান কি আর আমার কোনও কথা বলিবার মুখ রাখিয়াছেন?' জোঠাইমা অঞ্চলে শুষ্ক চক্ষু মুছিলেন—তাহার পর জোর করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'সবই আমাদের কপাল! তবে বাঁচিয়া থাকুক জোমায়ের বন্ধ, আবার ঘরে-ফুলে সংসার হইবে। সংসার ত তোমারই।'

এ দিকে গৌরীর বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল—কলিকাতায় ও গ্রামে সব উদ্যোগের সংবাদ বিধাত্রী দেবী রাখিতে লাগিলেন, গৌরীর বিবাহে যেন কোনও বিষয়ে কোথাও অসম্পূর্ণতা না হয়। বিবাহের সব ব্যবস্থায় তিনি গৃহিণীপনার ও কর্মতৎপরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

৪

গৌরীর বিবাহের পর দিন 'বরকনে-বিদায়' হইয়া গেল।

বিধাত্রী দেবী এতক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। উৎসবের আনন্দের মধ্যে তাঁহার পুষ্ট বুকের মধ্যে যে ব্যথা মুহূর্তে মুহূর্তে প্রবলতর হইয়াছিল, তিনি যেন তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। স্মৃতি কেবলই তাঁহার শোকক্ষতে তীব্র নিক্ষেপ করিতেছিল। শেষে যখন বর কন্যা আশীর্ব্বাদের সময় সুশীলের কোলে গৌরীর হাত দিয়া তাঁহাকেই বলিতে হইল—'এত দিন গৌরী ইহাদের ছিল, আজ তোমাকে দিলাম'—তখন তাঁহার মনে হইল, তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, আর স্থির থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার বুকের মধ্যে পুত্রহারা জননীর শোক-বেদনা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। আজ কোথায় সে—তাঁহার বক্ষের রক্ত—স্নেহের সম্বল, যে তাঁহার কন্যাকে জামাতার হস্তে সমর্পিত করিবে? সে কোথায়? আর কোথায় তিনি—তাহার শোকবেদনঙ্কিত জননী! হায় দেবতা, এ কি তোমার বিধান! তবুও তিনি প্রবল বলে আপনাকে স্থির রাখিয়া, যেন যন্ত্রচালিতবৎ সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু চারি দিকের লোক জন, কাজ—সে সব যেন তিনি আর লক্ষ্য করিতে পারিতেছিলেন না, অশ্রু যেমন তাঁহার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিতেছিল, বেদনা তেমনই তাঁহার অনুভূতি অস্পষ্ট করিতেছিল। 'বরকনে বিদায়' হইয়া গেলে তিনি আপনার কক্ষে যাইয়া বিছানায় ভূমিতলে পড়িলেন—মনের শক্তি ও শরীরের শক্তি এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা—পুঞ্জীভূত রোদন একটিমাত্র

আর্ত্তনাদে আত্মপ্রকাশ করিল—'বাবা!' তিনি আর তাহার বিস্রংশ রুদ্ধ করিতে পারিলেন না।

তখন পার্শ্বের কক্ষে গৌরীর মা চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে রমাকে গৌরীর বাড়ী পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। রমার সাজসজ্জা তিনি পূর্ব্বেই বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌরী পঁহুছিলে তাহার কেমন আদর হয়, রমা তাহা দেখিয়া আসিবে। তিনি রমাকে সেই সব কথা বলিতেছিলেন। এমন সময় পার্শ্বের ঘরের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। গৌরীর মার জ্যেঠাইমা বলিলেন, 'আজ শুভ দিন, আজ না কাঁদিলে হইত না?' গৌরীর দিদিমা বলিলেন, 'আহা, আজ শোক যে নূতন হইয়া উঠে।' বিধবা দুহিতার জননী তিনি—তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

রমা দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।—যে বেদনায় পিতামহীর মুখে যাতনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, উৎসবানন্দের মধ্যে আর কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু রমা লক্ষ্য করিয়াছিল। সে সেই বেদনার এমনই বিকাশের জন্যই উৎকর্ণ হইয়া ছিল। পিতামহীর আর্ত্তনাদ তাহার শ্রবণগোচর হইবামাত্র সে দিদির বাড়ী যাইবার জন্য সাজ উপহার ভুলিয়া গেল—ছুটিয়া যাইয়া ঠাকুরমার কাছে শুইয়া পড়িয়া হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিধাত্রী দেবী তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তিনি পুত্রহারা—সে পিতৃহারা; কাহার দুর্ভাগ্য অধিক—কাহার বেদনা অধিক? রমাকে বুকের কাছে লইয়া তাঁহার কত কথা মনে হইতে লাগিল। এক দিন তাহার পিতাও এতটুকুই ছিল—এমনই তাঁহার ছায়ায় এত থাকিত, তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। এবার মনে হইল, বুঝি এ সেই—তিনি তাহাকেই বক্ষে ধরিয়া আছেন—এক দিনের, এত বৎসরের এই শোক, এই ব্যথা, এ সব দুঃস্বপ্ন—সত্য নহে। কিন্তু তখনই সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল—বুকে যে চিতানল, তাহা ত নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তবে এও সেই—তাঁহার সেই অমূল্য নিধি—সেই স্নেহের সর্ব্বস্ব, সেই স্নেহবন্ধনেই বদ্ধ আছে। তিনি স্নেহের আবেগে রমাকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন—যেন সে শোকের ক্ষতে স্নিগ্ধ তেষজ।

বেদনার আবেগোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইবার পর বিধাত্রী দেবী উঠিয়া বসিলেন—রমার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনিই উদ্যোগ করিয়া তাহাকে দিদির বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন, এবং সে ফিরিয়া আসিলে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সন্ধ্যার পর দেওয়ানজী প্রভৃতিকে ডাকাইয়া তিনি ফুলশয্যার তত্ত্বের ফর্দ্দ ঠিক করিলেন—কত জন লোক যাইবে, কিরূপ কি ব্যবস্থা হইবে, সব স্থির করিলেন, দ্রব্যাদি যাহাতে যথাকালে পঁহুছে, তাহার জন্য উপদেশ দিলেন।

পর দিন তত্ত্ব পাঠাইয়া সরকার প্রভৃতির প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া রহিলেন, এবং তাহারা ফিরিয়া যখন জানাইল, 'ঝুটুম্ বাড়ী' সকলেই তত্ত্বের প্রশংসা করিয়াছে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

তাহার পর 'বর কনে' গ্রামে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা। তিনি পুত্রবধূকে বলিলেন, 'বৌমা, আমি আগে যাই—সব গোছগাছ করিয়া রাখি, তুমি মেয়ে জামাই লইয়া যাইবে; বরং বেহাইন ঠাকরুণ আমার সঙ্গে চলুন, দুই জনে পরামর্শ করিয়া কাজ করিব।' গৌরীর মা এ প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দিলেন; কেন না, ইহাতে তিনি শাশুড়ীর আওতাছাড়া হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিবার অবসর পাইবেন। যাইবার সময় তিনি নব বিষয়ের বন্দোবস্ত এমন ভাবে করিয়া গেলেন যে, পুত্রবধূর কর্ত্তৃত্ব-প্রকাশের কোন অবসর রহিল না। শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৌমা, রমা বাবু আমার সঙ্গে যাইবেন, না তোমার সঙ্গে যাইবেন?' বৌমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, 'গৃহিণী কি আর কর্ত্তাকে ছাড়িয়া যাইবেন?' বিধাত্রী দেবীও হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ—বাড়ীর কর্ত্তার কি আগে বাড়ী না গেলে ভাল দেখায়! বিশেষ আমার এই শেষ কায, কর্ত্তা গৃহিণী পরামর্শ করিয়া করাই ভাল; তবে কি না কর্ত্তা এবার মোটমাথ পড়িলেন।' বেহাইন বলিলেন, 'সে ভয় নাই, বেহাইন; দুই দিনে তোমার কর্ত্তাকে পর করে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু শেষ কায—রমার বিবাহ নহিলে হইবে না।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'সে আশীর্ব্বাদ আর করিও না, বেহাইন; এইবার আমার ছুটী।'

গ্রামে উৎসবের স্রোত বহিল—কোনও দিকে কোনরূপ ত্রুটী হইল না। কিন্তু সেই উৎসবের আনন্দালোকের মধ্যে ভবিষ্যতের দিকে যে ছায়া পড়িল, তাহা বিধাত্রী দেবীও লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। লক্ষ্য করিল—কেবল মৃণ্ময়ী। বিধাত্রী দেবীর ব্যবহারে আর তাহার শাশুড়ীর ব্যবহারে কি একটু প্রভেদ লক্ষ্য করিত। তাহার প্রতি বিধাত্রী দেবীর স্নেহ যেন শত ধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিল—কিন্তু সকল ব্যবহারে আনা আনা [illegible]

করিত। শাশুড়ীর ব্যবহারে সে তাহা পাইত না। সে মনে করিত, তাহা হয় অতিসংযমের ফল, নহে ত স্নেহের অনুদারতার পরিচায়ক। সে তাহা অতিসংযমের ফল বলিয়াই ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিত—শাশুড়ীর কর্তৃত্ব চালিত সংসারে গৌরীর মা হয় ত জামাতার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে একটু দ্বিধা অনুভব করেন। কিন্তু গৌরীর মার প্রগল্‌ভা জ্যেঠাইমার অতর্কিত কথায় এক দিন তাহার সে ভাবটুকু দূর হইয়া গেল। তিনি কথায় কথায় গৌরীর মাকে বলিলেন, 'তা, মা, তুমি মনে দুঃখ করিও না—রূপে তোমার গৌরীর মত না হউক, জামাই দেবিতে শুনিতে এক জন, আর পয়সা? সে বেহাইন ঠিকই বলিয়াছেন, মেয়ের কপালে থাকে, টাকার অভাব হইবে না।' সুশীল সে কথা শুনিল। কোনও কোনও কথা জলের উপর জলবিন্দুর মত পড়ে,—একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, তাহা অচিরে মিলাইয়া যায়; আবার কোনও কোনও কথা শীশার গুলির মত পড়ে—জলে ডুবিয়া যায় বটে, কিন্তু নষ্ট হয় না, ঘটনার জাল বুনিয়া বুনিয়া তাহা জড়াইয়া তুলিয়া জীবনের কূলে ফেলে। এই কথাও সুশীল ভুলিল না—তাহার শাশুড়ী রূপে ও ধনে যেমন জামাতা চাহিয়াছিলেন, সে তেমন নহে। তবে কি সে বিবাহে ভুল করিল? প্রথমেই সে ধনীর দুহিতা বিবাহ করিতে ভয় পাইয়াছিল। তাহার আশঙ্কাই কি তবে সত্য হইল? সে রাত্রিতে সে ঘুমাইতে পারিল না। তাহার পার্শ্বে নিদ্রিতা সুন্দরী পত্নীর মুখে চাহিয়া ভাবিল—নারীর মনের তল যে কোথায় মনেও প্রতিবিম্বিত হইবে না, তাহাকে কে জানিবে কি করিয়া? নবোন্মেষিত যৌবনে প্রথম প্রণয়বিকাশের কালে এমন সন্দেহ অনেক বন্ধনার কারণ। বসন্তের বাতাসে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন যদি সহসা তুষারপাতে ঘনসংশয়তা বিলীন হয়, তবে সে বড় দুঃখের। বিনিদ্র সুশীল বুঝিল, যত দিন গৌরী তাহার প্রেমে এই সন্দেহ-চিহ্ন ধৌত করিয়া দিতে না পারিবে, তত দিন তাহাকে এই বেদনাচিহ্ন বহন করিতে হইবে। জীবনে সে চিহ্ন অপনীত হইবে কি? সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। যখন শিক্ষিত যুবক বিবাহিত জীবনে দারিদ্র্য গ্রহণ করে, তখন সে সুখশান্তিময় সংসার-রচনার আশায় সে দারিদ্র্য গ্রহণ করিতে সাহস করে। জীবনে সুখ, শান্তি, সম্মান লাভ করিয়া ধন্য হইবার আশা করে। তাহার কল্পনা তাহার জন্য নন্দনের রচনা করে; তাহার পর স্বামি-স্ত্রীর প্রেমসঞ্জাত শক্তি সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত করিতে পারে। প্রেম বিনাই সেতুর মূল উদ্ভাবন হৃদয় যন্ত্র করে। কিন্তু যে স্থলে সেই

সেতুর কোনও অংশে—কোনও একটা কীলককে মরিচা ধরিবার অবকাশ থাকে, সে স্থলে সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতে পারে। অতর্কিতভাবে শ্রুত এই কথাটি সেইরূপ সর্ব্বনাশের অবকাশ প্রদান করিবে কি না, কে বলিতে পারে? কিন্তু সুশীলের সে সন্দেহ সুশীল ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিল না। সে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু প্রবোধে শান্ত করিতে পারিল না।

সুশীল কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিধাত্রী দেবীর মনে হইল, বোধ হয়, তাহার শরীর ভাল নাই। তিনিও তাহাকে আরও দিন থাকিবার জন্য জিদ করিলেন না। দুই দিনের মধ্যে সে ফিরিয়া গেল। হৃদয়ে প্রেমানুভূতির আনন্দের সঙ্গে সন্দেহের বেদনা বহিয়া গেল।

কলিকাতায় ফিরিয়াই বিধাত্রী দেবী সুশীলের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'সুশীল উকীল হইল—উপার্জ্জন এক দিনে হয় না, বিশেষ তাহাকে হাইকোর্টের একটা পরীক্ষা দিতে হইবে; কিন্তু খরচ বাড়িল; এখন সংসারের যেমন সুশীলের মারও তেমনই। তিনি সুশীলকে মাসে এক শত টাকা করিয়া দিবেন।' সুশীলের মা সহসা প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারিলেন না; বলিলেন, 'মা, টাকাকড়ির কথা—আমি ছেলেদের জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলিতে পারি না। তাহারা যাহা বলিবে, তাহাই হইবে। এখন তাহারা বড় হইয়াছে।'

সুশীলের মা যখন পুত্রদ্বয়কে এই প্রস্তাব জানাইলেন, তখন সুশীলের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। এই প্রস্তাবে তাহার প্রতি অনুকম্পা এবং তাহার শ্বশুরবাড়ীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা নাই ত? সে বলিল, 'মা, পরের চাকরীর উপর নির্ভর করিয়া কাজ নাই—আপনারা যাহা পাই, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।' তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাহার মাতা বলিলেন, 'তোর ইচ্ছা না হয়—লইয়া কাজ নাই। কাল তুই ত নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবি, সেই সময় তোর দিদিমা-ওঁদিকে বলিয়া আসিস। আমি বলিতে পারিব না—তাঁহার কথা এমন মিষ্ট যে, 'না' বলিতে পারা যায় না।'

পর দিন সুশীল শ্বশুর গৃহে যাইলে যখন নিকটে আর কেহ ছিল না, তখন বিধাত্রী দেবী তাহার নিকট সে প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলে তিনি স্নেহের দ্বারা তাহার যুক্তি খণ্ডিত এবং আপত্তি নিরস্ত করিলেন, এবং শেষে বলিলেন, 'তবুও যদি তোমার কোনও আপত্তি থাকে তুমি ও টাকা

গৌরীর মেয়ের বিবাহে গৌরীর বুড়া মিলুরমাকে যৌতুক বলিয়া দিও; কিন্তু, মা, আমার কথা রাখ—আমার মনে কষ্ট দিও না।' তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে সুধীর তাহার প্রতি দরদ বা আপনার মনগর্ব্ববিকাশচেষ্টার কোনও পরিচয়ই পাইল না। গৃহে ফিরিয়া সে তাহার মাতার সহিত সেই কথার আলোচনাকালে বলিল, 'মা, আমিও হারিয়া আসিলাম। কিন্তু ভাল হইল না।'

এই নাসহারার ব্যবস্থা বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূকে জানাইলে তিনি বলিলেন, 'এক শত টাকার কি হইবে?' তাঁহার কথায় যে খোঁচাটুকু ছিল, বিধাত্রী দেবী তাহা বুঝিলেন—যে ঘরে কাজ করা হইয়াছে, তাহাকে এক শত টাকা দিয়া গৌরীর উপযুক্ত খুড়শ্বশুড়ী করা অসঙ্গত। অথচ রমাকে ও গৌরীকে তিনি কোনও দিন বিলাসে-ললিতপালিত করেন নাই, তিনি বিলাসের বিরোধী ছিলেন। যাহা হউক, বৌমার কথার প্রচ্ছন্ন আঘাতটুকু তিনি গ্রহণ করিলেন না; কেবল ভবিষ্যতে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত-প্রকাশের অভিপ্রায়ে বলিলেন, 'দিবার দরকার হইলে সুযোগও পাওয়া যাইবে; এখন অধিক দিবার প্রস্তাব করিলে তাহারা মনে করিবে, আমরা—'বড়মানুষী' দেখাইতেছি!—তাহা হইলে তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইত না।' বৌমা কথাটার পিঠে জবাব দিলেন না; কিন্তু মনে মনে বলিলেন, 'তাহারা পাইবার আশাতেই এ সম্বন্ধ করিয়াছে।'

এই বিষয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে বিধাত্রী দেবীর মতান্তর ঘটিতে লাগিল। গৌরীর মা ঘরের প্রাণীটির মেয়ের খুড়শ্বশুড়ী ক'রে বড় করিবার কল্পনা করিলেন; বিধাত্রী দেবী সে কল্পনাকে মনে স্থান দান করিতে অসম্মত হইলেন। তাহাদিগের উভয়ের মতের প্রভেদ আরও প্রকাশ করিতে লাগিল। ছয় মাস পরে যখন গৌরী 'ঘর করিতে' গেল, তখনও তাহাই হইল। তাহার মা বলিলেন, মেয়ের সঙ্গে দুইখানি ঝি দিবেন। বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'এক জন মাত্র ঝি যাইবে—সেও স্থায়ী হইবে না; তাহার পর গৌরীর শাশুড়ী কিরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা দেখিয়া তবে তাহাকে স্থায়ী করা বা করার কথা বিচার করা যাইবে। কারণ, সেবেন স্বাচ্ছন্দ্যই দেখিতে হইবে—'বড়মানুষী' দেখাইয়া কুটুম্বের মনে সম্ভ্রম জন্মান বুদ্ধিমানের কাজ নহে।' অবশ্য বিধাত্রী দেবীর কথাই বহাল থাকিল; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ব্যাপার কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

কলিকাতায় গৌরীপুরের গৌরীদিগের এক বাটী ছিল। বিধাত্রী দেবী সে বাটী সর্ব্বদাই সুসংস্কৃত রাখিতেন; আত্মীয় কুটুম্ব যে কেহ চাহিত,

তাহাকেই দানের অনুমতি দিতেন। এবার বাড়ীর আবেষ্টন সংবাদ হইল। তাহার সব ভিনি কাশীবাসের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সম্পত্তির ও মনস্তাপের আর যাহাতে আর কোন ব্যবস্থা করিলেন যে, কেহ কিছু না করিতে না পারে। গৌরীপুরের সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার এবং শ্বশুরের ও স্বামীর ব্যবহারমাত্রে যাত্রাগুরের জমীদারীতে তাঁহার কর্তৃত্ব তিনি ত্যাগ করিলেন না; কেবল উইল করিলেন—তাঁহার মৃত্যুর পর সব রমানাথের।

দুর্গোৎসবের পর তিনি গ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। প্রজারা বলিল, এত দিনে আমরা মাতৃহীন হইলাম।'

দেওয়ানজী বলিলেন, 'এইবার আমায় ছুটীর দরখাস্ত মঞ্জুর করুন, মা!' বিধাত্রী দেবী উত্তর করিলেন, 'আমি আর সব বরখাস্তের মালিক নহি; এখন বৌমা সব দেখিবেন।' তবে দেওয়ানজী বুঝিলেন, প্রকারান্তরে তাঁহার ছুটীই হইল। কারণ, বুড়ার বুদ্ধি কাজে লাগাইবার যোগ্যতা বিধাত্রী দেবীরই ছিল, সকলের থাকে না।

কর্ম্মচারীরা বলিল, 'কি জানি—কি হয়!'

সম্পত্তির, সংসারের, দেব-সেবার, অতিথি-সেবার, রমার ও গৌরীর সব ব্যবস্থা বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূকে বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর বিশ্বনাথের চরণে আত্মনিবেদন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

আশ্রিতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে গেল। কাশীর মা প্রাচীনা হইয়াছিল, সে সঙ্গে গেল। সে না কি যাইবার সময় তাহার বহিনদিগকে বলিয়াছিল, বৌমার সঙ্গে মতান্তরের জন্যই গৃহিণী এত শীঘ্র কাশীবাসে চলিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কামরূপের ইতিহাসের একাংশ।

পৌরাণিক।

কোচজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সংবাদ কত দূর কি সংগ্রহ হইতে পারে, আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। স্মৃতির অতীত কাল হইতে একটী জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, পরশুরাম-ভয়ভীত এক দল পলায়িত ক্ষত্রিয় ভগবতীর শরণাপন্ন হইলে, দেবী তাহাদিগকে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা কোচে লুকাইয়া রাখেন। এই কোচে লুক্কায়িত আশ্রিতগণ উত্তরকালে 'কোচ' নামে অভিহিত হন।

কোচদেশ সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে :—

"কৌলাখ্যানে চ দেশে চ যোনিগর্ত্তসমীপতঃ।"—১০ পঃ ২।

অর্থাৎ, যোনিগর্ত্তের (কামাখ্যা) সন্নিধানে কোচ নামে দেশ আছে।

"অহং কোচবধূপুত্রে রমেশর ইতি স্থিতঃ।"—ইতি পীঠমালা।

অর্থাৎ, "আমি কোচবধূপুত্রে রমেশর নামে অবস্থিতি করিতেছি।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন :—

"শৃণু কৌন্তেয় রামস্য প্রভাবো যো যথা শ্রুতঃ।
মহর্ষীণাং কৃপয়তাং বিক্রমং তস্য তথা চ॥
ত্রিঃ সপ্তকৃত্বো রামেণ কোটীনাং ক্ষত্রিয়া হতাঃ।
উদ্ভূতা ক্ষত্রিয়কুলেষু যে ভূয়ো ভারতে হতাঃ॥"

অর্থাৎ, "হে কৌন্তেয়! আমি মহর্ষিগণের মুখে রামের জন্ম ও পরাক্রমের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি, সেই সমস্ত বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। সেই জামদগ্ন্য কোটী কোটী ক্ষত্রিয়কে সংহার করিয়াছিলেন, এবং সেই সমস্ত রাজবংশে যে সকল ক্ষত্রিয় পরে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সকল ক্ষত্রিয়ই ভারত-যুদ্ধে নিহত হইলেন।"

উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে :—

"সপ্তস্ত্রীষু ময়া গুপ্তাঃ স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়পুত্রবাঃ।
হৈহয়ানাং কুলে জাতাস্তে সংরক্ষন্তু মাং মুনে॥
সপ্তস্থ সৌদাসবায়ো বিদূরথসুতঃ প্রভো।
ঔর্ব্বঃ সংবর্দ্ধিতো বিপ্র তক্ষকস্য পর্ব্বতে।
তথানুকম্পমানেন যজ্ঞনাহগ্নিতেজসা।
পরাশরেণ ব্যাসাদঃ সৌদাসস্যাভিরক্ষিতঃ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি কুরুতে শূদ্রবত্তস্য স দ্বিজঃ।
সর্ব্বকর্ম্মেত্যভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ॥"—শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ, "ব্রহ্মণ্! কতকগুলি স্ত্রীতে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়সন্তানগণ, আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি হৈহয়-কুলজাত ক্ষত্রিয়াও জীবিত আছেন। পুরুবংশীয় বিদূরথ-পুত্র ঔর্ব্বান্ পর্ব্বতে ভৃগুগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সৌদাস রাজপুত্রকে অমিততেজা মহাযজ্ঞশালী পরাশর অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সংস্কারাদি দ্বারা দ্বিজাতির ন্যায় অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তিনি সর্ব্ব-কর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।"

"এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
একমেব যযৌ হন্তুং সর্ব্বানেবাতুরান্ নৃপান্॥
কেচিদ্দহনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশন্।
কেচিদ্বৈতালিকাঃ শূরাঃ ব্রাহ্মণত্বমুপাশ্রিতাঃ॥"

—ইতি স্কন্দপুরাণ, রেণুকা-মাহাত্ম্য।

অর্থাৎ, "পরশুরাম এইরূপে তীক্ষ্ণশর সন্ধানে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া, অন্যান্য কাতর ক্ষত্রিয়গণের নিধনসাধনার্থ, একাকী গমন করিয়াছিলেন। তখন কেহ ভয়ে নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন; কেহ বা ভয়ে পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন; আর কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

"মহানন্দিসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ।
উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ।
ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
একরাট্ স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি।"

—মৎস্য, বায়ু ও ভবিষ্যপুরাণ। *

অর্থাৎ, "শূদ্রাতে কলিকাংশজ মহানন্দিসুত সর্ব্বক্ষত্রান্তক মহাপদ্ম নৃপ উৎপন্ন হইবেন। সেই দিন অবধি শূদ্রবংশীয়গণ রাজা হইবেন। সেই মহাপদ্ম একরাট্ ও একচ্ছত্র হইবেন।"

"নন্দীসুতভয়াদ্ভীমে গৌড়দেশাৎ সমাগতঃ।
বর্দ্ধনস্য পঞ্চ পুত্রাঃ স্বগণৈর্বান্ধবৈঃ সহ।
রঙ্গপীঠং বিবিশুস্তে কালবিপ্রসঙ্গমাৎ।
ক্ষাত্রধর্ম্মাদপক্রান্তা রাজবংশীতি খ্যাতাঃ ভুবি॥"

—ভ্রামরীতন্ত্র, ২য় পটল।

অর্থাৎ, "বর্দ্ধনের পঞ্চ পুত্র স্বগণ ও বান্ধবগণসহ নন্দীর সুতের ভয়ে পৌণ্ড্র-দেশ হইতে ভীমে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রঙ্গপীঠে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া কালক্রমে বিপ্রদিগের অসঙ্গহেতু ক্ষাত্রধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় পৃথিবীতে 'ব্রাহ্ম-বংশী' এই নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।"

"জামদগ্ন্যভয়াদ্ভীতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বমেব যে।
ম্লেচ্ছছদ্মাস্যপাদায় জগদীশং শরণং গতাঃ॥ ৩০

* F. E. Pargiter's The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age, P. 25., শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, ৪৭ পৃঃ।

তে চেক্কবাচঃ সততমার্য্যবাচশ্চ সর্ব্বদা।
জহ্নীশং সেবমানাস্তে গোপায়ন্তি চ তং পুরম্।" ৩১
—ইতি কালিকাপুরাণ, ৭৭ অঃ।

অর্থাৎ, "পূর্ব্বে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয়, ম্লেচ্ছ-বেশ ধারণ করিয়া জহ্নীশের শরণাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ ও আর্য্য ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। জহ্নীশদেবের সেবা ও সেই শিবকে রক্ষা করিয়া কালযাপন করিতেছেন।"

উদ্ধৃত শাস্ত্রবচন দ্বারা হৈহয়াদি ও ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রহ্মশাপে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে;—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥—১০ অঃ, ৪৩।
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খসাঃ॥'—১০ অঃ, ৪৪।

অর্থাৎ, "পৌণ্ড্র, ওড্র ও দ্রবিড়াদিদেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ উপনয়নাদি সংস্কার ও যজন অধ্যয়নাদি ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥"—ইতি মনু ১০, ২২।

অর্থাৎ, "ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রাবিড় জাতি উৎপন্ন।" টীকাকার কুল্লুকভট্ট কহেন ইহারা এক জাতি, দেশভেদে নামভেদমাত্র।

"মুখবাহূরুপাজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"—ইতি মনু ১০, ৪৫।

অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে যাহারা ক্রিয়ালোপ হেতু বাহ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, উহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক, কিংবা আর্য্যভাষীই হউক, তাহাদিগকে দস্যু বলা যায়।"

"বিপাদ্ধরঃ সবর্ণাসু জনয়ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপতিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥"—ইতি মনু ১০, ৬১।

অর্থাৎ, "দ্বিজাতিগণ সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করেন, উপনয়ন সংস্কার না হইলে ঐ সন্তানদিগকে 'ব্রাত্য' বলা যায়।"

এতদ্দ্বারা সংস্কারহীন, ম্লেচ্ছভাষাভাষী, দ্রাবিড়াদি-দেশবাসী ও দস্যুজাতীয় ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা দ্বিজাতিগণ অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

কথিত আছে ;—

"পরশুরামভয়াৎ ক্ষত্রী সংকোচাৎ কোচ উচ্যতে।"

অর্থাৎ, পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয়েরা সঙ্কোচিত হইলে, সঙ্কোচ (লুক্কায়িত) হইতে 'কোচ' নামের উৎপত্তি।"

"কৌচাখ্যাবে চ দেশে চ যোনিগর্ভসমীপতঃ।
সাধ্বী সতী ব্রাহ্মিকা হি রেবতী বলবিক্রতা॥ ২
ম্লেচ্ছদেহোদ্ভবা যা তু যোগিনী সুন্দরী মতা।
* * * *
কালাৎ সা মাধবীদেবী মদ্দেহে লীনতাং গতা॥ ১৮
যথা পুত্রো ভৃঙ্গরাট তথা বিঘ্নসিংহঃ।
বিঘ্নসিংহোঽপি কল্পান্তে পুরাং সিদ্ধমবাপ্যতি॥" ২০

—যোগিনীতন্ত্র, ১৩ পঃ ২, ১৮, ১৯, ২০।

অর্থাৎ, "যোনিগর্ভের নিকট কৌচদেশে, ব্রাহ্মিকা সাধ্বী সতী বলবিক্রতা ম্লেচ্ছদেহোদ্ভবা রেবতী, যোগিনীসুন্দরী নামে উক্ত হইয়াছেন। সেই মাধবী দেবী কালবশে আমার দেহে লীন হইয়াছিলেন। ভৃঙ্গরাট আমার যেরূপ পুত্র, এই বিঘ্নসিংহও সেইরূপ জানিবে। বিঘ্নসিংহ ও (বিঘ্নসিংহ) কল্পান্তে মোক্ষ লাভ করিবে।"

উদ্ধৃত প্রমাণাদির সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হওয়ায় সর্ব্বত্র স্বল্পসংখ্যক ক্ষত্রিয় ও ম্লেচ্ছ ও শূদ্র ভাবাপন্ন ব্রাত্যক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিলেন। পরশুরাম-ভয়-ভীত বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের কাহারও গর্ভবতী মাতা ছদ্মবেশে, কাহারও পিতা লুক্কায়িতভাবে দিন কাটাইয়াছেন, এরূপ পরিগৃহীত জনশ্রুতির অভাব নাই। মহাভারতে লিখিত আছে ;—পরশুরাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের পত্নীগণ, ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মাইয়া ক্ষত্রিয়-বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন।* এমন অবস্থায় কোচজাতির জাতিতত্ত্বসম্বন্ধীয় জনশ্রুতি ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ, অগ্রাহ্য হইবার কোনও হেতু দেখা যায় না। মনু যে সব আচারহীন ক্ষত্রিয়ের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্রাবিড় ও কম্বোজ জাতির নাম আছে। জাতি-তত্ত্ববিদ্ কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, কোচজাতি দ্রাবিড়, মতান্তরে কম্বোজ জাতি হইতে উৎপন্ন। যোগিনীতন্ত্র আধুনিক বলিয়া অনেকে উহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কেবল আধুনিক হইলেই যে তাহা অবিশ্বাস করিতে

* আদিপর্ব্ব, ১০৩ অঃ।

হইতে, এরূপ যুক্তির সমর্থন করা যায় না। কালিকাপুরাণ ও ভাগীরীতন্ত্র কামরূপক্ষেত্রে ছদ্মবেশী এক দল ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। কেহ কেহ যোগিনীতন্ত্রের লিখিত 'সঙ্কোচ' ও 'কুবাচ' দুইটী পৃথক জাতি অনুমান করেন। উক্ত তন্ত্রে বিশ্বসিংহ সম্বন্ধে লিখিত আছে;—

"তস্যাপি বহবঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ।
কুবাচা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বে রাজানো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥"—১৩ পঃ, ১১।

অর্থাৎ, "তাহার (বিশ্ব সিংহের) পৃথিবীপালক বহু পুত্র উৎপন্ন হয়; কুবাচগণ সকলেই ধার্ম্মিক রাজা ও যুদ্ধপ্রিয় হইয়াছিল।"

"পূর্ব্ব ভাগে চ সৌমার: কুবাচঃ পশ্চিমে তথা।
দক্ষিণে যবনস্তদ্বদুত্তরে প্লব এব চ॥"—১৪ পঃ, ৭৯।

অর্থাৎ, "পূর্ব্বভাগে সৌমার, পশ্চিমে কুবাচ, দক্ষিণে যবন, উত্তরে প্লবগণ বাস করে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের "মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ, "মাংসচ্ছেদী ও তিবর জাতি হইতে কোচজাতির উৎপত্তি।" এই বচন উদ্ধৃত করিয়া কোচজাতির হীনাবস্থা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবরণ পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া, স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া স্বমতসমর্থনের প্রয়াস সমর্থনযোগ্য নহে। বিস্তারিত বিবরণ এইরূপ,—

"সবাঃ ক্ষত্রিয়বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্তু যোষিতঃ।
বভূব তীবরশ্চৈব পতিতো দ্বারদোষতঃ॥"

অর্থাৎ, "রাজপুত রমণীর গর্ভে ক্ষত্রবীর্য্যে তীবর জাতির উৎপত্তি সে দ্বার-দোষে পতিত।"

"মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

অর্থাৎ, "মাংসচ্ছেদীর গর্ভে তীবরের ঔরষে কোচ জাতির উৎপত্তি।"

"ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো দ্বারদোষতঃ।
সদ্যো বভূব চাণ্ডালঃ সর্ব্বাধমঃ সদাশুচিঃ॥
তীবরেণ চ চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকার ইতি স্মৃতঃ।
চর্ম্মকারাচ্চ চাণ্ডাল্যাং মাংসচ্ছেদী চ বভূব হ॥"

অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণকন্যা ও শূদ্রপুরুষযোগে অপবিত্র ও অধম চণ্ডালের সৃষ্টি। উহারা দ্বারদোষে পতিত। তীবর কর্ত্তৃক চাণ্ডালীতে চর্ম্মকার, এবং চর্ম্মকার হইতে চাণ্ডালীতে মাংসচ্ছেদীর উৎপত্তি।"

---

* ভারতী-পত্রিকার পঃ ১৫ আঃ ৪ সংখ্যা ২২১ পৃঃ। প্রবাসী পঃ ১৩১৬ ৬৬১ পৃঃ।

মতান্তরে,—

"কাপালী চর্ম্মকারাশ্চ কুবাচঃ সাবর স্তথা।

* * *

এতে বৈ তীবরাজ্জাতাঃ কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ"—জাতি-কৌমুদী।

অর্থাৎ, "তীবর পুরুষ ও ব্রাহ্মণকন্যায় কাপালী, চর্ম্মকার, কুবাচ ও সাবর জাতির উৎপত্তি।" উদ্ধৃত শাস্ত্রবচন দ্বারা কোচ জাতি হীন প্রতিপন্ন না হইয়া বরং আর্য্যবংশ (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) সম্ভূত বলিয়াই সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষকালে বহু জাতি হীন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোচ জাতির সম্বন্ধে উদ্ধৃত বচনাবলী প্রকারান্তরে তাহার সমর্থন করিতেছে। তীবর, চণ্ডাল, সংচ্ছেদী প্রভৃতি জাতির নামে নাসিকা-সঙ্কোচন কিছু কালের নিমিত্ত স্থগিত-রাখিয়া, ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় উক্তির সাহায্যে তাহাদের অপরাধ ও দণ্ডের ভীষণতা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। রাজপুত ও ক্ষত্রিয়ে মিলনে উৎপন্ন তীবর (তিওর) এখন অস্পৃশ্য জাতি। এই তীবরের ঔরসেই 'কুবাচ' বা কোচ জাতির জন্ম। মাতৃকুলে—ব্রাহ্মণীর গর্ভে 'চাণ্ডালী', চাণ্ডালীর গর্ভে 'মাংসচ্ছেদী' ও মাংসচ্ছেদীর গর্ভে 'কোচ' জাতির উৎপত্তি। মতান্তরে, তীবর ও ব্রাহ্মণীর সংযোগে 'কুবাচ' জাতির জন্ম। সেন রাজত্বকালে যে সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ করিতেন, * তাহাদের, এবং বর্ত্তমান যুগের অসবর্ণ ও (হিন্দুমতে) বিধবা-বিবাহকারিগণের অপরাধ ঐ সমস্ত কোচ, তিবর ইত্যাদি জাতির অপরাধের সহিত একত্র বিচারিত হওয়া আবশ্যক। কোচ জাতি মূলে ক্ষত্রিয় স্বীকার করা হইলেও তাঁহাদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছে, নিতান্ত পক্ষপাতিগণও তাহা বলিতে পারেন না। বঙ্গের কোনও জাতির সম্বন্ধেই এরূপ উক্তি প্রযোজ্য নহে। ইতিপূর্ব্বে যে ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা স্থানীয় জাতির সহিত কোচ জাতির রক্তমিশ্রণ সপ্রমাণ হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, জাতিকৌমুদী ও জাতিমালা আদি গ্রন্থও প্রকারান্তরে তাহার সমর্থন করে।

কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন, কোচেরা দ্রাবিড় জাতি হইতে উৎপন্ন, এবং দ্রাবিড়েরা আর্য্য জাতি হইতে ভিন্ন। তাঁহাদের বহু কাল পূর্ব্বে মনু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, দ্রাবিড় জাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয়।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ; ২৮৭ পৃঃ।

বৈদেহরাজবংশে ব্রাহ্মণ জাতির উল্লেখ আছে। তবে, পুরাণ ও আধুনিক পণ্ডিতগণের মত একত্রে বিচার করিলে কোন জাতি ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন বলিলেই সপ্রমাণ হয়। কোন জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ, অন্যান্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ অপেক্ষা দুর্বল নহে। অনার্য্য (দোগ-সিক্থ) রক্ত মিশ্রিত হইয়া থাকিলেও তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। মহাভারতের বনপর্ব্বে (২১২ অঃ) লিখিত আছে—

"শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি সদ্‌গুণ সম্পন্ন সাধুদের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়। এমন কি, একমাত্র সাধুসঙ্গে অতিবাহিত থাকিলে তাহার ব্রাহ্মণত্বও লাভ হইতে পারে।"

"শূদ্রযোন্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেষ্ঠমবাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদপ্যাশু শ্রেষ্ঠাং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ ॥ ৬৪
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ ॥ ৬৫
অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাদ্ধ তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাৎ তু নেতি হেত্বেবমেব তু ॥ ৬৬
জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌বা নৈ।
জাতোঽন্যুনাধ্যাধ্যুষণমনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬৭
অনুলোমাপসদাস্তিস্রো বিহিতা ধর্ম্মতো বরাঃ।
নৈগুণ্যাজ্ঞানতঃ পূর্ব্বে উত্তরাঃ প্রতিলোমতঃ ॥" ৬৮—মনু ১০ অঃ।

অর্থাৎ, "উৎকৃষ্ট জাতি হইতে স্ত্রী কন্যাতে যে সন্তান জন্মে, সেই নিকৃষ্টও সপ্ত জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। ব্রাহ্মণ হইতে অনার্য্য নারীতে যে (সন্তান) উৎপন্ন হয়, এবং অনার্য্য হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? (এ প্রশ্নের উত্তর এই) আর্য্যের ঔরসে অনার্য্যার গর্ভজাত সন্তান নিষ্ফল অনার্য্যই হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই নিন্দিত ক্ষেত্রসম্ভূত, এবং পরবর্ত্তী প্রতিলোমজ বলিয়া উহারই উপনয়নাদি সংস্কারের যোগ্য নহে; ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা।"

বিতাড়িত বিশ্বামিত্রের শাপপ্রভাবে বশিষ্ঠপুত্রগণ—মহানন্দিপুত্রাদি জাতির উৎকর্ষ ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি—প্রাক্ত নন্দন, পঞ্চম, বা ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত [illegible]

দ্বারা শূদ্রাতে উৎপন্ন কন্যা নিষাদী; সেই কন্যা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলে যদি তাহাতে আবার কন্যা উৎপন্ন হয়, এবং সে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হয়, এইরূপে পর পর তৎজাতা কন্যা কেবল ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলে সপ্তম পুরুষে পুত্র ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি গ্রন্থমাত্রেই আবদ্ধ ছিল না; ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জন্মবৃত্তান্ত তাহার প্রমাণ। "বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ" অর্থাৎ (ব্রহ্মার) বাহু হইতে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয় জাতির জন্মক্ষেত্র, পরবর্ত্তী কালে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, "চন্দ্রাদিত্য মনুনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।" চন্দ্র, সূর্য্য, ও মনু হইতে ক্ষত্রিয়-বংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

সংস্কার ও উপাসনা-প্রণালী।

কেহ কেহ বলেন, কোচরাজ বিশ্বসিংহ পার্ব্বতীয় অনার্য্য জাতি; তৎকর্ত্তৃক কামরূপে প্রথম ব্রাহ্মণ আনীত হয়, এবং কোচ জাতির হিন্দুমতে প্রবেশলাভ ঘটে। রাজর্ষি বিশ্বসিংহ কামাখ্যা পীঠের উদ্ধারকর্ত্তা। তিনি এক জন যথার্থ হিন্দু রাজার ন্যায় দেব-দ্বিজে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং নিজের সন্তানগণকে কাশীধামে রাখিয়া শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। সকে সকে এক জন নূতন হিন্দুর পক্ষে এতটা হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রকৃত কথা এই যে, আদিশূরের ন্যায় তাঁহার হিন্দুধর্ম্মপ্রিয়তা ছিল। সেই জন্যই তিনি কামরূপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭শ শতাব্দীর রচিত, আসামের বৈষ্ণবচূড়ামণি দামোদর দেবের জীবনচরিত গুরুলীলায় লিখিত আছে,—

"শ্রীহরি দেবর বীর্য্যে উৎপত্তি
বিশ্বসিংহ নরবরাজ।
পৃথিবীর যত অব্রাহ্মণ বধি
সাধিলন্ত দেবকার্য্য।"

কোচ জাতি যে পূর্ব্বে বঙ্গের অন্যান্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির ন্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। পূর্ব্বে কলিতা জাতি ইঁহাদের পৌরোহিত্য করিতেন। কলিতারা এতদঞ্চলে আগন্তুক আর্য্য জাতি। * কোচ জাতির মধ্যে তন্ত্রসম্মত বরাহাদি ভক্ষণ, রথযাত্রা ও দীপালীর ন্যায় উৎসব, চণ্ডী, তারা, ধর্ম্ম, কালভৈরব, কালী, কামাখ্যা,

* Gait's History of Assam, P 2

শীতলা, মহাকাল ইত্যাদি দেব দেবীর পূজা এ পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। এই জাতির হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ, বিশ্বসিংহের অনেক পূর্ব্বে হরিনৈবর্ত্তপুরাণের রচনাকালে অথবা তাহার পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। বিশ্বসিংহের জন্মের পূর্ব্বে অথবা সমসময়ে (১৫শ শতাব্দীতে) দেবীবর মিশ্র যে মেল বন্ধন করেন, তদ্দ্বারা তৎকালে কোচ জাতির ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকার আভাস ব্যক্ত হয়। বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ভাল বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার দ্বারা যে এ দেশে ব্রাহ্মণ-বসতির সূত্রপাত, এ কথা অগ্রাহ্য। তৎপূর্ব্বে (১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে), কামতাপুরের খেন রাজগণের আমলে এ দেশে ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। তৎপূর্ব্বে, অর্থাৎ, ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজির কামরূপ-অভিযান বৃত্তান্তে হিন্দু দেবমন্দিরের উল্লেখ আছে। তাহার অনেক পূর্ব্বে, পাল রাজগণের রাজত্বকালে কামরূপে ব্রাহ্মণের বসবাস থাকার উল্লেখ করা গিয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীর-রাজ দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্য-কর্ত্তৃক কামরূপে নৃসিংহ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। হিউয়েন সাঙ্গের কামরূপ-আগমন সময়ে (৬৩৮ খৃঃ) তাৎকালিক কামরূপরাজ ভাস্কর বর্ম্মা স্বয়ং হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোচরাজ সালস্তম্ভও হিন্দু ছিলেন। নরক, রামায়ণের সময়ে, এ দেশের রাজা ছিলেন; তিনি কিরাত-জাতিকে বিতাড়িত করিয়া, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজবংশীয়ের পক্ষে উপাধি-বিশেষের দ্বারা সমাজে উচ্চ-স্থান-গ্রহণ অসম্ভব নহে। কথিত আছে, রাজা রাজবল্লভ ব্রাহ্মণ-গণকে দশ লক্ষ টাকা প্রণামী প্রদান করিয়া তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবসায়ী স্বজাতিগণের উপবীতধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত হইলেও এই সংস্কার-গ্রহণ, বৈদ্য জাতির পূর্ব্বহীনতার পক্ষে একমাত্র ও অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। মুসলমানী পর্ব্বে মহরমে, তাজিয়া দিবার প্রথা কোচ জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা কোচ জাতি সেমেটীক জাতির অন্তর্গত আরববাসীর বংশধর, এরূপ প্রমাণ হয় না।

ভক্ষ্য ও আচার।

বর্ত্তমান হিন্দুয়ানীর চক্ষে দেখিতে গেলে, কোচ জাতির মধ্যে কতকগুলি অখাদ্য-ভক্ষণের অভ্যাস থাকা দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহারা

* রাজতরঙ্গিণী; ১ম খণ্ড, ৮২, ৮৩ পৃঃ।

† ইষ্টারন ইণ্ডিয়া; ২য় খণ্ড, ৬১৫ পৃঃ।

কতক তয়সম্মত। প্রতিবেশী অন্যান্য অসভ্য জাতির ভক্ষ্য বস্তু কোচ-সমাজে একেবারে প্রবেশলাভ করে নাই, বলা কঠিন; কিন্তু তাহা তুলনায় বঙ্গীয় ভদ্র হিন্দু সমাজের ভক্ষ্য চট্টগ্রামের 'লটাহুংনি' (এক জাতীয় পচা মৎস্য), পূর্ব্ব-বঙ্গের 'কুন্ধ', দক্ষিণ-বঙ্গের 'কর্কট' ও 'শুগ্‌লি' অপেক্ষা অধিক আপত্তিকর নহে। রাজপুতানার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাদের আহেরিয়া উৎসবে বরাহ ভক্ষণ করিয়া থাকেন।* নেপালের কোনও কোনও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে বরাহ-মাংস-ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে পিতৃকার্য্যে বরাহ-মাংসের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।† পশ্চিমের কোনও কোনও ব্রাহ্মণসমাজে গো-মাংস-ভক্ষণের প্রথা থাকা জানা যায়।‡ এমন অবস্থায় ভক্ষ্যবস্তুর দ্বারা জাতিবিচার সঙ্গত নহে। আসামে 'মারিয়া' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর মুসলমান আছে। তাহারা ১৬শ শতাব্দীর আসাম-আক্রমণকারী বক্তিয়ার পাঠান সেনার বংশধর। ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলে, তাহাদিগকে নীচ শ্রেণীর হিন্দুধর্ম্মত্যাগী মুসলমান বলিয়াই পরিচিত করিবার চেষ্টা হইত।

শূদ্রাচারবিশিষ্ট বঙ্গের সাহা, যোগী ও রজক ইত্যাদি জাতিগুলিকে আমরা কখনও অনার্য্য মনে করিতে পারি না। প্রতি বৎসর শীতকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সমস্ত কুলী বঙ্গদেশে আগমন করে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভাব নাই। তাহাদের চালচলন সঙ্গি দোসাদ, ও মুচী অপেক্ষা উন্নত নহে। বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সমস্ত কোচ জাতি বাস করে, তাহারা প্রতিবেশী অন্যান্য জাতির নিকট ভাল ব্যবহার না পাওয়ায়, ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নেপালে রাজাদেশে ইহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। তদ্দেশে উপনিবিষ্ট কোচবিহারবাসিগণের জল এখন আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত। যাহাই হউক, সামাজিক যাবতীয় ক্রিয়া কাণ্ডে কোচ জাতি সম্পূর্ণরূপে শূদ্রাচারী নহে। ক্ষত্রিয়োচিত 'রাক্ষস' বিবাহ প্রথা ইহাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। কোচ জাতির মধ্যে বিধবা-গ্রহণের প্রথা আছে। ইহা ঠিক বিধবাবিবাহ নহে। পরাশরের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের বিধি ছিল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে, রাজপুতানার ক্ষত্রিয়দের মধ্যে, বংশ-গৌরবে

---

* রাজস্থান; ১ খণ্ড, ২৬, ২৭, ৫৩৫ পৃঃ।

† মনুসংহিতা; ৩, ২৭০।

‡ রাজস্থান; ২ খণ্ড, ৩১৩ পৃঃ।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদয়পুরের রাজবংশের আদিপুরুষ জনৈক নাগর ব্রাহ্মণ ও হীনজাতীয়া রাণীর সংযোগে উৎপন্ন। ১৪শ শতাব্দীতে এই বংশে বিধবাবিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই বিধবার সন্তানের চিতোরের রাজসিংহাসনলাভে কোনও আপত্তি হয় নাই। ইতিপূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে যে, কোচ জাতি বহুকাল পূর্ব্বে মূল ক্ষত্রিয় জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নানা কারণে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মূল ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে পরবর্ত্তী কালে যে সব পরিবর্ত্তন বা সংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল, কোচ জাতির মধ্যে তাহা সংক্রামিত হইবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। এমন অবস্থায় আদিম কালের বিধবাবিবাহ প্রথার চিহ্ন এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, মনে করা অযৌক্তিক নহে। ইহাদিগের উদ্ভবসময়ে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে কত কাল ব্যাপিয়া কত জাতির সংসর্গে আসিতে হইয়াছিল, বলা কঠিন। তাহার চিহ্ন কিছু কিছু থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

কোচবিহার-রাজবংশে ও কোচ জাতির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ আচরণ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাহা বঙ্গের অন্যান্য হিন্দু সমাজে দৃষ্ট হয় না। হিন্দু ব্যবস্থা-গ্রন্থে জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারের বিধি নাই; তথাপি বঙ্গের অনেক রাজবংশে তাহা প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ সবর্ণকন্যার সহিত বিবাহিত হইতে পারেন; সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত হন। পরস্পর মাতুল ও ভাগিনেয়ীর মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ। † মহীশূরের বর্ত্তমান রাজভগ্নী আপন মাতুলের সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন। ‡ মণিপুরে ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন। § ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পুত্রের পরিবর্ত্তে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হন। ‖ সেনরাজগণের সময় পর্য্যন্ত আমাদের এই বঙ্গদেশেই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত যমুনা নদীর পূর্ব্ব পাড়ে কায়স্থ ও সাহা, এবং বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে অসবর্ণ

---

* I. P. A. S. B, New series, Vol. V. 1909, PP. 167—87.

† ভারতী পঃ; ১৩০৪, ১৮৭—৮৮ পৃঃ।

‡ প্রবাসী পঃ; ১৩০৮, ১৮২ পৃঃ।

§ রাজমালা; ২৭০ পৃঃ।

‖ ভারতী পঃ; ১৩০৪, ২২৯ পৃঃ।

৭ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১৮৭ পৃঃ।

বিবাহের চলন আছে। * বঙ্গের বারেন্দ্র-গ্রহ-বিপ্র নামে পরিচিত, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি-বিবরণের উল্লেখ এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উডেম মতে শাকদ্বীপ ভারতের বহির্ভাগস্থ কোনও দেশ। কেহ কেহ হিমালয়ের উত্তরস্থ তিব্বতাদি স্থান বলেন। পুরাণে প্রকাশ,—শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কর্ত্তৃক ভারতে আনীত। মহাভারতের যুগে তুর্কীস্থান শাকদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। কেহ কেহ বলেন,—পারসীকদের ভারত-আক্রমণকালে ইহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। মতান্তরে, ইহারা মগদেশ হইতে আগত। জাতিকৌমুদী গ্রন্থে ইহারা পক্ষিরাজ গরুড় কর্ত্তৃক শাকদ্বীপ হইতে আনীত, লিখিত আছে। বঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি-বিবরণ ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। কালবশে উচ্চ শ্রেণীর পতন ও নীচ শ্রেণীর উন্নতি বড়ে অল্পপরিমাণে নহে, প্রায়শিক ঘটনা। ধ্রুবানন্দের গৌড়বংশাবলীতে লিখিত আছে, আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগ করিবার উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জপতির নিকট কয়েক জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান; তিনি আদিশূরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে, আদিশূর তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে গৌড়ীয় সৈন্যের পরাজয় ঘটে; পরে আদিশূরের সেনাপতি কৌশলে ভূপময় ও ব্রাহ্মণ-আনয়নের অভিপ্রায়ে গৌড়ব্রাহ্মণবেশে কান্যকুব্জরাজের বিরুদ্ধে নীচ শ্রেণীর অস্পৃশ্য সাত শত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ-বেশে গোপৃষ্ঠে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। কনৌজরাজ গো-ব্রাহ্মণ-বধের ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধি করেন, এবং গৌড়পতিকে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ প্রদান করেন। উক্ত সাত শত ব্যক্তি আদিশূরের অনুগ্রহে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছেন। †

* * *

"ততঃ সপ্তশতা বঙ্গা অস্পৃশ্যা হীনসম্ভবাঃ॥
বিপ্রবেশং সমাস্থায় গাং আরুহ্য ধনুর্দ্ধরাঃ।
* * *
ভবন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে মদ্ভাং মদ্ভ্যাং মমাজ্ঞয়া।
সপ্তশতীতি বিখ্যাতাস্তেষ্বংশীকা প্রাভবংস্তদা॥"—ধ্রুবানন্দের গৌড়বংশাবলী।

কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্রের মতে একদা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বল্লালসেনের দান-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে, বল্লাল চণ্ডীর আরাধনা করেন। চণ্ডী তাঁহাকে 'এখন হইতে তুই

* স্মৃতিমালা; ৪০১, ৪৮০ পৃঃ।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; ৭৮ পৃঃ।

প্রহরের মধ্যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা ব্রাহ্মণ করিতে পার, আমার বরে তাহারা ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হইবে' এই বর প্রদান করেন; বল্লালসেন এই সুযোগে গুণবান সপ্তশত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।*

"* * *
মহান্ কিন্তু মে প্রহরদ্বয়ং কুরু বরং
বিপ্রং যয়া জ্ঞাপিতম্।
দত্তমস্ত বরং নৃপায় সহসৈবাস্তর্হিতা পার্ব্বতী
রাজা সপ্তশতদ্বিজানতিগুণানাদ্যাজ্ঞয়া নির্ম্মমে।
* * *"

(এড়ুমিশ্রের কারিকা)

বাচস্পতি মিশ্র, ধ্রুবানন্দকে সমর্থন করিয়া সপ্তশতী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু গবারোহী সৈন্যগণকে নীচ শ্রেণীর বলেন নাই, নিরগিরু ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন।

"বৃষারূঢ়া বিপ্রাঃ * * *"

—বাচস্পতি মিশ্র-কৃত কুলরাম।

উত্তরকালে সপ্তশতীরা বৈদিক ব্রাহ্মণদের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিবিধ গাঁই ও গোত্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।† জাতিতত্ত্ব-সংক্রান্ত এই সমস্ত আলোচনায় লিপ্ত হইতে হইলে, সর্ব্বত্রই বিজলি সাহেবকে সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

সংস্রব।

কোচরাজ বিশ্বসিংহের অষ্টাদশ পত্নী ছিলেন; তন্মধ্যে ২ জন নেপাল হইতে, ১ জন কাশ্মীর হইতে, ৩ জন বারাণসী হইতে ও ২ জন মিথিলা হইতে আনীতা। পরিচয় প্রকাশ না থাকিলেও ইহাদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের কেহই ছিলেন না, বলা কঠিন। বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহারের ৩ জন রাজকুমার, আসামের অন্তর্গত ভ্রমরাবুকে স্থান-সংক্রান্ত বিবাদে আসামীগণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে নরনারায়ণের পক্ষ হইতে আসামে উকীল প্রেরিত হইয়াছিল। আসামরাজ চুখাফার কর্ম্মচারী বড় গোঁহাই তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ হত্যা ও মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; ৭৯ পৃঃ।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; ৮৮, ৮৬ পৃঃ। গৌড়ের ইতিহাস; ৮০ পৃঃ।

অনুচিত বলিয়া উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। * ১৬শ শতাব্দীতে অম্বররাজ স্বনামখ্যাত মানসিংহ কোচবিহারের তাৎকালিক অধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। † উক্ত শতাব্দীতে কামাখ্যা-মন্দিরের দ্বারে মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের যে ইষ্টকমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার গলদেশে উপবীতের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ‡

১৭শ শতাব্দীতে নেপালের তাৎকালিক সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা প্রতাপমল্লের সহিত কোচবিহার-রাজ প্রাণনারায়ণের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রূপমতী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। প্রতাপমল্ল ১৬৪৯ খৃঃ কাঠমাণ্ডু রাজধানীর অদূরবর্ত্তী এক প্রাসাদে (অধুনা বিশ্বমন্দির) এক শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন; উহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতে এই বৃত্তান্ত ক্ষোদিত দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, রূপমতী দেবী প্রতাপমল্লের জ্যেষ্ঠা মহিষী ছিলেন। শাস্ত্রানুসারে স্ববর্ণা না হইলে কেহ মুখ্যা পত্নী বা সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন না।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।"—মনু; ৩, ১২।

অর্থাৎ, দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্তা।

"দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি।"—মনু; ৩, ১৮।

অর্থাৎ, যে দ্বিজের দৈব, পিত্র্য ও আতিথ্য কার্য্যে শূদ্রা প্রধান অর্থাৎ শূদ্রা-গৃহিণীস্বরূপা হইয়া যাঁহার সেই সকল কার্য্যে যোগ দেয়, তাঁহার সেই হব্য কব্য দেব ও পিতৃলোকেরা গ্রহণ করেন না, এবং সেই গৃহস্থ তাদৃশ আতিথ্য দ্বারা স্বর্গলাভও করিতে পারেন না।

"ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষা ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যকম্।
যা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাদ্যাজ্ঞাতিঃ কদাচন।"—মনু; ৯, ৮৬।

অর্থাৎ, "স্বামীর দেহ পরিচর্য্যা, দৈনিক গৃহকর্ম্ম ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া কলাপাদি কেবল স্বজাতীয়া স্ত্রীই সম্পাদন করিবেন। ভিন্নজাতীয়া স্ত্রী করিবেন না।"

---

* আসামবন্ধু পত্রিকা; ২৭শে জুন ১৯০২ "কোচবিহার রাজ এলেকার নরাই" শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

† আইন-ই-আকবরী ১ম, ৫৪০ পৃঃ ও আসামবুরঞ্জী।

‡ কেহ কেহ ইহা উত্তরীয় বলেন। পাতঞ্জলের মতে ইহা পৈতৃক।

১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত আসামের অন্তর্গত জয়ন্তরাজ মহামাণিক্যের পরিণয় হইয়াছিল। এই রাজবংশ কিরাত জাতির অন্তর্গত। বৃহৎসংহিতা-বর্ণিত ক্ষত্রিয় বলিয়াই এই বংশ পরিচিত। ব্রাহ্মণগণের নিকট এই রাজবংশ চিরকাল 'আর্য্য' বলিয়াই সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, এই রাজবংশ শূদ্র জাতি হইতে উৎপন্ন। মনুর মতে, বৃষলাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয়।

অলৌকিকতা।

কোচরাজ বিশ্বসিংহের জন্মবৃত্তান্ত এ কালে এক সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। মহাদেবের ঔরসে শাপগ্রস্তা যোগিনীর গর্ভে (মানব-দেহে) বিশ্বসিংহের জন্ম; যোগিনীতন্ত্রে লিখিত এই বিবরণ গ্রহণ করিতে অনেকেই অনিচ্ছুক। কেহ কেহ এজন্য তন্ত্রকারকে কটূক্তি করিতেও ছাড়েন নাই। বিশ্বসিংহের জন্মবৃত্তান্তে বিস্মিত হইবার এবং তজ্জন্য শাস্ত্রকারকে কটূক্তি করিবার কোনও হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। জনসমাজে বিশেষ খ্যাত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তির জন্ম অলৌকিক-উপায়ে সাধিত হইবার বৃত্তান্ত এশিয়া, ইয়োরোপ কোনও দেশেই অজ্ঞানিত নহে। এই বিজ্ঞানের যুগে ঐ সমস্ত বিবরণ কাল্পনিক বা ভাবপ্রবণতা-প্রসূত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞানিত কাল হইতে মানবসমাজ নির্ব্বিচারে যাহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে কটূক্তি করিলে তাহার প্রতীকার হইবে, এমন আশা করা যায় না। যুধিষ্ঠিরের উরসে শ্বেত হস্তীর প্রবেশ, ভীষ্মদেবের বক্ষঃস্থল হইতে জন্ম, ইত্যাদি অলৌকিক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। খৃষ্টাব্দের ৮ম শতাব্দীতে নাগাশঙ্কর নামক কামরূপের এক জন রাজার করতোয়ার চরে জন্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী আড়িমত্ত রাজার ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে জন্ম, বলা হয়। স্বয়ং কৌলীন্য-মর্য্যাদার বিধাতা বল্লালসেন ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার মাতা স্বামী কর্ত্তৃক ব্রহ্মপুত্র তটে নির্ব্বাসিতা অবস্থায় বল্লালসেনকে প্রসব করেন। যাহাই হউক, মহাদেবের জনসমাজে স্ত্রী-গ্রহণ এই প্রথম নহে; অতীত কালে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাণ্ড্যরাজ্যের রাজা মলয়ধ্বজের কন্যা তড়াতৈকের সহিত শিবের বিবাহ হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদ আছে। এই তড়াতি এখন নাহুয়ায় মীনাক্ষী দেবী ও শুন্দর নামে পূজা

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা; ১২শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১ পৃঃ।

পাইতেছেন। * এই বিজ্ঞানের যুগে, অলৌকিকতার বিরুদ্ধবাদিগণের চক্ষের উপর, বঙ্গীয় সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণ পরমহংসের অলৌকিক উপায়ে (শিব-প্রসাদাৎ) জন্ম, কথিত হইতেছে। বঙ্গের যোগীজাতি শিববংশীয় বলিয়া শাস্ত্রোক্তি আছে। † যাহাই হউক, বিশ্বসিংহের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক বলিয়া পরিহার করিলে, ভারতের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের বংশমর্য্যাদার কোনও মূল্য থাকে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় মহাদেবও ক্ষত্রিয়; সেই সূত্রে বিশ্বসিংহও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত।

গেইট তাঁহার আসামের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, বিশ্বসিংহ রাজা হইয়া সামান্য (humble) হারিয়া মণ্ডলের পরিবর্ত্তে দেবতা শিবকেই আপন জন্মদাতা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের এই জন্মবৃত্তান্ত একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না। রূপান্তরিত অবস্থায় সমসাময়িক দিল্লীদরবারে পর্য্যন্ত ইহা ব্যক্ত ছিল। আকবরনামায় মুহাজ্জেবের বরে বিশ্বসিংহের জন্ম লিখিত আছে। তাঁহার পিতা তুলনায় পুত্র অপেক্ষা নিতান্ত সামান্য ছিলেন না। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর গোয়ালপাড়া জেলায় সণকোষ ও মনাস নদের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডের তিনি অধিকারী ছিলেন। স্বজাতির দ্বাদশটী শ্রেষ্ঠ বংশের উপর তাঁহার আধিপত্য ছিল। তাঁহার উর্দ্ধতন-ষষ্ঠ পুরুষের পরিচয় পর্য্যন্ত প্রকাশ রহিয়াছে। দিল্লীশ্বর শেরসাহ ও মারহাট্টারাজ শিবাজীর পিতার পদমর্য্যাদা তুলনায় বিশ্বসিংহের পিতার পদমর্য্যাদা অপেক্ষা উন্নত ছিল না। হরিদাস বা হারিয়ার মণ্ডল উপাধি তাঁহাকে রাজা সপ্রমাণ করিতেছে। অভিধানে মণ্ডল অর্থে এক প্রকার রাজা। মণ্ডধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ—ভূষিত করা। মনু ও শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থে দ্বাদশ মণ্ডলাধিপের উল্লেখ আছে। হাণ্টার হরিদাসকে এক জন দলপতি বা সরদার (chief) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠান-রাজত্বকালে ১৪ জন চৌধুরী ও ৭২ জন মণ্ডল বঙ্গরাজ্যে বিশেষক্ষমতাপন্ন ছিলেন; অর্থাৎ, মণ্ডলেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্ত ছিলেন। ‡ পাঠান-আধিপত্যের বহু পূর্ব্ব হইতে 'মণ্ডল' উপাধির ব্যবহার ছিল। বঙ্গীয় গুপ্তরাজগণের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে 'মণ্ডলাধিকরণ' বলিত। §

---

* ঐতিহাসিক চিত্র; ১০।৭, ৫১৪ পৃঃ।

† 'ব্রাহ্মণ্যাম্ বভূবুশ্চ নাথঃ সম্ভূত এব হি।" ইতি পরাশর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর গর্ভে অধ্যুতের (শিবের) ঔরসে "নাথ" উৎপন্ন।—ভাঃ কৌমুদী, ৩৪—৩৫ পৃঃ।

‡ গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড ২০৯, ২১১, ২৬৮ পৃঃ।

§ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাস"; ৭২ পৃঃ।

সঙ্কাকর নন্দীর 'রামচরিতে' বঙ্গনাধিপতির উল্লেখ আছে। দিনাজপুরের অন্তর্গত মহিপালের জমীদার মহাশয়গণের নিকট ঈশ্বর ঘোষ মহীপালদিগের এক খণ্ড তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহা খৃষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে মণ্ডলেশ্বর শব্দে রাজাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।*

ভাষা।

কোন্ জাতি যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে, তাহা প্রকৃতির বঙ্গভাষা। বঙ্গভাষার ন্যায় তাহা সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্যমূলক শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণ। তদ্ভিন্ন এখানে হিন্দী, মৈথিলী ও উর্দ্দু শব্দ যথেষ্টপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। উত্তর-বঙ্গের জনসমাজ প্রায়ই দক্ষিণ-বঙ্গের শব্দবিন্যাস ও অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া উত্তর বঙ্গে জ্ঞানচর্চ্চায় মৌলিকতাহীন, ইহা বলা যায় না। এ কালের ন্যায় যখন এত দ্রুত ভাব আদান-প্রদানের সুবিধা ছিল না, সে সময়েও এতদঞ্চলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-ভাষার যথেষ্ট চর্চ্চা হইত। উত্তর-বঙ্গের কোচরাজগণ তাহার নিয়ামক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপণ্ডিত রাজার অভাব ছিল না। ইংরেজী ভাষায় বর্ত্তমান কোচবিহারাধিপতির রচিত কবিতা ও মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের 'শিকারকাহিনী' ইংরেজ-সমাজে প্রশংসা লাভ করিয়াছে। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ কবিতা-রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। মহারাজ বলেন্দ্রনারায়ণ ও তৎপত্নী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবীর রচিত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচনাপাঠে প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। পারস্য ভাষাতেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাৎকালিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ব্যক্তিগত তিনি সর্ব্বপ্রজেনেরাল গর্ড সর্ব্বত্রালিসকে বঙ্গ ও পারস্য ভাষায় স্বহস্তে পত্র লিখিতেন। তাঁহার অনুবাদিত ও বিরচিত বহু পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি সাহায্য ও উৎসাহ দানে বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার 'পঞ্চরত্ন' নামে এক পণ্ডিত-সভা ছিল। অধিকন্তু তিনি এক জন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুকবি ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থগুলি দুঃখের বিষয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। মহারাজ নরনারায়ণ (মল্লনারায়ণ) ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহারাণী ভানুমতী দেবী বিদ্যোৎসাহে পণ্ডিত

* সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২১, ৫৫—৫৬ পৃঃ।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ 'প্রয়োগরত্নমালা' সঙ্কলিত হয়। মহারাজ স্বয়ং 'মল্লদেবী' অভিধান সঙ্কলন করেন। তিনি আকবর শাহের প্রশংসাসূচক এক খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আকবরনামায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের স্মরণীয় যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ইঁহার সহায়তায় ও উৎসাহে কত গ্রন্থ বিরচিত ও অনুবাদিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। আসাম গবর্মেণ্ট, কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা সেই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন।

নরনারায়ণ কাণীবাসে ব্রহ্মানন্দ নামক কোনও পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দেশে রীতিমত জ্ঞানচর্চ্চা হইত। শঙ্কর-চরিতে লিখিত আছে :—

"গজপতি কাশী যাহি পাঠ পুরোহিত।
সমস্তকে রাজা শিক্ষাই আছে সংস্কৃত॥"

রাজসভায়—

"সংস্কৃত বিনে আন মাত নমাতয়।
সামান্য অংশেও সবে সংস্কৃত কয়॥"

এই সমস্ত বিবরণ অত্যুক্তিপূর্ণ মনে করা গেলেও, ইহা হইতে কতকটা অবশ্য অনুমান করা যাইতে পারে।

ভাষা-বিজ্ঞানের (Science of language) সাহায্যে কোনও জাতির মূল-তত্ত্ব-আবিষ্কারের প্রয়াস কতদূর ফলপ্রদ, বলা কঠিন। মানসিক অবস্থা অবগত হইবার পক্ষে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজনীয় হইতে পারে। পণ্ডিত বর্ণ, বুর্ণফ্, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের আবিষ্কৃত তথ্য যে জাতিনির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে, প্রফেসর সেসের গ্রন্থ-পাঠে তাহা সুবোধ হয়। তাঁহার মতে, ভাষা কোনও দেশ বা জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। উহা বিবিধ উপায়ে প্রতিবেশী দেশ ও জাতির মধ্যে প্রসার লাভ করিয়া থাকে। *

* Language is no test of race; the same race may speak different languages, and different races may speak the same language. * * * It is astonishing how quickly and easily languages are borrowed by one people from another, and there are certain races which seem to display a peculiar readiness to adopt the language of others. * * * The attempt to base ethnological conclusions upon philological evidence, to argue from similarity of language to similarity of race, has been the bane of archæological speculation.

—*The races of the Old Testament* pp. 11—

মেজর কণ্ডর তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপিনী আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে এমন ৭০টী ধাতু আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীস্থ অধিকাংশ জাতির ভাষায় দৃষ্ট হয়। * বহিঃসংস্রবের প্রসঙ্গ পরিহার করিলে এক জাতির মধ্যেই ভাষা কত পরিবর্ত্তন-শীল, ঋগ্বেদ হইতে তাহার প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থার সমুদ্র (আকাশ), ঘসা (সেবাকারিণী), জার (স্বামী) প্রভৃতি শব্দ এখন কি অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যম (সূর্য্য), বৃহস্পতি (বাক্ দেবতা), সরস্বতী (জলদাত্রী) প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ এখন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলের শব্দার্থ ১০ মণ্ডলেই পরিবর্ত্তিত লক্ষ্য হয়।

কোচবিহার অঞ্চলের কথিত ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণতঃ দক্ষিণ-বঙ্গের কথিত ভাষার সহিত এতদঞ্চলের কথিত ভাষার মূলে কোনও অনৈক্য নাই; কেবল স্থানভেদে উচ্চারণ-বৈষম্য বিদ্যমান। দক্ষিণ-বঙ্গের পাল-যুগের শেষ পর্য্যন্ত উত্তর-বঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান ছিল; তাহার ফলে পালি ও প্রাকৃতের উচ্চারণ ও লেখনপদ্ধতি এখনও প্রায় হওয়া যায়। প্রতিবেশী নেপালী, ভূটীয়া ও কতিপয় পর্ব্বতীয় অসভ্য জাতির ভাষার শব্দ এতদঞ্চলের কথিত ভাষায় একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে।

'কোচ ভাষা' নামে একটী পৃথক ভাষার শব্দ-সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। † সংগৃহীত শব্দগুলি যে দেশজ, এবং বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও তাহার ব্যবহার আছে, এ স্থলে তাহার আলোচনা পুনরুল্লেখমাত্র। ‡

নাম।

কথিত আছে, কোচ জাতির বাসস্থান বা বিহার-ক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি। কোচকুমারী ও ব্রহ্মদেশের বিহার-ক্ষেত্র বলিয়াও, কোচ-বিহার নামের উৎপত্তি অনুমান করা হয়। কেহ কেহ সণকোষ নদের তটবর্ত্তী বলিয়া, 'কোষ' হইতে 'কোচ' শব্দের উৎপত্তি অনুমান করেন। যথা গোদাবরী প্রদেশ, নর্ম্মদা প্রদেশ ইত্যাদি। যোগিনী তন্ত্রে 'কোচ' দেশের নাম পাওয়া যায়। পীঠমালায় এই দেশ 'কোচবদ্দপুর' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

* Old Testament history.

† সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা; ১৩শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

‡ উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী; ২ ভাঃ, ১৩৮ পৃঃ।

কথিত আছে, ভীত ক্ষত্রিয়গণ ভগবতীর 'কোচে' আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা হইতে 'কোচ' নামের উৎপত্তি। পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত 'কুবাচ' অর্থাৎ মন্দভাষাভাষী হইতেও 'কোচ' নামের উৎপত্তি অনুমান করা হয়। ১৭শ শতাব্দীর আলমগীরনামায় কোচ জাতির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

"সেই দেশ 'ভিতর বন্দ' এবং তাহার বহির্ভাগ 'বাহার বন্দ' নামে পরিচিত। * * * এবং তথায় দুই প্রকার জাতি বাস করে। এক 'মহাহু' (মেছ) তাহারা ভিতর বন্দে, অপর 'বাহার' তাহারা বাহার বন্দে বাস করে। কোচবিহার নামের উৎপত্তি উক্ত 'বাহার' জাতি হইতে। আসাম রাজ্য 'কোচ আসথে' নামে অভিহিত। সে দেশেও অনেক 'কোচ' বাস করে। * * * 'বাহার' জাতি শ্যামবর্ণ ও গঠনের মধ্যমশ্রেণীভুক্ত। 'মহাহু' জাতি দেখিতে গৌরবর্ণ। ইহারা যোদ্ধজাতি; বিষ মিশ্রিত তীর ও তরবার ইহাদের অস্ত্র।" কাতে-হাক্-ইব্রিয়া পুস্তকে প্রকাশ যে, ভূটীয়া ভাষার সহিত কোচ জাতির ভাষার ঐক্য আছে। রিয়াজ উস্-সালাতিনে এই মত সমর্থিত হইয়াছে। সার-অ্যাসলি ইডেন তাঁহার ভুটান মিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভূটীয়া জাতির-ভূটান রাজ্যে বসবাস দুই শত বৎসরের অধিক নহে। তৎপূর্ব্বে 'টেঙ্কু' নামক কোচবিহারবাসী এক শ্রেণীর লোক ছিল। তাহারা তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক নিম্নভূমিতে তাড়িত হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ অভিধানে—

কুচ, কুচ (কুচ্—সংকুচিত হওয়া) পরশ্রেধর।
কোচ (কুচ্—তুচ্ছ হওয়া) জাতিবিশেষ, তিওর।
কুবচ (কু-কুৎসিত বচ—বলা) কটুভাষী, পরনিন্দক।

বিশ্বকোষে কোচ শব্দের সঙ্কোচ অর্থ সমর্থিত হইয়াছে। বিহার অর্থে, ক্রীড়া। বৌদ্ধ যতিগণের মঠ বা আশ্রমকেও বিহার বলিত। হাণ্টার পেরোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে পাটনার অন্তর্গত 'বিহার' নামক স্থানে বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত ছিল; তাহা হইতে ঐ স্থান, এবং উহার নিকটে এক বৃহৎ ভূভাগ 'বিহার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কোচবিহার অঞ্চলে বৌদ্ধ মতের প্রচার থাকা সম্বন্ধে কোনও তর্ক উঠিতে পারে না; বৌদ্ধ-বিহারের পূর্ব্ব অস্তিত্বও অসম্ভব নহে। কোচবিহারের উত্তরে মহাকাল, গোয়ালপাড়ায় মঙ্গলচণ্ডী ও যোগীযোগা, কামরূপে হাজো ও মঙ্গলচণ্ডী, নওগাঁয়ে কেশবধাম, দরঙ্গে সিপরী নামক স্থান, লক্ষ্মীপুরের থানভি-রাজ্যস্থ বৌদ্ধ চৈত্যসমূহ ও কামতাপুরের (কোচবিহার) শিলামূর্ত্তিগুলি, বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিক

যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। অল্পদিন হইল, কোচবিহারে ভাস্কনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। * বগুড়া মহাস্থানের নিকট বিহার ও ভাদুবিহার গ্রাম অবস্থিত; কানিংহামের মতে, ঐ সব স্থানে বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত ছিল। বৌদ্ধযুগে মিথিলাদেশ উত্তরবিহার নামে পরিচিত হইত। বাপ্পাইদেওপাড়ায় প্রাপ্ত শিলাফলকে বিজয়সেনের প্রসঙ্গে ও মাণিকগঞ্জের পুরাতন মঙ্গলচণ্ডী পুস্তকে, এক কলিঙ্গদেশ বা নগরের নাম আছে। ঐতিহাসিকগণের মতে, ঐ কলিঙ্গ হিমালয়-পাদদেশে অবস্থিত বৌদ্ধতান্ত্রিকতার একটী কেন্দ্রস্থল ছিল। কোচবিহার অঞ্চলের নরনামতীর গীতে কলিঙ্গ রাজ্যের নাম আছে। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভনস্যাম ব্রুক কর্ত্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে, কোচবিহারের উত্তরে এক 'কলিঙ্গ' স্থান লাভ করিয়াছে; † ইত্যাদি কারণে কোনও বৌদ্ধবিহার হইতে 'বিহার' নাম সৃষ্ট হইয়া, উত্তরকালে তাহার সহিত 'কোচ' শব্দ যোগ হওয়া সম্ভবপর মনে হয়।

মোগল সংস্রবের পূর্ব্বে 'কোচবিহার' নাম ছিল না। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্বসিংহের রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইলে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পূর্ব্বার্দ্ধ 'কোচহাজো' ও পশ্চিমার্দ্ধ 'কোচবিহার' নামে পরিচিত করিতে আরম্ভ করেন। ১৮শ শতাব্দীর লিখিত রাজকীয় কাগজপত্রে কেবল 'বিহার' নাম দৃষ্ট হয়। নেপালে আবিষ্কৃত ১৭শ শতাব্দীর শিলালিপিতে 'বিহার' নাম ক্ষোদিত আছে। ১৬শ শতাব্দীতে মহারাজ নরনারায়ণ ও আহম রাজের মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার ও উকীল দ্বারা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আসামবস্তি পত্রে তৎপ্রসঙ্গে কেবল 'বিহার' নাম মুদ্রিত হইয়াছে। বিশ্বকোষে প্রকাশ,—মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্ব্বে কেবল 'বিহার' নাম ছিল, বিহার প্রদেশ হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য 'কোচবিহার' নাম হইয়াছে; বুকাননও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ১৬শ শতাব্দীতে রচিত শঙ্করদেব, মাধবদেব ও দামোদরদেবের জীবনচরিত পুস্তকে কেবল 'বিহার' নাম লিখিত আছে। ১৮শ শতাব্দীর মেজর রেণেল অঙ্কিত মানচিত্রে রাজ-

* গৌড়ের ইতিহাস; ২ খণ্ড ১১৬ পৃঃ। স্থানীয় অনুসন্ধানে এই আবিষ্কারের সমর্থনযোগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

† উড়িষ্যার, গঞ্জামের দক্ষিণে, গোদাবরীতীরে ও গঞ্জামনগরের নিকট কলিঙ্গদেশের অবস্থান সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। পুরাণোক্ত যজ্ঞদেবের জীলাস্থান একান্ত্রক্ষেত্র, এই কলিঙ্গদেশে কথিত হয়। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে, দিব্যসিংহ বিষ্ণুসিংহমাতা, ব্রহ্মশাপে

ধানীর 'বিহার' নাম দৃষ্ট হয়। ভূটানের দেবরাজ এ পর্য্যন্ত কোচবিহার রাজকে 'বিহারেশ্বর' লিখিয়া থাকেন। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত মিঃ বার্টিনের পুস্তকে কেবল 'বিহার' নামই দৃষ্ট হয়। এই সময়ে 'বিহার' ও 'কোচবিহার' উভয় নামই লিখিত হইত। হাণ্টার লিখিয়াছেন যে, কোচ-বিহার রাজদরবারে 'নিজ বেহার' নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উপসংহার।

যত দূর আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, কোচজাতি—

১। পার্ব্বতীয় অনার্য্য বা অসভ্য জাতি নহেন; ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের দূর-বর্ত্তী শাখা ও পরবর্ত্তী সংস্কারহীন, এবং—

২। মঙ্গোলীয় অর্থাৎ উঃ পূঃ দেশ হইতে আগত নহেন; দক্ষিণ-পশ্চিম দেশ হইতে আগত, এবং—

৩। উপাসনা-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকাণ্ড ও ভাষা ইত্যাদিতে তাঁহাদের কোনও পৃথক বিশেষত্ব নাই; দেশ ও কালভেদে ঐ সমস্ত গৃহীত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, এবং—

৪। তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক প্রমাণ, অন্যান্য ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের প্রমাণ অপেক্ষা ন্যূন নহে, এবং—

৫। মঙ্গোলীয় বা অনার্য্য রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়া থাকিলেও শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের হানি হয় নাই, এবং—

৬। ১৫শ শতাব্দী, অর্থাৎ, দেবীবর মিশ্রের মেল-বন্ধনের সময় যাবৎ তাঁহারা এত হীন ছিলেন না।

শ্রীআমানতউল্লা আহম্মদ।

আসামস্থ উদ্ভিদ।

যে কোনও বৃক্ষ হউক, বা লতা হউক, রোপণ করিলেই যে তাহা ফল ফুল প্রদান করিবে, এরূপ আশা করা অন্যায়। কয়েকটী কারণে বৃক্ষলতাদি ফল বা ফুল ধারণ করিতে পারে না। আবার অনেক গাছ কচি ফুল প্রদান করিলেও স্ব স্ব বংশের গুণানুরূপ ফল বা ফল প্রদানে বিমুখ হয়। এই শ্রেণীর কতক

উদ্ভিদ কৃত্রিম উপায় সকলের কঠোর প্রয়োগে কোনও ক্রমে ফল বা ফুল বাহির করে, কিন্তু বংশগত গুণ বিস্মৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কমলার কথা বলা যাউক।

আমরা চিরদিন জানিয়া আসিতেছি যে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীহট্ট জেলাই কমলার একমাত্র উৎপত্তিস্থান। ইদানীং জানিয়াছি—নাগপুর ও দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলেও কমলা জন্মিয়া থাকে। উক্ত কয়টী স্থানেই কমলার উৎপত্তি আবদ্ধ নহে; ভারতের মধ্যে অপরাপর স্থানেও কমলা জন্মে; কিন্তু মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার স্বাতন্ত্র্য হেতু জেলা বা প্রদেশবিশেষের কমলা ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। আসামের উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত নাগাপাহাড় অঞ্চলেও যথেষ্ট কমলা জন্মে, মহীশূরেও কমলা উৎপন্ন হয়। যত প্রকার কমলা খাইয়াছি, মহীশূরজাত কমলা যত বড়, এবং যেমন সুমিষ্ট হয়, এরূপ কমলা ভারতের আর কুত্রাপি হয় না। আকার ও মিষ্টতা ছাড়াও মহীশূর-কমলার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ফলের ভিতরের কোয়ামধ্যস্থিত দানাসমূহকে কোয়ার আবরণ হইতে সহজে পৃথক করিতে পারা যায়। ফলের গুণাগুণ, আবহাওয়া ও মাটীর উপর নির্ভর করে। সে সকল গাছের কলম বা চারা দেশান্তরে,—ভিন্ন আবহাওয়ায়, ভিন্ন মাটীতে স্থানান্তরিত হইলে, সেই সকল গাছের এবং তাহাদিগের ফলের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত স্থলবিশেষে স্থানপরিবর্ত্তনহেতু আদৌ ফলধারণ করিতে না পারে।

এইরূপ, যে সকল গাছ স্থানপরিবর্ত্তনবশে আত্মপ্রকৃতি বিস্মৃত হয়, তাহাদিগের প্রবাসস্থানে স্বজাতীয় স্থানীয় বীজের চারার কলম করিলে তাহারা ফল প্রদান করিতে পারে, এবং জাতীয় গুণ বজায় রাখিতে পারে। বাঙ্গালা দেশ কমলার উপযোগী স্থান নহে, কিন্তু বিদেশ হইতে আনীত কমলার কলম স্থানীয় কাগজী বা পাতি লেবুর চারার সহিত জোড় কলম করিলে, কিংবা তাহাতে চোক বা চোঙ্গ কলম করিলে, কমলার আসল প্রকৃতি কতকটা রক্ষিত হইতে পারে।

ম্যাঙ্গোষ্টিনের আদিম নিবাস স্থান ব্রহ্ম ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ। উক্ত বৃক্ষ নিম্ন বা পশ্চিম বঙ্গের কুত্রাপি ফল প্রদান করে না, কিন্তু দ্বারভাঙ্গা ও দিনাজপুরে তাহা ফলে। দিনাজপুর ও দ্বারভাঙ্গায় আবহাওয়ার বিস্তর প্রভেদ সত্ত্বেও উভয় স্থানেই তাহারা ফলশালী হয়; কিন্তু নিম্ন বঙ্গ—কলিকাতা অঞ্চলের স্থিত দিনাজপুরের আবহাওয়ার অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমোক্ত স্থানে ফল হয় না। এ সমস্যার সমাধান কঠিন।—আক্ষে, সাহারাণ

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যে 'ক্ষণিক' সুখের উৎসবে মাতিয়া চিরকাল বাসনাময় প্রেম-ভালবাসার গানে উন্মত্ত ছিল, এ কথা তাঁহার পরিণত বয়সের কাব্য-গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে মনে হয় না। "নদীজলে পড়া আলোর মতন" তাঁহার কবি-জীবনের উষাকালে "প্রতি পলকের রাগিণী" যে ঝলকে ঝলকে ছুটিয়া যাইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কালিদাস, সেক্সপীয়র, বঙ্কিমচন্দ্র, সকলেই জীবন-পালার উদ্বোধনে "হেলার ভরে খেলার মত" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে নিজের সম্বন্ধে এই কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
বেচে ছুটে যায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদের গান গা'রে আজি প্রাণ,
ক্ষণিক দিনের আলোকে।"—উদ্বোধন।

রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের কবিতায় যদিও বিচ্ছিন্ন ভাবের সমাবেশ, সকল স্থানে না হউক, কোনও কোনও স্থানে দেখা যায়, তাহা হইলেও এই সময়কার প্রেম-ভালবাসার গানগুলির ভাষা যে আধুনিক মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের গানের উৎস হইতে এক বিন্দু-মাত্র লইয়া আমরা কৌতূহল নিবৃত্তি করিব

"ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা।
সুখের বেদনা সোহাগ যাতনা
বুঝিতে পারি না, ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
'লহ' 'লহ' বলে' পরে আরাধন
পরের চরণে আশা।

তিলেক নয়ন পরশ লাগিয়া
নয়নে নয়ন রাখিয়ে জাগিয়া,
পলের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু সাগরে ভাসা।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখনাশা।"

গানটি শুনিয়া বিদ্যাপতির "বরিষ বরিষ করি সময় গোঙায়নু" মনে পড়ে। "দরশ পরশ" কথা দুইটি বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল বৈষ্ণব কবি-ই ব্যবহার করিয়াছেন।

"দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
পরশ পরশ বাধি আউলাইছে গা।"—জ্ঞানদাস।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে কেবল যে অনেক পুরাতন শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি প্রেম-ভালবাসার গানের উপযোগী অনেক ভাবও বৈষ্ণব-কবির গীতি-কবিতা হইতে আহরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। স্বপ্ন-ভঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছিলেন—

"পরাণ-বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া পিরীতি পাশে।
বাসায় কেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে।"

রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতায় এক জন নায়িকা বলিয়াছেন,—"শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন কোণে হেসেছিল সে।"

জ্ঞানদাসের রাধা পথের মাঝে কৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন,—

"সখি হে পেখনু পথক মাঝ।"

রবীন্দ্রনাথের রাধারও পথেই প্রেমিকের সঙ্গে দেখা।

"দাঁড়ায়ে ছিলাম পথের মাঝে সহসা দেখিলেম তারে—"

ভাব সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবির প্রভাব "ভানুসিংহের পদাবলী" অতীত রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক গানে ও কবিতায় স্পষ্ট অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া তাহার আলোকে নিজের কাব্যের কোনও কোনও স্থানে নায়িকার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে দিনকতক বৈষ্ণব কবির পাঠশালায় প্রেমের পাঠ পড়িয়াছিলেন, তাহার

যাহার প্রেম ভক্তির চিরসহচরী। [illegible] যাহার প্রেমের দুই ভাগ। [illegible] প্রেম ভক্তি বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাই [illegible] করিয়াছে। প্রেম-ভালবাসা বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাই [illegible] রবীন্দ্রনাথের নায়িকা বধূর গলায় গলাইয়া দিতে চাহে। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবের সম্বন্ধে "বৈষ্ণব কবিতা" নামক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন।

"আমাদেরই ভুবন কাননে
ফুটে পুষ্প, ভেঙে পড়ে দেবতা-উদ্দেশে।
কেহ রাখে প্রিয়জনে ভক্তি—তাহে ঊর্ধ্ব
নাহি আকাঙ্ক্ষায়। এই স্নেহ দীপ্তি হয়
পায় দুই নারী-হিয়ে-মর্ত্যের
কেহ কে জানে, কেহ রহে গোপনে।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।"

বাঙ্গালী প্রেমিক প্রেমিকা শিক্ষিত না হইলে বৈষ্ণব সমাজের অবনতির যুগে প্রেম-ভক্তির যে দুর্দশা হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সময়ে প্রেম-ভালবাসারও সেই অবস্থা ঘটিল। অশিক্ষিত, কুশিক্ষা ও নামমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবক যুবতীর হৃদয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভালবাসার গান কিছু কতকটা লালসার ভাব অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল বাঙ্গালী-হৃদয়ের প্রতিধ্বনি এই সকল প্রেম-ভালবাসার কোনও কোনও গানে শুনা যায় বলিয়া ভাবময় বাঙ্গালী-জগতে সেই অল্পসংখ্যক গানের এত আদর। উদাসীনভাবে যে জাতি বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাদের চিন্তাশূন্য অন্তরের মধুর ভাবগুলিও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এইরূপে সঙ্গীতাকারে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছে।

বাঙ্গালীর প্রাণে এত সাধও ছিল! মরমের কথা, সুরের কথা শুনিতে শুনিতে অবসাদজড়িত চিত্ত অবশ হইয়া পড়ে। "হৃদয়ের এ কূল ও কূল দুকূল ভেসে যায়।" "সকলি দিলেম হতাশ," "কি বাসনা, কি বেদনা গো" [illegible] "[illegible]

ঠিক করিয়া উঠা যায় না। হৃদয়ের এ শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? কবি বলেন—

"হৃদয়ে হৃদয়ে আঁধ পরিচয়
আধখানি কথা সাধ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা।"

বাঙ্গালী প্রেমিকের জীবনে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। "শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।" ইহার উপর আবার প্রেমিকের ভয় হয়, পাছে এই "যাওয়া আসা" করিতে করিতে, পরিচয় গাঢ় হইয়া প্রণয়ে পরিণত হইবার পূর্ব্বে "যদি দূরে যাই চলে।" "যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম-ছলে!"

'প্রমোদ কাননে' মৃদু মৃদু গান গাহিয়া, বীণা বাজাইয়া, 'সবে মিলে ফিরি ফিরি ফিরিবে' নাচিয়া, হাসিয়া, আকাশের তারা গণিয়া 'চাঁদিনি যামিনী' ভোর করিয়া দিব—এইরূপ স্বপ্নময় বাসনা যাহাদের মনে উদয় হয়, কবি তাহাদেরও মুখে শুনিয়াছেন, 'প্রাণ কেন কাঁদে রে!' রবীন্দ্রনাথের গানের মর্ম্মে মর্ম্মে একটা দূরত্ব অনুভবের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বাসের অভাব কোনও কোনও প্রেম-ভালবাসার গানে পাঠকের মনে বিস্ময়ের উৎপাদন করে।

"কেন গো সে মোরে যেন-কবে না বিশ্বাস?
কেন গো বিষম বাঁধি আমি দুই হাতে ফাঁসি?
কাছের মানুষে মোরে চায় অন্তরে
সহসা কি ভেবে যেন কেঁদে সে আপনা!"

কবির গানে শুক্ল আশালতা, হৃদয়ের ঝরা ফুল, 'শুকান পাতার ঢাকা বসন্তের মৃত কীর্ত্তি' প্রভৃতির উল্লেখ প্রেমিক-প্রেমিকার অকারণ হৃদয়ে থাকিয়া থাকিয়া হাহাকার উত্থিত করে। 'যেথায় পরাণ এদে কেঁদে ফিরে চলে যায়।' যেখানে 'প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলা ফেলা', সেখানে যে নানা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে পুরুষ জাতির স্বভাবসিদ্ধ উদাসীনতার উল্লেখ করিয়াছেন—

"এরা, চাহিতে জানে না মন মোদের বাঁধে।
এত লোক আছে কাজে না ডাকে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকার আশালতা 'কেবলি যাতনাময়', 'কেবলি চোখের

জল', 'কেবলি ছুনের খাদ।' তাঁহার অনেক কবিতায় ও গানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয়ে'র কাহিনী তিনি পাঠ করিয়াছেন। যদি কেহ ভবিষ্যতে বাঙ্গালী-হৃদয়ের প্রেম-ভালবাসার ইতিহাস লেখেন, তাহা হইলে তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা হইতে অনেক মহত্বপূর্ণ-উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

'বৈষ্ণব-কবিতা' নামক মনোহর রচনায় রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

'সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহু ডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
ডুবেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে!

রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়া, কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহাকেও এই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না, বরং মনে হয়, যেন কবি তাঁহার হৃদয়ের দ্বার ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈষৎমাত্র উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বাহির হইতে কেবল ভিতরের ছায়া ও অন্ধকার দৃষ্ট হয়। কবির হৃদয় যে কাহার জন্য ব্যথিত, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। জগতের প্রায় সকল প্রেমিক কবির এরূপ দুর্ব্বলতা আছে। পেট্রার্কের ন্যায় কয় জন কবি লরার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন? তাঁহার ন্যায় কয় জন কবি সমালোচনার তীব্র কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া লরার অনুসরণ করিয়াছেন? আর 'চণ্ডে ক্ষ্যাপা'র ত কথাই নাই। চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত কবি জগতে কেহ কখনও দেখে নাই। চণ্ডীদাসের জাতির কথা স্মরণ করিলে রজকিনী রামীর প্রতি তাঁহার গভীর প্রেমের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। রাধা-চরিত্র সেই জন্য তিনি যে ভাবে দেখাইতে সমর্থ

হইয়াছেন, তাহার তুলনা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবধর্ম্মের এই স্বর্গীয় আদর্শ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানের হৃদয়েও রাধা-প্রেমের সুধা বর্ষণ করিয়াছিল, আর তাহার ফলে বঙ্গীয় কাব্য-কুঞ্জে মুসলমান বৈষ্ণব কবির অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের অন্তর্দৃষ্টি আছে সত্য, কিন্তু সে দৃষ্টি তাঁহার অপরিণত বয়সের কবিতায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দেখিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। ফেনপুঞ্জের বহু নিম্নে যে অগাধ জলরাশি রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যৌবনে তাহাতে অবগাহন করে নাই। আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য, অতৃপ্তির তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় বিক্ষোভিত হইয়াছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রেম যতটা ব্যাপক, ততটা গভীর নহে। একটি হৃদয়ের অখণ্ড প্রেমভাব তিনি বর্ণন করেন নাই। অসংখ্য হৃদয়ের টুকরা ভাব লইয়া তাঁহার গীতি-কাব্য। সামাজিক রাধা তাঁহার আদর্শ। সেই কারণেই তিনি কাহাকেও তাঁহার কাব্যের মূল আদর্শ করিতে পারেন নাই। কেবল তাহাই নহে, গভীরতা বলিয়া জিনিসটা আপাততঃ বাঙ্গালী-হৃদয়ের কোনও স্থানে নাই। বহির্জগতেও প্রেমের স্রোতে সর্ব্বত্র চর পড়িয়া আসিতেছে। বঙ্গের নদ নদী তরল প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিতেছে, কিন্তু প্রেমের খাত দিন দিন বালুকা ও মৃত্তিকায় ভরিয়া উঠিতেছে।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে সন ১৩০০ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হয়, তখন তিনি গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—'কৈশোরক আখ্যায় যে সকল কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা লেখকের পোনেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের পনের ষোল বৎসর বয়সের লেখা..... গ্রন্থশেষে যে সমস্ত গান প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও এই কথা খাটে।' এত অল্প বয়সে কোনও কবি ডুবিতে শিখে না। এ বয়সে প্রেম আভিধানিক সংজ্ঞার বাহিরে যাইতে পারে না। তবে, বাঙ্গালীর অকালপক্কতা বলিয়া একটা জাতীয় গুণ আছে, যাহা অধিক মাত্রায় প্রতিভাবান্ কবিবিশেষের রচনায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের যৌবন-স্বপ্ন যখন চিরদিনের তরে ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তিনি প্রেমের তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন।

যৌবনের কল্পনা-প্রসূত কতকগুলি প্রেমের কবিতা ও গান লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে ভয়ানক বিরত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভূমিকায়

সংস্করণ হইতে বুঝা যায়। তের বৎসর পূর্ব্বে সন ১৩১০ সালে রবীন্দ্রনাথের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, তাহার ভূমিকায় মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—'এই সংস্করণে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কতকগুলি কবিতা বাদ গিয়াছে এবং যেগুলি ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্য্যে মনোহর ও মর্ম্মস্পর্শী সেগুলিকে বর্জ্জন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।' এই দ্বিতীয় সংস্করণে যে কবিতাগুলি বাদ গিয়াছে, সেগুলি যে একেবারে অপদার্থ, তাহা নহে, তবে প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রচনার সহিত কিছুতেই খাপ খায় না। কিন্তু যে কবিতাগুলিকে রক্ষা করা হইয়াছে, তাহাদের কলেবরেও অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বয়সের পরিণতির সহিত কবির বিচারশক্তি যে বাড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে অভিব্যক্তির নিয়মের অধীন, এ কথা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশ যে কিরূপে সপ্রমাণ করেন, তাহা সকলের বোধগম্য হওয়া—দুষ্কর ব্যাপার। যে কবি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিতে যত্নবান হন, কাব্যজগতে তিনি যে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। সন ১৩০০ সালে কাব্যানুরাগী লেখক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় 'সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' নামক কাব্য গ্রন্থের যে সমালোচনা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি কবিকে প্রশংসার সপ্তম স্বর্গে তুলিয়াছিলেন। অথচ উল্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণে 'মানসী'র কয়েকটী কবিতা স্থান পায় নাই, এবং যেগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলির আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোরম করা হইয়াছে। দীর্ঘ কবিতার ঝঙ্কার ও ভাববিহীন অনেক শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে; ফলে সেগুলি দোষশূন্য হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

ক্ষুদ্রায়তন কবিতায় ভাষার পারিপাট্য ও চারুকৌশল লক্ষিত হয়। কবিতাপাঠে প্রাণের ভিতর যে উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়, অভিদীর্ঘ কবিতায় ভাষা ও ভাবে সামঞ্জস্যের অভাব হইলে সেই উচ্ছ্বাস হৃদয়কে প্লাবিত না করিয়াই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ভাবের বিস্তৃতি যদি অত্যধিক হয়, তাহা হইলেও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। ভাবের ও ভাষার পুনরুক্তি আবার নিতান্ত অসহনীয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা-ভঙ্গীতে যে নূতনতা, মৌলিকতা ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা যতই কেন অনায়াস স্ফূর্ত্তিতে প্রকাশ পাউক না, সে শিল্পকুশল সাধারণ তাঁহার লেখনী সংযত করিয়া রাখিতে সমর্থ

করিল, তাহার পরিণতির জন্য কবিকে অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। যৌবনের ভ্রান্তি, রূপের মোহ যখন কবির মন হইতে দূর হইল, তখন তিনি প্রেমের শক্তি অনুভব করিলেন; আর সেই সঙ্গে তাঁহার কাব্যের শিল্প সৌন্দর্য্য নূতন ও উজ্জ্বলতর ছটায় ফুটিয়া বাহির হইল। 'মদন-ভস্মের পূর্ব্বে' ও 'মদন-ভস্মের পর' এই যুগল কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রেম যে যৌবন-স্বপ্ন নয়, তাহা যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার ভাব ভাষা ছন্দ যেন কলার পরিপূর্ণতা লাভ করিল। উৎকর্ষ এইরূপেই প্রত্যেক প্রতিভাশালী লেখকের আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথম সংস্করণে গোবিন্দলালকে মরিতে দেখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তর-রাজ্যে যে পুরাতন ভাবগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহা 'মানসী'র 'ভুল-ভাঙ্গা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় বেশ বুঝিতে পারা যায়।—

"বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।"—ভুল-ভাঙ্গা।

যখন আঁখিতে প্রেমের ঘোর ছিল, তখন কবি বাহুলতা সম্বন্ধে 'কড়ি ও কোমলে' যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার শেষ দুই ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।"—বাহু।

'কড়ি ও কোমলে' কবি 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা' প্রভৃতি যে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেগুলির রচনাকে 'আকাশ-কুসুম-বনে স্বপন-চয়ন' ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? কবির হৃদয়ের দেবতা মদন তখনও তিরোভূত হন নাই। 'কড়ি ও কোমলে'র নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এই কবিতা-

যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিস্তব্ধতা মহাপ্রেমে বসি নিশ্চুপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্ম-প্রতিরূপ।"—বলাকা।

নারীর দেবীভাব এমন কবিত্বময়ী রচনায় আর কোনও বাঙ্গালী কবি বর্ণনা করেন নাই। কবির আদর্শ যে এখন স্বর্গীয় প্রতিভায় মণ্ডিত হইয়া তাঁহার কল্পনার সাথী হইয়াছে, তাহা আরও অনেক কবিতার স্পষ্ট বুঝা যায়।

"তোমার শান্তি পাস্থ জনে
ডাকে দূরের পানে!
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্য কুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত যে আকুল
মুকুল খসে' পড়ে!
সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে!"—বলাকা।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ত্রৈযবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রেমভাব রমণী-প্রেমের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস।

নির্ব্বোধের শাস্তি।

১

ছোট একখানি চালা ঘর, আর তাহারই ভিতর ছোট স্যাকরার দোকান খানি। দোকানে আসবাবপত্র যেমন কম, লোকও তেমনই বেশী ছিল না। শুধু গোকুল একা বসিয়া নিঃশব্দে কাজ করিত। একাই হাপর তাওয়াইয়া রূপা গলাইত; একাই তাহা ঠুক্-ঠাক্ করিয়া পিটিত; কখনও বা প্রদীপের শীষের উপর বাঁক-নল রাখিয়া,তাহাতে ফুৎকার প্রদানপূর্ব্বক গহনায় পান দিত। পাশেই গোপাল দত্তের বড় দোকান; সোনা রূপার কত ভারী ভারী কাজ সেইখানে যাইত। শুধু গরীব চাষা ভুষাদের রূপার মল, দরিদ্র মুসলমান শিশুর

ছোট দোকানখানিতে আসিত। আর গোকুল একা সকাল হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সেই ছোট-খাট কাজে লাগিয়া থাকিত।

কাজও যে সব সময় থাকিত, তাহা নহে। তখন গোকুল যন্ত্রপাতিগুলা একটু সরাইয়া নই কাঠখানা মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িত, এবং কাশীদাসের মহাভারত-খানি খুলিয়া পড়িতে থাকিত—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥"

অবশ্য সময়-ক্ষেপণের দিকে গোকুলের যতটা আগ্রহ ছিল, পুণ্য-সঞ্চয়ের দিকে ততটা আগ্রহ ছিল না।

পড়িতে পড়িতে গোকুল কখনও কখনও ঘুমাইয়া পড়িত। তখন একটী নয় দশ বছরের মেয়ে আসিয়া 'গোকুলদা, গোকুলদা' বলিয়া ডাকিত। কিন্তু দুই তিন ডাকেও গোকুলের ঘুম না ভাঙ্গিলে সে আস্তে আস্তে আসিয়া কাছে বসিত, এবং গামলা হইতে একটু জল লইয়া নিদ্রিত গোকুলের নাসারন্ধ্রে বা কর্ণ-বিবরে প্রদান করিত। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে সে আগে পরিধেয়ের আঁচলটা নিজের মুখে বেশ করিয়া চাপিয়া দিত; পাছে উদ্গত হাস্যের বেগে এই আরব্ধ রহস্যজনক কার্য্যটী অসম্পন্ন থাকিয়া যায়।

অঙ্গে জল স্পৃষ্ট হইবামাত্র গোকুলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং সে হুঙ্কার দিয়া 'পেসাদী!' বলিয়া উঠিয়া বসিত। পেসাদী আর হাসি চাপিতে পারিত না, মুখে কাপড় চাপা সত্ত্বেও সে হাসিয়া উঠিত, এবং সে চাপা হাসি শীঘ্রই কান্নাতে পরিণত হইত। গোকুল রাগিয়া বলিত, 'দেখ্ পেসাদী, তুই ভারি দুষ্টু হ'য়েছিস্! কাণে জল দিলি কেন বল্ তো?'

পেসাদী ঘাড় দোলাইতে দোলাইতে উত্তর করিত, 'তুমি ঘুমুচ্ছিলে কেন বল তো?'

'আমার ঘুমুতে ইচ্ছে হ'য়েছে, তাই ঘুমিয়েছি।'

'আমারও তোমার কাণে জল দিতে ইচ্ছে হ'য়েছে, তাই দিয়েছি।'

রাগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে গোকুল হাতে মুখে জল দিয়া পেসাদীকে তাড়াক সাজিতে আরম্ভ করিত। পেসাদী কোনও দিন বিনা বাক্যব্যয়ে তাড়াক সাজিতে বসিত; কোনও দিন বা মুখ ভার করিয়া বলিত, 'আমি তোর তাড়াক সাজার চাকরাণী নাকি?'

গোকুল হাসিয়া বলিত 'ছিঃ, আমি কি তাই বলছি।'

'তবে কি বলছো ?'

'বলছি যে, তুই চমৎকার তামাক সাজতে পারিস্, তোর সাজা তামাক বড্ড মিষ্টি লাগে।'

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

এই প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া পেসারী তামাক সাজিতে যাইত। তার পর গোকুল তামাক খাইয়া কাজে বসিত; পেসারী সম্মুখে বসিয়া তাহার সহিত গল্পে প্রবৃত্ত হইত।

কিছুক্ষণ গল্প করিয়া পেসারী যখন উঠিয়া যাইত, তখন গোকুল অত্যন্ত মৃদু মৃদু স্বরের সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিত—

এত সাধের বাগান আমার, ফুটলো নাকো ফুল!

২

অধিকাংশ জাতির মধ্যে যে গোকুলের মত নির্ব্বোধ ছেলে জন্মিতে পারে, ইহা গোকুলকে না দেখিলে কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে পারিত না। গোকুলের বাপ নকুড় স্যাকরা শুধু বুদ্ধিমান্ ছিল না, এক জন নামজাদা কারিকরও ছিল। দেশের বড় লোক নকুড়ের কাছেই গহনা গড়াইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইত। ইহাতে নকুড়ের দোকানটা এমন জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, একা সামলাইতে না পারিয়া সে আপনার পিসতুত ভাই গোপালকে আনিয়া রাখিয়াছিল। গোপাল শাস্ত্র কর্ম্ম কিছুই জানিত না; অল্প বয়সে মা বাপ মারা যাওয়ায় গাঁজা খাইয়া, তাস খেলিয়া বেড়াইত। গোকুল তাহাকে আনিয়া হাতে ধরিয়া কাজ শিখাইয়া এক জন কারিকর করিয়া তুলিল। শুধু তাহাই নহে, বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিল।

নকুড় পিসতুত ভাইকে মানুষ করিল বটে, কিন্তু নিজের ছেলেকে মানুষ করিবার সময় পাইল না। গোকুল হাপর তাওয়াইয়া সবেমাত্র যখন সোনা রূপা গলাইতে শিখিয়াছে, তখন নকুড় হঠাৎ সাত দিনের জ্বরে মারা গেল। মরিবার সময় সে রোরুদ্যমানা পত্নীকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া গেল, 'গোপাল রইল, ভয় কি ?'

কিন্তু দিন কতক পরেই গোপাল যখন এই সামান্য দোকানের আয়ে এত বড় সংসারটা চালাইবার অক্ষমতা প্রকাশ করিল, তখন গোকুলের মা ভীত হইয়া বলিল, 'ছেলেটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও না ঠাকুরপো, তা হ'লে তো ওর দ্বারাও দু'পয়সা আসতে পারবে।'

গম্ভীরভাবে গোপাল বলিল, 'ও আবার কাজ শিখবে! ওর মত বোকা কি দুনিয়ায় আছে?'

গোকুল যে বাস্তবিক বোকা ছিল, তা নয়, কিন্তু বাপ মারা যাওয়ার পর হইতে সে যেন কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছিল। ইহার উপর কাজ করিতে গেলে সে যখন খাতার কাছে প্রতি পদে ধমক এবং সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত খাইত, তখন তাহার অবশিষ্ট বুদ্ধিটুকুও যেন লোপ পাইয়া আসিত; চোখের সম্মুখে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া যাইত; অর্দ্ধগলিত রূপাটা হাতেরই পড়িয়া যাইত। তার পর রীতিমত প্রহার খাইয়া সে এক পাশে বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে থাকিত।

কোনও পুরাতন খরিদ্দার আসিয়া যদি গোপালকে বলিত, 'নকুড়ের ছেলেটাকে বসিয়ে রেখেছ কেন? কাজ-কর্ম্ম শিখিয়ে মানুষ ক'রে নাও না।' তাহা হইলে গোপাল হাসিয়া বলিত, 'মানুষের ছেলেই মানুষ হয়, গাধা পিটে ঘোড়া হয় না। আর ও হতভাগা কাজ শিখলে কি আপনাদের গয়না গড়াতে হবে?'

খরিদ্দার ইহার কারণ জানিতে চাহিলে গোপাল বলিত, 'হতভাগা কাজের কিছুই জানে না, এরি মধ্যে চুরী বিদ্যেটুকু শিখে নিয়েছে। এক ভরি রূপো গলাতে দিলে দু'আনা চুরী ক'রে বসে থাকে। এর পর ও ভরিকে ভরি পার করবে।'

খরিদ্দার গোকুলের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গোপালের সততার প্রশংসা করিত।

কিন্তু কেবল সততা লইয়া থাকিলে যে সংসার-সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায় না, এ কথা গোপাল বেশ জানিত; সুতরাং সে লোকের বাক্য সমালোচনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া, নকুড়েরই একখানা ঘর নিজস্ব করিয়া লইয়া, নকুড়ের স্ত্রী পুত্রের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিল, এবং দোকানের অংশস্বরূপ গোকুলকে একটা সাঁড়াশী, একটা ভাঁট-ভাঙ্গা হাতুড়ী, এবং সোনা ঢালিবার একটা ভাঙ্গা ছাঁচ পাঁচ জনের সাক্ষাতে ফেলিয়া দিল।

গ্রামে সৎ অসৎ দুই প্রকারের লোকই থাকে। গোপালের ব্যবহারটা যাহাদের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইল, তাহারা গোকুলকে পরামর্শ দিল, 'তোর বাপের দোকান, নিজের ঘর ভিটে; গোপালকে তাড়িয়ে দে।'

গোকুল মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, 'ছিঃ, কাকা যে!'

পরামর্শদাতারা বলিল, 'সাত পুরুষের কাকা। দূর বোকা।'

তাহারা গোকুলকে নির্ব্বোধ আখ্যা দিয়া নিরস্ত হইল। আর গোকুল প্রতিবেশী গগন স্যাকরার দোকানে বিনা বেতনে কাজ শিখিতে আরম্ভ করিল।

বছর দুই শিক্ষার পর যখন কাজটা কতক আয়ত্ত হইল, এবং মায়ের যে দুই একখানি গহনা ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিল, তখন গোকুল খুড়ার দোকানের একটু দূরে একখানি চালা-ঘর তুলিয়া দোকান পাতিয়া বসিল।

৩

'গোকুল দা!'

'কেন রে পেসাদী!'

'ওটা কি গড়ছো?'

'চুড়ী।'

'কার চুড়ী?'

'পরাণ বাগ্দীর ছেলের বিয়ে হবে, তারি বৌয়ের চুড়ী।'

পেসাদী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা গোকুল দা, তোমার বিয়ে হবে?'

গোকুল রূপার পাতে হাতুড়ীর ঘা দিতে দিতে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল 'হুঁ।'

'আমার?'

'তোরও বিয়ে হবে।'

'তোমার বউকে চুড়ী দেবে?'

'নিশ্চয়।'

'আমাকে?'

'তোকেও তোর বর চুড়ী দেবে।'

পেসাদী ছোট হাতুড়ীটা মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, 'তুমি কিন্তু দেবে না?'

'দেব।'

'কি দেবে?'

'সোনার চুড়ী!'

বিস্ময়ে চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া পেসাদী বলিল, 'সোনার চুড়ী?'

গোকুল তাহার হর্ষসমুজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'হাঁ।'

পেসাদী বলিল, 'সত্যি?'

গোকুল বলিল, 'আমি কি মিছে কথা বলি।'

পেসাদী আনন্দে নাথা নাড়াইতে নাচাইতে বলিল, 'ওঃ, সোনার চুড়ী! আচ্ছা, কবে দেবে?'

'তোর বিয়ের সময়।'

পেসাদী উঠিয়া দাঁড়াইল; হর্ষোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিল, 'আমি মাকে বলি গে, সোনার চুড়ী!'

সে প্রস্থানোদ্যত হইলে গোকুল হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং একটু ধমকের সুরে বলিল, 'খবরদার, তা হ'লে কিন্তু দেব না।'

পেসাদীর হর্ষোজ্জ্বল মুখখানি মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। তখন গোকুল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সহাস্যে বলিল, 'এখন এ কথা কাউকে বলতে নাই, বুঝলি?'

পেসাদীর মুখে আবার হাসি ফুটিল; বলিল, 'কাউকে বলবো না?'

গোকুল বলিল, 'না।'

পেসাদী তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া এবং আর একবার গোকুলের প্রতিশ্রুতি লইয়া চলিয়া গেল। গোকুল মুগ্ধ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার হর্ষচঞ্চল-গতির দিকে চাহিয়া রহিল।

গোকুলের বিবেচনা করিবার একটু কারণও ছিল। পেসাদী প্রতিবেশী কৈবর্ত্ত-কন্যার ভাইঝি। পেসাদীর বাপ ছিল না, বিধবা মা ছিল। মেয়ে বড় হইতেছে দেখিয়া মা তাহার বিবাহের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়াছিল; কিন্তু মনের মত পাত্র মিলিতেছিল না। এই মেয়েটিই মায়ের একমাত্র সম্বল; সুতরাং বেশী দূরে দিবার ইচ্ছা ছিল না, অথচ একটু ভাল ঘরে দিবারও লোভ ছিল। কিন্তু এরূপ মনোমত পাত্র না পাওয়ায় বিধবা অবশেষে গোকুলকেই মনোনীত করিয়াছিল, এবং গোকুলের মায়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তাও কহিতেছিল। সে কথাবার্ত্তা খুব গোপনে হইলেও মায়ের কথার ভাবে গোকুল সেটুকু বুঝিয়া লইয়াছিল। ইহাতে সে যে মনের ভিতর আশা ও আনন্দের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস অনুভব করিতেছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকিলেও, এ অবস্থায় পেসাদীকে সোনার চুড়ী দিবার প্রতিশ্রুতিটা প্রকাশ পাইলে তাহা যে নিতান্তই লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা গোকুল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। পেসাদীর মা কথাটা শুনিলে কি মনে করিবে! ছিঃ!

গোকুল যে আশায় পেসাদীর নিকট প্রতিশ্রুত হইল, তাহার সে আশা

কিন্তু পূর্ণ হইল না। বিবাহের কথাটা চাপা রহিল না, শীঘ্রই পাঁচ কান হইয়া পড়িল, এবং সেই পাঁচ কানের মধ্যে গোপালেরও একটা কান ছিল। এমন অসম্ভব কথাটা শুনিয়া গোপাল শীঘ্রই পেসাদীর মায়ের কাছে উপস্থিত হইল, এবং গোকুলের মত হতভাগার হাতে মেয়ে দিতে স্বীকৃত হওয়ায় পেসাদীর মাকে আত্মীয়তাসূচক কতকগুলা তিরস্কার করিয়া দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিল যে, ইহা অপেক্ষা মেয়েটার গলায় কলসী বাঁধিয়া কানা নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়াও লক্ষগুণে ভাল। গোকুল তাহার আত্মীয় হইলে কি হয়, দোষগুণ বলিবার অধিকার ত সকলেরই আছে; এই অধিকারের বলেই সে জানাইয়া দিতেছে যে, গোকুলের মত নির্গুণ পাত্র জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।

তখন পেসাদীর মা ভীত হইয়া পরমাত্মীয় গোপালের শরণাপন্ন হইল। গোপাল তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, গাংপুরে তাহার এক মামাতো শ্যালা আছে! যেমন ঘর, তেমনই বর। পেসাদীর মা যখন তাহার উপর নির্ভর করিয়াছে, তখন সে যেরূপেই হউক, এই ছেলেটাকে ঠিক করিয়া দিবে। শুধু তাহাই নয়, সে এমনও আশ্বাস দিতে পারে যে, ইহাতে পেসাদীর মার একটী পয়সাও খরচ হইবে না।

পেসাদীর মা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল, এবং নিজের স্ত্রীবুদ্ধিকে অসংখ্য ধিক্কার দিয়া শতমুখে এই পরোপকারী লোকটীর প্রশংসা করিতে লাগিল।

এই সংবাদটা গোকুলের কানে গেলে সে প্রথমটা একটু বিচলিত হইয়া পড়িল; তার পর মনটাকে স্থির করিয়া লইয়া স্বীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিল, এবং যে জিনিসগুলা গড়িবার জন্য কোনও তাড়া ছিল না, তাহাই দুই দিনে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

গোকুলের মা কিন্তু এত সহজে স্থির হইতে পারিল না। তাহার ছেলের বিবাহে যে কানভাঙ্গানী দেয়, তাহার সুবিচার করিবার জন্য ভগবানের নিকট অভিযোগ করিতে লাগিল। শুনিয়া গোকুল বলিল, 'ছি মা, কাকা যে।'

গোকুলের মা কিন্তু এত বড় অপমানটা সহজে বিস্মৃত হইতে পারিল না, সে ইহারই মধ্যে পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, এবং গগন নস্তকে ধরিয়া এক স্থানে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ভাল বর পাওয়া গেল না। মেয়ের বাপ খুব গরীব, কিছু দিয়া খরচের সাহায্য করিতে হইবে। গোকুলের মা তাহাই স্বীকার করিয়া লইল। পেসাদীর

বিবাহের এক দিন পরেই গোকুলের বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। গোকুল বলিল, 'এত তাড়াতাড়ি কেন মা?'

মা বলিল, 'আমার খুসী।'

বলিয়া গোকুলের হাতে এক ছড়া হার এবং দুইখান মাকড়ী দিল, এবং তাহা ভাঙ্গিয়া দুই গাছা বালা ও দুইটা পার্শী মাকড়ী গড়িবার আদেশ দিল।

৪

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পশ্চিম আকাশে একখানা কালো মেঘ উঠিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল। বাতাস একটুও ছিল না, গাছ পালা সব যেন আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; সন্ধ্যা না হইতেই জমাট অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া যাইতেছিল। এমন সময় পেসাদী আসিয়া ডাকিল, 'গোকুল দা!'

চমকিতভাবে গোকুল বলিল, 'কে, পেসাদী? এমন সময়?'

পেসাদী দোকানের ভিতর আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'তোমার চুড়ী কৈ?'

চুড়ীর কথাটা গোকুলের আদৌ মনে ছিল না; সুতরাং সে সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিল না, নীরবে পেসাদীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পেসাদী একটু হাসিয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিল, 'ভুলে গেছ বুঝি?'

ঈষৎ লজ্জিতভাবে গোকুল বলিল, 'কবে বিয়ে?'

পেসাদী বলিল, 'কবে কি? পরশু।'

গোকুল হাসিয়া বলিল, 'ও, পরশু—এখনো দুদিন।'

অতঃপর সে পেসাদীর অঙ্গের অলঙ্কারের দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর এ সব গয়না এল কোথা হ'তে?'

পেসাদী একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, 'গায়ে-হলুদের তত্ত্বের সঙ্গে হার, মাকড়ী আর মল এসেছে। বালা জোড়া মায়ের ছিল।'

'আজ গায়ে হলুদ হ'য়ে গিয়েছে?'

'হাঁ।'

বাহিরে গোঁ গোঁ শব্দে ঝড় উঠিল। পেসাদী ব্যস্তভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া উঠিল, 'ওমা, ঝড় উঠলো যে।'

গোকুল বলিল, 'একটু ব'সে যা।'

'না, এই সময়ে পালাই' বলিয়াই পেসাদী ছুটিয়া বাহির হইল। গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। আট গাছা চড়ী, ছ' ভরির কম কিছুতেই

দাঁড়াবে না। ছ' ভরি সোনা কোথায়? সময়ও নাই, দুই দিনের কম চূড়ী প্রস্তুত হইবে না। কিন্তু সোনা পাই কোথায়?

গোকুল যখন দোকানে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছিল, পেয়াদী তখন ঝড়ের ধূলা আর মেঘের অন্ধকারের মধ্য দিয়া ছুটিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়াছিল। কিন্তু গোকুলের দোকানের পর গোপালের দোকান পার হইয়া বোস পুকুরের পাড়ের কাছে যাইতেই একটা তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। পেয়াদী ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে কে আসিয়া দৃঢ় হস্তে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল, এবং তাহাকে কথা কহিতে অবসরমাত্র না দিয়াই তাহার গলার হার এবং কাণের মাকড়ী ছিনাইয়া লইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। পেয়াদী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

নিকটেই লোকের বাস। চীৎকার শুনিয়া অনেকেই ছুটিয়া আসিল। গোপালও দোকান হইতে চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল; সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দোকানে গগন ছিল, সেও আসিল। তাহারা পেয়াদীর মুখে অলঙ্কার-হরণের বৃত্তান্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। গোপাল ব্যস্ততার সহিত বলিল, 'পুলিসে খবর দাও।'

গ্রামেই পুলিস থানা। গগন সেখানে খবর দিতে ছুটিল।

অবিলম্বে দারোগা, জমাদার, কনেষ্টবল প্রভৃতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে; ঝড়ে মেঘের দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া গিয়াছে; মধ্যগগনে বসিয়া শুক্লাষ্টমীর চাঁদ হাসিতেছে।

দারোগা প্রথমেই পেয়াদীর এজাহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সে এমন সময় কোথায় গিয়াছিল, কেন গিয়াছিল, চোর কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছিল, তাহাকে সে চিনিতে পারিয়াছে কি না, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উত্তরে পেয়াদী কাঁদিতে কাঁদিতে গোকুলের দোকানে যাওয়া, সেখান হইতে প্রত্যাগমন, বিদ্যুৎস্ফুরণে চমকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়ান, ইত্যাদি সকল কথা বলিল, কিন্তু চোর কে, বা সে কোন্ দিক্ হইতে আসিল, তাহার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। তবে সে যে পিছন হইতে আসিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিল। গোপাল সাক্ষ্য দিল যে, ঠিক সেই সময়ে তাহার দোকানের সম্মুখ দিয়া এক জন লোককে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু ঝড়ের সময় কে কোথায় ছুটিয়া যাইতেছে ভাবিয়া তেমন লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, এবং অন্ধকারে লোকটাকেও চিনিতে পারে নাই।

এইরূপ সান্ত্বনা দিয়া গোপাল দারোগা বাবুর কাণের কাছে মুখ রাখিয়া কি একটা সন্দেহের কথা বলিল। শুনিয়া দারোগা বাবু তাহার মুখের উপর বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

৭

অনেকক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দোকানের দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া, আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মাতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার দুইখানি বাহির করিল। নিক্তি ধরিয়া ওজন করিয়া দেখিল, সাড়ে ছয় ভরি। তাহার মুখে একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল।

তার পর গোকুল হাপর ঠিক করিয়া মুচিতে গহনা দুইটী রাখিয়া তাহা হাপরে চড়াইয়া দিল, এবং তাহার চারি পাশে কয়লা সাজাইয়া দিয়া ভোরে জোরে হাতা টানিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নিমধ্যস্থ মুচি অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল, গহনা দুইটা উত্তাপে লাল হইয়া আসিল। গোকুল বাম হাতের তেলোয় একটু সোহাগা লইয়া স্থিরদৃষ্টিতে মুচির দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা দোকানের বাহিরে একটা কলরব উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ঘন ঘন শব্দে ঘা পড়িল। ভীতি ও বিস্ময়ে বিমূঢ় গোকুল উঠিয়া দরজা খুলিবে কি না স্থির করিবার পূর্ব্বেই দরজাটা হুড়মুড় শব্দে ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। দারোগা বাবু সদলবলে দোকানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গোকুল বাঁ হাতে বাঁ কাণ, ডান হাতে সোহাগাটুকু ধরিয়া বিস্ময়স্তব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গোপাল তাড়াতাড়ি হাপরের মুখের মুচিটা জল হাপরে ঢালিয়া দিল।

হাপর হইতে মুচি নামান হইলে সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার মধ্যে মকদ্দমার হার ও মাকড়ি। পেসাদী হাঁ করিয়া একবার গোকুলের মুখের দিকে, শ্যামবাবু দারোগার ভ্রূকুটীভীষণ মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, এবং দারোগার বেতের হুঙ্কার খাইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, এই হার ও মাকড়ি তাহারই। গোকুল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সত্যি পেসাদী, এগুলা এখন তোরি বটে, কিন্তু গয়নার মত ক'রে চুড়ী গ'ড়ে দিতে পেলাম না।'

'তবে নিজেই চুড়ী পর' বলিয়া জমাদার তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল। গগন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'কিন্তু গোকুল—'

দারোগা বাবু একটা অশ্রাব্য ভাষায় তাহাকে ধমক দিয়া উঠিলেন।

গোকুলের মা গোপালের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া বলিল, 'এ কি হ'লো

গোপাল প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কি ক'রবো বল, পাপের সাজা ভগবান্ দেন। হতভাগা নেহাৎ নির্ব্বোধ কি না। একটা দিন না হয় চেপে রাখ্। তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে গালিয়ে ফেলতে বসেছে। হরি হে, তুমিই সত্য।'

গোকুলের মা কাঁদিয়া বলিল, 'ও ঠাকুরপো, সে হার মাকড়ী যে আমার; আমিই তাকে গয়না গড়তে দিয়েছি।'

তীব্র বিদ্রূপের স্বরে গোপাল বলিল, 'তুমি তো গোকুলেরই গর্ভধারিণী। এমন মাতৃগর্ভা মা না হ'লে এমন রত্ন জন্মায়!'

গোপালের স্ত্রী ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'পরের মেয়ের গয়না নিয়ে ছেলের বিয়ে। গলায় দড়ি!'

গোপাল বলিল, 'শুধু ত বিয়ে নয়, আমার উপর টেক্কা দেওয়া। আমার মধুসূদন আছেন। দীনবন্ধু হে, তুমিই সত্য।'

তাহার এই আহ্বানে দীনবন্ধুর আসন টলিয়াছিল কি না, বলা যায় না, কিন্তু কৃতজ্ঞতার আসনটা নিশ্চয়ই বিচলিত হইয়াছিল।

তার পর ছয় মাস জেল খাটিয়া গোকুল যে দিন ফিরিয়া আসিল, তাহার কয়েক দিন পরে একটা চুরীর মোকদ্দমার খানাতল্লাসীর ফলে গদাই ডোমের ঘর হইতে যখন পেসাদীর হার ও মাকড়ী বাহির হইল, তখন গোপাল আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, 'ছোঁড়া যেমন নির্ব্বোধ, তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। ছি ছি, এমন নির্ব্বোধও জগতে থাকে? হরি হে, তুমিই সত্য।'

নির্ব্বোধ গোকুল কিন্তু খুড়ার এ সকল কথায় কান না দিয়া আপনার চালা-ঘরে বসিয়া ঠুক্-ঠাক্ শব্দে রূপা পিটিতে লাগিল; আর তাহারই সঙ্গে মাঝে মাঝে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতে লাগিল—

এত সাধের বাগান আমার ফুটলো নাকো ফুল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। [illegible] 'আপনপ্রস্তু অহংয়ে' নামক প্রবন্ধটি 'আপনই ইংরেজপদবি' ও মাদ্রাজী ত্রিবেদম্-পদ্ধতির hybrid; তথায় তাহাতে ত্রিবেদম্ পদ্ধতি [illegible] প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার প্রেম, দৃষ্টি, পাষাণপত্র, তুলনা প্রভৃতিও অপ্রকৃত নহে। ইংরেজি পরিপ্রেক্ষিত এতদ্বারে বিশ্লেষিত হয় নাই। অহংয়ের যে দোষ আছে বলিয়া, তাহাতে মনস্তিপ্রস্থ মতবাদের আভাস আছে। যাহা হউক আমাদের [illegible] ভাল, ধ্রুব; তাহা নহে; খৃষ্টের অহংয়ে পৌরুষের গৌরবে তাহা পরাস্ত হইয়াছিলেন। ত্রিবেদম্ [illegible] পূর্ণ করিয়া [illegible] 'ত্রিবেদম্-পদ্ধতির' নামকরণ যথার্থতঃ পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহা হইলেই আমরা [illegible] ত্রিবেদমী। ত্রিবেদম্-প্রতিষ্ঠাও অবশ্যক [illegible] করিয়া তোলেন তাহা আমাদের পূজা করিবার চরিতার্থে চলিতে পারে না। 'ত্রিবেদম্' 'আপনই' বা 'ত্রিবেদী' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। [illegible] ইহা আমাদের নিকট [illegible] আপত্তির অতিরিক্ত। বিধবা-বিবাহের [illegible] প্রতি [illegible] প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও 'বন-প্রবাস' গোছা সমস্তগুলিই উপহাসের ছিল। এবার [illegible] 'Unmarried' শিরোনামে [illegible] অনুযায়ী ও চলনসই [illegible] হইয়াছে। সম্পাদক [illegible] 'ঐ [illegible] প্রকাশ করিতেছেন,—' [illegible] বিষয়ের আলোচনা [illegible] ঐ [illegible] [illegible] আমাদের পাঠকগণ, উহারা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] । [illegible] নামে দিবারও আমার প্রয়োজন নাই। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] 'চুকলি' নামক গল্পটি [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]